৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩৪৬

পরিচয়

পিতৃযান ও দেবযান

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে এই প্রাচীন মন্ত্রটি দৃষ্ট হয় :—

> দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণাম্ অহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্।
> তাভ্যাম্ ইদং বিশ্বম্‌এজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ ॥—১০।৮৩।১৫

'মনুষ্যদিগের পক্ষে দুইটি সৃতির (যানের) কথা শ্রুত আছি,—পিতৃযান ও দেবযান। তদ্দ্বারা প্রচলিত এই বিশ্ব পিতা ও মাতার মধ্যস্থলে মিলিত হয়।' অধ্যাপক ডয়সন্ ঐ মন্ত্রের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—'I have heard from my forefathers that there are two ways, alike for gods and men. They are all subject to the laws of day and night.'

এ অনুবাদ ঠিক মনে হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য ছান্দোগ্যের ৫।১০।২ মন্ত্রের ভাষ্যে ঐ ঋগ্বেদীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই :—

> এষ দেবযানঃ পন্থাঃ ব্যাখ্যাতঃ সত্যলোকাবসানো; ন অণ্ডাৎ বহিঃ—'যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ' ইতি মন্ত্র-বর্ণাৎ। ইহার টীকায় আনন্দ গিরি লিখিয়াছেন :—পিতরং দ্যুলোকং মাতরঞ্চ পৃথিবীং মধ্যে যে দ্বে সৃতী (পিতৃযান ও দেবযান) অশৃণবং,, তাভ্যামিদং বিশ্বম্ কর্ম-জ্ঞানাধিকৃতম্ গচ্ছতি; ন চ অণ্ডাৎ (ব্রহ্মাণ্ডাৎ) বহিরস্তি গতিরমিত্যর্থঃ।

অতএব ঐ মন্ত্রে প্রযুক্ত পিতা ও মাতার অর্থ দ্যুলোক ও পৃথিবী—দিবা ও রাত্রি নহে। অধ্যাপক ডয়সন্ আরও বলেন যে ঐ মন্ত্র—

Is a hymn celebrating *Agni* in its twofold character as sun by day and fire by night. In view of this connection, it can hardly be doubtful

that by the two ways that unite (সমেতি) all that moves between earth and heaven, day and night are to be understood, (and not পিতৃযান and দেবযান)।

বৃহদারণ্যকের ঋষি কিন্তু ঋগ্বেদোক্ত ঐ দুই সৃতির দ্বারা পিতৃযান ও দেবযানই বুঝিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে রাজর্ষি প্রবাহণ জৈবলি ব্রাহ্মণকুমার শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিতেছেন :—

"বেত্থ দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদম্ পিতৃযানস্য বা—যৎকৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযানং বা। অপি হি ন ঋষেঃ বচঃ শ্রুতং—দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্ ইতি"।—বৃহ ৬।২.২

"কুমার! দেবযান পথের প্রতিপৎ (সাধন) ও পিতৃযান পথের প্রতিপৎ —যদ্দ্বারা দেবযান পথ ও পিতৃযান পথ লাভ করা যায়* —তাহা তুমি কি জান? তুমি কি ঋষির উক্তি শুন নাই 'দ্বে সৃতী অশৃণবম্' ইত্যাদি

অতএব অধ্যাপক ডয়সনের অর্থ গ্রহণ করা কঠিন।

ডয়সনের এ সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যখন এই পিতৃযান ও দেবযানের কথা বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ খণ্ডে আছে (যাহাকে খিলকাণ্ড বলে), তখন ইহা কখনই প্রাচীন বৈদিক শিক্ষা হইতে পারে না। এ আপত্তির সহজ উত্তর এই যে, ঐ বিবরণ কেবল বৃহদারণ্যকে নয় ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডেও আছে এবং উভয়ে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুরূপ। উভয় বিবরণের মেলন করিলে মনে হয় ছান্দোগ্যের বিবরণই প্রাচীনতর। সে বিবরণ আমরা এখনই উদ্ধৃত করিব; কিন্তু তৎপূর্বে লক্ষ্য করিতে চাই, যে শতপথ ব্রাহ্মণ (যাহার প্রাচীনতার বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন না)—ঐ ব্রাহ্মণে এই বিবরণের পূর্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ছান্দোগ্যের বিবরণ এইরূপ :—

কোন সময়ে অরুণ-গোত্রীয় শ্বেতকেতু পাঞ্চালদিগের পরিষদে উপস্থিত হইলে, প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কুমার! অনু ত্বা অশিষৎ পিতা'—তোমার পিতা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন ত'—শ্বেতকেতু বলিলেন হাঁ—

---

* যৎ কর্ম কৃত্বা দেবযানং পন্থানং যান্তি পিতৃযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে সা প্রতিপৎ ইত্যর্থঃ—নিত্যানন্দ

'অন্থ হি ভগব ইতি'। তখন প্রবাহণ তাহাকে পরপর পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন :— বেত্থ যৎ ইতঃ অধি প্রজাঃ প্রয়ন্তি—'জীব ইহলোক হইতে কিরূপে পরলোকে প্রয়াণ করে তাহা জান কি?' শ্বেতকেতু বলিলেন 'ন ভগবঃ'। বেত্থ যথা পুনঃ আবর্তন্তে—'কিরূপে জীব পরলোক হইতে আবর্তন করে তাহা জান কি?' 'ন ভগবঃ।' বেত্থ পথো র্দেবযানস্য পিতৃযানস্য চ ব্যাবর্তনা?—'পিতৃযান ও দেবযান পথের বিয়োগস্থান কোথা জান কি?'—'ন ভগবঃ'। বেত্থ যথা অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্যতে?—'ঐ পরলোক কেন ভরিয়া যায় না জান কি?'—'ন ভগবঃ'। বেত্থ যথা পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তি?—'পঞ্চম আহুতিতে অপ্ (রেতঃ) কিরূপে পুরুষ-শব্দ-বাচ্য হয় তাহা জান কি?' 'নৈব ভগব ইতি'। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে জৈবলির ঐ পঞ্চ প্রশ্নের উপন্যাস এইরূপ :—

(১) বেত্থ যথা ইমাঃ প্রজাঃ প্রযত্যঃ বিপ্রতিপদ্যন্তে

(২) বেত্থ যথা ইমং লোকং পুনরাপদ্যন্তে

(৩) বেত্থ যথা অসৌ লোক এবং বহুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভিঃ ন সংপূর্যতে

(৪) বেত্থ যতিথ্যাম্ আহুত্যাং হুতায়াম্ আপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুৎথায় বদন্তি

(৫) বেত্থ দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযানস্য বা, যৎ কৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযানং বা।

শ্বেতকেতু জৈবলির ঐ পঞ্চ প্রশ্নের একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে না পারায় মহা লজ্জিত হইয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং পিতাকে ঐ পঞ্চ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন—'পঞ্চ মা রাজন্য-বন্ধুঃ প্রশ্নান্ অপ্রাক্ষীত্ তেষাং নৈকং চ নাশকং বিবক্তুং'—পিতা বলিলেন আমিও জানি না—'যথা অহম্ এষাং নৈকং চ ন বেদ'।

তখন পিতা পুত্রে রাজা জৈবলির সমীপস্থ হইলেন এবং শ্বেতকেতুর পিতা রাজাকে বলিলেন—'আপনি আমার পুত্রকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর বলিবেন কি?'

স হ কৃচ্ছ্রী বভূব। তং হ চিরং বস ইত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার। তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি।

অর্থাৎ, গৌতমের প্রার্থনা শুনিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে বলিলেন, 'কিছুদিন অপেক্ষা করুন।' তাহার পর কহিলেন, 'হে গৌতম! আপনি যে

বিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন ঐ বিদ্যা আপনার পূর্বে কোন ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই।' পরে রাজা গৌতমকে সেই গোপনীয় বিদ্যার উপদেশ করিলেন।

ঐ উপদিষ্ট বিদ্যার পারিভাষিক নাম 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা'। উহাতে মৃত্যুর পর জীবের পিতৃযান অথবা দেবযান-পথে পরলোকে গতি এবং পিতৃযানীর স্বর্গ-ভোগান্তে মাতৃকুক্ষি হইতে পুনর্জন্ম বর্ণিত আছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক ব্যতীত কৌষীতকী উপনিষদেও এই বিদ্যার বিবরণ আছে (সেখানেও ইহার উপদেষ্টা ঐ প্রবাহণ জৈবলি)। তাহা ছাড়া, প্রশ্ন ও মুণ্ডক উপনিষদেও ইহার উল্লেখ আছে। আমরা যথা স্থানে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা বলিয়াছি, শতপথ-ব্রাহ্মণেও জৈবলির প্রশ্নের অনুরূপ প্রশ্ন আছে। ঐ ব্রাহ্মণের যাজ্ঞবল্ক্য-জনক-সংবাদের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য জনকের নিকট ছয়টি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন, এবং জনক তাহার যথোচিত উত্তর দিতেছেন। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য ৫।৪।১ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

স উক্তো বাজসনেয়কে। তং প্রতি প্রশ্নাঃ উৎক্রান্তিঃ আহুত্যোর্গতিঃ প্রতিষ্ঠা তৃপ্তিঃ পুনরাবৃত্তির্লোকং প্রত্যুত্থায়ীতি। তেষাং চ অপাকরণমুক্তং তত্রৈব *

উদ্ধৃত ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য শতপথ ব্রাহ্মণের যে অংশের প্রতি লক্ষ্য করিলেন তাহার মূল এইরূপ :—

তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ তে অন্তরিক্ষম্ আবিশত স্তে অন্তরিক্ষম্ এবাহবনীয়ং কুর্বতি, বায়ুং সমিধং, মরীচীরেব শুক্রাম্ আহুতিং। তে অন্তরিক্ষং তর্পয়ত স্তে তত উৎক্রামতঃ। তে দিবম্ আবিশতঃ। তে দিবম এবাহবনীয়ং কুর্বতি, আদিত্যং সমিধং চন্দ্রমসমেব শুক্রামাহুতিং। তে দিবং তর্পয়ত স্তে তত আবর্তেতে। তে ইমাম্ আবিশতঃ। তে ইমামিব আহবনীয়ং কুর্বতি, অগ্নিং সমিধম্, ওষধীরেব শুক্রামাহুতিং। তে ইমাং তর্পয়তঃ তে তত উৎক্রামতঃ। তে পুরুষম্ আবিশতঃ। তস্য মুখম্ এবাহবনীয়ং কুর্বতি জিহ্বাং

* ইহার আনন্দ গিরি কৃত টীকা এইরূপ—তত্রাগ্নিহোত্রে সায়ং প্রাতস্চ হুতয়োরাহুত্যোঃ অস্মাৎ লোকাৎ উৎক্রান্তিঃ। উৎক্রান্তয়োঃ পরলোকং প্রতি গতিঃ। গতয়ো স্তত্র প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠিতয়োঃ স্বাশ্রয়ে সংপাদ্যমানা তৃপ্তিঃ। তৃপ্তিমাপাদিতবতোঃ পুনঃ ইমং লোকং প্রত্যাবৃত্তিঃ। আবৃত্তয়োবাশ্রয়ঃ পুমান্ কথম্ অমুং লোকং প্রত্যুত্থানশীলো ভবতি ইতি কার্যারম্ভবিকৃত্য ষট্ প্রশ্নাঃ প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। তত্রৈব বাজসনেয়কে যাজ্ঞবল্ক্যং প্রতি জনকস্য প্রতিবচনং দর্শয়তি।

সমিধম্ অন্নমেব শুক্রামাহুতিং। তে পুরুষং তর্পয়তঃ। স য এবং বিদ্বানশ্নাতি অগ্নিহোত্রম্ এবাস্য হুতং ভবতি। তে তত উৎক্রামতঃ। তে স্ত্রিয়ম্ আবিশতঃ। তস্যা উপস্থম্ এবাহবনীয়ং কুর্বতি, ধারকাং সমিধং, ধারকা হ বৈ নাম এষা এতয়া হ বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা ধারয়াং চকার, রেত এব শুক্রামাহুতিং। তে স্ত্রিয়ং তর্পয়তঃ। স য এবং বিদ্বান্ মিথুনম্ উপৈতি অগ্নিহোত্রম্ এবাস্য হুতং ভবতি যস্ততঃ পুত্রো জায়তে স লোকঃ প্রত্যুত্থায়ী। এতদ্ অগ্নিহোত্রং যাজ্ঞবল্ক্য। নাতঃ পরমস্তীতি হোবাচ। —শতপথ, ১১।৩।২।৬-১০

ইহার Julius Eggaling-কৃত অনুবাদ এই :—

'Well, those two libations, when offered, rise upwards : they enter the air (অন্তরিক্ষং) and make the air their offering-fire, the wind their fuel, the sun-motes (আদিত্যম্) their pure libation : they satiate the air, and rise upwards therefrom.

'They enter the sky (দিবম্) and make the sky their offering-fire, the sun their fuel, and the moon their pure libation : they satiate the sky, and return from there.

'They enter this (earth), and make this (earth) their offering-fire, the fire their fuel, and the herbs their pure libation : they satiate this (earth), and rise upwards therefrom.

'They enter man, and make his mouth their offering-fire, his tongue their fuel, and food their pure libation : they satiate man ; and verily, for him who, knowing thus, eats food, the Agnihotra comes to be offered. They rise upwards from there.

'They enter woman and make her lap their offering-fire, her womb (ধারকাম্) the fuel,—for that (womb) is called the bearer, because by it Prajapati bore creatures,—and the seed (রেতঃ) their pure libation : they satiate woman ; and, verily, for him who, knowing this, approaches his mate, the Agnihotra comes to be offered. The son who is born therefrom is the renascent (প্রত্যুত্থায়ী) world : this is the Agnihotra, Yagnavalkya ! There is nothing higher than this.'

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পরবর্তীকালে যাহাকে 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' বলা হইত, তাহার বিস্পষ্ট পূর্বরূপ আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত হই। অতএব জন্মান্তরের-উপদেশক ঐ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা অর্বাচীন নহে, সুপ্রাচীন। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা সম্পর্কে অন্যান্য কথা আগামী প্রবন্ধে বলিব—তদ্দ্বারা পিতৃযান ও দেবযান সম্বন্ধে উপনিষদের উপদেশ আরও বিশদ হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ইমিয়েনীনী

সে বছর "স্বেন্ মাত্‌কি",* রবিবার ও স্তানিস্লাভের "ইমিয়েনীনী"† একসঙ্গে পড়িল। তাহাতে দুই দুইটা ছুটি একেবারে মাঠে মারা যাইলেও পানী‡ স্তানিস্লাভার অপরিসর গৃহে অতিথি সমাগম অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কিছু কম হইল না। দুই মেয়ে, জামাই ও বড় ছেলে নানা বর্ণ ও নানা আকারের পুলিন্দা ও পুষ্প সমভিব্যাহারে একে একে প্রবিষ্ট হইল, এবং মা'র হস্ত চুম্বন করিয়া স্বেন্ মাত্‌কি ও নামোৎসবের দুইটা কর্ত্তব্য একসঙ্গেই সারিয়া লইল।

পানী স্তানিস্লাভা কৃত্রিম রোষ সহকারে ভর্ৎসনা করিলেন, "দেখো দেখি পাগ্‌লা ছেলেমেয়েদের কাণ্ড! এই সব ছাই ভস্ম কিনে পয়সা নষ্ট করা! তোরা সবাই মানুষ হয়েছিস্, বেঁচে বর্ত্তে আছিস্, তাতেই আমার সুখ। এইসব জিনিষ-পত্তর দিয়ে কি আমার সে সুখ বাড়বে রে?"

উত্তরে মেয়ে, জামাই ও বড় ছেলে পুনরায় মা'র হস্ত চুম্বন করিল। ফুলের মোড়কগুলা খুলিতে খুলিতে পানী স্তানিস্লাভা নানা আনন্দোক্তি করিতে লাগিলেন, "বাঃ কী চমৎকার ফুল! আজালিয়া, রোদোদেন্‌দ্রন্, কন্‌ভালিয়া, নার্ৎসিজ, এই যে মাসে অমন মাগ্‌নোলিয়া কোত্থেকে পেলি রে? ভারী চমৎকার, ভারী চমৎকার! তবে পয়সা নষ্ট করা! এবার যা' ক'রেছিস্ তা ক'রেছিস্, আর যেন কিনিস্ নে আমার জন্যে এসব বাছা। তোরা ত আর রাজারাজড়া ন'স্ বাপু। হ্যাঁ কী বলছিলুম, ক্রাকুফ্ থেকে স্তেফান্ টেলিগ্রাম ক'রেছে, আর সকাল হ'তে না হ'তেই পিওন এক মস্ত মোট নিয়ে হাজির। স্থির হ'য়ে ব'স্ তোরা, দেখাচ্ছি। পাগল ছেলেটা, লিখেছে আস্‌তে পারবে না, ছুটি পায় নি ব'লে। তার ওপর কচি মেয়েটা, তাকে নিয়ে নাড়ানাড়ি করা! না এসেছে

* 'মা'র দিন' অর্থাৎ মাতৃ-উৎসব। ঐদিনে সমগ্র পোলোনিয়ায় মাতৃ-পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

† ইউরোপের বহু দেশে জন্মোৎসবের পরিবর্ত্তে নামোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের নাম অনুযায়ী যথা যান্ (জন্), প্যাত্র্ (পিটার) ইত্যাদি—উক্ত সন্তগণের উৎসবের দিন জন্মদিনরূপে রক্ষিত হয়।

‡ শ্রীমতী বা মহাশয়া। পোলোনীয় ভাষায় "আপনি"র পরিবর্ত্তে "পান্" (পুং) বা "পানী" (স্ত্রী) ব্যবহৃত হয়।

ভালোই ক'রেছে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি কী পাঠিয়েছে। কেবল পয়সা নষ্ট করা।" বলিতে বলিতে পানী স্তানিস্লাভা চক্‌চকে নিকেল-করা কী একটা কল আনিয়া হাজির করিলেন।

"দেখো দেখি পাগল ছেলেটার কাণ্ড!"—আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিয়া পানী স্তানিস্লাভা কহিতে লাগিলেন—"দেখো দেখি একবার, এইসব কিনে পয়সা নষ্ট করা। ঐ ত রোজগার, তার ওপর বৌ, মেয়ে, দেখো দেখি পয়সা নষ্ট করা।" তাঁহার আদরের ছোট ছেলে স্তেফান্ যে তাঁহাকে সকলের অধিক ভালোবাসে এই গর্ব্বে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "এই সব কল-কব্জা নিয়ে আমার হবে কী বল ত। আমাদের সেকেলের কয়লার উনুন কী খারাপ বাপু? তা আজকাল সব নতুন কালের নতুন বিধেন। কয়লা গেল, এল গ্যাস্, আবার এই নতুন ফ্যাশান্, ইলেক্‌ট্রিক। ইলেক্‌ট্রিকের উনুন, বলে, মা ধোঁয়ায় রাঁধতে তোমার কষ্ট হয়, চোখ জ্বলে, ইলেক্‌ট্রিকের সে বালাই নেই। তাছাড়া এতে নাকি ঘর নোংরা হয় না। পাগল ছেলেটা।"

নিকেল-করা এই অভিনব যন্ত্র দর্শনে মেয়ে, জামাই ও বড় ছেলে মিশ্রিত আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল, "বাঃ, বাঃ! সত্যই কী চমৎকার! এবার মা, শুয়ে শুয়েই তুমি চায়ের জল ফোটাতে পারবে। কেৎলীতে জল ভরে' শোবার আগে উনুনের ওপর বসিয়ে রাখা, আর সকালে শুয়ে শুয়েই বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সুইচ্‌টা টিপে দেওয়া।"

পানী স্তানিস্লাভা গর্ব্বভরে কহিলেন, "সুধু তাই নয়, এ উনুনে নাকি পোড়া ঝোড়ার কোনো বালাই নেই। রান্না চড়িয়ে পার্কে দু'চক্কর দিয়ে এসো, রান্না তৈরী হ'য়ে আছে, অথচ একটি আনাজ পর্য্যন্ত পোড়ে নি। তবে পয়সা নষ্ট করা। যা' বাছা তোরা, ঐ বড় ঘরটায় গিয়ে ব'স্‌গে যা'।" পরে স্বর নামাইয়া একপ্রকার চুপি চুপি বলিলেন, "ভাড়াটেরা মানুষ ভারী ভালো, এই দেখো না আমার এই ত একখানা ঘর, তা'র আধখানা আবার রান্নাঘর। তা আজ সকালে পানী য়ানীনা এসে ব'ললেন, 'পানীর ঘরে আজ লোকজন আস্‌বে, তা পানী আজ আমাদের ঘরটাতেই লোকজন বসাতে পারবেন।' যা' বাপু তোরা বড় ঘরটায় গিয়ে ব'স্ গে যা, আমি এক্ষুণি আস্‌ছি। পান্না* কাতারিনা

* কুমারী

এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ক' গে যা, উনি একলা ব'সে আছেন। ভাড়াটেরা মানুষ ভালো, তবে অচেনা, অজানা মানুষ, পান্না কাতারিনার একটু সমীহ হ'চ্ছে বোধ হয়। যা', তোদের উনি জানেন শোনেন, যা বাপু তোরা।"

উক্ত "বড় ঘর" হইতে তখন পান্না কাতারিনার অপ্রতিহত কথায় ছোট বড় ঢেউ দরজার ফুটাফাটা দিয়া ভাঙ্গা নৌকার খোলের ভিতর যেমন অবাধে জল আসিয়া ঢোকে তেমনি করিয়া কুল কুল শব্দে প্রবেশ-কক্ষকে ভরিয়া ফেলিতেছে। দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পান্না কাতারিনার উল্লসিত চীৎকার সকলকে অভ্যর্থনা করিল, "ওমা, আজ কতদিন তোমাদের দেখি নি গো! আট বচ্ছর আগে সেই যে পানী স্তানিস্লাভার ইমিয়েনীনীতে দেখা হয় তারপর আর তোমাদের দেখি নি। তা পানী স্তানিস্লাভার ছেলেমেয়েরা অমন ডাগর হ'য়ে উঠেছে যে আর তুই-তুকারী করবার জো নেই। পান্ ভিতল্দ ত একেবারে মস্ত পুরুষ মানুষ হ'য়ে উঠেছেন!"

ত্রিশ বচ্ছর বয়সেই পান্ ভিতল্দের মাথার মধ্যস্থল একেবারে পালিশ-করা হাতীর দাঁতের মত চক্‌চক করিতেছে। পান্না কাতারিনার হস্তচুম্বন করিয়া সে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া মিনিট গুণিতে বসিল, এখন ছয়টা বাজিয়া সতেরো মিনিট, সাতটায় তাহার ইয়ার স্তানিস্লাভের বাড়ী যাইতে হইবে। সেখানেও ইমিয়েনীনী, স্তানিস্লাভ অবিবাহিত, তাহার ঘরে ডান্‌দিক্‌কার দেওয়াল-আলমারীতে নানা রঙের ও নানা আকারের বোতলগুলা এবং টেবিলে নোন্‌তা "শ্লেজ্"* মাছ ও "কাভিয়ারের"† কথা মনে করিয়া তাহার জিভটা শুকাইয়া উঠিতে লাগিল।

দুই মেয়ে ভান্দা ও হান্‌কা পান্না কাতারিনার সহিত চুম্বন বিনিময় করিয়া দেওয়ালের কাছে দিভানটার উপর বসিল। জামাই তাহার কুটুম্ব-সুলভ লজ্জা সহকারে একখানা চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সুমিষ্ট স্মিতহাস্যে ঘরখানাকে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। তাহার কাল-শুভ্র মাথাটার ভিতর "বসিব" কি "বসিব না" এই দুইটা প্রশ্ন ঢেঁকি-দোলনার মত দুলিতে থাকিল, এবং যতই সময় যাইতে লাগিল, বসা তাহার পক্ষে ততই দুরূহ হইয়া

---

* ইংরাজী "হেরিং", কতকটা ইলিশ মাছের মত।

† একপ্রকার মাছের ডিম, রুশ ও পোলোনিয়া দেশে বিশেষ পরিচিত।

উঠিল। তাহার মনে হইল যেন ঘরশুদ্ধ সকলেই তাকে ইচ্ছা করিয়াই বসিতে বলিতেছে না! সে যে ৬২ বৎসর বয়সে ২৫ বছরের ভান্দাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাতে যে ভান্দার আত্মীয়স্বজন কেহ খুসী হয় নাই, সেই দোষবোধটা তাহাকে অতিশয় পীড়া দিতে লাগিল। তাই তাহার বাঁধানো বিবর্ণ দাঁতগুলাকে বাহির করিয়া সে মমীর মত হাসিতে হাসিতে বসিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভান্দা দিভানের উপর পাতা সতরঞ্চীর ঝালরগুলা আঙুলের চারিপাশে জড়াইতে লাগিল এবং তাহার ছোট বোন হান্‌কা দেওয়াল-পাঁজিতে আঁকা কুকুরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, সে যখন বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার পাতিবে, তখন ঠিক ঐ জাতের একটা কুকুর সে পুষিবেই পুষিবে। এমন সময়ে কলঘরের ঝাঁঝরার মত পান্না কাতারিনার কথার ঝাপ্‌টা ভান্দার আনত মুখের উপর একেবারে উছলিয়া পড়িল—

"বলি পানী ভান্দো,* পানীকে দেখে আমার বোনঝি বার্‌বারার কথা মনে পড়ে। একেবারে হুবহু বসানো, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক, সেই ভুরু, সেই চুল, এমন কি গায়ের রংটি পর্য্যন্ত! পানীকে দেখে কে বলবে যে পানী আমার বোন্‌ঝি বার্‌বারা ন'ন্। পানী যেই ঘরে ঢুক্‌লেন, আমি অমনি একেবারে চম্‌কে উঠলুম, বলি ও মা, পানী স্তানিস্লাভার বাড়ীতে বার্‌বারা কোত্থেকে গা! তারপর অনেকক্ষণ ঠাওর ক'রে দেখ্‌লুম যে না এ নিশ্চয়ই পানী স্তানিস্লাভার বড় মেয়ে পানী ভান্দা! তা ভগবানের এম্‌নি ছিষ্টি যে বয়েসটাও কি ঠিক এক হ'তে হয় গা!"

ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় এই দার্শনিক গবেষণায় যোগ দিয়া পানী স্তানিস্লাভার ভাড়াটে পানী য়ানীনা তাহার গ্রাম্য উচ্চারণকে যথাসম্ভব সহুরে এবং কণ্ঠস্বরকে তদুপযুক্ত শ্রুতিমধুর ও সভ্য করিয়া বলিলেন, "হ্যা, ভগবানের সিষ্টির কথা যদি বলেন পানী কাতারিনো ত তা সুধু মানুষে মানুষেই যে মিল বা সাম্য পাওয়া যায় তা নয়, উৎভিদ্ এবং জীব্‌জগতেও এমন মিল দেখা যায় যে সত্যই আশ্চর্য্য না হ'য়ে থাকা যায় না। লক্ষ লক্ষ গাছ পাতা, তার একটাও আর একটার সঙ্গে মেলে না, আবার এমনও দেখা যায় যে দু'টো পাতায় একেবারে হুবহু মিল।"

* সম্বোধন কারক।

পান্না কাতারিনার কথার ঝারা হু হু করিয়া বহিয়া চলিল :—

"তা পানী যা' বল্‌লেন তা' একেবারে খাঁটি সত্যি। ব'ল্‌বো কি প্রশেঁ পানস্ত‌্ভা.* পানস্ত‌্ভো† শুনলে বিশ্বাস করবেন না। ভিল্‌নোয় থাক্‌বার সময় একটা কুকুর পুষেছিলুম, তার নাম নেরো। নেরো আমার ঐ দেয়ালের ছবির কুকুরটার মতন কতকটা। কাণ দু'টো ঝোলা ঝোলা, একেবারে কুচ্‌কুচে কালো, স্রুদ্ধু লেজের ডগাটা শাদা। ও জাতের কুকুর প্রায় কালোই হয়, নেরোর স্রুদ্ধু লেজের ডগাটায় একটু শাদা। তা ব'ল্‌বো কী প্রশেঁ পানস্ত‌্ভা, একদিন বিকেলের দিকে বসে' আছি পার্কে, দেখি নেরো চলেছে কোন্ এক পানের সঙ্গে! আমি ত অবাক! বলি এই মাত্তর নেরোটাকে গিলিয়ে কুটিয়ে দোর বন্ধ করে' একটু বেড়াতে বেরিয়েছি তা সে বেরুলো কোন্‌খান দিয়ে! ডাক্‌লুম 'নেরো! আয় এদিকে;' ডাক শুনে' নেরো একবার ফিরে তাকালে, কিন্তু ভাবটা দেখালে যেন সে আমায় জীবনে কখনো দেখে নি। ফিরে একবার তাকিয়ে সে চল্‌লো সেই পানের সঙ্গে সঙ্গে। ভাব্‌লুম, নেরোকে চোরে নিয়ে যাচ্ছে। ছুট্‌লুম পিছু পিছু, যতবার ডাকি 'নেরো,' 'নেরো,' নেরো ততবারই ফিরে' তাকায় অথচ ভাবটা দেখায় যেন সে আমায় চেনেও না। ধমক দিয়ে' ব'ল্‌লুম, 'হতভাগা কুকুর, কোন্ এক অজানা মানুষের সঙ্গে চলেছো গেলবার লোভে, জানো না যে তোমায় চোরে নিয়ে যাচ্ছে। জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে যে মারবে তোমায়। জানেন ত পানস্তভো শোনা যায় যে হাবানো কুকুর ধরে' চোরে দস্তানার কারখানায় বেচে দেয়, তার পর জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে সেই ছালে দামী দামী দস্তানা তৈরী হয়? আমি কেঁদে মরি, বলি নেরোর আমার সেই দশাই ক'রবে ওরা। ছুট্‌তে ছুট্‌তে কাছে গিয়ে সেই পান্‌কে ডেকে বললুম, 'বলি, আমার কুকুরটাকে ধরে' নিয়ে যাচ্ছো, এক্ষুনি ছেড়ে দাও, তা না হ'লে পুলিশ ডাক্‌বো।' আমার কথা শুনে সেই পান্ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'পানীর কুকুর! অর্থাৎ?' বলি, 'অর্থাৎ

---

* পোলোনীয় ভাষায় ভদ্রতায় পরিচায়করূপে কথার মাঝখানে "প্রশে পানা" (পুং) "প্রশেঁ পানী" (স্ত্রী) ও "প্রশে পানস্ত‌্ভা" (পুং ও স্ত্রী) ব্যবহৃত হয়। কতকটা ইতালীয় ভাষার "প্রেগো'র মত।

† আপনারা (পুং ও স্ত্রী)। তদনুরূপে, "পানভিয়ে=আপনারা (পুং), "পানিয়ে"=আপনারা (স্ত্রী)। ঐ সর্ব্বনাম ও অন্যান্য পোলোনীয় শব্দ, গল্পের স্থানীয় আবহাওয়াকে বজায় রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইল।

আবার কী? এ আমার কুকুর!' ব'লে, 'পানীর মাথার একটু দোষ আছে কী?' ধমক দিয়ে বলি, 'এক্ষুনি যদি ছেড়ে না দাও ত পুলিশ ডেকে একটা অনর্থ কাণ্ড ক'রবো!' বলে, 'হয় পানীর মাথা খারাপ, আর না হয় পানী তামাসা ক'রছেন। এ আমার কুকুর নেরো!' চেঁচামেচি শুনে লোক জড় হ'য়ে গেল, পুলিশ এলো। তবুও সে পান্ বলে, 'এ আমার কুকুর নেরো।' আমি বলি, 'অম্নি ব'ল্লেই হ'ল, আমার কুকুর নেরো, ও যে আমার দুধের বাচ্চাটি থেকে মানুষ করা নেরো গা!' পুলিশ সেই পান্‌কে নিয়ে চ'ল্লো থানায়, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি। কুকুর-চোর দেখে আমাদের পেছনে পেছনে জোয়ারের মতন লোক চলেছে। নেরো কী ভেবে' আমায় দু' একবার শুঁকে ঘেউ ঘেউ করে' ডেকে উঠলো। ধরতে যাই ত ধরতে দেয় না, কেবল ঘেউ ঘেউ করে' ডাকে। থানায় যাবার পথে আমার বাড়ী পড়ে। পুলিশকে বলি, 'বাপু দাও আমার কুকুর আমায়, নিশ্চয় ওর একটা অসুখ বিসুখ ক'রেছে। তা পোড়া কুকুর ধরতে দেবে না, কেবল ঘেউ ঘেউ ক'রে আমায় কামড়াতে আসে। তারপর বাড়ীর কাছে এসে আমি একেবারে থ হ'য়ে গেলুম! দেখি জান্‌লার গরাদ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার নেরো! দেখো দিকিন কী কাণ্ড! আমি ত লজ্জায় মরি। দু'টো কুকুরে একেবারে হুবহু মিল, এমন কি নামটা পর্য্যন্ত এক!'

সুবিধা পাইয়া জামাই চোরটার উপর বসিয়া পড়িয়া ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কী একটা অতিশয় জ্ঞানী গবেষণার উত্থাপন করিতে যাইতেছে এমন সময়ে আচম্‌কা ঢেউয়ের মত পান্না কাতারিনার বাক্যস্রোত সকলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল—

"তারপর কী বল্‌ছিলুম, প্রশে পান্‌স্ভা, হ্যাঁ, মানুষে মানুষে মিল এমন হয় যে দু'জন লোককে চেনা পর্য্যন্ত যায় না যমজে যমজে মিল অনেক সময় হয় বটে। কিন্তু দু'টো মানুষ, একেবারে অচেনা, অজানা, কোন সম্পর্ক পর্য্যন্ত নেই, কেমন করে' যে একরকম হয় তা ভগবানই জানেন। পান্‌স্ভোকে ব'লবো কি, একবার ভারী অপ্রস্তুতে পড়েছিলুম। আমার বোনঝি বার্‌বারার সই মাল্‌গোঝাতা বার্‌বারারই সমবয়সী। তা'র ভগ্নিপোত, বয়েস বছর পৈঁত্রিশ হ'বে, সোঁদর-সুপুরুষ মানুষটো, তার ওপর ভারী সৌখীন, হাজার মানুষের মধ্যে

তা'কে চিনে নেওয়া যায়। চুল ওলটানো, চক্‌চকে বুরুশ করা আমেরিকান্ জুতো পায়ে, ইংরিজি পোষাক ছাড়া অন্য কোনো পোষাক পরে না, রুমাল, টাই, সার্ট, সমস্ত ইংরিজি, একেবারে লণ্ডনে তৈরী, হাতের দস্তানা জোড়াটি পর্য্যন্ত। বার্‌বারার সই মাল্‌গোঝাতার ভগ্নিপোতকে একবার যে দেখেছে সে আর ভোলে নি। তা'র চলার ধরণ, মুখের হাসি সব একেবারে পেটেণ্ট করা, দস্তানা জোড়াটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরবার কায়দাটি পর্য্যন্ত। তা প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, একদিন চলেচি ট্রামে ক'রে, দেখি ইষ্টিশানের কাছে বার্‌বারার সই মাল্‌গোঝাতার ভগ্নিপোত আমাদের গাড়ীটাতেই এসে উঠ্‌লো। চেনা মানুষ, তাই তা'র দিকে তাকিয়ে. একটু মুচ্‌কে হাসলুম। ও মা, তা সে এমন ভাবটা দেখালে যে আমায় জন্মে দেখে নি! বিচ্ছিরি ব্যাপারটা হ'য়ে গেল, হাজার হোক্ মেয়ে মানুষ, পুরুষ মানুষের দিকে তাকিয়ে হাসা, লোকে ব'লবে কী গা! ভাব্‌লুম হয়তো আমায় চিন্‌তে পারে নি। তাই কাছে গিয়ে ব'ল্‌লুম, 'নমস্কার'। ও মা, তা লোকটা একটা নমস্কার পর্য্যন্ত ক'রলে না। বলি, 'মাপ্ ক'রবেন, পান্ মাল্‌গোঝাতার ভগ্নিপোত না?' বলে, 'মাল্‌গোঝাতা, মাল্‌গোঝাতা!' ফেল্ ফেল্ করে' আমার মুখের দিকে তাকায়, বলে, 'আজ্ঞে না পানী ভুল ক'রেছেন, আমি মাল্‌গোঝাতার ভগ্নিপোত নই, মাল্‌গোঝাতা ব'লে আমার শালী টালী কেউ নেই, আমি বিয়ে পর্য্যন্ত করি নি।' দেখো দিকিনি কী লজ্জার কথা, লোকটা কী ভাবলে বলো ত! অপ্রস্তুতের একশেষ! আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেবেই দে ছুট! তারপর মাঝে মাঝে ট্রামে দেখা হয় লোকটার সঙ্গে, এখন সে নিজেই টুপি খুলে নমস্কার করে, এমন কি তার সঙ্গে দস্তর মত পরিচয় পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে। দেখো দিকি ভগবানের ছিষ্টি!"

পান্না কাতারিনার এই অসম্ভব কাহিনী শুনিয়া ভাড়াটে পানী য়ানীনার পোষ্যপুত্র (জিজ্ঞাসা চিহ্ন, কারণ পানী য়ানীনার বয়স ৩২ এবং পোষ্যপুত্রের বয়স ২১) পান্ তাদেউশ একটী বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া তাহার অল্পবয়সী কবিদের মত ঝাঁকড়া চুলগুলা কাণের দুই পাশে সরাইয়া দিয়া মুখখানাকে যথাসম্ভব ট্রাজিক্ করিয়া কয়েকদিন আগে পঠিত নিট্‌শের জ্ঞানগর্ভ বাণী হইতে কী একটা আওড়াইতে যাইতেছিল, সহসা পান্না কাতারিনার বাক্যস্রোতে তাহার সে প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিল। শুক্‌নো রুটি গেলার মত একটা কোঁৎ

করিয়া শব্দ করিয়া সে চুপ্ করিয়া রহিল। পান্না কাতারিনা নূতন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন—

"পানস্তভো ভাগ্যে বিশ্বাস করেন!"

তাহার উত্তরে 'হাঁ' বা 'না' বলিবার পূর্ব্বেই পান্না কাতারিনা সুরু করিলেন—

"ভাগ্যে আমিও বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু এখন এমন সব কথা আমার নিজের জীবনে একেবারে হাতে হাতে ফলে' গেছে যে ভাগ্যে বিশ্বাস না করে' উপায় নেই। আমার জানা এক বেদে বুড়ী আছে, বল্‌বো কী প্রশে পান্‌স্ত্‌ভা, সে যা' যা' বলে' দিয়েছিল আজ পাঁচ বছর আগে তার একটু নড়চড় পর্য্যন্ত হয় নি। পথের এক বেদে বুড়ী রাস্তা দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল, বলে, 'কে হাত গোণাবে, হাত গোণাবে?' জানলা দিয়ে ডাক্‌লুম, বুড়ী ঘরে ঢুকেই বলে, 'মা তুমি লটারীতে অনেক টাকা জিতবে, তবে তার কিছুদিন পরেই একটা ফাঁড়াও আস্‌বে, তা ভয় করো না মা। লটারীতে অনেক টাকা জিতবে।' আমি ত হেসেই উড়িয়ে দিলুম, বলি, হ্যাঃ লটারীতে নাকি আবার জেতা যায়! সুধু টিকিট কেনার টাকাগুলো গবচা দেওয়া!' তার পর সে বেদে বুড়ী, লটারীতে টাকা জেতার কথা, সব ভুলে গিছলুম। বলি, গতর খাটিয়ে খাই মেয়ে মানুষ, বরাতে যে কত সুখ তা তাতেই বোঝা যায়। আমার বাপ ছিলেন বড় মানুষ, কিন্তু বাবা মারা যাবার পর একটি ভাঙ্গা গ্রশ্* পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত কেউ না খাটিয়ে দেয় নি। তা যাই হোক্, একদিন অপিসের এক বুড়ো কেরাণী বলে, 'পান্নী লটারীর টিকিটের অর্দ্ধেক কেনেন ত দু'জনে মিলে একখানা টিকিট কেনা যায়।' ঝালোঝালি, বলে, 'দশটা জলতী† দিয়ে টিকিট কেনবার পয়সা নেই, তাই পান্নী যদি আধখানা কেনেন ত পাঁচটা জলতী চট্টা করে' দেওয়া যায়।' বলি, বুড়ো মানুষ বল্‌ছে এত করে', দিলুম পাঁচটা জলতী। যাই টিকিট কেনা তার এক হপ্তা পরেই প্রশে পান্‌স্ত্‌ভা আমার অমন পাকা চাকরীটি গেল। বিনি কারণে ডিরেক্‌টারের সঙ্গে কী নিয়ে একটা মন কষাকষি হ'লো, আমায় জবাব দিলে, বলে, পান্নীর বয়েস হ'য়েছে,

* কানা কড়ি।

† চুই জলতী=১৲ টাকা।

আপিসের কাজ করতে পানীর কষ্ট হয়। দেখো দিখি, বলে বয়েস হয়েছে, এইত সবে চল্লিশ পেরিয়েছি। এখন যাই কোথা বলো ত, একলা মানুষ, বিয়ে করিনি, থা' করিনি, ছেলেপুলে নেই যে বুড়ো বয়সে আমায় খাওয়াবে। মনে মনে বলি, হা আমার কপাল, আমার নাকি আবার কোনো দিন বরাত খুল্‌বে। ব্যাগে গোটাকতক জলতী পড়ে' আছে, আর সেই লটারীর টিকিটের আধখানা। ভাবলুম যাই একবার বোনের বাড়ী, হয়তো টিকিটের আধখানা বেচে পাঁচটা জলতী পাওয়া যাবে, তাই দিয়ে কিছু না হোক অন্ততঃ দু'টো দিনও ত বাপু শুক্‌নো রুটী খেয়ে কাটানো যাবে। চললুম বোনের বাড়ীর দিকে। পথে ভাবছি, টিকিটটা বেচবো কি বেচবো না। হঠাৎ সেই বেদে বুড়ীর কথা মনে পড়লো। ভাবছি যাক্‌গে, দেখাই যাক্ না কী হয়, দু'দিন না হয় উপোস করেই কাটানো যাবে। বোনের বাড়ী না গিয়ে নিজের ঘরেই ফিরলুম। তারপর প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা ব'লবো, ব'ললে বিশ্বাস করবেন না, পরের দিন সকালে সেই বুড়ো কেরাণী এসে হাজির। বলে এই দেখুন পানী টিকিটের নম্বরটা মিলিয়ে। দেখি আমাদের টিকিটখানা জিতেছে, নগদ ৫০,০০০ জলতী।'

সংখ্যাটা উপস্থিত সকলকেই স্তম্ভিত করিয়া দিল। বড় ছেলে পান্ ভিতল্‌দ দেনায় হাবুডুবু খাইতেছে, সে ভাবিতে লাগিল, ইস্, সংখ্যাটার একটা শূন্য বাদ দিয়াও যদি সে কয়েক হাজার জলতী পাইত ত সে ছাত্রজীবন হইতে সুরু করিয়া যত দেনা করিয়াছে তাহা সুদে আসলে শোধ করিয়া দিত এবং একটা পার্টি দিবার মত শ'খানেক জলতীও তাহার হাতে থাকিত। তা ভগবানের বিচারে লটারীর সমস্ত পাকা পাকা নম্বরগুলো যত ঝাড়ুদার ও বিধবা বা অবিবাহিতা বুড়ীদের হাতে আসিয়া পড়ে।

জামাই তাহার পাকা চুলগুলার উপর হাত বুলাইয়া ভাবিতে লাগিল—ইস্, অতগুলা টাকা! যে যদি পাঁচ শত জলতীও জিতিতে পারিত ত পরের দিনই ইতালী যাত্রা করিত, রোম, মিলানো, ভেনেৎসিয়া! ভেনেৎসিয়ায় গন্দোলায় চড়িয়া ইতালীর নীল আকাশের দিকে তাকাইয়া সে গন্দোলার মাঝিদের গান শুনিত। দূরে নানা গির্জ্জার গম্বুজ দেখা যাইতেছে, ঠিক যেমন সে দেখিয়াছে

ভারশৌ*-এর ইতালীয় কুল্পিবরফের দোকানগুলায়, নীল জল, নীল আকাশ, লাল ও সবুজ রঙের গন্দোলা, এবং গন্দোলার মাঝিদের মিষ্টি তেনর†। সুধু পাঁচ শত জ্লতী পাইলেই যথেষ্ট হইবে, এমন কি পারীটা পর্য্যন্ত দেখা হইয়া যায়। পারী সম্বন্ধে সে কত বই পড়িয়াছে, কত ছবি দেখিয়াছে। জোসেফিন্ বেকারও নাকি পারীতেই বেশীর ভাগ থাকে। পারীতে কত অদ্ভুত ব্যাপারই না ঘটে যাহার কথা সে অতি মনোযোগ সহকারে চায়ের দোকানে বসিয়া চিত্রিত সাপ্তাহিকগুলাতে পড়িয়া থাকে। একখানা সাপ্তাহিকের এক বিশেষ ছবির কথা তাহার মনে পড়িল। নেগ্লিজে-পরা একটি মেয়ে বারান্দায় পাতা বেতের চেয়ারে বসিয়া এক চোখ টিপিয়া আপন ফুটন্ত স্তনের প্রতি ভারী একটা মুখরোচক ইসারা করিতেছে। পারীতে নাকি এমন দৃশ্য বিরল নয়, দু'পয়সা খরচ করিলে নাকি ইহার চেয়েও অধিক সুড়্সুড়ি-দায়ক দৃশ্য দেখা যায়, এবং আরো দু'পয়সা খরচ করিলে উক্ত মেয়েটির মরালগ্রীবা-বিনিন্দিত হাত দু'খানাও তাহার গলায় অতি মৃদু, অতি মধুরভাবে পরাইয়া দিতে পারে। এবং তারপর আরো দু'পয়সা খরচ করিলে, এবং আরো দু'পয়সা......

সহসা পান্না কাতারিনার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর জামাইয়ের অমন চমৎকার দিবাস্বপ্নটা একেবারে মাটি করিয়া দিল। পান্না কাতারিনা নূতন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন—

ভগবানের এমনই সুক্খু বিচার যে মানুষকে না খাটিয়ে তিনি এক পয়সা দিতে চান্ না। ভাগ্যের ফের, কখনো ওঠে, কখনো নামে। এই দেখো না লটারির টাকাগুলো জিৎলুম, এক আধটা জ্লতী নয়, নগদ ২৫,০০০! ভাবলুম এবার আমার দুঃখু ঘুচ্লো, জীবনের শেষ কটা বছর আর হা পয়সা জো পয়সা করে' কাটাতে হবে না। টাকাগুলো ব্যাঙ্কে জমা রাখ্লুম, ভাব্লুম সুদে খাটালে কী জানি বাপু কে ফাঁকি দেয় না দেয়। ব্যাঙ্কে কম সুদ তা কমই সই। সেখানে চোর জোচ্চোরের বালাই নেই। মাসে মাসে সুদ পাই আর কিছু কিছু আসল ভাঙ্গাই, এমনি করে' মাস কয়েক কাট্লো। তারপর বছর যেতে না যেতেই এক নূতন গেরো! প্রেশঁ পান্স্ত্ভা, দিনে দুপুরে পথ চল্তে চল্তে

* পোলোনিয়ার রাজধানী, ইং ওয়ারস।

† Tenor, সঙ্গীতে কণ্ঠস্বরের প্রকৃতিভেদ।

কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে' পা'টা ভাঙ্গলুম। ছ'টি মাস হাঁসপাতালে শুয়ে। ডাক্তারেরা বলে অস্তর ক'রতে হবে, হাড়টা নাকি ভেঙ্গে একেবারে দু'টুক্‌রো হ'য়ে গেছে। পায়ের মাংস কেটে ভাঙ্গা হাড়টাকে টেনে বার ক'রতে হ'বে, তারপর হাড়ের টুকরো দু'টোকে ইস্ক্রুপ দিয়ে জোড়া দিতে হ'বে এবং সেই অবস্থায় কড়িকাঠ থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পা'টাকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে ছ'টি মাস, যেন মাংসের দোকানে ভেড়ার ঠেং।'

উক্ত উপমায় উপস্থিত সকলেই টেবিলের উপরে সাজানো নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও নানা রূপে রূপান্তরিত মাংসের খাবারগুলার প্রতি আপন অজ্ঞাতসারে একবার দৃষ্টিপাত করিল। ছোট মেয়ে হান্‌কার ভিতরটায় একটা মোচড় দিয়া উঠিল, সে মা'কে সাহায্য করিবার অছিলায় সেই যে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল তাহার পর তাহাকে আর দেখা গেল না।

পান্না কাতারিনা কহিতে লাগিলেন—

"তারপর প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, ২৫০০০ জ্‌লতীর ১৫০০০ চোখের নিমেষে যেন একেবারে উবে গেল; ডাক্তাররে, ওষুধরে, পত্তিরে। ছ'টি মাস বিছানায় শুয়ে আর পা'টা কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে, যেন সেটা আমার পা'-ই নয়। তারপর সেরে উঠে গেলুম হাওয়া বদ্‌লাতে পাহাড়ে, এক সানাতোরিউমে, আরো পাঁচ হাজার গেল তাতে। তারপর যে ডাক্তার চিকিচ্ছে করে' আমায় সারিয়ে তুললে, ভারী সোঁদর সুপুরুষ মানুষটো, তাকে একটা সোনার ঘড়ি কিনে উপহার দিলুম, দামী ঘড়ি, তার উল্টো দিকে খোদাই করে' লেখা, 'অসীম কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক এই সামান্য স্মৃতিচিহ্ন—উপকৃতা।' তাতেও প্রায় হাজার খানেক জ্‌লতী লাগলো। তারপর পাঁচশ' জ্‌লতী দিলুম গির্জ্জেয়, মানত ক'রেছিলুম যে চেঁস্তোখোভার* মা মারীয়া যদি পা'টা ভাল করিয়ে দেন ত মা'কে পাঁচশ' জ্‌লতী গুণে দেবো। তারপর অমুক রে, তমুক রে, হেন রে, তেন রে। বাকী রইল হাতে কয়েকশ' জ্‌লতী। তাতে ত আর সারা জীবন চল্‌বে না। তাই আবার কাজের খোঁজে বেরুলুম। এখন আবার যে কে সেই, গতর খাটিয়ে খাচ্ছি।"

পান্না কাতারিনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। টাকাগুলা যে অমন

* পোলোনিয়ার প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। চেঁস্তোখোভার মাদন্না পরীক্ষা পাশ, আরোগ্যলাভ প্রভৃতি গুণাবলী দ্বারা আমাদের কালীঘাটের মা কালীকেই হার মানাইতে পারেন।

ক্ষিপ্রগতিতে খরচ হইয়া গেল তাহা শুনিয়া বড় ছেলে ভিতল্‌দ ও জামাই উভয়েই অকারণে এক গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। পান্না কাতারিনা এক নূতন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন—

"হাঁসপাতালে ছ'টা মাস যে ক'রে কাটিয়েছি তা ভাব্‌তেও ভয় করে। 'জীবন', 'জীবন' লোকে বলে, জীবন যদি কোথাও থাকে ত সে বাড়ীতে নয়, রাস্তাঘাটে নয়, থিয়েটার সিনেমাতে নয়, সে হাঁসপাতালে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত জিনিষই দেখলুম যে তা লিখ্‌লে একখানা বই হয়ে যায়। পান্‌স্ত্‌ভো ব'ল্‌লে বিশ্বাস ক'রবেন না, একবার কি কাণ্ডটা হ'লো আমি যে ঘরটায় শুয়েছিলাম ঠিক সেই ঘরটার মাঝ-মধ্যিখানে। আমি যে ঘরটায় শুয়েছিলুম সেটা অস্তর করা রুগীদের ঘর। রুগীদের চেহারাগুলোর কথা মনে পড়লে যেন গা'টা শিউরে ওঠে। কারো সর্ব্বাঙ্গ বেণ্ডেজ করা স্রুধু নাকটা খোলা, কারো বা একটা হাত নেই, কারো বা পা'ছুটোর একটাও নেই, সবাই মড়ার মতন পড়ে আছে, স্রুদ্ নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের কম্বলটা একটু একটু কাঁপছে মাত্র। আমার একটু দূরেই একটা রুগী ছিল, বয়েস বেশী হবে না মেয়ে মানুষটার; বছর তিরিশ বত্রিশ হ'বে। তার পায়ে একটা কি অস্তর করা হয়েছে। তার মুখ দেখে মনে হয় না যে তার কোনো অস্থখ বিস্থখ ক'রেছে, স্রুধু শুয়ে থাকে আর বই পড়ে, আর না হয় ঘুমোয়। এখন হয়েছে কী, একদিন মাঝরাত্তিরে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখে তার অস্তর করা আঙুলটা দিয়ে টপ্ টপ্ করে' রক্ত পড়ে' বেণ্ডেজটা একেবারে ভিজে উঠেছে। তা কোথায় নার্সকে ডাক্ তা নয়, বল্‌বো কী, প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, মাগীটা সটান উঠে গিয়ে একটা বাল্‌তী এনে বিছানার তলায় রেখে আবার পাশ ফিরে শুলো। আমি বলি কি জানি বাপু, হয়তো ডাক্তারে তাই বলেছে। অমন ধুম্বে. মাগীটার ঘটে অতটুকু বুদ্ধি নেই তা আমি জান্‌বো কেমন করে' গা! বলি, হয়তো বদ্‌রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, সারারাত টপ্, টপ্, টপ্, টপ্, ঠিক ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতন টপ্, টপ্, টপ্, টপ্। সারারাত আমি চোখের পাতা ফেলতে পারি না। মানুষটোর পা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে বিছানা ফুঁড়ে নীচের বালতীটার ভেতর গিয়ে পড়ছে, টপ্, টপ্, টপ্, টপ্! ভোর বেলায় যখন নার্স এলো তখন তা'র শেষ হ'য়ে গেছে।"

পান্না কাতারিনা কিছুক্ষণ চুপ করিলেন। বড় মেয়ে ভান্দা উঠিয়া স্বামীর কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া কী বলিয়া বিদায় না লইয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। পান্না কাতারিনা পুনরায় সুরু করিলেন—

"হাঁসপাতালে যে সব কাণ্ড ঘটে তা প্রশেঁ পান্স্ত্ভা কোনো নভেল-নাটকেও পড়া যায় না। শোনোই না গো একবার কী ব্যাপারটা ঘট্লো। অবশ্য সে আমাদের ঘরে নয়, মড়ার ঘরটায়।"

মৃত্যু ও মৃতদেহের কথা শুনিয়া জামাই যেন একটু অশ্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। আজ গত ৬৫ বৎসর ধরিয়া সে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, মৃত্যুর কথা যখনই মনে হইয়াছে তখনই সে একটা বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক প্রশ্ন লইয়া দিনের পর দিন বই পড়িয়া কাটাইয়াছে। সহসা পান্না কাতারিনার বাস্তবিকতাপূর্ণ কী এক মৃত্যুর কাহিনীর ভয় তাহাকে কিছু বিহ্বল করিয়া ফেলিল। কোনো অছিলায় ওঠা যায় কি না তাহা ভাবিবার আগেই পান্না কাতারিনা নূতন গল্প সুরু করিলেন—

"প্রশে পান্স্ত্ভা এ গল্প নয়, একেবারে সত্যি ঘটনা, বাস্তব! আমি যে হাঁসপাতালটায় ছিলুম, তাতে পুরুষ নার্সও ছিল, মেয়ে নার্সও ছিল। পুরুষদের ঘরে প্রায়ই পুরুষ নার্স থাকতো। এখন হয়েছে কি, মড়ার ঘরে সেদিন গোটা দশেক লাশ পড়ে আছে। সুড়ঙ্গের মতন ঘরটায় সারি সারি খাট পাতা, আর তার ওপর রুগীগুলো যেমন শুয়ে ছিল, মারা যাওয়ার পর তেমনি অবস্থাতেই মড়ার ঘরে শুয়ে আছে, শুধু শাদা কাপড় দিয়ে তাদের আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া। মস্ত বড় ঘরখানা, সেখানে দিনের বেলাতেও অন্ধকার ছম্ ছম্ করে। সারি সারি সাদা কাপড়ে ঢাকা মড়া, সুধু দু'একখানা খাট খালি পড়ে আছে। এখন মড়ার ঘরে সারারাত একজন চৌকিদার থাকে, কেন কী জানি বাপু! তা হয়েছে কি, একদিন রাত্তির বেশ গভীর হ'য়ে এসেছে, চৌকিদারটা দোরের কাছে ব'সে ঝিমোচ্ছে। ঘরের এক কোণে মিট্ মিট্ করে' সুধু একটা আলো জ্বল্ছে। হঠাৎ চৌকিদারটা চোখ চেয়ে দেখে, একটা মড়া যেন একটু নড়ে' উঠলো। ভাবলে, হয়তো তা'র চোখের ভুল। দু'চার বার পায়চারী করে' আবার তার চেয়ারটাতে এসে বস্লো। কিছুক্ষণ পরে দেখি, ওমা, মড়াটা দিব্যি পাশ ফিরে শুলো। সর্ব্বনাশ! ভয়ে তার প্রাণ একেবারে শুকিয়ে উঠেছে। একবার

ভাবলে পালাবে কি পালাবে না। কাঠখোট্টা গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের লোকটা, তা না হ'লে কি তারা তা'কে মড়ার ঘরে চৌকী দিতে দিয়েছে। ভাবলে, না পালাবে না, ও ভূত-পেরেত কিছু নয়, হয়তো একটা মড়া বেঁচে উঠেছে। এমনও ত হয় গো বাছা। তা সাহস করে' এগিয়ে গিয়ে মড়াটার খাটের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছে কী করবে? দেখে মড়াটার নিঃশ্বাসে তার মুখের কাপড়টা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। বলে, দেখিই না ব্যাপারটা কী। বলে তা'র মুখের ওপর থেকে কাপড়টা খুলে ফেললে। দেখে—"

পান্না কাতারিনা পাকা গল্প লেখকদের মত গল্পের শেষের দিকে হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

পানী য়ানীনার পোষ্যপুত্র (জিজ্ঞাসার চিহ্ন) পান্ তাদেউশ অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কী দেখলে?"

পান্না কাতারিনা গম্ভীর কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—

"দেখে একটা পুরুষ নার্স কাজ ফাঁকি দেবার মৎলবে মড়ার ঘরে এসে মড়াদের পাশাপাশি মুখ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। জ্যান্ত মানুষটা দশটা লাশের মাঝ-মধ্যিখানে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।"

জামাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "ভান্দেচকার শরীরটা তেমন ভালো নেই। সে বাড়ী চ'লে গেছে, দেখি গিয়ে সে কেমন আছে? মাপ করবেন, ভান্দেচকা যদি ভালো থাকে ত তা'কে নিয়ে আবার আসবো এক্ষুনি।" বলিয়া সে পান্না কাতারিনার হস্ত চুম্বন করিয়া যৌবন-পরিপূর্ণ পদবিক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বড় ছেলে পান্ ভিতল্দ অধীর ভাবে ঘড়ির দিকে তাকাইয়া তাহার চেয়ারটার উপর মনে মনে কাটা পাঁঠার মত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এতক্ষণে তাহার ইয়ার স্তানিস্লাভের ঘরে নিশ্চয়ই অন্যান্য ইয়ারবৃন্দ আসিয়া হাজির হইয়াছে। স্তানিস্লাভ বোধ করি এইবার তাহার নিজের হাতের তৈরী কড়া ভিশনিউভকার* বোতলটা টেবিলের মাঝখানে রাখিল। তাহার পাশে আনারশের ভদ্‌কাটাও নিশ্চয় ভোলে নাই, এবং কমলালেবুর ভদ্‌কাটাও কি বাদ গিয়াছে? টেবিলের উপর মস্ত চেটালো থালায় সাজানো কাভিয়ারের সেণ্ডুইচ, তাহার পাশেই শ্লেজ-মাছের দাগাগুলা অলিভের তেলে ভাসিতেছে।

* চেরীর ভদ্‌কা

তাহার চারিপাশে মিহি করিয়া কাটা পেঁয়াজ। পান্ ভিতল্‌দ তাহার মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল, সে নিজে এক টুক্‌রা কালো রুটির উপর কাভিয়ার মাখাইয়া মুখে পুরিয়া দিল, এবং অনতিবিলম্বে গেলাস ভরিয়া খানিকটা ভিশ্‌নিউভকা গলার ভিতর ঢালিয়া দিল। কড়া ভদ্‌কা তাহার গলা ও পাকস্থলী বাহিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া চলিল। পান্ ভিতল্‌দ কল্পনার চক্ষে উক্ত পেয়টির উষ্ণ প্রতিক্রিয়া অনুভব করিতেছে, এমন সময়ে পান্না কাতারিনা এক নূতন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন।

"প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, আর একবার যে কেলেঙ্কারীটা হ'লো সে কথা নিশ্চয়ই খবরের কাগজওয়ালারা ছাপিয়েছে, পান্‌স্ত্‌ভা হয়তো পড়ে থাকবেন। সেও আমি হাঁসপাতালে থাকবার সময়। পান্‌স্ত্‌ভা জানেন যে হাঁসপাতালে ছাত্রদের দেখবার জন্যে মরা মানুষের হাত, পা, পিলে, লিবার, ফুস্‌ফুস্ এই সব কড়া ইস্পিরিটে জারিয়ে রাখা হয়। মা গো, ভাবতে গেলেও গা'টা ঘিন্ ঘিন্ করে' ওঠে। প্রকাণ্ড একটা কাঁচের চৌবাচ্চায় এক চৌবাচ্চা ইস্পিরিট, আর তার মধ্যে পিলে, লিবার, ফুস্‌ফুস্‌গুলো যেন জ্যান্ত কচ্ছপের মত ভেসে বেড়াচ্ছে। ছাত্রেরা যা'র যখন যেটা দরকার হয়, সেই চৌবাচ্চায় হাত ডুবিয়ে সেটা টেনে তোলে, আবার কাজ হ'য়ে গেলে চৌবাচ্চার ইস্পিরিটের ভেতর ফেলে দেয়। ভারী কড়া ইস্পিরিট, তাতে মাংসগুলো চট্ করে পচতে পারে না। এখন হয়েছে কী, হঠাৎ দেখা গেল যে চৌবাচ্চার পিলে, লিবার ফুস্‌ফুস্‌গুলো দু'দিন যেতে না যেতেই পচতে সুরু ক'রেছে। কী ব্যাপার, কী ব্যাপার! নিশ্চয়ই কোনো দোষ আছে। তারপর ইস্পিরিট খানিকটা নিয়ে পরীক্ষে করে' দেখলে হাঁসপাতালে, দেখে তা'র বেশীর ভাগই জল! কী ব্যাপার, ইস্পিরিটে জল কোত্থেকে এল, এই নিয়ে নানা তদন্ত সুরু হলো। শেষকালে জানা গেল যা' তা' ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।"

সবাই এক সঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তাইত ইস্পিরিটে আবার জল কোত্থেকে আস্‌বে? বোধ হয় দোকানে ভেজাল স্পিরিট বেচেছে।"

পান্না কাতারিনা বলিলেন—

"উঁহু সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! পান্‌স্ত্‌ভা বললে, বিশ্বাস করবেন না, হাঁসপাতালের কতকগুলো চাকরে মিলে সেই চৌবাচ্চা থেকে গেলাস ভরে' ভরে'

ইস্পিরিট তুলে' নিয়ে ভদ্‌কা তৈরী করে' গিলেছে, আর তার বদলে দেদার জল ঢেলেছে চৌবাচ্চায়।"

পান্ ভিতলদ্ পান্না কাতারিনার হস্তচুম্বন করিতে করিতে বলিল, "আমায় এক্ষুণি যেতে হলো, মাপ ক'রবেন। আমার এক বন্ধুর নামও স্তানিস্লাভ, সেখানেও ইমিয়েনীনী, তাই না গেলে রাগ ক'রতে পারে।" বলিয়া সে একপ্রকার ছুটিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পান্না কাতারিনা কী একটা নূতন গল্প সুরু করিলেন। পানী য়ানীনী ও তাঁহার পোষ্য পুত্র (জিজ্ঞার সচিহ্ন) উভয়েই টেবিলের খাবারগুলার দিকে পিঠ দিয়া বসিয়া সেই গল্প শুনিতে শুনিতে কোনপ্রকারে আত্মসম্বরণ করিয়া রহিলেন। পানী স্তানিস্লাভা এতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার "পাক-প্রণালীর" উপদেশ অনুসারে কী একটা নূতন রকমের মাংসের পিঠা তাঁহার নূতন ইলেক্‌ট্রিকের উনানটাতে প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। খাবারের থালা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেয়েমেয়েগুলো আবার গেলো কোথায়!"

পান্না কাতারিনা স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "কেন, যে যার বাড়ী চলে গেছে, পানীর সঙ্গে দেখা করে' যায় নি? আমায় বল্‌লে, 'এবার আসি তাহ'লে', আর আমিও এমন ভোলা মানুষ যে একবার খেয়ে যেতেও বল্‌লুম না! তা পানী স্তানিস্লাভো, আমিও এবার উঠি রাত হয়েছে অনেক বোধ করি।"

পানী স্তানিস্লাভা বাধা দিয়া বলিলেন, "ওমা সে কি কথা গো পান্নো কাতারিনো! কিছু খেলেনা দেলেনা এর মধ্যেই উঠছো যে। না, না, তাও কী হয়, কিছু খেয়ে যেতে হবে বৈকি!"

পান্না কাতারিনা অতিশয় ক্ষোভের সুরে কহিলেন, "পানী স্তানিস্লাভো, খেতে কি আমার অসাধ গো, কিন্তু খাবে কে? ডাক্তারে খাওয়া একেবারে প্রায় বাবণই করে' দিয়েছে, বলে আমার শরীরে যতগুলো পাথুরী আছে তা দিয়ে নাকি একখানা বাড়ী গাঁথা যায়। আজ বাদে কাল আবার একটা অস্তর করাতে হবে। আর খাওয়াও আজকাল যা হয়েছে তা বিষ বললেই হয়। এত বড় বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ চলছে, বড় বড় বাড়ী, ফেশানের আসবাব, চাকরবাকর, আর খাবার একেবারে বিষ, খাঁটি বিষ!" বলিতে বলিতে পান্না কাতারিনা প্রবেশকক্ষে

আসিয়া তাঁহার পুরুষালী ধরণের পাল্‌তো'টা* পরিতে রত হইলেন। পরে কহিতে লাগিলেন, "আমি হোটেল বা রেস্তোরাঁর ধার দিয়েও যাই না পানী স্তানিস্লাভো। হয় নিজে রেঁধে খাই আর না হয় কারো, জানাশোনো লোকের বাড়ীতে, তাও কি কিছু খাবার জো আছে? একটুক্‌রো রুটি, একটু মাখন, একবাটি চা, বাস্‌! তাও আবার ঘড়ি ধরে। আজকালকার হোটেল রেস্তোরাঁ-গুলোও যা হয়েছে, যতসব রোগের এক একটি ঘাঁটি। এই কিছুদিন আগে কাগজে পড়েন নি, একটা নামজাদা হোটেলে কী কেলেঙ্কারীটা হলো! তা বলি শুনুন, পানী স্তানিসাভো।"

সদর দরজাটা খুলিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া পান্না কাতারিনা এক নূতন গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন—

"মস্ত হোটেলটা গো, কাগজে তা'র নাম দেয়নি, মোটা ঘুষ নিয়েছে নিশ্চয়ই। যাই হোক্‌, সেই হোটেলে যারা যারা খেতে যেত তাদের অনেকেরই গায়ে হঠাৎ একটা বিদ্‌ঘুটে রকমের রোগ দেখা দিলে, কতকটা কুটের মতন। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে' দেখ্‌ল, সে রোগের বীজ কেমন করে' খাবারের সঙ্গে শরীরে ঢুকেছে। তাই নিয়ে হোটেলে খাবার সম্বন্ধে তদন্ত সুরু হ'লো। অনেক খোঁজা খুঁজির পর জানা গেল ব্যাপারটা এই। কী একটা গরম দেশের বিদ্‌ঘুটে রোগের বীজ নিয়ে এখানকার একটা হাঁসপাতালে কয়েকজন ডাক্তার কতকগুলো খরগোসের ওপর পরীক্ষা করছিল, রোগটার একটা ওষুধ বা'র ক'রতে পারলে নাকি ওলোন্দাজ সরকারের কাছ থেকে অনেক টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। সে যাই হোক্‌, এখন হয়েছে কি, সেই হাঁসপাতালের একটা চাকর খরগোসগুলো ফেলে না দিয়ে সটান সেই হোটেলে এসে বেচে দিয়ে যেত। সস্তার খরগোস হোটেলওলারাও দেদার কিনে খদ্দেরদের পাতে দিতে লাগ্‌লো। দেখ দেখি একবার লোকটার কাণ্ড! রুগী খরগোসগুলো মানুষকে খাওয়ালে! তাই বলি পানী স্তানিস্লাভো, পানী এত কষ্ট করে' খাবার-দাবারগুলো তৈরী করলেন, আর ছেলেমেয়েরা কেউ তা মুখে পর্য্যন্ত দিলে না।

আজকালকার ছেলেমেয়ে, তাদের যতসব ফেশানের হোটেল রেস্তোরাঁ ছাড়া

* ওভারকোট।

আর কিছু ভালো লাগে না। পয়সা দিয়ে কেবল বিষ কিনে খাওয়া। আচ্ছা, আমি তাহ'লে আসি এইবার পানী স্তানিস্লাভো, আজ সন্দেটা পানীর বাড়ীতে বেশ কাট্‌লো। আস্‌বেন একদিন আমার বাড়ীতে যদি সময় পান, আমি বিকেলের দিকে প্রায়ই বাড়ী থাকি। আচ্ছা, আসি তা হলে।" বলিয়া পান্না কাতারিনা বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। দরজার ওদিক হইতে তাঁহার স্বগত কথোপকথন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শোনা গেল—"এই দেখো না, সিঁড়ির আলোটা আবার নিবে গেছে। সুইচ্‌টা কোথায় কে জানে, হ্যাঁ এই যে, এইবার আলোটা জ্বালা গেল, আবার নিবে না যায়, আজকালকার যতসব কলকারখানা, আলোটাও আবার আপনি আপনি নিবে যায়। যাক্ রাস্তার আলো দেখা যাচ্ছে, ওমা, আবার বিষ্টি পড়্‌ছে যে গো, পোড়া কপাল আমার, ছাতাটাও আন্‌তে ভুলে গেছি" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পানী স্তানিস্লাভা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর অত যত্নে সাজানো খাবারগুলা কেহ স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই। পানী প্রানীনী দিভানটার উপর আধো শোয়া অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহার পোষ্যপুত্র (জিজ্ঞাসার চিহ্ন) একটা চেয়ারে বসিয়া আর একটা চেয়ারের পিঠের উপর মাথা রাখিয়া অসাড়ে নিদ্রা যাইতেছে। কাহাকেও না জাগাইয়া পানী স্তানিস্লাভা পা টিপিয়া আপন ঘরে আসিয়া আলোটা নিবাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। নিত্যকার অভ্যাসমত নিদ্রার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রকন্যাদের কল্যাণে প্রার্থনা করিবার কথাটা পর্য্যন্ত আজ তাঁহার মনে রহিল না।

সমীর রায়

ক্ষণিকবাদ (২) *

"তত্ত্বসংগ্রহে"র যে অংশ এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে সেই অংশে ক্ষণিকবাদ সম্বন্ধে যাহা আছে তাহা সংক্ষেপে "সর্বদর্শনসংগ্রহে"ও সূচিত হইয়াছে। "সর্ব-দর্শনসংগ্রহ" প্রায় সূত্রাকারে লিখিত হওয়ায় এই গ্রন্থের অর্থবোধ করা সুসাধ্য নহে; অপর দিকে "পঞ্জিকা" সম্বলিত "তত্ত্বসংগ্রহ" এতই বিস্তীর্ণ যে তাহার একই অধ্যায়ের আদি ও অন্তের মধ্যে যোগ স্মরণ রাখা কঠিন। পারস্পরিক অভাব পূরণে "তত্ত্বসংগ্রহ" ও "সর্বদর্শনসংগ্রহ" আদর্শস্থানীয়। এ-ক্ষেত্রে, বোধসৌকর্যে, সংক্ষেপে মাধবাচার্যকৃত ক্ষণিকবাদের আলোচনা উপস্থিত করা অযৌক্তিক হইবে না :—

অর্থক্রিয়াকারিত্বই হইল অস্তিত্বের লক্ষণ; কিন্তু অর্থক্রিয়া ক্রমিক বা অক্রমিক ভিন্ন অপর কোন প্রকারের হইতে পারে না (ক্রমাক্রমাভ্যাং ব্যাপ্তম্)। স্থায়ী বস্তুর পক্ষে ক্রমিক বা অক্রমিক কোন প্রকারের ক্রিয়াই সম্ভব নহে। সুতরাং বস্তু স্থায়ী নহে, ক্ষণিক। কিন্তু অক্ষণিকের অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভব নহে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাস্য, বর্তমান কালে অর্থক্রিয়া উৎপাদনের সময়ে অক্ষণিক বস্তুর অতীত ও অনাগত কালের অর্থক্রিয়া উৎপাদন করিবার সামর্থ্যও থাকে কি থাকে না? যদি বলা যায় থাকে, তবে অতীত ও অনাগত অর্থক্রিয়া বর্তমানে রুদ্ধ হইবে কেন? আর যদি বলা যায় থাকে না, তবে স্বীকার করা হইবে যে বস্তু কোন কালেই কিছুই করিতে পারে না, কারণ অর্থক্রিয়া কেবল মাত্র সামর্থ্যের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে (কালের উপর নহে)। পূর্বপক্ষী অবশ্যই বলিবেন, অক্ষণিক বস্তু অর্থক্রিয়া উৎপাদনের জন্য সহকারী কারণের মুখাপেক্ষী, এবং তাহাদের সাহায্য পাইলে তদ্দ্বারা ক্রমানুযায়ী অর্থক্রিয়া বাস্তবিকই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু তখন জিজ্ঞাস্য, সহকারী আদি বস্তুর উপকারী কি না। যদি না হয় তবে তদ্দ্বারা ক্রমিক কার্য সম্পন্ন হইতে পারে

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, No. 17.

না। আর যদি হয়, তবে জিজ্ঞাস্য, সহকারী হইতে যাহা লব্ধ তাহা আদি বস্তু হইতে পৃথক্ কি না? যদি পৃথক্ হয় তবে আমরা বলিব কার্য তাহা হইতেই হয়, আদি বস্তুটি নিষ্ক্রিয় থাকে! আরও জিজ্ঞাস্য, সহকারীর দ্বারা যে-অতিরিক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয় তদ্দ্বারা আবার একটি অতিরিক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয় কি না। যদি বলা যায় হয়, তবে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়িবে। অপর দিকে যদি বলা যায় যে সহকারীর দ্বারা যাহা উৎপন্ন তাহা আদি বস্তু হইতে অভিন্ন—তাহা হইলেও প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইল যে প্রাচীন নিষ্ক্রিয় ভাববস্তুটির স্থলে নূতন একটি ক্রিয়াশীল (কুর্বদ্রূপ) ভাববস্তু উৎপন্ন হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ক্ষণিকবাদেরই সমর্থন হয়।

দেখান হইল যে স্থিরবস্তুর পক্ষে ক্রমিক কার্য উৎপন্ন করা অসম্ভব। কিন্তু অক্রমিক (যুগপৎ) কার্য উৎপন্ন করাও কি স্থিরবস্তুর পক্ষে সম্ভব? তাহাও নহে। কারণ এ-স্থলে জিজ্ঞাস্য, যে-অক্ষণিক বস্তু তাহার সকল কার্য ক্রমান্বয়ে না করিয়া যুগপৎ করিবে তাহা কার্যোৎপত্তির পরেও বর্তমান থাকে কি না! যদি বলা যায় থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে বস্তু প্রথম ক্ষণে যাহা সম্পাদন করে দ্বিতীয় ক্ষণে তাহারই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে, কারণ প্রথম ক্ষণের কার্যাবলীর সম্যক্ কারণরূপ সেই বস্তুটি পূর্বপক্ষীর মতে দ্বিতীয় ক্ষণেও বর্তমান আছে! আর যদি বলা যায় থাকে না, তাহা হইলে বস্তুর স্থায়ীত্ব কল্পনা মূষিক ভক্ষিত বীজ হইতে অংকুরোৎপত্তি স্বীকার করার মতই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে স্থিরবস্তু ক্রমিক বা অক্রমিক কোন প্রকারের কার্যই করিতে পারে না। কিন্তু অন্য কোন প্রকারের কার্য যখন সম্ভব নহে তখন স্বীকার করিতে হইবে যে স্থিরবস্তুর পক্ষে কোন কার্য সম্পাদন করাই অসম্ভব। অথচ কার্যকারিত্বই অস্তিত্বের লক্ষণ। সুতরাং স্থিরবস্তু অসৎ।

এইবার দেখা যাউক শান্তরক্ষিত ও কমলশীল "তত্ত্বসংগ্রহে" এ-সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করিয়াছেন। এখানেও শান্তরক্ষিত প্রথমে সেই মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকরকে ই আক্রমণ করিয়াছেন।

ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে মত্বর্থীয় প্রত্যয়ান্ত "ক্ষণিক" কথাটির কোন সুসঙ্গত অর্থ হইতে পারে না। নৈরুক্তগণের

মতে 'ক্ষণে'র অর্থ 'ক্ষয়' ; এই ক্ষয় যাহার আছে তাহাই 'ক্ষণিক'। কিন্তু এই অর্থ যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ক্ষীয়মাণ বস্তু ও ক্ষয়—এই উভয়ের মধ্যে সর্বদাই কালের ভেদ পরিলক্ষিত হয় ; এবং এই ভেদ বশতঃ কোন বস্তুর প্রতি ক্ষয় আরোপ করাও অসম্ভব, যে-হেতু ক্ষয় ও ক্ষয়ী কখনই একই সঙ্গে দেখা যায় না। সুতরাং 'ক্ষণ'-শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় (possessive) প্রত্যয়ান্ত "ক্ষণিক" কথাটির কোন সদর্থ হইতে পারে না। ধর্ম (predicate) যদি ধর্মীর (subject) সমকালীন না হয় তবে তাহা ধর্মী-সম্বন্ধে প্রযুক্তই হইতে পারিবে না ; সুতরাং 'ক্ষণ' কথাটির অর্থ যদি 'ক্ষয়' হয় তবে তাহা কোন বস্তু সম্বন্ধেই ব্যবহার করা চলিবে না, কারণ এ-ক্ষেত্রে ধর্মী (ক্ষীয়মাণ বস্তু) লুপ্ত না হইলে ধর্মের (অর্থাৎ, ক্ষয়ের) কথা উঠিতেই পারে না। ধর্ম ও ধর্মীর সমকালীনতা এ-স্থলে একেবারেই অসম্ভব। আবার এ-কথাও বলা যায় না যে উৎপত্তির অনন্তরকালে যাহার বিনাশ ঘটিবে তাহারই নাম ক্ষণিক, কারণ ধর্মীতে যে ধর্ম এখনও উপগত হয় নাই ধর্মীর সেই ধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ মত্বর্থীয় প্রত্যয় প্রয়োগ করা যাইতে পারে ? সুতরাং 'ক্ষণিক' কথাটির অর্থ 'ক্ষয়ী' হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে, যাহার স্থিতি ক্ষণকাল মাত্র তাহাই 'ক্ষণিক' ; কালের সূক্ষ্মতমাংশ হইল ক্ষণ (সর্বান্ত্যো হি কালঃ ক্ষণঃ), এবং 'ক্ষণিক' বলিতে তাহাই বুঝায়, যাহার স্থিতি মাত্র এই ক্ষণকাল ব্যাপী। কিন্তু এ-কথাও অযৌক্তিক, কারণ (বৌদ্ধ মতে) কাল সংজ্ঞামাত্র। কাল সংজ্ঞামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিয়া বৌদ্ধ নিজেই আবার কিরূপে তাহা বস্তুর বিশেষণরূপে ব্যবহার করিতে পারেন ?

উদ্দ্যোতকর 'ক্ষণ' কথাটির যে ভ্রান্ত নিরুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই শান্তরক্ষিত এইবার তাঁহার যুক্তির প্রতিবাদ করিতেছেন ঃ—

উৎপাদানন্তরাস্থায়ি স্বরূপং যচ্চ বস্তুনঃ।
তদুচ্যতে ক্ষণঃ সোঽস্তি যস্য তৎ ক্ষণিকং মতম্ ॥ ৩৮৮ ॥

অর্থাৎ, বস্তুর যে-স্বরূপ উৎপত্তির অনন্তর স্থায়ী হয় না তাহাই হইল 'ক্ষণ' ; এই 'ক্ষণ' যাহার আছে তাহারই নাম 'ক্ষণিক'।—ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়

যে 'ক্ষণ' একটি পারিভাষিক শব্দ, moment ইহার প্রকৃত অর্থ নহে। কমলশীল এতদ্বিষয়ক এই বচনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—আত্মলাভের (self-realisation) অনন্তরই যাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহাই 'ক্ষণ'।—পূর্বপক্ষী কিন্তু আপত্তি করিতে পারেন যে ক্ষণ যাহার স্বভাব তাহাকে 'ক্ষণিক' বলা অযৌক্তিক; স্বভাব বলিতে যখন পৃথক্ কিছু বুঝায় না তখন সেই স্বভাবের অধিকারীকে আবার অপর (ক্ষণ হইতে পৃথক 'ক্ষণিক') নামে অভিহিত করা কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ঃ—

অসত্যপ্যর্থভেদে চ সোঽস্যাস্যেতি ন বাধ্যতে।
ইচ্ছারচিতসঙ্কেতমাত্রভাবি হি বাচকম্॥ ৩৮৯॥

অর্থাৎ, দুইটি বস্তুর মধ্যে অর্থভেদ যখন অবিদ্যমান তখনও বলা যাইতে পারে যে তাহাদের একটি অপরটির; কারণ বাচক শব্দ ইচ্ছারচিত সঙ্কেত ভিন্ন আর কিছুই নহে।—বাস্তব ভেদ বর্তমান না থাকিলেও ভেদ কল্পনা করিয়া লইয়া তজ্জ্ঞাপক ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে—যেমন "শিলামূর্তির শরীর"। ভাষা বস্তুর স্বভাবানুগ নহে; ভাষা কেবল বক্তারই ইচ্ছানুযায়ী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ভাষার বিচার করিয়া বস্তুসত্তা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

উদয়ানন্তরাস্থায়ি বস্ত্বেবং তু বিবক্ষিতম্।
তত্র সপ্রত্যয়ঃ শব্দোঽপ্রত্যয়ো বা প্রযুজ্যতাম্॥ ৩৯০॥

অর্থাৎ, উৎপত্তির অনন্তর কালে যে-বস্তুর আর অস্তিত্ব থাকে না তাহাই হইল এখানে আলোচনার বিষয়; এই বস্তু সপ্রত্যয় "ক্ষণিক"-শব্দ এবং অপ্রত্যয় "ক্ষণ"-শব্দ এই উভয়ের দ্বারাই ইঙ্গিত হইতে পারে।—এতক্ষণে শব্দ বিচার শেষ হইল। শান্তরক্ষিত এইবার দেখাইতেছেন যে আকাশাদি অকৃতক (uncreated) পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহাদের ক্ষণিকত্বও স্বীকার করিতে হইবে ঃ—

যদি তু ব্যোমকালাদ্যাঃ সন্তঃ স্যুস্তে তথা সতি।
নাতিক্রামন্তি তেঽপ্যেনং ক্ষণভঙ্গং কৃতা ইব॥ ৩৯১॥

অর্থাৎ, ব্যোম, কাল প্রভৃতি যদি সৎ পদার্থ হয় তাহা হইলে তাহারাও কৃতক (created) পদার্থের মত ক্ষণভঙ্গী হইতে বাধ্য। কারণ—

তথাহি সন্তো যে নাম তে সর্বে ক্ষণভঙ্গিনঃ।
তন্থথাসংস্কৃতা ভাবাস্তথাসিদ্ধা অনন্তরম্॥ ৩৯২॥
সন্তশ্চামী ত্বয়েষ্যন্তে ব্যোমকালেশ্বরাদয়ঃ।
ক্ষণিকত্ববিয়োগে তু ন সত্তৈষাং প্রসজ্যতে॥ ৩৯৩॥
ক্রমেণ যুগপচ্চাপি যস্মাদর্থক্রিয়া কৃতা।
ন ভবন্তি স্থিরা ভাবা নিঃসত্বাস্তে ততো মতাঃ॥ ৩৯৪॥

এই কারিকাত্রয়ে ক্ষণিকবাদের প্রধান কথা অতি সরল ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। শান্তরক্ষিত বলিতেছেন, সংস্কৃত ভাবাবলীর (created things) ন্যায় যাহাই অস্তিত্বশীল তাহাই ক্ষণভঙ্গী। নৈয়ায়িক বলিতে চাহেন যে ব্যোম, কাল ও ঈশ্বরাদি সৎ, কিন্তু ক্ষণিকত্ব ব্যতিরেকে ইহাদের কাহারও সত্তা সম্ভব হইবে না। স্থির ভাবাবলী (permanent entities) যুগপৎ বা ক্রমানুযায়ী কোন অবস্থাতেই অর্থক্রিয়া (effective action) উৎপাদন করিতে পারে না; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে এরূপ স্থিরভাবের অস্তিত্ব নাই।—কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে তদ্বিষয়ক প্রমাণ আবশ্যক। এবং এই প্রমাণ বস্তু সম্বন্ধীয় দৃষ্টি,স্পর্শ প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু দৃষ্টিস্পর্শাদিও বিশিষ্ট ক্ষণেই কার্য (অর্থক্রিয়া) করিয়া থাকে। সুতরাং বস্তুর ক্ষণিক অস্তিত্ব ভিন্ন অপর কোন অস্তিত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে না।—কমলশীল এই কারিকাত্রয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

বস্তুসত্তার হেতু হইল অর্থক্রিয়ার সামর্থ্য, কিন্তু ক্ষণিকত্বের নিবৃত্তিতে এই সামর্থ্যেরও নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। ভাবাবলী যুগপৎ বা ক্রমানুযায়ী ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে অর্থক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে না, এবং ক্রম ও যৌগপদ্য ভিন্ন অপর কোন উপায়ও সম্ভব নয়, যেহেতু এই দুই উপায়ের মধ্যে অন্যোন্যব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধ (relation of mutual exclusion) বর্তমান; কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না যে ঘট অন্যান্য দ্রব্য হইতে পৃথক্ মধূদকাদি ক্রমানুযায়ী একটির পর একটি করিয়া আহরণ করিতেছে এবং সেই সঙ্গেই স্বজ্ঞানোৎপাদন, উদকাহরণ প্রভৃতি কার্যও করিয়া যাইতেছে।* ঘট যে-সকল

* ঘটো মধূদকাদীংস্তদন্যদ্রব্যব্যাতিভিন্নান্ ক্রমেণাহরন্ স্বজ্ঞানোদকাহরণে ন চ যৌগপদ্যেন কুর্বন্ প্রত্যক্ষেণৈব পরিচ্ছিদ্যতে।—এই দৃষ্টান্তের দ্বারা ক্রমিক ও অক্রমিক কার্যের অন্যোন্যব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধ কিরূপে বিশদীকৃত হইল তাহা বুঝা দুষ্কর।

বিভিন্ন কার্য ক্রমানুযায়ী করিয়া থাকে সেইগুলি কখনই তাহা যুগপৎ করিতে পারে না। অপর দিকে ঘট স্ববিষয়ে যে-জ্ঞানাদি যুগপৎ উৎপন্ন করিয়া থাকে সেইগুলিকেই আবার সেই সঙ্গেই ক্রমানুযায়ী উৎপন্ন করা ঘটের পক্ষে অসম্ভব। অতএব, ক্রমের দ্বারা যখন যৌগপদ্যের এবং যৌগপদ্যের দ্বারা ক্রমের ব্যবচ্ছেদ (exclusion) ঘটিতেছে তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে ক্রমিক ও যুগপৎ ভিন্ন তৃতীয় কোন প্রকারের কার্য সম্ভব নহে।

নৈয়ায়িক উত্তরে বলিতে পারেন, ক্রম ও যৌগপদ্যের কথা বৌদ্ধের পক্ষে বলা সাজে না, কারণ বৌদ্ধ স্বীকারই করেন না যে কাল একটি পদার্থ। কিন্তু এ-যুক্তি চলিবে না। কারণ আমরা বলি না যে ভাববস্তুর ক্রম ও যৌগপদ্য কাল নামক একটি বিভিন্ন পদার্থের উপরেই নির্ভর করে। আমরা কেবল বলি, ভাববস্তু এই এই ভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক বস্তু যে-সময়ে (যদা) সত্তা লাভ করে অপরাপর বস্তুও যদি সেই সময়ে (তদা) সেই রূপেই তাহা করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাদের সকলকে অক্রমিক বলা হয়—যেমন সম্যক্ কারণাবলীর বলে (সমগ্রসামগ্রীকাঃ) একসঙ্গে বহু অঙ্কুরের উৎপত্তি। এই নিয়মের ব্যতিক্রম স্থলে যাহা ঘটে তাহারই নাম ক্রম—যেমন অঙ্কুর, কাণ্ড ও পত্রাদির উৎপত্তি। এখন পদার্থের উৎপত্তি যে-কারণের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই কারণাবলীও অনুরূপ পন্থায় ক্রমিক বা অক্রমিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। সুতরাং কাল স্বীকার করা হয় না বলিয়া ক্রম ও যৌগপদ্যও স্বীকার করা চলিবে না—এ-কথা বলা যায় না।—কমলশীলের কথা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বৌদ্ধমতে temporality একটি বিশেষ modality ভিন্ন আর কিছুই নহে।* কিন্তু তাহা হইলে কি এই আলোচনায় 'যদা' 'তদা' না বলিয়া 'যথা' 'তথা' বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইত না ?—

পরবর্তী কারিকায় দেখান হইতেছে যে যে-বস্তু স্থিরভাব তাহার পক্ষে ক্রমিক অর্থক্রিয়া সম্ভব নহে ঃ—

কার্যাণি হি বিলম্বন্তে কারণাসন্নিধানতঃ।
সমর্থহেতুসদ্ভাবে ক্ষেপস্তেষাং হি কিং কৃতঃ ॥ ৩৯৫ ॥

* "ত্রৈকাল্যপরীক্ষা"য় এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

অর্থাৎ, কারণের অসন্নিধান বশতই কার্য উৎপন্ন হইতে বিলম্ব হয়; সমর্থ হেতু উপস্থিত থাকিলে কার্যের বিলম্ব (ক্ষেপ) ঘঠিবে কেন?—শান্তরক্ষিতের এই কথাটি নূতন নহে। তিনি বলিতেছেন, বস্তু যদি ক্ষণিক না হয় তবে তাহা নিশ্চয়ই বিভিন্ন ক্ষণে বিভিন্ন কার্য উৎপাদন করিবে। কিন্তু সেই একই তথা-কাথত স্থিরবস্তু যখন এই সকল কার্যেরই কারণ তখন সেগুলি সব একসঙ্গে ঘটে না কেন?—এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য সহজ ঃ—

অথাপি সন্তি নিত্যস্য ক্রমিণঃ সহকারিণঃ।
যানপেক্ষ্য করোত্যেষ কার্যগ্রামং ক্রমাশ্রয়ম্ ॥৩৯৬॥

অর্থাৎ, কারণস্বরূপ স্থির পদার্থ সর্বদা সন্নিহিত থাকিলেও যে-সহকারী কারণা-বলার সাহায্যে ইহা কার্যসকল উৎপন্ন করিয়া থাকে সেগুলি সর্বত্র ক্রমিক।—এতদুত্তরে শান্তরক্ষিত কার্য, কারণ ও সহকারী কারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক দীর্ঘ ও দুরূহ আলোচনা করিয়াছেন ঃ—

সাধ্বেতৎ কিন্তু তে তস্য ভবন্তি সহকারিণঃ।
কিং যোগ্যরূপহেতুত্বাদেকার্থকরণেন বা ॥৩৯৭॥
যোগ্যরূপস্য হেতুত্বে স ভাবস্তৈঃ কৃতো ভবেৎ।
স চাশক্যক্রিয়ো যস্মাত্তৎ স্বরূপং তদা স্থিতম্ ॥৩৯৮॥
কৃতৌ বা তৎস্বরূপস্য নিত্যতাস্যাবহীয়তে।
বিভিন্নোঽতিশয়স্তস্মাত্তত্তসৌ কারকঃ কথম্ ॥৩৯৯॥

অর্থাৎ, তাহা যেন হইল; কিন্তু এই সহকারীগুলি বস্তুরই যোগ্যরূপের হেতুস্বরূপ, অথবা তাহাদের কার্য মূল বস্তুর কার্য হইতে অভিন্ন? প্রথম পক্ষে ভাবোৎপত্তি সহকারী কারণের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু যাহা স্থিরভাব তাহা—ex hypothesi—অশক্যক্রিয়। তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ তাহা সকল সময়েই সেই রূপেই বর্তমান ছিল—নহিলে তাহাকে স্থিরভাব বলাই যাইত না। অপর দিকে, কারণের (এখানে স্থিরভাবের) স্বরূপই যদি সহকারীর দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা হইলে স্থিরভাবের নিত্যতার হানি হইবে। আর শেষ কথা, সহকারী কারণের দ্বারা যাহা সংঘঠিত হয় তাহা যদি বস্তুটির কার্য হইতে পৃথক ও অতিরিক্তই হয় তবে মূল বস্তুটিকে

তাহার কারণ বলিয়া স্বীকারই বা করা হইবে কেন? কমলশীল এই কারিকাত্রয়ের বেশ সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

নিত্য বস্তুর কখনই কোন সহকারী থাকিতে পারে না। সহকারীর কার্য অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করা—যেমন বীজের পক্ষে ক্ষিত্যাদি ; অথবা সহকারীর কার্য মূল কারণের কার্য হইতে অভিন্ন (একার্থক্রিয়য়া)—দৃষ্টির পক্ষে যেমন রূপাদি। এখানে কিন্তু প্রথম পক্ষটি সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ সে-ক্ষেত্রে সেই উৎপন্ন অতিরেক মূল কারণের স্বভাব হইতে অভিন্ন বা ভিন্ন হইবে, অথবা অভিন্ন ও ভিন্ন এই দুইই হইবে, অথবা এতদ্দ্বয়ের কোনটিই হইবে না (আজীবকগণও এই চারিটি পক্ষ স্বীকার করিয়া থাকেন)। এখানেও কিন্তু প্রথম পক্ষটি অসম্ভব, কারণ সহকারী যদি মূল কারণের স্বরূপই হয় তবে তাহা তো পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল এবং যাহা বর্তমানই ছিল তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না ; বর্তমান সহকারী কারণেরও যদি আবার উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় তবে একেবারে ভাবটির উৎপত্তি স্বীকার করিতেই বা দোষ কি? কিন্তু তাহা কিরূপে করা যাইবে—পূর্বপক্ষীর মতে ভাব তো নিত্য। আবার দ্বিতীয় পক্ষটিও গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কারণ সহকারীর দ্বারা উৎপন্ন অতিরেকই যদি কার্য হয় তবে প্রকৃত কারণটি অকারক হইয়া পড়িবে, এবং সহকারীই হইবে প্রকৃত কারণ।—এই প্রকারের schematic dichotomy বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদের মজ্জাগত। পূর্বপক্ষী কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আপত্তি করিতেছেন এবং বৌদ্ধও তাহার যথোপযুক্ত উত্তর দিতেছেন :—

অথাপি তেন সম্বন্ধাত্তস্যাপ্যস্ত্যেব হেতুতা।
কঃ সম্বন্ধস্তয়োরিষ্টস্তাদাত্ম্যেন বিভেদতঃ ॥ ৪০১ ॥
ন চ তস্য তদুৎপত্তির্যৌগপদ্যপ্রসঙ্গতঃ।
ততশ্চ যৌগপদ্যেন কার্যাণামুদয়ো ভবেৎ ॥ ৪০২ ॥

অর্থাৎ, উৎপন্ন অতিরেকের সহিত নিত্য দ্রব্যটির সম্বন্ধ থাকায় সেই দ্রব্যটিরও হেতুত্ব স্বীকার্য। এ-কথার উত্তরে বৌদ্ধ প্রশ্ন করিতেছেন, দ্রব্য ও উৎপন্ন অতিরেকের মধ্যে কি সম্বন্ধ? তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তি ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধ সম্ভব নহে। কিন্তু ভেদ যখন স্বীকারই করা হইয়াছে তখন তাদাত্ম্য সম্বন্ধের

কথাই উঠিতে পারে না। আর যদি তদুৎপত্তি সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সকল কার্য যুগপৎ উৎপন্ন হইবে। মূল দ্রব্যটিই যদি সহকারী কারণের দ্বারা উৎপন্ন বৈশিষ্ট্যের হেতু হয় তবে সেই মূল দ্রব্য যখন পূর্বপক্ষীর মতে সর্বদাই বর্তমান তখন সহকারী কারণাবলীর দ্বারা যে সকল কার্য উৎপন্ন হয় সেগুলি এক মুহূর্তেই ঘটিয়া যাওয়া উচিত।—এই সকল এবং অন্য আরও কয়েকটি অনুরূপ যুক্তি দেখাইয়া শান্তরক্ষিত শেষে প্রমাণ করিলেন যে হেতুর কার্য যে সহকারী কারণ সাপেক্ষ তাহা স্বীকার করিলেও অক্ষণিক স্থিরভাবের পক্ষে ক্রমিক অর্থক্রিয়া উৎপাদন করা অসম্ভব। বিবিধ অর্থক্রিয়া যুগপৎ উৎপাদন করাও যে স্থিরভাবের পক্ষে সম্ভব নহে তাহাই দেখাইবার জন্য এইবার বলা হইতেছে ঃ—

যৌগপদ্যং ন চৈবেষ্টং তৎকার্যাণাং ক্রমেক্ষণাৎ ॥ ৪১৪ ॥

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষীও বলিতে চাহেন না যে তথাকথিত নিত্য পদার্থের কার্যাবলী যুগপৎ সম্পন্ন হইয়া যায়, কারণ তাহাদের ক্রমানুবর্তিতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; যেমন আত্মার সুখ দুঃখাদি ; আকাশের শব্দাবলী ; মনের ক্রমবিবর্তমান বিবিধ বিজ্ঞান ; পরমাণুর দ্ব্যণুকাদিক্রমে বিভিন্ন স্থূল পদার্থ। কাল, দিক্, ঈশ্বর প্রভৃতিরও ক্রমিক অর্থক্রিয়া পূর্বপক্ষী স্বীকার করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত এই বিষয়ের অনুমানপ্রমাণও আছে ঃ—

নিঃশেষাণি চ কার্যাণি সকৃৎ কৃত্বা নিবর্ততে।
সামর্থ্যাত্মা স চেদর্থঃ সিদ্ধাস্য ক্ষণভঙ্গিতা ॥ ৪১৪ ॥

অর্থাৎ, সামর্থ্যবিশিষ্ট পদার্থ* যদি তাহার সকল কার্য ক্রমানুযায়ী না করিয়া একবারেই শেষ করিয়া নিবৃত্ত হয় তাহা হইলেও পদার্থের ক্ষণিকত্বই সিদ্ধ হইয়া যায়। অপর দিকে পদার্থ তাহার সকল কার্য যুগপৎ উৎপন্ন না করিলে ঃ—

তদ্রূপস্যানুবৃত্তৌ তু কার্যমুৎপাদয়েৎ পুনঃ।
অকিঞ্চিৎকররূপস্য সামর্থ্যং চেষ্যতে কথম্ ॥ ৪১৫ ॥

---

* স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৌদ্ধ সামর্থ্যবিহীন কোন পদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

সর্বসামর্থ্যশূন্যত্বাত্তারাপথসরোজবৎ।
অসন্তোঽক্ষণিকাঃ সর্বে শক্তির্যদ্বস্তুলক্ষণম্ ॥ ৪১৬ ॥

অর্থাৎ, কার্যোৎপত্তির পরেও যদি বস্তু স্বাকারে অনুবৃত্ত হইতেই থাকে তবে তদ্দ্বারা সমুদয় কার্য্য পুনরায় উৎপন্ন হইবে! আর তাহা যদি সেই কার্য পুনরায় উৎপাদন করিতে না পারে তবে তাহার সামর্থ্য (অস্তিত্ব) স্বীকার করা হইবে কেন? তাহা যদি করা হয় তবে সমস্তই আকাশ কুসুমের ন্যায় অক্ষণিক এবং সেই জন্য অসৎ হইয়া পড়িবে, কারণ কার্যোৎপাদনের শক্তিই হইল বস্তুত্বের লক্ষণ।

পূর্বপক্ষী এখন বলিতেছেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বকেই বস্তুত্বের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কেন? কেবল মাত্র সত্তাসমবায়ই (inherence in existence) বস্তুত্বের লক্ষণ হইতে পারে! এই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর অনুবর্তী কারিকায় দেওয়া হইয়াছে:—

সত্তাসম্বন্ধ ইষ্টশ্চেদ্বস্তূনাং লক্ষণং ন তৎ।
অসিদ্ধেঃ সমবায়াদেঃ কথং বান্যোন্যলক্ষণম্ ॥ ৪১৮ ॥

অর্থাৎ, কেবলমাত্র সত্তাসমবায়কেই বস্তুর লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ বস্তু ও সত্তার মধ্যে সমবায়সম্বন্ধই অসিদ্ধ; এ-স্থলে এতদ্দ্বয়ের একটি অপরটির লক্ষণ হইবে কিরূপে? না হয় ধরিয়াই লওয়া গেল যে সত্তাদির অস্তিত্ব আছে। কিন্তু তাহা হইলেই বলা যায় না যে সত্তাসমবায়ই বস্তুত্বের লক্ষণ। যে-সকল মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না তাহাদিগকে বস্তুর এমন একটি লক্ষণ দেখাইয়া দিতে হইবে যদ্দ্বারা সেটি অপরাপর বস্তু হইতে সুপরিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ং অবধারিত হইয়া পড়ে* যেমন পৃথিবীর কর্কশতা। একটি পদার্থ কখনই অন্য একটি পদার্থের স্বরূপ হইতে পারে না, কারণ তাহাতে অন্যত্বেরই হানি হয়। কিন্তু এ-স্থলে লক্ষণ বলিতে যখন স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইতে পারে না তখন এক বস্তু অপর বস্তুর লক্ষণ হইবে কিরূপে?

বিচারে এতক্ষণ ধরিয়াই লওয়া হইয়াছিল যে যাহার অর্থক্রিয়া উৎপাদনের

* Cf. Mill: A thing is known to be what it is only by contrast with what it is not.

সামর্থ্য নাই তাহার অস্তিত্বও নাই। শান্তরক্ষিত এইবার এই বিষয়টি বিশদভাবে বুঝাইতেছেন :—

নিঃশেষশক্তিশূন্যং তু যদ্বন্ধ্যাসুতসন্নিভম্।
সর্বজ্ঞচেতসোঽপ্যেতি হেতুত্বং ন কদাচন ॥ ৪২২ ॥
ক্রিয়তে তত্র নৈবেদং কার্যরূপাদ্যদৃষ্টিতঃ।
নির্নিবন্ধনমস্তিত্বব্যবস্থানং বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪২৩ ॥
ন তস্মিন্ সাধিতেনার্থঃ ক্ষণিকত্বেন কশ্চন।
তত্র পর্যনুযোগশ্চ ক্রিয়মাণোঽপি নিষ্ফলঃ ॥ ৪২৪ ॥

অর্থাৎ, যাহা সম্পূর্ণরূপে শক্তিশূন্য এবং সেইজন্য বন্ধ্যাপুত্রের মতই অলীক, তাহার হেতুত্ব সর্বজ্ঞেরও কল্পনাতীত। এবং এই প্রকার শক্তিহীন পদার্থে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যেহেতু কোন কার্য বা রূপ দেখিতে পান না, সেইজন্য তাঁহারা এই সকল পদার্থের অস্তিত্বের কোন ভিত্তি আছে বলিয়াই স্বীকার করেন না। এইরূপ পদার্থের ক্ষণিকত্ব প্রমাণ করিলেও কোন লাভ হইবে না ; সুতরাং প্রতিবাদী যদি আপত্তি করেন যে এইসকল পদার্থের ক্ষণিকত্বই বা কিরূপে জানা যায়,—তবে সে-আপত্তিও সম্পূর্ণ ব্যর্থ ; কারণ বাদী এইসকল শক্তিশূন্য পদার্থের ক্ষণিকত্ব প্রমাণ করিতে উৎসুক নহেন। কমলশীল একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে অর্থক্রিয়া উৎপাদনের সামর্থ্য যাহার নাই তাহার ক্ষণিকত্ব বা অক্ষণিকত্ব বিচারও নিষ্প্রয়োজন। শ্লোকটি সুরুচিসঙ্গত নহে :—

অর্থক্রিয়াসমর্থস্য বিচারৈঃ কিং তদর্থিনাং।
ষণ্ডস্য রূপবৈরূপ্যে কামিন্যাঃ কিং পরীক্ষয়া॥

পূর্বপক্ষী এইবার বলিতেছেন যে অর্থক্রিয়া উৎপাদনের সামর্থ্যকেই বস্তুত্বের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে অতিব্যাপ্তি* দোষ অবশ্যম্ভাবী :—

নন্বু চার্থক্রিয়াশক্তা নভস্তামরসাদয়ঃ।
স্বজ্ঞানহেতুভাবেন ন চৈতে সন্তি ভাবিকাঃ ॥ ৪২৫ ॥

অর্থাৎ, আকাশকুসুমাদিও এক প্রকারের অর্থক্রিয়া উৎপাদনে সমর্থ ; কারণ তাহারাও অন্ততঃ স্বজ্ঞানোৎপাদন করিয়া থাকে ; অথচ বলা যায় না যে ইহারা

* গরুর শিং আছে বলিয়া শৃঙ্গবিশিষ্ট সকল জন্তুরই গোত্ব স্বীকার করা হইল অতিব্যাপ্তি দোষের উদাহরণ।

ভাববিশিষ্ট।—নৈয়ায়িকের এই উত্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র বিবাদ করাই যাহাদের উদ্দেশ্য তাহারাই এইরূপ কথা বলিতে পারে। কিন্তু আকাশকুসুমাদির জ্ঞানের যে কোন উৎপাদক হেতু নাই তাহার প্রমাণ কি? উত্তর ঃ—

অভাবকারণত্বে তু নৈরন্তর্যেণ সম্ভবেৎ।
নাভাবোঽপেক্ষতে কিঞ্চিন্নির্বিশেষতয়া সদা॥ ৪২৭॥

অর্থাৎ, অ-ভাবই যদি আকাশকুসুমাদির জ্ঞানের কারণ হয় তবে তাহা নিরন্তরই সম্ভূত হইতে থাকিবে, কারণ অ-ভাব কোন বিশেষ অবস্থার মুখাপেক্ষী নহে।

শান্তরক্ষিত এইবার ভদন্ত যোগসেন নামক এক আচার্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। নাম হইতে মনে হয় যে যোগসেন ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু তথাপি তিনি বিজ্ঞানবাদ স্বীকার করিলেও ক্ষণিকত্বে বিশ্বাস করিতেন না ঃ—

ক্ষণিকেষ্বপি ভাবেষু নন্বু চার্থক্রিয়া কথম্।
বিশেষাধায়িনোঽন্যোন্যং ন হ্যাদ্যাঃ সহকারিণঃ॥ ৪২৮॥
জাতৌ সর্বাত্মনা সিদ্ধেরজাতৌ বস্তুভাবতঃ।
নির্বিশেষাদ্বিশেষস্য ভাবে কার্যং ন কিং ভবেৎ* ॥ ৪২৯॥
ন চান্যতো বিশিষ্টাস্তে তুল্যাপর্যনুযোগতঃ।
সহকারিকলাপানামনবস্থা চ তে ভবেৎ॥ ৪৩০॥
ক্রমেণ যুগপচ্চাপি যতস্তেঽর্থক্রিয়াকৃতঃ।
ন ভবন্তি ততস্তেষাং ব্যর্থঃ ক্ষণিকতাশ্রয়ঃ॥ ৪৩১॥
সহকারিকৃতশ্চৈবং যদা নাতিশয়ঃ ক্বচিৎ।
সর্বদা নির্বিশেষৈব তদা সন্ততিরিষ্যতে॥ ৪৩২॥
বিনাশে যদ্যহেতুঃ স্যাদাদাবেব ভবেদয়ম্।
সম্ভবো যদি নাস্যাদাবন্তেঽপি স কথং ভবেৎ॥ ৪৩৩॥
স্বহেতোর্যদি ভাবানামিষ্যতেঽন্ন কারণম্।
বিনাশস্য কথং তেষাং ক্বচিদেব বিরুদ্ধতা॥ ৪৩৪॥

অর্থাৎ, ভাববস্তু ক্ষণিক হইলেই বা তাহার অর্থক্রিয়া কিরূপে সম্ভব হয়?

* এই শ্লোকার্ধ টি অতিশয় অস্পষ্ট। মদ্দত্ত অনুবাদ আনুমানিক মাত্র।

পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক বলেন যে স্থিরসত্তাও সহকারী কারণের উপর নির্ভরশীল বলিয়াই তাহা ক্রমানুযায়ী কার্যোৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু ক্ষণিকবাদীকেও মনে রাখিতে হইবে যে আদ্যাবস্থার সহকারীগুলি পরস্পরের প্রতি কোন বৈশিষ্ট্য উৎপাদন করিতে পারে না। আদ্যাবস্থায় সহকারীগুলি যদি বর্তমান থাকে তবে স্বীকার করিতে হইবে যে সে-গুলি তখন পূর্ণাকারেই বর্তমান ছিল। যদি বলা যায় যে তখন তাহারা বর্তমান ছিল না, তাহা হইলে উৎপাদ্য বস্তুরই অভাব ঘটিবে; এবং এই অভাববশতঃ বুঝিতেও পারা যাইবে না, সহকারী কারণের দ্বারা কোন বৈশিষ্ট্য ঘটিতেছে কি না। এ-ক্ষেত্রে সহকারীনিরপেক্ষ অবস্থাতেও ভাববস্তুর কার্যোৎপাদিকা শক্তি স্বীকার করিতে দোষ কি? আদ্যাবস্থার ভাবাবলী পূর্বভাব হইতে বিশিষ্টও হইতে পারে না, কারণ তদ্বিরুদ্ধেও অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এবং এইরূপে সহকারী কারণের আবার সহকারী কারণ অন্বেষণ করিতে হইবে এবং তাহাতে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়িবে। আর ভাবাবলী ক্রমিক ও অক্রমিক কার্যে অসমর্থ বলিয়াই তাহাদিগকে ক্ষণিক বলিতে পারা যায় না। সহকারীর দ্বারা কোন বৈশিষ্ট্যই যদি উৎপন্ন না হয় তবে বিজ্ঞানসন্তান সর্বদা নির্বিশেষ থাকাই উচিত। বিনাশ যদি হেতুনিরপেক্ষই হয় তবে আদিতেই বিনাশ ঘটে না কেন? আর আদিতে না ঘটিলে বিনাশ অন্তেই বা কেন ঘটিবে? ভাবাবলীর স্বহেতু ভিন্ন অপর কোন (সহকারী প্রভৃতি) কারণ যখন স্বীকার করা হইতেছে না তখন তাহাদের বিনাশ বিশেষ বিশেষ ক্ষণে ঘটিলেই বা দোষ কি?—শান্তরক্ষিতের এই কারিকাগুলি আদৌ স্পষ্ট নহে, এবং কমলশীলও 'পঞ্জিকা'য় কারিকার ব্যাখ্যাচ্ছলে যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা দুষ্কর। "কলাপ" কথাটি এখানে "বিজ্ঞানসন্তান" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে হয়। বিজ্ঞানবাদীর মতে কার্যোৎপাদন নূতন একটি বিজ্ঞানধারার প্রবর্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন বস্তু ক্ষণিকই হউক আর অক্ষণিকই হউক, প্রথম ক্ষণে তাহাদের কোন বৈশিষ্ট্যই থাকে না (নির্বিশেষ), কারণ প্রথম ক্ষণে বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ক একটা সাধারণ সচেতনতা ভিন্ন আর কোন ভাবই মানুষের মনে উদিত হয় না। এই সাধারণ সচেতনতাই বিশিষ্ট হইয়া বস্তু বিষয়ক "বিজ্ঞানে" পরিণত হয়। এখন এই নির্বিশেষ ক্ষণ হইতে যদি বিশিষ্ট ক্ষণের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে তবে তাহা হইতে একেবারে কার্যোৎপত্তি

বিষয়ক বিজ্ঞানোদ্ভবেই বা আপত্তি কি? এই বৈশিষ্ট্যের হেতুস্বরূপ এ-কথাও বলা চলিবে না যে এই বিশেষ ক্ষণ পূর্বের ক্ষণসন্তান হইতে পৃথক্ আর এক ক্ষণসন্তানের অন্তর্বর্তী, কারণ পরবর্তী বিজ্ঞানসন্তানের ক্ষণাবলীর মধ্যেও এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না। সুতরাং বৈশিষ্ট্য যখন কোথাও পাওয়া যাইতেছে না তখন অবিশিষ্ট কারণসন্তান হইতেই কার্যোৎপত্তি হইবে; কিন্তু তাহা হইলেই প্রতি কারণ হইতেই সর্ব কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করা হইল—যাহা অবশ্যই অসম্ভব। সুতরাং ক্রম ও যৌগপদ্য অনুযায়ী অর্থক্রিয়ার বিরোধ সত্ত্বেও ভাবাবলী যে-হেতু অর্থক্রিয়া উৎপাদনে সমর্থ সেই হেতু স্বীকার করিতে হইবে যে ভাবাবলী নিত্য হইলেও ঐরূপ অর্থক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে। ভাবাবলীর ক্ষণিকত্ব স্বীকার করা তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ইহার উত্তরে ক্ষণিকবাদী বলিতেছেন ঃ—

> উচ্যতে প্রথমাবস্থা নৈবান্যোন্যোপকারিণঃ।
> একার্থক্রিয়য়া ত্বেতে ভবন্তি সহকারিণঃ॥ ৪৩৫॥
> অন্যোন্যানুপকারেঽপি নাবিশিষ্টা ইমে যতঃ।
> স্বোপাদানবলোদ্ভূতাঃ কলাপোৎপাদকাঃ পৃথক্॥ ৪৩৬॥

অর্থাৎ, প্রথম ক্ষণে যে-সকল কারণ ক্রিয়াশীল হয় তাহারা পরস্পরের উপকারক নহে; ইহারা সকলে একই অর্থক্রিয়া উৎপাদনে লিপ্ত থাকাতেই ইহাদিগকে সহকারী কারণ বলা হয়। পরস্পরের উপকারক না হইলেও এই সহকারীগুলি অবিশিষ্ট নহে, কারণ ইহারা স্ব স্ব উপাদানের শক্তি হইতে উৎপন্ন; সুতরাং এইগুলি যে সন্তানাবলী উৎপন্ন করে সে-গুলিও বিভিন্ন।—কমলশীল কারিকাদ্বয়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

সহকারী কারণ দুই প্রকারের হইতে পারে ঃ—একই অর্থক্রিয়ার উৎপাদক, অথবা পরস্পরের সহায়ক। কার্য যখন অব্যবহিত কালেই উৎপন্ন হইবে তখন সহকারীর একার্থক্রিয়াকারিত্বই যুক্তিসঙ্গত, কারণ কার্যক্ষণ নির্বিভাগ হওয়াতে তাহাতে কোন সহকারীর পৃথক্ কোন অংশ থাকিতে পারে না। কার্য যখন ব্যবহিত কালে উৎপন্ন হয় তখন কিন্তু কারণ ও সহকারী পরস্পরের সহায়ক। সুতরাং প্রথম ক্ষণে কারণ ও সহকারীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না; কিন্তু তৎসম্বন্ধেও তাহারা একই অর্থে ক্রিয়াশীল হওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য করিতে

পারে। কিন্তু তদনুবর্তী বিশিষ্ট ক্ষণ উৎপাদনের সময়ে তাহারা আর অবিশিষ্ট থাকে না, কারণ উত্তরকালের সমগ্র কার্যক্ষণসন্ততি (chain of moments of effective action) পূর্বগামী হেতুপ্রত্যয় হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল হেতুপ্রত্যয়েরও আবার উৎপত্তি অন্য হেতুপ্রত্যয় হইতে। ইহাতে অনবস্থা ভাব আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এ অনবস্থা দোষের নহে, কারণ ইহাতে প্রত্যেক বিশেষ অবস্থার একটি বিশেষ হেতু আছে।

ততঃ প্রভৃতি যে জাতা বিশেষাস্তে তু তৎকৃতাঃ।
তদ্রূপপ্রকৃতিত্বেন তেষাং তদুপযোগিনাম্ ॥ ৪৩৭ ॥

অর্থাৎ, তখন হইতে যে-সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সে-গুলি সহকারীর দ্বারা সমুৎপন্ন বিশেষ কারণের দ্বারাই সম্পাদিত, কারণ এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য ও সহকারীর মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।—কমলশীল বলিয়া দিয়াছেন যে "ততঃ" বলিতে এখানে বুঝাইতেছে "দ্বিতীয় ক্ষণের পর হইতে"। তৃতীয় ক্ষণের কার্যে দ্বিতীয় ক্ষণের যে-সকল বৈশিষ্ট্য কারণরূপে প্রযুক্ত হয় সে-গুলির প্রকৃতি এ-রূপ যে তদ্দ্বারা সহকারীর দ্বারা উৎপন্ন বিশেষ কারণ হইতে উদ্ভূত কার্যও নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই জন্যই তৃতীয় ক্ষণ হইতে যে-সকল বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হয় সেগুলি সহকারী কারণের দ্বারা সম্পাদিত।

যোগসেন বলিয়াছিলেন যে বিনাশ যদি হেতুনিরপেক্ষ হয় তবে তাহা আদিতেই ঘটা উচিত। তাহার উত্তরে এখন শান্তরক্ষিত বলিতেছেন ঃ—

সন্তানোচ্ছেদরূপস্তু বিনাশো যো ন হেতুমান্।
তস্যান্তেঽপি ন ভাবোঽস্তি তথা জন্ম তু বার্যতে ॥ ৪৩৯ ॥
বিলক্ষণকলাপাদেরুৎপাদস্তু* সহেতুকঃ।
সোঽপ্যাদৌ জায়তে নৈব তদা হেতোরসম্ভবাৎ ॥ ৪৪০ ॥

অর্থাৎ, বিনাশ দুই প্রকারের—বিজ্ঞানসন্তানের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ, অথবা একটি বিজ্ঞানসন্তানের স্থলে অপর একটি বিসদৃশ বিজ্ঞানসন্তানের প্রবর্তন। এখন শান্তরক্ষিত এখানে বলিতেছেন, সন্তানোচ্ছেদ রূপ যে বিনাশ তাহা হেতুমান্ নহে। যোগসেন যদি এই বিনাশ সম্বন্ধে ঐ কথা বলিয়া থাকেন তবে তাহা

* ছাপা হইয়াছে "বিলক্ষণকপালাদেঃ"।

ঠিক নহে, কারণ এই বিনাশের যখন কোন রূপই নাই তখন আদিতে কেন, অন্তেই বা তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? ইহাতে কেবল বুঝায় যে সদৃশ লক্ষণ বিশিষ্ট সন্তানান্তরের উৎপত্তি বাধিত হইয়াছে। আর বিসদৃশ জ্ঞানসন্তানের উৎপত্তিরূপ দ্বিতীয় প্রকারের বিনাশই যদি যোগসেনের অভিপ্রেত হয়, তবে তাহার অহেতুকত্ব অসিদ্ধ, কারণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে মুদ্গরাদির আঘাতেই নূতন বিজ্ঞানধারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিবিধাঃ ক্ষণিকা ভাবাঃ কেচিদ্ধ্রাসস্য হেতবঃ।
শীতাদেরেব বহ্ন্যাদ্যা অপরে ন তথাবিধাঃ ॥ ৪৪১ ॥
অদৃষ্টতত্ত্বো লোকস্তু বিরোধমভিমন্যতে।
কার্য্যকারণভাবেঽপি প্রথমোক্তেষ্বনেকধা ॥ ৪৪২ ॥
বাধ্যবাধ্যকভাবস্তু বস্তুনো নৈব তাত্ত্বিকঃ।
বিদ্যতে তত এবোক্তং বিরোধগতিরিত্যপি ॥ ৪৪৩ ॥

অর্থাৎ, ক্ষণিক ভাবাবলী দুই প্রকারের ; কতকগুলি হ্রাসের হেতু—শীতাদির পক্ষে যেমন অগ্নি, এবং অপরগুলি তাহা নহে। অতত্ত্বদর্শী লোকেরাই প্রথম ক্ষেত্রে কার্য্যকারণ সম্পর্ক সত্ত্বেও বিরোধ কল্পনা করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে বস্তাবলীর মধ্যে বাধ্যবাধক সম্বন্ধ কোথাও নাই।—এই কারিকাদ্বয়ে শান্তরক্ষিত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে জগতে একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর বিরোধী কখনও হইতে পারে না। এটি প্রমাণ করা বিজ্ঞানবাদীর পক্ষে প্রয়োজন, কারণ আপাতদৃষ্টিতে যে-সকল ভাব পরস্পরের বিরোধী বলিয়া মনে হয় সেগুলি একই বিজ্ঞানধারায় সম্মিলিত হয় কিরূপে?

ইহার পরেই শান্তরক্ষিত কুমারিল ভট্টের মতের আলোচনা করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

তৃতীয়া

শপথের পাশে আমারে রেখেছ বেঁধে,
কতদিনে শেষ হবে যে তোমার ব্রত,—
নন্দন হতে পারিজাত খুঁজে এনে
কবে কোজাগর জাগিবে মাল্য গেঁথে ?
সময় কি সখি শপথের বাধা মানে ?
নয়নে ভাসিছে কনকাবতীর পুরী,
কাহিনী শুনেছি রাজকন্যার এক,
চিত-চঞ্চল শুকশারীদের গানে ।
জানো না ঘুমায় রূপসী রাজার মেয়ে
সোনার শিথানে শিয়র তাহার রাখি,
স্বপ্ন বাসরে গোপনে চুমিয়া যায়,
ঘুম ভাঙ্গিলেও থাকে সে স্মরণ ছেয়ে ?
এস দোঁহে রচি মিলন বন্য ফুলে ;
পূর্ণিমা পুন নাই বা রচিল মায়া,—
তৃতীয়ার চাঁদ সাক্ষী রাখিয়া করি
শপথ সফল, মর্ত্ত্যে, প্রদীপ জ্বেলে ॥

অশোক মৈত্র

গ্রীক সমাজব্যবস্থার ভূমিকা

গ্রীসের সম্পত্তিশালী ও সম্পত্তিহীন শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কলহ অহরহ প্রত্যেক সহরেই হইত। সম্পত্তিহীন দলের মধ্যে স্বাধীন গরীব নাগরিক, স্বাধীন শ্রমিক, অর্দ্ধগোলাম, গোলাম প্রভৃতি শ্রেণীর লোক ছিল। এই সব লোককে মেঠোবক্তারা (Demagogues) সাম্যবাদের আদর্শের কথা কহিয়া সম্পত্তিশালী আভিজাত্যদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত, এবং যাহাদের রাষ্ট্রে ভোটাধিকার ছিল তাহাদের ভোট লইয়া রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গরীবদের তরফদারী করিত। কিন্তু গ্রীসের কোন রাষ্ট্রেই শ্রমিক বা সর্ব্বহারাব দল আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। কারণ কন্সটিটুশান সম্পত্তিহীনদের বিপক্ষে ছিল। পেরিক্লিসের সংস্কার পর্য্যাপ্ত হয় নাই, এবং প্লেটোর আদর্শ পুস্তকেই আবদ্ধ ছিল। কাযেই উভয় শ্রেণীর মধ্যে রেষারেষিও শত্রুতা বদ্ধমূল ছিল।

পেরিক্লিস ও প্লেটোর যুগের অব্যবহিত পরে, যখন ইসক্রেটেস্ ও ডেমসথেনেস আথেন্সের প্রধান রাজনীতিক নেতা ছিলেন, এবং সুদূর বর্ব্বররাজ্য মাসিডো-নিয়াতে গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আরিষ্টটল তথাকার যুবরাজ আলেকজাণ্ডারকে গ্রীক সংস্কৃতিতে শিক্ষাদান করিতেছিলেন, তখন এই বর্ব্বররাজ্যের রাজা ফিলিপ গ্রীসের স্বাধীনতা হরণে ব্যস্ত ছিলেন।

এই সময়ে গ্রীসের রাষ্ট্রসমূহ আপনাদের মধ্যে ক্রমাগত কলহ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; নিজেদের মধ্যে ঐক্য কিছুতেই সংস্থাপিত হইল না দেখিয়া হেলেনীক পণ্ডিতেরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। হোমার বর্ণিত ট্রোজান যুদ্ধের পর, গ্রীক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া হেলেনীক জাতির সমস্ত শাখাগুলি আম্পিওথেনিক সংঘ স্থাপিত করিয়া তাহাতে সকলে মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু তদ্দ্বারা হেলেনীক জাতীয়তা (Nationality) সংগঠিত হয় নাই। পরে, পারস্য সম্রাটের গ্রীসে অভিযানের সময়ে অনেকগুলি গ্রীস রাষ্ট্র কিছুদিনের জন্য একত্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বিপদ কাটিয়া যাইলে

যথা পূর্ব্ব তথা পর অবস্থা হয়। একে আত্মঘাতী কলহে গ্রীসের রাষ্ট্রগুলি জর্জ্জরিত হয়, তৎপর আভ্যন্তরীন শ্রেণী কলহে সেই অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়। সম্পত্তিশালী শ্রেণী উদারনীতি কিছুতেই অবলম্বন করিল না ; গরীবকে পীড়ন, আত্মসেবা ও পরশ্রীকাতরতা হেলেনীক আভিজাত্যদের স্বধর্ম্ম হইয়াছিল। সক্রেটিসের শিষ্য দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে গভীর চিন্তা ও সমাজ সংস্কারের ভাব প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বৃথায় গেল। নাটকের মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে অনেক কথা তাঁহারা জনসাধারণকে বুঝাইলেন, গ্রীসে সমস্ত রাষ্ট্রের ঐক্যের কথা তাঁহারা বলিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সাহিত্যে এই চেষ্টার নজীর প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইউরিপিডেস্ তাঁহার 'হেলেন' নামক নাটকে সাম্রাজ্যবাদীদের কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ হেলেনের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে কেমনে আনন্দ (Joy) বৃথা মরিয়াছে—

Died beside the streams of Troy
For the phantom of a face
And the shadow of a name. ("Helen", pp. 249—51)

আবার আত্মকলহে মগ্ন হেলেনীকদের তাহা হইতে বিরত হইবার জন্য ইউরিপিডেস্ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন :—

"Silent lie the Spartan plain,
They shall never ride again.

*　　*　　*　　*

They shall never more contend
Youth with youth and friend with friend.
(Helen, pp. 208-11).

অন্যদিকে, বিবদমান হেলেনীকদের মধ্যে শান্তি আনয়ন করার জন্য আরিষ্টফেনেস্ বলিয়াছেন :—

Put an end to our fights and our feuds and divisions
Till all men shall hail thee, our Lady of Peace.

*　　*　　*　　*

And mingle all Greece
In a cup of good fellowship. ('Peace' pp. 991-8).

আবার, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনমত্ততার ফল যে শুভ নহে, তাহাই পেরিক্লীয় যুগের সাম্রাজ্যবাদের এবং নেতাদের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সফোক্লস বলিয়াছেন :—

"O Wealth, O kingship, and those gift of wit
Surpassing in life's rivalry of skill,
What hate, what envy come with you" !

(" Œdipus Tyranmus", pp. 380-2)

আবার, সিসিলীয় যুদ্ধে এথেনীয় সাম্রাজ্যের ভীষণ পরাজয় হইলে এবং তজ্জন্য দেশে বিপ্লবের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে যুদ্ধ বিষয়ে দেশের মাতৃজাতির মনোভাব কি হয় তাহা আরিষ্টফেনেস এক কাব্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। যখন একজন ম্যাজিষ্ট্রেট লিসিসট্রাটাকে বলে, "স্ত্রীলোকের যখন যুদ্ধ ব্যাপারের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাদের যুদ্ধের নিন্দা করা অন্যায়, তাহারা সুতা কাটিবে।" ইহাতে মাতৃজাতির মনোভাব কবি এই স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন'—

Lys. "Nothing to do with it, wretch !
When it is we
Who bear your sons and
send them to the war.
Magistrate. Hush, hush ! No bitterness" !

("Lysistrata", pp. 588—90.)

কিন্তু গ্রীসের গৃহকলহ কিছুতেই মিটিল না; গ্রীস জাতীয়তা লাভ করিতে অসমর্থ হইল। তখন স্বজাতিপ্রেমিক পণ্ডিত মহলে চিন্তার কথা হইল—বাহির হইতে কেহ আসিয়া যদি গ্রীসকে একতাবদ্ধ করিয়া দেয়! এমন সময়ে আথেন্সের এক রাজনীতিক ইসক্রেটেস্ বলিলেন, "ঐ মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ আমাদের এক করিয়া দিবে"। কিন্তু ইহার প্রত্যুত্তরে বিখ্যাত বাগ্মী ডেমসথেনেস্ বলিলেন, "সেই পিলের (মাসিডোনিয়ার রাজধানী) রাজাটা ? সেটাত বর্ব্বর"! কিন্তু অবশেষে ঘটনাচক্রে করোনিয়ার রণক্ষেত্রে সেই মাসিডোনিয়ার গ্রীক সংস্কৃতিতে

শিক্ষিত রাজা ফিলিপ গ্রীসের স্বাধীনতাকে নিগড়বদ্ধ করেন। পরের বৎসরে, ফিলিপের মৃত্যুর কথা গ্রীসে প্রচারিত হইলে তথাকার অভিজাতবর্গ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আবার যুদ্ধ করে, এবং আবার পূর্ব্বোক্ত রণক্ষেত্রে ফিলিপের অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র আলেকজাণ্ডার দ্বারা পরাজিত হয়। এই সময় হইতে হেলেনীক জাতির যথার্থ স্বাধীনতা চির অস্তমিত হয়। অবশ্য আলেকজাণ্ডার সুসভ্য, শিক্ষিত গ্রীকদের ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। এই সময়ে হইতে প্রাচীন হেলেনীক জাতির যথার্থ স্বাধীনতা আর ছিল না।

ইহার পর, আলেকজান্দার যখন এসিয়াজয়ে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি সেই মহাদেশ হইতে বিমুক্ত গ্রীক কয়েদীদের স্বদেশে পাঠাইয়া এবং স্বীয় লোক দ্বারা প্রত্যেক গ্রীক সহরের গরীব শ্রেণীকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করেন। ইহার ফলে, শ্রমিকশ্রেণী সর্ব্বত্র তাঁহার পক্ষাবলম্বী হয়। পরে, যখন বাবিলনে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু সংবাদ গ্রীসে উপনীত হইল, তখন গ্রীক অভিজাতেরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য পুনরায় চেষ্টা করে। কিন্তু তখন শ্রমিকশ্রেণী আলেক-জাণ্ডারের পক্ষীয় হওয়ায়, তাহার মাসিডোনীয় সেনাপতিদের পক্ষে গ্রীক অভিজাতদের বিদ্রোহ দমন করা সহজ হইয়াছিল।*

এই প্রকারে, হেলিনীক জাতির সমাজের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ হওয়াতে তাহাদের অখণ্ড জাতীয়তা এবং এক আদর্শ গড়িতে যেমন বিঘ্ন হইয়াছিল, তেমনি স্বাধীনতা সমরে একমন হওয়া অসম্ভব হইয়াছিল। বিভিন্ন স্বার্থের জন্যই তাহারা এক হইতে পারে নাই। গ্রীসের অধীনতার যুগের ইতিহাস তাহা আরও প্রকট করিয়া দেখায়।

গ্রীসের অধীনতার ইতিহাস লাঞ্ছনাপূর্ণ। গ্রীকজাতি মাসিডোনীয় সময় হইতে পুনঃ পুনঃ বিদেশীর দ্বারা বিজিত হয়। সে শৌর্য্য, সে বীর্য্য, সে তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক, সে কলা কৌশল সমস্তই ভোজবাজীর ন্যায় পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়।† আলেকজাণ্ডারের জয়ের কিছু দিন বাদে গ্রীক থিয়েটারে গ্রীক সৈন্যকে কাপুরুষ সাজাইয়া বিদ্রূপ করা হইত। ইহার পূর্ব্বে, পারসীকেরা

* Mahaffy—দ্রষ্টব্য।

† Finlay.

হেলেনীকদের স্বদেশভক্তিহীন, ভাড়াটিয়া বলিয়া ঘৃণা করিত, পরে রোমানেরা তাহাদের চোর মিথ্যাবাদী বলিয়া অবিশ্বাস করিত।* শেষের দিকে, রোমীয় আদালতে একজন গ্রীক সাক্ষীর সাক্ষী অবিশ্বাস্য বলিয়া গৃহীত হইত না।† এত গর্ব্বিত গ্রীকদের অবস্থা এত হীন হইয়াছিল। তত্রাচ গ্রীক সম্পত্তিশালী শ্রেণী স্বজাতীয় নির্দ্ধনশ্রেণীকে অর্থনীতিক ও সামাজিক সাম্য প্রদান করে নাই। বিভিন্ন শ্রেণী স্বীয় শ্রেণীস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া পৃথক পথে গিয়াছিল। কখন রাস্তায় এক হইতে পারে নাই। সেই জন্য হেলেনীক জাতির মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাহারা অনৈক্য প্রদর্শন করিয়াছিল।

গ্রীসের পরাধীনতার যুগেও আর একবার শ্রেণীসংগ্রাম ভীষণভাবে জাগিয়া উঠে। এইবার, গ্রীক উপনিবেশসমূহ প্রজ্বলিত হয়। সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালীতে এই সংগ্রাম বিশেষভাবে প্রকট হয়, অবশ্য গ্রীসও এই ধাক্কা হইতে বাদ যায় নি।

প্রাচীনকালে, সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালীতে অনেক গ্রীক উপনিবেশ ছিল; তথাকার গ্রীক সহরগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রও সংঘটন করিয়াছিল। সিসিলিতে একজন স্বাধীন রাজাও ছিল। এইজন্য দক্ষিণ ইতালীকে Magna Graecia অর্থাৎ "বৃহত্তর গ্রীস্" নামে অভিহিত করা হইত। কিন্তু কালে এই সব দেশ সর্ব্বগ্রাসী রোমান সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয়। রোম সিসিলি হইতে কার্থেজেনীয় প্রভাব বিনষ্ট করিলে, সেই দেশে ষাট বৎসর ধরিয়া সাধারণভাবে ধনবৃদ্ধি হয়। তৎপর, সিসিলিতে ভীষণভাবে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠে। এই বিদ্রোহ গ্রীক শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা সংঘটিত হয় নাই বটে, কিন্তু গ্রীক সমাজের ক্রীতদাসদের দ্বারা ইহা আবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া, এই বিপ্লবকে "দ্বিতীয় শ্রেণীসংগ্রাম" বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অভিহিত করিয়াছিল।‡ খৃঃ পূঃ ১৪০-১৩১ সালে এই ঘটনা সমুপস্থিত হয়। এই দুর্ঘটনার মূলে আছে বিশেষভাবে উপরের স্তরের লোকদের ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং তদনুযায়ী মূলধন তাহাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়; আর এই অর্থে বেশী সংখ্যায় গোলাম কেনা

* Mahaffy.

† Mahaffy—Ibid.

‡ Diodorus of Agyrium—Fragments of Books XXXIV—XXXV, Group 2.

হয়। ইহাদের নিষ্ঠুরভাবে খাটাইয়া লওয়া হইত এবং তাহাদের খাইবারও পরিবার কোনই ব্যবস্থা করা হইত না। ইহার মধ্যে ইটালীয়ান মনিবেরা তাহাদের গোলাম গরু-পালকদের দস্যু তস্করের কার্য্য করিতে শিক্ষা দিত কারণ তাহাদের আহার্য্য না দিয়া লুটতরাজ করিয়া খাইতে অনুমতি দেওয়া হইত। ইহার ফলে, সিসিলি দ্বীপ লুণ্ঠনকার্য্য এবং আকস্মিক মৃত্যুতে পূর্ণ হইয়াছিল এবং এই সব কার্য্য করিয়া গরুপালকেরাও আত্মনির্ভরশীল এবং সাহসী হইয়া উঠে।

এইরূপ অবস্থাতে, গোলামদের কষ্ট ও তাহাদের উপর শারীরিক অত্যাচার সামাতীত হইয়া উঠে। তাহারাও সুবিধা পাইয়া বিদ্রোহ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করে। এই সময় এউনার গোলামদের একজন মনিবের সিরিয়া নামক পশ্চিম এসিয়ার দেশের একটি গোলাম ছিল। তাহার "ভূত নামান" ও "তুক তাক" করা বাই ছিল ; সে স্বপ্নের প্রত্যাদেশ দ্বারা ভবিষ্যত বলিতে পারিত বলিয়া দাবী করিত। এই সব ভূতুড়ে কাণ্ড দ্বারা সে লোকদের আশ্চর্য্যান্বিত করিত। অবশেষে সে ভবিষ্যৎ বাণী বলিবার জন্য নিজেকে উন্মত্তাবস্থায় আনিয়া মুখ দিয়া অগ্নি ও আগুনের শিখা বাহির করিবার কৌশল আবিষ্কার করে। গোলামদের বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই প্রতারক প্রচার করে যে সিরিয় দেবী তাহার কাছে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাহাকে "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

গোলামদের এই রকম মনের অবস্থাতে, এউনার ডামপিলিউস নামক একজন কোটিপতির ব্যবহারে বিদ্রোহ সর্ব্ব প্রথমে প্রজ্জলিত হইয়াছিল। গোলামেরা উপরোক্ত ইউনুস নামধেয় সিরিয় ভূতুড়ে গোলামের সহিত ষড়যন্ত্র করে, এবং সে বলে ভগবান তাহাদের প্রচেষ্টা সফল করিবে। ইহার পর, গোলামেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাদের লৌহশৃঙ্খলবদ্ধ সঙ্গীদের খালাস করে, নিকটবর্ত্তী জমিদারী সমূহ হইতে গোলামদের একত্রিত করে, এবং এউনার নিকটে একটা আবাদে চারিশত লোক জমা করে। বিদ্রোহীরা রাত্রিতে পূজার সময় নিজেদের মধ্যে একটা বোঝা পড়া করে এবং পরস্পরের প্রতি বশ্যতার শপথ গ্রহণ করে ; আর ষড়যন্ত্রকারীরা যেমনভাবে পারে অস্ত্র সংগ্রহ করে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে মারাত্মক অস্ত্র তাহাদের হস্তে আসিয়াছিল তাহা হইতেছে, তাহাদের

উদ্ধত মনিবদের রক্তপাত করিবার জিঘাংসা। ইউনুস সেনাপত্য গ্রহণ করে, মধ্য রাত্রিতে সহর আক্রমণ করে এবং সকলকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। এই কর্ম্মে তাহারা সহরের গোলামদের সাহায্য পায়। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কোটিপতি ডামপিলিউসের কন্যাকে গোলামেরা রক্ষা করে এবং কাটানো নামক স্থানে তাহার আত্মীয়দের কাছে পৌঁছিয়া দেয়। ইতিহাসকার বলিতেছেন, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধগম্য হয় যে মনিবেরা যে অত্যাচার গোলামদের প্রতি করিয়াছিল তাহারই পাল্টা জবাব তাহারা দিতেছিল, অন্যের প্রতি তাহাদের কোন ক্রোধ ছিল না।*

এই কর্ম্মের পর, ইউনুস রাজা বলিয়া ঘোষিত হয় এবং শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কশালী লোকদের তাহার মন্ত্রী করে। অতি বৃহৎ সংখ্যক গোলাম তাহার পতাকামূলে উপনীত হয়। তাহাতে সে রোমানদের বিপক্ষে অস্ত্রচালনা করিতে সাহসী হয় এবং সংখ্যাধিক্যের বলে, কতকগুলি খণ্ডযুদ্ধে সে জয়ী হয়। এই সময় তাহার অধীনে দশ হাজারের বেশী লোক ছিল।

এই সময়ে ক্লিয়ন নামে সিলিসিয়ার (এসিয়া মাইনরের একটি প্রদেশ) একটি গোলাম আর এক দিক হইতে গোলামদের বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করে। এই দুই দল দেখিয়া, মনিব শ্রেণী আশা করিতেছিল যে উভয়ে কলহ করিয়া পরস্পরকে ধ্বংশ করিবে, এবং সিসিলি শ্রেণীসংগ্রাম বিমুক্ত হইবে। কিন্তু, মনিবদের আশায় ছাই দিয়া দুই দল এক হইয়া যায়। ক্লিয়ন ইউনুসের আধিপত্য স্বীকার করে এবং ৫০০০ লোক লইয়া তাহার অধীনে সেনাপত্য গ্রহণ করে। ইহা বিপ্লব আরম্ভ হইবার একমাস পরে সংঘটিত হয়। এই সময়ে রোম হইতে হিপ্সেয়ুস আসিয়া আট হাজার সৈন্যের সেনাপত্য গ্রহণ করে। ইহাতে বিদ্রোহীরা রোমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব গ্রহণ করে এবং তাহাদের হারাইয়া দেয়। এই সময়ে, তাহারা সংখ্যায় বিশ হাজার ছিল; কিন্তু শীঘ্রই তাহারা সংখ্যায় দুই লক্ষ হয় এবং কৃতকার্য্যের সহিত রোমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ চালায়। ইহা তাহারা প্রশংসনীয় ভাবে পরিচালিত করে এবং রোমানদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। এই সংবাদ চারিদিকে যত প্রচারিত হইতে লাগিল, ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ তত সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

* Diodruus—P, 106

রোমে দেড়শত লোক ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত হয়, আটিকাতে এক হাজারের উপর লোক, ডেলস এবং অন্যান্য জায়গায়ও এই প্রকারের ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। কিন্তু স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্রই ভীষণ নিষ্ঠুরতার সহিত এই আন্দোলন নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়। অন্য দিকে, সিসিলিতে বিদ্রোহ আরও ভীষণতর রূপ ধারণ করে। সমস্ত অধিবাসী সহিত সহরের পর সহর বিদ্রোহীরা জয় করিতে লাগিল, এবং একটি সৈন্যদলের পর আর একটি সৈন্যদল তাহারা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে ; অবশেষে রোমান সেনাপতি, রুপিলিউস তাহার গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া টাউরমেনিউম অবরোধ করে। এই অবরোধ খুব জোরভাবে চালান হয় এবং অবরুদ্ধ লোকদের এমন খাদ্যাভাব হয় যে তাহারা বাধ্য হইয়া নর মাংস ভক্ষণ করে। অবশেষে, সারাপিয়ন নামে একজন সিরিয়ান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কেল্লা শত্রু হস্তে অর্পণ করে। রুপিলিউস জয়ী হইয়া এউনাতে অগ্রসর হয়, ক্লিয়ন বীরভাবে যুদ্ধে মারা পড়ে। ইউনুস এক হাজার শরীররক্ষী লইয়া এক পর্ব্বতশৃঙ্গে পলায়ন করে। কিন্তু পলাইবার উপায় আর নাই দেখিয়া ইউনুসের শরীররক্ষীরা ধরা না দিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের মস্তক ছেদন করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। ভূতুড়ে রাজা ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় এক পর্ব্বত গহ্বরে চারিজন লোক লইয়া পলায়ন করে এবং শেষে তথায় ধৃত হয়। তাহাকে মরগানটিন নামক স্থানে বন্দী করিয়া রাখা হয়, তথায় সে কীট দষ্ট হইয়া মারা যায়। অবশেষে সিসিলিতে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন, পতিতদের এই বিদ্রোহের সময়ে প্রলেটারিয়েট শ্রেণী কি করিতে-ছিল ? স্বাধীন শ্রমিকশ্রেণী উচ্চস্তরের লোকদের এই দুর্দ্দশার সময়ে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া বরং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল ; কারণ ধনের ও অবস্থার জন্য সমাজে যে বৈষম্য ছিল তৎপ্রতি তাহাদের বিশেষ ক্রোধ ছিল। আশ্চর্য্যের ঘটনা এই যে, বিদ্রোহীরা তাহাদের কর্ম্মে যুক্তি ও দূরদৃষ্টি প্রদর্শন করিয়াছিল ; তাহারা কৃষকদের চাষজমি নষ্ট করে নাই, কিংবা তথায় প্রাপ্ত কৃষিজাত সঞ্চিত দ্রব্য নষ্ট করে নাই, অথবা যাহারা জমিতে কার্য্য করিতেছিল তাহাদের উৎপাত করে নাই। কিন্তু, স্বাধীন প্রলেটারিয়েটের সামাজিক বৈষম্য জনিত অসন্তোষ মনে এত বেশী ছিল যে, তাহারা ক্রীতদাসদের বিপক্ষে লড়াই করিবার জন্য গ্রামে

যাইবার ছল করিয়া গ্রামে গিয়া সম্পত্তি ধ্বংস এবং কৃষকের বাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছিল।

ইহার বহু শতাব্দী বাদে যখন সমগ্র হেলেনীক জগত রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইল, তখন গ্রীসীয় সমাজের শ্রেণীবিরোধের ইতিহাস পুনরভিনীত হইল অর্থাৎ, মাসিডোনীয় আধিপত্যের সময়ে যেমন শ্রেণীবিরোধের ফলে উভয় শ্রেণী একত্রিত হইয়া বিদেশীর বিপক্ষাচরণ করিতে পারে নাই তদ্রূপ রোমান আধিপত্যের সময়ে সেই ট্রাজেডির পুনরভিনয় হইয়াছিল। রোমান আধিপত্যের সময়ে জমিদার ও অভিজাতশ্রেণীয় লোকেরা "আখেয়ান লীগ" (Achaean League) সংগঠন করিয়া স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করিতে থাকে। অবশেষে যখন এই আভিজাত্য-সংঘ রোমানদের বিপক্ষে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করে, তখন তাহারা গণশ্রেণীর নিকট হইতে কোন সাহায্য পায় নাই। অবশেষে প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর সময় আসে। শ্রমিক ও কৃষক উভয় শ্রেণীই "গণ" বা প্রলেটারিয়েটের অন্তর্গত। শ্রমিক যেমন অর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক সাম্য দাবী করিত, কৃষকও তদ্রূপ জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করিতে চাহিত এবং জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিবার জন্য দাবী করিত। এই সময় জমির প্রশ্নই গণশ্রেণীর প্রধান সমস্যা হইয়াছিল। এই সময়ে এসিয়া হইতে সোশালিষ্ট মত গ্রীসের গণশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা জমি চাহিত। অবশ্য জমিদারবর্গ ইহার বিপক্ষে ছিল। শেষে যখন গ্রীসীয় গণশ্রেণী গ্রীসকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করে, তখন জমিদারকুল তাহার বিপক্ষে ছিল। কিন্তু গ্রীসের এই স্বাধীনতাসমর যাহা গণশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা অস্ত্রে ও রক্তে রোমানদের দ্বারা নির্ব্বাপিত হয়। আর হেলেনীক জাতির বেশীর ভাগ লোককে কয়েদ করিয়া রোমানেরা ইতালীর চারিদিকে গোলামরূপে বিক্রয় করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। একে গ্রীসের লোক চিরকালই কম ছিল, তারপর এই ভীষণ যুদ্ধের পর দেশ উজাড় করিয়া খালি করিয়া দেওয়াতে প্রাচীন হেলেনীক জাতি ধ্বংস মুখে পতিত হয়। এই ব্যাপারে, রোমানেরা পণ্ডিত ও গোলাম কাহাকেও বাদ দেয় নাই। এই সময়েই বিখ্যাত ঐতিহাসিক পলিবিউস্ রোমে বন্দীরূপে নীত হন।

এই যুদ্ধকে গ্রীসের গণশ্রেণীর বা পতিতের মুক্তি আন্দোলনের তৃতীয় চেষ্টা

বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহার পর যে গ্রীস ছিল, তাহা আর প্রাচীন হেলেনীক জাতির গ্রীস ছিল না। অবশ্য রোমান শাসনের প্রারম্ভেই প্রাচীন হেলেনীক জাতির বর্ণসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে বিদেশীয় গোলাম ও ঔপনিবেশকারীদের দ্বারা গ্রীস আবার অধিবাসিত হইয়া একটা "রোমেক" (Romaic) নামে নূতন জাতির উদ্ভব হয়। ইহারা অবশ্য গ্রীসের অধিবাসী বলিয়া "গ্রীক" এই নাম ধারণ করিয়াছিল। বর্ত্তমানের গ্রীকেরাই তাহাদের বংশধর। কিন্তু হোমারের হেলেনীক জাতি তাহার সমাজের প্রশ্ন সমাধান করিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ বিদেশীর দ্বারা বিজিত হয় এবং অবশেষে জীবতাত্ত্বিক জগৎ হইতে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া সেই প্রশ্নের সমাধান করে।

গ্রীসের ইতিহাসে পতিত জাতির মুক্তি আন্দোলনের চেষ্টার অনুধাবন করিয়া আমরা কি সমাজতাত্ত্বিক সত্য দেখিতে পাই? ইহাতে আমরা নিম্নলিখিত কতকগুলি সাধারণ প্রতিষ্ঠান দর্শন করি :—

(১) হোমারিক যুগে প্রত্যেক কৌমের একটি করিয়া রাজা (Basileus) ছিল। রাজা দেবতাদের বংশধর এবং তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত বলিয়া দাবী করিত। এই রাজা একাধারে, রাজা বা নেতা, পুরোহিত এবং বিচারক ছিল।

(২) এই যুগে রাজার পরে অভিজাতবর্গের স্থান ছিল। রাজবংশের কনিষ্ঠ শাখাসকল এবং বড় ভূস্বামীদের লইয়া এই শ্রেণী গঠিত হইয়াছিল। ইহারাও রাজার ন্যায় "বাসিলিউস্" (রাজকুমার) উপাধি ধারণ করিত। ইহাদের নীচে স্বাধীন নাগরিকের দল ছিল। পুরোহিতশ্রেণী বলিয়া কোন শ্রেণী ছিল না। এই ব্যবসায় গুটিকতক কুলে আবদ্ধ ছিল, যদিচ ইহা পুরুষানুক্রমিক পেষা ছিল না। অভিজাতেরা পুরোহিতদের উপরের স্তরের লোক ছিল। সেইজন্য, পুরোহিত গোষ্ঠীর মন্দিরে অভিজাতদের পূজা করিবার অধিকার ছিল। এই সব স্তরের নিচে ছিল ক্রীতদাসের দল।

(৩) হোমারিক যুগের পরে, অভিজাত-শ্রেণী রাজাকে অপসারিত করিয়া নিজেদের হস্তে শাসনদণ্ড কাড়িয়া লয়। এই সময়ে সামাজিক বৈষম্য বিশেষ-ভাবে দৃঢ়বদ্ধ হয়। হোমারিক যুগে রাজকুমার ও উচ্চবংশের লোকদের সহিত

বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু অভিজাতশ্রেণীর শাসনকালে, অভিজাতবর্গীয়দের সহিত বিবাহ (connubium) এবং আহারাদি (commensality) সামাজিক সম্বন্ধ বন্ধ হইয়াছিল। এই বিষয়ে বর্ত্তমান হিন্দুদের ন্যায় জাতি বিভাগ (caste system) তৎকালীন হেলেনীক সমাজে সংস্থাপিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

(৪) কিন্তু, অলিগার্কি (মুষ্টিমেয় লোক) দলের শাসনযুগে অর্থনীতিক এবং সামাজিক বিপ্লব সাধিত হইয়া অভিজাতদের শাসন নষ্ট করিয়া দেয়। এই সময় ধনের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বুর্জোয়া ডেমোক্রাসীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে, পূর্ব্বেকার বিবাহের কড়া আইন উঠিয়া গিয়া, অভিজাত ও ধনী নাগরিকদের (বুর্জোয়া) মধ্যে বিবাহ প্রচলনের আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু বৈদেশিকগণের সহিত বিবাহ দৃঢ়ভাবে নিষিদ্ধ হয়।

(৫) গ্রীসের শ্রেণীভেদ কোন স্থানে অর্থনীতিক বিভিন্নতাজনিত সামাজিক বৈষম্য প্রসূত, কোনস্থানে বিজেতা ও বিজিত সম্পর্কজনিত বৈষম্যের জন্য উদ্ভব হয়।

(৬) গণশ্রেণী যাহারা নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল তাহারা সম্পত্তিশালী শ্রেণীদের সহিত নানা উপায়ে ক্রমাগত শ্রেণী-সংগ্রাম চালায় এবং নিজেদের অধিকার পাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে।

(ক্রমশঃ)

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

স্পিনোজা

ইতিবৃত্ত রাত্রিতলে মধ্যযুগতামস আকাশ
দীপ্ত হল ক্ষণতরে লেকিহান চিতাগ্নিশিখায়,
অতিক্রমি ধরিত্রীর অল্পতার ধূলির মৃত্যুরে
অম্লান অন্তরছবি স্বপ্নরূপে উঠিল উদ্ভাসি
বিদ্রোহীর চিদাকাশে সৌরকেন্দ্র জগতের রূপে
ছুটে যেথা পৃথ্বীসহ গ্রহদল বর্ষদীর্ঘ বৃত্তপথ বাহি ;
নবদৃষ্টিভঙ্গিতলে গণিতের কল্প আলিম্পনা
চিরন্তন রূপ পেল প্রতীচীর চিত্তের প্রসারে।

যুগান্তের সেই মন্বন্তরে,
আপনার প্রতিভার উচ্চভূমি হতে
নবযুগ মানদণ্ডে মাপিয়াছ তুমি
অতীতের ধর্ম্ম রাষ্ট্র বিজ্ঞান দর্শন।
জ্ঞানের কুলিশাঘাতে দগ্ধ হল ভস্মরাশিরূপে
ধর্ম্মের অলীক মূঢ় কল্পনার অনাদি মন্দির ;
রাষ্ট্র যে শক্তির লীলা সেই বাণী প্রচারিলে তুমি পুনর্ব্বার,
বিজ্ঞানের মর্ম্মকথা তোমার মাঝারে লভে আপনার সমগ্র প্রকাশ,
যার খণ্ড অভিব্যক্তি দেখিয়াছ সমকালে অন্তরের মধুদৃষ্টি দিয়া।

দেশ হ'তে দেশান্তরে বিতাড়িত মহা সত্যাশ্রয়ী
মিথ্যাময় দেবতার বেদীমূলে কর নাই কখনো প্রণতি।
রিক্ততা সম্বল তব চিরদিন তুমি গৃহহীন
সুচির প্রবাসী তুমি, বিশ্ব তাই তব নিত্যদেশ।

সর্ব্বলোক মুক্তিতীর্থ তব চিত্ত প্রয়াণসঙ্গমে
প্রতীচ্যের সার্ব্বভৌম জ্ঞানগঙ্গাধারা
প্রীতির কালিন্দীনীরে বাঁধিয়াছে বাহুর বন্ধনে।

দেশকালাতীত তব নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানের প্রকাশ
বিরাট ব্যক্তিত্ব তব অবলুপ্ত চক্ষু অগোচরে
বুদ্ধি ও বস্তুর ক্ষেত্রে
অন্তর্লীন নিত্য প্রকৃতির চিরন্তন সম অন্তরালে।
ব্যষ্টি সমষ্টির স্তর অতিক্রমি উত্তরিলে স্থিরলক্ষ্য তুমি
প্রজ্ঞানের গৌরীশৃঙ্গে যেথা ধ্রুব আলোক সম্পাতে
দৃষ্টি তব মুক্তি লভে লুপ্তসীমা সমগ্রের মাঝে।
বদ্ধ গৃহকোনে বসি জীবনের নিত্য প্রয়োজনে
দণ্ডে দণ্ডে আপনারে করিয়া নিঃশেষ
চিক্কন স্ফটিক তুমি করেছ নির্ম্মাণ
দূরান্তিকে প্রসারিত বিজ্ঞানের দুই চক্ষু তরে ;
তাহাতে নিখিল বিশ্ব অন্তহীন মহিমায় উঠিয়াছে ফুটে
অণু হতে অণীয়ান মহা হতে মহীয়ান রূপে।
স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব তাই অস্বীকার করি
মানবের ভাবাবেগ রেখাচিত্রে আঁকিয়াছ তুমি
জ্যামিতির সূত্রময় কালাতীত আবশ্যিক রূপে ;
অহঙ্কারঘন মায়া দেহাকাশে রচে ইন্দ্রজাল,
আত্মার প্রশান্তিময় শুভ্র জ্যোতিরেখা
সপ্তচ্ছন্দ বর্ণচ্ছত্রে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে
সুখ দুঃখ হাসি কান্না রাগ দ্বেষ অভিমান রূপে।
সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অনুবীক্ষণের তলে
জীবন সন্তানধারা প্রকর্ষের অসীম প্রয়াস
গোপন আঁধার যত উন্মুক্ত আলোক মাঝে

সন্তর্পনে আসিল মন্থরে
অন্ধপ্রায় অনিচ্ছুক শম্বুকের মত।
অনাগত শতাব্দীর চিন্তাধারা করি আহ্বান,
প্রাণবিদ্যা সমন্বয়ে রচিয়াছ মানসবিজ্ঞান
প্রকৃতির মানদণ্ডে মাপিয়াছ চিত্তের পরিধি।

নিরুদ্দেশ্য প্রকৃতির অনেকান্ত বহুগুণ মাছে
লুপ্ত হল কারুনিক ঈশ্বরের কাল্পণিক মঙ্গল বিধান,
শুভাশুভ পাপশূন্য সুন্দর কুৎসিত
চরম নিঃস্বতা লয়ে পূর্ণতায় লভে অবসান
বস্তুতন্ত্র বিষয়ের সুনির্ম্মম বিধির নিগড়ে।
কারণের তন্তুজাল রচিয়াছে প্রকৃতির বিচিত্র বসন
দুঃশাসন চিত্তবৃত্তি পরিশ্রান্ত ব্যর্থতার ভারে
সে বস্ত্র হরণ করি নগ্নরূপ ভোগের কামনা
তন্দ্রামগ্ন চেতনার অবাস্তব ছায়া চিত্রময়
স্বপ্নের কুহেলিমাত্র, এই বার্ত্তা ঘোষিয়াছ তুমি
উদাত্ত গম্ভীর স্বরে।
তব রুদ্র দৃষ্টিতলে শুষ্ক হল তাই চিরতরে
স্বেচ্ছাচারী ঈশ্বরের পাদপীঠে মানবের সজল কামনা,
শাশ্বত প্রকৃতি বিশ্বে বিভুরূপে প্রতিষ্ঠিত হল নবযুগে।

যুগে যুগে তাই যত কবি, শিল্পী, দার্শনিকদল
বাসনার জ্বরতপ্ত বিকারের দুঃস্বপন হ'তে
সুস্নিগ্ধ শান্তির তরে মাগিয়াছে পরম আশ্রয়
নামরূপাতীত তব শাশ্বতের সুষুপ্তির কোলে।

সমুদ্রের নীল বাধা, শতাব্দীর ঘন অন্তরাল
অতিক্রমি অবহেলে ভেসে উঠে ধ্যানমূর্ত্তি তব,
যবে বসি শবাসনে মধ্য রাত্রি তমিস্রার তলে
লভেছিলে মহাসিদ্ধি তান্ত্রিকের মন্ত্রের সাধনে
যুগান্তের সন্ধিক্ষণে মৌন সাধকের মত প্রতীচীর শ্মশান অঙ্গনে।
ফুটিয়াছে অকম্পিত নিস্তব্ধ আকাশে
জ্যোতির প্রাচুর্য্যে অন্ধ তারকারোমাঞ্চময়ী মুক্তি-সিদ্ধ শর্ব্বরীর স্মৃতি
কৃষ্ণ অন্ধকার স্তূপে অন্তহীন প্রকৃতির চিত্রকল্পরূপে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

রেনে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ

কুশানযুগে বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্ম স্থাপন এবং তার মধ্যে সম্প্রদায়ভেদের উৎপত্তি সমসাময়িক বলেই মনে হয়। ঐতিহ্য প্রমাণে বৈশালীর দ্বিতীয় মহাসভাতেই স্থবিরবাদিন্, পালিতে থেরাবাদিন্ (অর্থাৎ বৃদ্ধ বা সনাতনপন্থী) এবং মহাসঙ্ঘিকাদের (অধিকাংশই অল্প বিস্তর নব্যপন্থী) মধ্যে মতভেদ আরম্ভ হয়। Przyuski সাহেবের মতানুসারে উত্তরে কৌশম্বী (কোশম্) ছিল স্থবিরদের কেন্দ্রস্থল। দক্ষিণে ত দেখা গেল যে সিংহলের সমগ্র ধর্মমণ্ডলীই তাঁদের দ্বারা স্থাপিত ; এমন কি খৃঃ পূঃ ৮৯ অব্দে যে পালি শাস্ত্রগ্রন্থ সিংহলে বিধিবদ্ধ হয়, সেও তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে। ক্রমশঃ অন্যান্য সম্প্রদায়েরও আবির্ভাব হল, তার মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে সর্বাস্তিবাদিনের দল ; অথাৎ যাঁরা সর্বতোভাবে বাস্তববাদী। তাঁদের এই নামকরণের কারণ এই যে, দার্শনিক ক্ষেত্রে তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করতেন ; যে বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের বিশেষ সন্দেহ ছিল। উক্ত সাহেবের মতে এই সম্প্রদায়ের নিবাস ছিল মথুরা, ও পরে তাঁরা নিজেদের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেন কাশ্মীরে। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়েছে যে সর্বাস্তিবাদিনদের প্রভাবেই জালন্ধরের মহাসভায় কণিষ্কের অধীনে সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র বিধিবদ্ধ হয়।

কুশান যুগে বৌদ্ধধর্মের দুই ঐতিহাসিক শাখার পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয় : যথা মহাযান বা মোক্ষলাভের বৃহৎ বাহন, এবং হীনযান বা ক্ষুদ্র বাহন। রূঢ়ভাবে যে কোন সংঘর্ষ বা বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তা মনে হয় না। দুই বিভিন্ন মতের যে পণ্ডিতী তর্ক, তা' কখনো রাজনৈতিক বা সাংসারিক ক্ষেত্রে দলাদলির সৃষ্টি

* শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী কর্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত "রেনে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ" সম্পূর্ণ আকারে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ প্রকাশ করিবেন।

করেনি। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুই মতের প্রার্থক্য ক্রমশঃ এতই বেড়ে যেতে লাগল যে, আজকের দিনে একজন মহাযানী তিব্বতীয়ের সঙ্গে একজন হীনযানী সিংহলীর কোন বিষয়েই বিশেষ মিল দৃষ্ট হয় না।

হীনযান ও মহাযান মতবাদের প্রভেদ কতকাংশে বৌদ্ধধর্মের দেবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। হীনযানপন্থীগণ শাক্যমুনির উহ্য নাস্তিকতা ও মানবধর্ম ভাবের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন ; এবং তাঁকে কেবলমাত্র একজন মহামানব বা অতিমানব বা "মহাপুরুষ" রূপে গণ্য করতে থাকলেন। কিন্তু মহাযানপন্থীগণ ক্রমশঃ তাঁতে দেবত্ব আরোপ করতে লাগলেন। তাঁরা যে কখনো তাঁকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছিলেন, তা নয়। পরমাত্মা বা নির্বিকার সত্তার কল্পনা কোন দিনই বৌদ্ধধর্মে স্থান পায়নি। কিন্তু ঈশ্বর না হয়েও মহাযানের বুদ্ধ দেবতার সমান বা ততোধিক ছিলেন। তিনি ছিলেন চিরন্তন, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী মহত্ত্বের স্বরূপ, যিনি নিজ মূর্তিতে পরিকল্পিত অসংখ্য অতিপ্রাকৃত মূর্তির সৃষ্টি দ্বারা অতীতে ও ভবিষ্যতে প্রসারিত। মহাযানীদের ধারণা ছিল যে শাক্যমুনির পূর্বেও তিনি বহু যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং তিনি এই মর্ত্যলোকে যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে যুগাবসানে আরও অনেক বুদ্ধ আবার আবির্ভূত হবেন ; এখনই তাঁদের ভবিষ্যৎ বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয়। এই সকল বোধিসত্ত্বের মধ্যে প্রধান ছিলেন মৈত্রেয়, যিনি পরবর্তী যুগের বুদ্ধ, এবং শাক্য-মুনির অব্যবহিত উত্তরাধিকারী ; অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি, মঞ্জুশ্রী, ক্ষিতিগর্ভ ও সমন্তভদ্র। শেষ পর্যন্ত মহাযান পন্থায় এঁরা ঐতিহাসিক বুদ্ধ অপেক্ষা গুরুতর ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন। উপরন্তু প্রত্যেক বুদ্ধ প্রত্যেক বোধি-সত্ত্বের একটি বাঙ্ময় জুড়ি, অর্থাৎ ধ্যানী বুদ্ধ বা আধ্যাত্মিক প্রতিরূপ ছিল, যার দ্বারা তাঁরা মানুষের কাছে প্রকাশ পেতেন। ধ্যানী বুদ্ধের আদর্শ রূপ ছিলেন অবলোকিতেশ্বর, কিম্বা শাক্যমুনি অমিতাভ। এই অমিতাভের পূজা, বা অমিতবাদ উত্তরকালে মহাযানে ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ করতে করতে অবশেষে চীন ও জাপানে একটি নূতন ধর্মে পরিণত হল। সে ধর্ম একপ্রকার বৌদ্ধ ঈশ্বরবাদ বা সকল ভক্তির ধর্ম। তার 'সুখাবতী' বা পবিত্র স্বর্গরাজ্যে পদ্মফুলের প্রতীকে সেই সকল আত্মার পুনর্জন্ম হয়, যারা বোধিসত্ত্বের কৃপায় ত্রাণ লাভ করেছে। মহাবৈরোচন নামক আর একজন ধ্যানী বুদ্ধ কোন কোন তিব্বতী ও

চীন-জাপানী মহাযান সম্প্রদায়ে "আদিবুদ্ধে" পরিণত অর্থাৎ একপ্রকার প্রথম ও পরমবুদ্ধ, যিনি স্রষ্টা ও চিরন্তন এবং অচিরে বিশ্বাত্মা বা পরাপ্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন বা অবিনশ্বর বজ্রধাতুরূপে পরিকল্পিত হয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই সকল দিব্যপুরুষের মধ্যে অনেকেরই উৎপত্তি অ-বৌদ্ধ বলে বোধ হয়। বজ্রপাণিকে মনে হয় ইন্দ্রের রূপান্তর; অবলোকিতেশ্বর হয়ত ঈশ্বর বা শিব হতে সম্ভূত। আর অমিতাভের উদ্ভব ইরাণ দেশে হওয়া খুবই সম্ভব ও কিছুমাত্র অসম্ভব নয় মনে হয়, যদি স্মরণ করা যায় যে কুশান সাম্রাজ্যে যেমন বৌদ্ধধর্মের, তেমনি মাজ্দাধর্মেরও সমান অধিকার ছিল। এইরূপে মহাযানীরা এক রীতিমত দেবসভা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মহাবস্তু, ললিতবিস্তর ও সদ্ধর্মপুণ্ডরীক পাঠে হীনযান থেকে মহাযান পর্য্যন্ত বৌদ্ধ দেবদেবীর অভিযান বেশ পরিষ্কার লক্ষ্য করতে পারা যায়। হীনযান শাস্ত্রের অন্তর্গত সংস্কৃত মহাবস্তুতে বুদ্ধের একটি জীবনচরিত আছে, তার সঙ্গে একরাশ জাতক অবদান ও ধর্মসূত্র মিশ্রিত। তা'তে শাক্যমুনির জীবনের অনেকস্থলে (বিশেষতঃ কাশীর উপদেশে) বহু প্রাচীন জীবনকথার দর্শন পাওয়া যায়; সেগুলি সিংহলী থেরাবাদিনদের পালি ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই অতিপ্রাকৃতের প্রতি ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়; বোঝা যায় যে বুদ্ধের জীবনকথা পৌরাণিক ঈশ্বরাবতারদের জীবনকাহিনীর ছাঁচে ঢালাই হবার উপক্রম হয়েছে। বস্তুত যদিও মহাবস্তুর মূল কাহিনী আধুনিক যুগের দুই শতাব্দী পূর্বে সম্ভবত রচিত হয়েছিল, কিন্তু তার পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত অংশে উল্লেখ আছে যোগাচার সম্প্রদায়ের, যার তারিখ খৃঃ চতুর্থ শতাব্দী; এবং হূণ জাতির, যার তারিখ পঞ্চম শতাব্দী। ললিতবিস্তরে যেন আর এক ধাপ অগ্রসর হবার চিহ্ন বর্তমান। যদিও সর্বাস্তিবাদিনদের মতানুযায়ী শাক্যমুনির এক জীবন তার মূল আখ্যানবস্তু, তথাপি এই জীবনচরিতে যেন মহাকাব্যের দার্শনিক অবদানের ছায়া পরিলক্ষিত হয়; এবং সেটি সর্বতোভাবে নিত্যানন্দ বুদ্ধকে ভগবানরূপে পরিকল্পনার আদর্শে রচিত। এই রচনা সম্ভবত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই তার বর্তমান আকারে গ্রথিত হয়েছে। তার মধ্যে দেখা যায় ক্রমশই অলৌকিক কর্মসম্পাদনে ব্যাপৃত অন্যান্য দেবগণ তাঁর আরাধনায় নিযুক্ত, ইত্যাদি। এবং সেই গ্রন্থটি মহাযানী শাস্ত্রের একটি আদি গ্রন্থরূপে

গণ্য হয় (তার মূল বিষয়গুলি উপরন্তু অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে এবং গান্ধারের ভিত্তিলগ্ন মূর্তিতে দেখা যায়)। অতঃপর সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের কাল আনুমানিক ভাবে খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং এই গ্রন্থে আমরা মহাযানের পরিচ্ছিন্ন রূপের দর্শনলাভ করি। তার মধ্যে বুদ্ধের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তিভাব, তাঁর মূর্তি ও চিহ্নাদির পূজা, এবং অবলোকিতেশ্বর প্রমুখ অন্যান্য বোধিসত্ত্বের অর্চনা জয়যুক্ত হয়েছে দেখতে পাই।

বৌদ্ধধর্মের আদি সম্প্রদায়

দার্শনিক হিসেবে দেখতে গেলে, হীনযান ও মহাযান উভয় দিক থেকেই বড় বড় তত্ত্বজিজ্ঞাসু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ চিন্তার এ যাবত আদিম অবস্থা তার মধ্যে প্রসার ও উন্নতির পথ পায়।

হীনযানের দুই প্রধান শাখা বৈভাষিক ও সৌতান্ত্রিক সম্প্রদায়। কণিষ্কের রাজত্বকালে যে সংস্কৃত অভিধর্মগ্রন্থ তখন সম্প্রতি রচিত হয়েছিল, তারই ভাষ্য বা বিভাষের উপর বৈভাষিকগণ তাঁদের ভিত্তি স্থাপন করেন। (৩৫০ খৃঃ-র দিকে ?) বসুবন্ধু কর্তৃক রচিত অভিধর্ম কোষশাস্ত্র অতঃপর এই সম্প্রদায়ের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থস্বরূপে গণ্য হয়। সে যুগে যে হিন্দু বস্তুতান্ত্রিকতা পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছিল (বৈশেষিক সূত্র, খৃঃ ১০০-১৬০র দিকে ?) সম্ভবত তারই প্রভাবে বৈভাষিকগণ যে কেবলমাত্র পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তববাদের পক্ষপাতী ছিলেন তা' নয়, পরন্তু একপ্রকার পরমাণুবাদেরও ভক্ত ছিলেন। অথচ অন্যান্য সকল বৌদ্ধের ন্যায়, তাঁরা অহংয়ের চিরস্থায়ীত্ব অস্বীকার করতে থাকলেন। তাঁদের অহং একটি নশ্বর পদার্থ রয়েই গেল, অথচ যে-সকল কায়িক-মানসিক উপাদানে সে অহং গঠিত, সেগুলি বাস্তব ও স্থায়ী বলে' স্বীকৃত হল।

সৌতান্ত্রিক সম্প্রদায় এই সকল প্রবণতার বিরোধী ছিলেন। পরবর্তী টীকাভাষ্য অগ্রাহ্য করে', তাঁরা বুদ্ধের নিজ মুখের বাণী বা সূত্রের প্রতি নিষ্ঠাবান বলে নিজেদের প্রচার করেন। এঁদের ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন কুমারলব্ধ (১৫০-২০০-র দিকে), এবং উন্নতি বিধান করেন হরিবর্জন (২৬০-এর দিকে)। চীনাভাষায় যে গ্রন্থ চেং-চি-লুয়েন বলে প্রসিদ্ধ (সংস্কৃত সত্য সিদ্ধশাস্ত্র ?) শেষোক্ত তারই রচয়িতা। বৈভাষিকদের বাস্তবতার বিরুদ্ধে

সৌতান্ত্রিকগণ আদিম সূত্রের অবিমিশ্র প্রত্যাবর্তন করেন, এমন কি তার মায়াবাদের পক্ষপাতিতার অর্থগ্রহণের প্রতি ঝোঁক দেন। তাঁদের অহং আবার কতকগুলি সজ্ঞান অবস্থাপরম্পরায় পরিণত হল (বিজ্ঞান-সন্তান)। তার প্রত্যেক অবস্থার অস্তিত্ব কেবলমাত্র একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে-ওঠার উপর নির্ভর। অস্তিত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব একই মুহূর্ত্তে হয়, সুতরাং তা যে কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী তা নয়, বস্তুত তার স্থায়িত্ব নেই বল্লেই হয়। বাহ্য বস্তুসকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কেবল আনুমানিক মাত্র।

এই সম্প্রদায়বরাবর আমরা মহাযান সম্প্রদায়ে বিশেষত মাধ্যমিকে উপনীত হই।

অশ্বঘোষ ও তাঁর রচনা

মাধ্যমিক মতের পোষকতা করেন নাগার্জুন, যিনি দাক্ষিণাত্যের মধ্যস্থিত (অন্ধ্ররাজ্যের) বিদর্ভ বা বেরাবের অধিবাসী ছিলেন। যতদূর জানা যায় তিনি খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, এবং প্রধানত মাধ্যমিক শাস্ত্ররচয়িতা বলে প্রসিদ্ধ। তাঁর পরে এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য ছিলেন যথাক্রমে চতুঃশতকরচয়িতা সিংহলী আর্যদেব (২০০-২৫০-র দিকে ?); মাধ্যমকারতার ও প্রসন্নপাদরচয়িতা চন্দ্রকীর্তি (৫৫০-৬০০-র দিকে); এবং বোধিচর্যাবতার ও শিক্ষাসমুচ্চয়রচয়িতা গুজরাটী শান্তিদেব (৬৫০-৭০০-র দিকে)।

আদিম বৌদ্ধধর্ম এই মত উপস্থাপিত করে যে, শাশ্বত, চিৎ বা সৎবস্তুর উদ্দেশ কোথায়ও পাওয়া যায় না, এবং কেবলমাত্র প্রাতিভাসিক বা নশ্বর রূপ (ধর্ম, সংস্কার) ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সৌতান্ত্রিকগণ আবার এর উপর এক পোঁছ রঙ চড়িয়ে উপদেশ দিলেন যে, বাহ্য বস্তুসকল কেবল যে নশ্বর তা নয়, পরন্তু ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী বা প্রকৃতপক্ষে স্থায়িত্ববিহীন। নাগার্জুন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যদি ক্ষণমাত্র স্থায়ীই হয় তাহলে সে বস্তুর অস্তিত্বই নেই; কারণ ক্ষণস্থায়ীর ধর্মই হল অহংয়ের রূপ ধারণ করতে না করতে বিনষ্ট হওয়া। এখন প্রাতিভাসিক সত্তা ভিন্ন যখন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, তখন সে সত্তা যদি বিনষ্ট হয়, তাহলে কিছুই বাকি থাকে না; সকলই ফাঁকা (সর্ব্বং

শূন্যং), জগত শূন্যতা মাত্র। আত্মনের পরিবর্তে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম অহংয়ের উপাদানস্বরূপ যে অবস্থপরম্পরা বা স্কন্ধের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আত্মনের সঙ্গে সঙ্গে সে স্কন্ধও বিলুপ্ত হয়। প্রাতিভাসিক তত্ত্ব অবশেষে শূন্যবাদে পর্যবসিত হল। এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নাগার্জুন এবং শান্তিদেব একপ্রকার Critique of Pure Reason-এর স্থাপনা করলেন, তা'তে প্রধানত প্রতিপন্ন করলেন যে কার্যকারণবাদ স্বতোবিরোধী ; কালের ধারণা অযৌক্তিক, কেননা অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জ্ঞান নিরর্থক ; জ্ঞান লাভ করাই অসম্ভব, কারণ আত্মা নিজেকে নিজে জানতে পারে না (আঙুল নিজেকে ছুঁতে পারে না), অপরকে অর্থাৎ বাহ্যবস্তুকেও নয়। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রে শূন্যবাদী হলেও, ধর্ম সম্বন্ধে নাগার্জুন ও শান্তিদেব উভয়ই পরাভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন ; শেষোক্তের বোধিচর্য্যাবতার Imitation of Christ-এর সমতুল্য।

মাধ্যমিকের পরে মহাযানের অন্যতম প্রধান সম্প্রদায় যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদিন। আমরা এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব, যে সময়ে অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু নামক তার দুই প্রবর্তকের জীবদ্দশা ছিল (৪র্থ বা ৫ম খৃঃ)।

মহাযানের প্রবর্তকদের মধ্যে একটি নিঃসঙ্গ ভাবুকের দর্শন মেলে, যাঁর নাম ছিল অশ্বঘোষ ; ও যিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের কবি। যতদূর জানা যায় এই লেখকটির বাড়ী ছিল অযোধ্যার অন্তর্গত সাকেত নগর, এবং তিনি জন্মেছিলেন কণিষ্কের রাজত্বকালে (৮০-১১০ বা ১১০-১৬২ খৃঃ-র দিকে)। জালন্ধর মহাসভার সভ্যদের প্ররোচনায় সম্ভবত কণিষ্ক তাঁকে কাশ্মীর ও গান্ধারে নিজের কাছে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ; উক্ত সভায় যে বিভাষ নির্ধারিত হয়, তার সাহিত্যিক রূপ দেবার জন্য। অশ্বঘোষ ছিলেন একাধারে বিশ্বব্যাপী প্রতিভার অধিকারী, ধর্মশাস্ত্রী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং কবি। তিনি প্রধানত লিখেছিলেন বুদ্ধচরিত নামে বুদ্ধজীবনী সম্বন্ধে একটি সুন্দর দার্শনিক কাব্য ; এবং সূত্রালঙ্কার নামক বৌদ্ধ সূত্রাবলী, একটি সাধুসন্ত সংক্রান্ত সাহিত্যিক বর্ণনা, যেটি Little Flowers of St. Francis ও Golden Legend-এর সঙ্গে সমকক্ষতা লাভের যোগ্য। এঁর রচনাগুলি যেমন সুবিন্যস্ত তেমনি গভীর তার সৌন্দর্য এবং এগুলি বৌদ্ধ সাহিত্যের মুকুটমণির মধ্যে গণ্য। এর দার্শনিক আকর্ষণও কম নয়, কারণ পরে অমিতবাদ নামে যে ব্যক্তিগত ধর্মের উদ্ভব হয়,

এখানে আমরা তার পূর্বাভাস দেখতে পাই। আরও একটি রচনার সঙ্গে অশ্বঘোষের নাম সংযুক্ত করা হয়, সেটি হচ্ছে মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্র নামে মহাযানের একটি দর্শনশাস্ত্র গ্রন্থ,—কিন্তু সকলে এ সংযোগ স্বীকার করেন না। যিনিই তার রচয়িতা হোন, শেষোক্ত গ্রন্থটির গুরুত্ব সামান্য নয়, কারণ তা'তে বৌদ্ধধর্মের প্রাতিভাসিকতা একপ্রকার আদর্শ একেশ্বরবাদে পরিবর্তিত হবার উপক্রম লক্ষিত হয়। রচয়িতার মতে বিশ্বের মূল কারণ ব্রাহ্মণত্বের চিৎপদার্থও (আত্মনও) নয়, কোন কোন বৌদ্ধের শূন্যতাও নয়; পরন্তু তথতা অর্থাৎ সারবস্তু, ইহত্ব, একরূপত্ব বা বস্তুর মূল প্রকৃতি, যে ক্ষেত্রে বিশ্বঘটনা সংঘটিত হয় (ধর্মধাতু)। এই তথতা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কারণ সেটি অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এক ও বহুর ঊর্ধতন ও পূর্বতন। তত্রাচ সেটি কার্যত সৎবস্তুরই অনুরূপ; তফাতের মধ্যে এইমাত্র যে, এই বৌদ্ধ সদ্বস্তু যেন প্রকারান্তরে তার সহজাত হয়। উপরন্তু এ স্থলে এই তথতা একদিক থেকে দেখতে গেলে "আলয়-বিজ্ঞানের"ই প্রতিশব্দ। অক্ষরে অক্ষরে তর্জমা করলে তার মানে "চিন্তার পাত্র," অর্থাৎ কিনা শূন্য চিন্তা,—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানক্রিয়ার পূর্বাবস্থা; অথবা যদি বলতে চাও ত নিরপেক্ষ অবিভক্ত চিন্তা,—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানক্রিয়া সবই যার অন্তর্গত। এই দিক থেকে দেখলে অশ্বঘোষ—অথবা যে লেখককে তিনি বলে ভুল করছি—একাধারে মহাযানের আদর্শবাদ এবং অদ্বৈতবাদ, উভয়েরই পূর্বসূচনা করে গেছেন বলতে হয়। প্রথমোক্ত বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার নামে পরে চতুর্থ শতাব্দীতে অসঙ্গ সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকটিত হয়; এবং শেষোক্তটি পরে মধ্যযুগে তিব্বতে ও সুদূর প্রাচ্যে অবতংসক সূত্র এবং টিয়েন টাইয়ের ভক্তরা গড়ে তোলেন; যথা চীন দেশে চে-ই এবং জাপানে ডেঙ্গিও আর নিশিরেন।

একথাও মনে রাখা দরকার যে, "সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক"-এর কাল কুশান যুগের শেষাশেষি (২০০ খৃঃ-র দিকে ?) এবং এই পুস্তক পরবর্তীকালে টিয়েন-টাই ও নিশিরেন প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ সংগঠনের সবিশেষ সাহায্য করেছিল।

গান্ধারের গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পকলা

ভর্হুত ও সাঁচির প্রকৃত ভারতীয় শিল্পকলার পাশাপাশি ভারতীরাণীয় সীমান্ত প্রদেশ গান্ধার ও পাঞ্জাবে, ভারতীয়-গ্রীক, শকপহ্লব ও কুশান-যুগে

একটি নব শিল্পকলার অভ্যুদয় লক্ষিত হয়,—যেটি গ্রীক-ভারতীয় মিশ্রণে উৎপন্ন। তাকে গ্রীক-বৌদ্ধ নাম দেওয়া হয়, কারণ বৌদ্ধ ভক্তগণ কর্তৃক যাবনিক পদ্ধতি ব্যবহার থেকেই তার উৎপত্তি।

খৃঃ পূঃ আনুমানিক ১৬০-৬০ পর্যন্ত যে-সকল গ্রীকবংশীয় রাজা গান্ধার ও পাঞ্জাবে রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মিশর বা আসিয়াবাসী শিল্পীগণ তাঁদের রাজসভায় আহূত হয়েছিলেন, এবং ক্রমশ সে দেশে বংশাবলী স্থাপন করেছিলেন। যে শক-পহ্লব ও কুশান রাজগণ উক্ত রাজাদের স্থান অধিকার করেন, তাঁরাও সম্ভবত এ বিষয়ে তাঁদের অনুকরণ করেছিলেন, সে কথাও মুদ্রাতেই প্রকাশ। পার্থিয়া ও Pont রাজ্যের সকল Arsace বা Mithridates-এর ন্যায় এঁরাও হেলেনীয় পদ্ধতির নকল করেন, তার কারণ স্বরুচিবশতাই হোক বা পরানুবর্তিতাই হোক। সেই হেতু স্থানীয় বিষয়ের সঙ্গে কমবেশী সুসঙ্গতি রক্ষাপূর্বক গান্ধার দেশের পূর্ণ বা অর্দ্ধোৎকীর্ণ মূর্তিগুলিতে হেলেনীয় শিল্পকলার সনাতন বিষয়গুলির অবতারণা লক্ষিত হয়; যথা ঈগলপক্ষী আরূঢ় Ganymede (এস্থলে নাগহরণকারী গরূড়রূপে প্রকাশ), Tritons ও Atlantis, চিতাবাঘ-আরূঢ় Dionysos, Silenus ও Mænads। অপরপক্ষে অশোকের দ্বারা ধর্মে দীক্ষিত হবার পর গান্ধার ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধানতম বৌদ্ধকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল; চীনা পরিব্রাজকগণ তাকে দ্বিতীয় মগধ বা নরপুণ্যভূমি-রূপে বর্ণনা করে গেছেন। ফলত যে বিদেশী রাজগণ পরে সেখানে আধিপত্য করেন, যথা মিলিন্দ ও কণিষ্ক, তাঁরাও এই পরধর্মে দীক্ষিত হন; অন্তত বৌদ্ধধর্ম রাজঅনুগ্রহ এবং পোষকতা লাভ করে।

সম্ভবত যখন ভারতীয়-গ্রীকগণ সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অর্থাৎ Foucher সাহেবের মতে তাঁদের রাজত্বকালের শেষভাগে, খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে—তখন এমন একদিন এল যেদিন জনৈক যাবনিক বৌদ্ধ কোন গ্রীসীয় বা দো-আঁশলা ফিরিঙ্গী শিল্পীকে বুদ্ধের একটি মূর্তি গড়বার ফরমাস করলেন। অতি অভূতপূর্ব কাণ্ড। এ যাবৎ ভারতীয় শিল্পকলায় (সাঁচি) কেউ কখনো সাহস করেনি সেই মহাপুরুষের প্রতিকৃতি গড়তে,—যিনি মহানির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। গ্রীকদের মজ্জাগত মূর্তিপূজা

এবং স্বভাবসিদ্ধ মানবরূপী দেবত্বের অভ্যাসবশত, এই ভারতীয় মুনির আকৃতি কল্পনা করা তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক মনে হল; যেমন এর কিছুকাল পরে তারা খৃষ্টের আকৃতি কল্পনা করেছিল। এবং যেমন সেই Good Shepherd Hermes Criophoras-এর রূপ ধারণ করেছিলেন; তেমনি এই আদিবুদ্ধ তাদের বাটালির কৃপায় একটি অলিঙ্গ Apollo-রূপে দেখা দিলেন। তাঁর মাথায় ছিল উষ্ণীষ বা চূড়াবাঁধা কেশ, যেটি পরবর্তীকালে করোটির স্ফীতরূপ ধারণ করে, ভ্রূযুগের মধ্যে ছিল ঊর্ণ অথবা বিকল্পে জ্যোতির্মণ্ডল; কিন্তু সে মূর্তিতে আপলোর দৃপ্ত তেজ সর্বদাই রক্ষিত হয়েছিল; যথা আটকের নিকটস্থ একটি অর্ধোৎকীর্ণ মূর্তি থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধের পাশমুখ, যার আলোকচিত্র এখন Musée Guimet-র "আফগানিস্থান কক্ষে" শোভমান, কিম্বা হোটি মর্দনে "গাইড্ কক্ষের" বিখ্যাত বুদ্ধ।

গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পকলা হেলেনীয় এবং গ্রীক-রোমান যুগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তাই আমরা তার মধ্যে এমন কতকগুলি শিল্পকার্যের নিদর্শন পাই যা আলেক্জান্দ্রিয়া, Pergamos এবং Rhodes-এর চিত্রশালার উপযুক্ত; এবং অনেক হীনাবস্থার নিদর্শন পাই, যেগুলি রোমসাম্রাজ্যের অধোগতির পরিচায়ক। Foucher সাহেবের মতে, এই শিল্পগোষ্ঠীর চরম বিকাশ হয়েছিল প্রথম খৃষ্টাব্দে (রোমে Caesar ও Flavian-দের যুগ, এবং পাঞ্জাবে শক ও প্রথম কুশানদের যুগ)। পূর্ব শতাব্দীর সঙ্গে এই শতাব্দীর বুদ্ধমূর্তির প্রভেদ Corinthian রীতির অলঙ্কারপ্রাচুর্যে প্রতীয়মান; এবং পরবর্তী শতাব্দীর সঙ্গে প্রভেদ কতকগুলি বিশেষ লক্ষণে প্রকাশ, যথা (১) প্রথম শতাব্দীর গান্ধারী বুদ্ধমূর্তিগুলির দক্ষিণ স্কন্ধ ও পদযুগল সঙ্ঘাতি বা ভিক্ষুর আলখাল্লায় আবৃত; (২) সেগুলিতে উপদেশের মুদ্রার অভাব লক্ষিত; (৩) সনাতন দেবতাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষিত; (৪) চিত্রের মুখ্য এবং গৌণ ব্যক্তিদের অঙ্গসৌষ্ঠবের তারতম্য সুসঙ্গতিপূর্ণ। অপরপক্ষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দী হতে (গোষ্ঠীর অধঃগতির যুগ), এবং সেই কারণেই বিশেষ করে চতুর্থ শতাব্দী হতে (তার মৃতকল্পযুগ) ভারতীয় রীতি অবলম্বন-পূর্বক বুদ্ধমূর্তিগুলির দক্ষিণ স্কন্ধ অনাবৃত এবং উপবেশনের আনত ভঙ্গীতে পদতলদ্বয় পশ্চাতে প্রসারিত; এরই সঙ্গে সঙ্গে পটস্থ মুখ্য এবং গৌণ

ব্যক্তিদের আকারবৈষম্য ক্রমবর্ধমান ও শেষোক্তরা ক্রমশ ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিত্ব-বিহীন বালখিল্য জনতায় পর্য্যবসিত।

গান্ধারী শিল্পকলার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাধান্য ও শৈল্পিক মূল্য পর্য্যায়ক্রমে অতি প্রশংসা এবং অতিনিন্দা লাভ করেছে। এই শিল্পই সমগ্র বৌদ্ধ-শিল্পকলার সারসংগ্রহ নয়, যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন। এর পূর্বে সাঁচিতে এবং এর পরে গুপ্তযুগশিল্পে অধিকতর এবং অপূর্বরূপে মর্মস্পর্শী বৌদ্ধ দেবমূর্তির পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। সুদূর প্রাচ্যের সব শিল্পকলাই একমাত্র উক্ত শিল্প হতে প্রেরণা লাভ করেনি। তার প্রকৃত শৈল্পিক প্রভাব কেবলমাত্র পূর্বতুর্কীস্থান (Rawak-এর অর্ধোৎকীর্ণ মূর্তি এবং তমসুখের পুত্তলিকা) তো'পা বা ওয়াই-এর চীনা শিল্প (Yan-Kang, Long-men), এবং ওয়াইয়ের মধ্যে দিয়ে নারার জাপানী শিল্পের উপর বিস্তারিত হয়েছে। তাছাড়া গান্ধারী শিল্পকলা ছিল Asia-minor-এর চিত্রশালাগুলির পূর্বশাখা (Ephesus, Antioch, Palmyra), সুতরাং ততদিনই তার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল যতদিন হেলেনীয় শিল্প বর্তমান ছিল (প্রথম শতাব্দী); তারপরে আণ্টনীনদের যুগ থেকে গ্রীক-রোমান শিল্পকলার সাধারণ অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তারও দ্রুত অধঃপতন হল।

তাহলেও স্বীকার করতে হবে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পের সক্রিয় অবস্থার একটি মহাগুণ এই যে, সে দিয়েছিল বুদ্ধমূর্তি গঠনের প্রথম সঙ্কেত, এবং বুদ্ধবিহীন বুদ্ধজীবনের ঘটনাবলীর যে স্বতঃবিরোধ—তা দূর করেছিল। অবশ্য সাঁচির শিল্পকলার প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত ও রুচিগত পক্ষপাতিতা কোনদিন অস্বীকার করিনি। সাঁচিতে বুদ্ধজীবনের ঘটনাবলী ক্রমাগত রূপকচ্ছলে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধারে সেই একই দৃশ্যের বাস্তব পরিকল্পনা অপেক্ষা তা' সহস্রগুণে স্বতঃস্ফূর্ত, মর্মস্পর্শী এবং প্রাণবন্ত বলে আমাদের মনে হয়। তবুও সকল সময় বুদ্ধের পরিবর্তে তাঁর প্রতীক ব্যবহার করতে বাধ্য হওয়ায় বৌদ্ধ দেবমূর্তি রচনা যে অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছিল, সে বিষয় সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রেও গান্ধারী শিল্পকলা দ্বারা বৌদ্ধধর্মের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছে; কেবলমাত্র যে তার দ্বারা বুদ্ধ, মৈত্রেয় এবং বজ্রপাণি ইত্যাদির রূপ কল্পিত হয়েছে, তা নয়; কিন্তু তার অসংখ্য অর্ধোৎকীর্ণ ভাস্কর্যে বুদ্ধজীবনের বিভিন্ন

ঘটনাবলী ও বিভিন্ন জন্মবৃত্তান্তের একটা সুসমঞ্জস শৃঙ্খলা ও দেবমূর্তি পরিকল্পনার আদর্শ চিরদিনের জন্য সুসম্বদ্ধ ও স্থিরীকৃত করে দিয়েছে। এ বিষয়ে সমগ্র বৌদ্ধ শিল্পকলা, জাপান থেকে মধ্য আসিয়া পর্যন্ত এবং তিব্বত থেকে জাভা পর্যন্ত তদবধি গান্ধারী চিত্রশালার পুনরাবৃত্তি ভিন্ন আর কিছু করেনি।

ফলত গান্ধারী শিল্পকলা কখনো কখনো যথার্থ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়; যদিও সাঁচির পূর্ববর্তী যুগের গভীর ভাবুকতা, বা ততোধিক সেই মাত্রায় পরবর্তী গুপ্তযুগের উচ্চ আদর্শবাদ কখনো তার অধিগম্য হয়নি। পেশাওয়ার ও লাহোরের সাধারণ চিত্রাবলীর মধ্যে কতকগুলি অনন্যসাধারণ শিল্পের দর্শন পাওয়া যায়। তখন আমরা কেবল Hermes বা Apollo-র মামুলী নকল দেখিনে; আমরা দেখতে পাই নমনীয় হেলেনীয় কুঞ্চিত বস্ত্রপরিহিত একটি নিদিষ্ট স্মিতহাস্যমুখ আসীয় যুবক, একটি রহস্যপূর্ণ এবং ঈষৎবর্বর কিঞ্চিৎ কোমলভাবাপন্ন কিশোর মূর্ত্তি, যে ভাবের নরদেবতা তখন পাশ্চাত্য জগতে জয়যাত্রায় বেরিয়েছিলেন, Adonis বা Serapis। যখন বোধিসত্ত্ব রাজকুমারদের চিত্রিত করবার জন্য এই মূর্তি ভারতীয় রূপ অর্থাৎ গুল্‌ফ, উষ্ণীষ ও হাতের বালা শোভিত আবক্ষ নগ্নমূর্ত্তি ধারণ করে, যথা Louvre-এ রক্ষিত সাবাজগর্হির প্রকাণ্ড বোধিসত্ত্ব,—তখন হিন্দুপুরাণকাহিনীর নায়কের মত দেখতে একটি অতি আধুনিক অপূর্বতম তরুণ রাজার অপ্রত্যাশিত রূপ প্রকাশিত হয়। অপরপক্ষে পেশাওয়ারের যাদুঘরে দেখ সাহরিবাহলোলের ক্ষত্রিয় মূর্তি অথবা লাহোরের যাদুঘরে তখালের পাঞ্চিকের পাশমুখ ঃ—ভারতীয় যোদ্ধার চিরন্তন আদর্শ মূর্তি এমন অপরূপ ভাবে কোন প্রাচ্য চিত্রকর কি কখনো প্রতিষ্ঠা করেছেন! অবশেষে এদেশের যোগবিদ্যার বিধিবদ্ধ ধারণার সঙ্গে গ্রীক শারীরবিজ্ঞানকে সাময়িকভাবে খাপ খাওয়াবার যে অদ্ভুত প্রচেষ্টা এস্থলে করা হয়েছে, সেটা বিশেষ দ্রষ্টব্য,—যে চেষ্টার ফলে আমরা সিক্রিয় তাপসবুদ্ধকে লাভ করেছি।

গ্রীক-বৌদ্ধ ভাস্কর্যের পাথরের কাজ (গান্ধারের নীল স্লেট) চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ শেষ হয় বলে ধরা যেতে পারে। সাধারণত তার শেষ নিদর্শন-স্বরূপ কতকগুলি স্থূল খর্বকায় কদাকার মূর্তি ভিন্ন পঞ্চম শতাব্দীতে কিছু আবিষ্কার করা যায় না। তথাপি গান্ধারী শিল্পকলা আয়ুষ্কালগত হবার পরেও তক্ষশিলার

মাটির কাজে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। এই শিল্পীসম্প্রদায়ের কার্যপদ্ধতি, তুর্কিস্থানে আমদানি হয়ে, তম্‌সুখের মৃৎপুত্তলিকার জন্মদান করে। সেই সঙ্গে তক্ষশিলার কতকগুলি মূর্তি গান্ধারী শিল্পকলা ও গাঙ্গেয় প্রদেশের গুপ্তযুগের শিল্পকলার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে (যথা তরল পরিধেয় বস্ত্র, দেহে আশ্লিষ্ট কুঞ্চিত বেশ)। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য মূর্তি "অলৌকিক কর্মরত মহাবুদ্ধ," যেটি ১৯২৪ খৃঃ-র ডিসেম্বর মাসে কাপিসের নিকটবর্তী পাটাবা গ্রামে হাকঁ্যা সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়, এবং এখন musee Guimet-র আফগানিস্থান কক্ষে শোভমান। তিনি এই মূর্তির কাল ৩য়, এমন কি ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফেলেন, ও বলেন "উত্তরীয় বস্ত্রের ভাঁজগুলি শরীরে আশ্লিষ্ট করবার পরিকল্পনা, যাতে করে উরুর গঠন এবং স্কন্ধের সুডোল বৃত্ত পরস্পর-বিরোধী ভাব দ্বারা পরিস্ফুট হয়, তা'তে একটি নব্য প্রস্থানভূমি সূচিত হয়েছে, যেটি ক্রমশঃ গুপ্তযুগের শিল্পকলায় পর্য্যবসিত হবে।" এইখানে আমরা সেই বিশেষ লক্ষণযুক্ত মূর্তির দর্শন পাই, যেটি আমাদের গান্ধারীয় বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্তি থেকে ক্রমে সারনাথের নগ্নমূর্তিতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

বামিয়ান ও দুহতার-ই-নশিরওয়ানের প্রাচীর চিত্র

১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে গডার্ড্ সাহেব ও মেম কর্তৃক যে-সকল প্রাচীর চিত্র আফ্‌গানিস্থানের বামিয়ান সহরে আবিষ্কৃত ও আনীত হয়েছিল, কতক পরিমাণে গান্ধারী শিল্পকলার সঙ্গে তার চিত্রণপদ্ধতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই চিত্রগুলি সম্ভবত চতুর্থ, পঞ্চম, বা ষষ্ঠ শতাব্দীর, কিন্তু এগুলি নিশ্চয়ই পথ-চলতি শিল্পীর আঁকা,—যথা নানা বৌদ্ধ দেশ থেকে ভারতে তীর্থ করবার জন্য আগত ভিক্ষু, কিম্বা বামিয়ানের মঠে অতিথিরূপে অবস্থিত সওদাগর। সেই জন্য এগুলিতে আমরা নানাপ্রকার প্রভাবের অতি অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখতে পাই। গায়ের কাপড়ের ভাঁজের বিন্যাসে এবং একটি মূর্তির মাথার টুপির চওড়া কিনারায় গান্ধারীয় প্রভাব লক্ষিত হয়। তাছাড়া গডার্ড্ সাহেবের মতে বুদ্ধের ৫৩ গজ প্রকাণ্ড মূর্তিটির প্রেরণা কোন গ্রীক বা রোমক মূর্তি থেকে এসেছে (বাঁ পায়ের উপর ঈষৎ ভর)। কিন্তু বামিয়ানের প্রাচীর চিত্রে আরও অনেক জিনিষ আছে, বিশেষত একটি স্পষ্ট পারস্য-সাসানীড প্রভাব, যেটি মাথার টুপির ছাঁদেই প্রকাশ পায়।

বুদ্ধের ৩৫ গজের উপর উচ্চ মূর্তির কুলুঙ্গির উপরে দাতাদের যে ছবি আঁকা আছে, তাঁদের মাথায় একপ্রকার গম্বুজ ও অর্ধচন্দ্র মিশ্রিত গড়নের টায়ারা এবং স্কন্ধে "কোস্তি" দোদুল্যমান। এইপ্রকার মস্তকাবরণ এবং সাসানীড ধরণে ছাঁটা দাড়ি সমেত বামিয়ানের যে ব্যক্তির ছবি গডার্ড মেমের তুলিতে অবিকল প্রতিফলিত হয়েছে, তাকে দেখলে ঠিক একজন বৌদ্ধ সাপর বা খসরু বলে মনে হয়। গডার্ড সাহেব মনে করেন যে এ স্থলে আমরা সেই সাসানীড প্রভাবিত চিত্রণের নিদর্শন পাই, যার অস্তিত্ব ইতিপূর্বেই অনুমান করা গিয়েছিল; কারণ কাশগারিতে (বিশেষতঃ মীরানে) আবার তার দেখা পাই। ভারত-ইরাণের এই সীমান্ত প্রদেশে এ চিত্রণপদ্ধতি খুব সম্ভবত ইতিমধ্যেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে অল্পবিস্তর অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হয়েছিল। উপরন্তু বামিয়ানের এই বৌদ্ধ প্রাচীরচিত্রে আমরা সেই সূর্যচন্দ্রতারার প্রতীকসকল দেখতে পাই, যার অত প্রাধান্য ছিল মধ্য আসিয়ার (কুশ-তুর্ফান) ভারতীরাণীয় দেবমণ্ডলীতে, ও যার রূপ যত না বৌদ্ধ তত মানিকীয় (পুষ্পকরথে শিবের পা-তোলা শাদা ঘোড়া)। অন্যান্য লক্ষণেও (জ্যোতির্মণ্ডলমণ্ডিত মূর্তি, পরণে নানা রঙের ডোরা লম্বা আলখাল্লা, হাতে তলোয়ার ও নিশান) বোঝা যায় যে এটি ইরাণীয়-ঘেঁষা কুশ প্রদেশের শিল্পকলা। অপরপক্ষে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, বামিয়ানের অধিকাংশ বিষয়ই ভারতবর্ষীয়;—সেই কিন্নর গায়কগণ থেকে আরম্ভ করে, যারা অজন্তার কায়দায় আকাশে ভাসমান। এবং যেখানে মুখাবয়ব সাসানীড ধাঁচের নয়, সেখানে ভারতীয় ছাঁদ অনুসৃত হয়েছে,—হেলেনীয় নয়। তাহলেও, অজন্তায় যে ভারতীয় অঙ্গসৌষ্ঠব এমন পেলব ও তন্বী, বামিয়ানে সেটি স্থূল ও নিরেট হয়ে পড়েছে। তার কারণ প্রথমতঃ ভারতীয় স্বাভাবিকতার বদলে গতানুগতিকতার যুগের অভ্যুদয়; দ্বিতীয়ত পার্শ্ববর্তী মধ্য আসিয়ার প্রভাব। উড্ডীয়মান কিন্নরগণ পর্যন্ত এই মধ্য আসীয় কাঠিন্য থেকে মুক্ত নয়। গডার্ড সাহেব বামিয়ানে আর একটি প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, যার নির্দেশ ঐ একই দিকে মনে হয়। "বামিয়ানের এক কুলুঙ্গিতে উপবিষ্ট বুদ্ধের পার্শ্ববর্তী বোধিসত্ত্বের মূর্তিতে একপ্রকার বিপুলতা ও আভিজাত্য, যা' একেবারে বৈজন্তীয়।" Grimwedel এবং Von Le Coq কুশ ও তুর্ফান অঞ্চলের কতকগুলি ছবির যে নকল করেছেন, সেগুলিতে আবার আমরা এই বৈজন্তীয় প্রভাব দেখতে পাই,

--কমবেশি বিস্তীর্ণ এবং পারস্য প্রভাবের সঙ্গে মিশ্রিত। গডার্ড্ সাহেব বামিয়ানের প্রাচীরচিত্রের কোন কোন খণ্ডে যে চীনা প্রভাব অনুমান করেন, তাও আমরা উক্ত চিত্রে দেখতে পাই, অবশ্য আরও স্পষ্টভাবে।

হাকঁ্যা সাহেব কর্তৃক জানুয়ারী ১৯২৪-এ আবিষ্কৃত রুইয়ের নিকটবর্তী দুহতার-ই-নশিরওয়ানের প্রাচীর চিত্রের মূল্যও কিছু কম নয়। এগুলি আরও বিশেষভাবে সাসানীড, এমন কি হাকঁ্যা সাহেব মনে করেন হয়ত ব্যাক্ট্রিয়ার পুনর্জয়ের পরে খস্রু আনশিরওয়ানের ফরমাসে আঁকা। বস্তুত মধ্যস্থলের মূর্তিটি—দুঃখের বিষয় ভগ্নাবস্থায়—একটি সাসানীড রাজার প্রতিকৃতি, তাঁর মাথায় পূর্ববর্ণিত আবরণ (যথা মুক্তার পাড় দেওয়া বিস্তৃত শাদা ডানা, সর্বোপরি একটি সিংহমূর্তি)। অপর একটি সাসানীড রাজার চেহারা নাক্স-ই-রস্তমের অমুক সাগরের মূর্তি প্রত্নতাত্ত্বিকদের স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু পারস্য সাম্রাজ্যের মহিমা ঘোষণার্থে ফরমাসী এই সকল চিত্রে যে কতকগুলি স্পষ্ট ভারতীয় প্রভাব ধরা না পড়ে, এমন নয়। তার সাক্ষী জীবজন্তু চিত্রণে অবয়বের গতিশীল নমনীয়তা (সাম্বর, বন্যমেষ, ষাঁড়, হরিণ, শিরপাতোলা সিংহ, হাতী)। আরও সাক্ষী নারীমূর্তিগুলি—কেবলমাত্র অঙ্গসৌষ্ঠবে নয়, পরন্তু চেহারার সাদৃশ্যেও তারা অজন্তার মূর্তির সগোত্র। উপরন্তু আমরা দেখতে পাই সাসানীড রাজার পাশে "একটি মূর্তির পরণে শাদা কলারযুক্ত কুর্তা, চারধারে চওড়া লাল পাড়, এবং পদক দিয়ে সাজানো কুর্তাটি একটি কোমরবন্ধ দিয়ে কোমরে আঁটা, তাতে এক যোড়া চামড়ার পটি দিয়ে কাঁধে আট্কানো, যার থেকে একটি লম্বা দুমুখো তলোয়ার ঝুলছে; এই মূর্তিটির ছাঁদ অবিকল খিজিলের ঘোড়সওয়ারদের অনুরূপ।"

ফলত তক্ষশিলার মূর্তি যেমন তমস্নুখের পুত্তলিকার অগ্রদূত, তেমনি বামিয়ান ও দুহ্তার-ই-নশিরওয়ানের প্রাচীরচিত্রে গান্ধার ও অজন্তা থেকে আমাদের নিয়ে যায় সেই পথে, যেখানে গোবি ইদিখুট সাহ্রি এবং খিজিলের সংস্কৃতি স্থানে স্থানে পুঞ্জীভূত।

(ক্রমশঃ)

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে সদানন্দ সাধুর আশ্রম হইতে সদানন্দ সাধুকেই তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। অন্য সকলের মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গেল, কথাটা সত্যই কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, কেবল মহেশের ভাব দেখিয়া মনে হইল না সে বিশেষ অবাক হইয়াছে। সে যেন এ রকম একটা কিছু প্রত্যাশাই করিতেছিল। বিস্ময় প্রকাশ করার বদলে সে দেখাইল রাগ।

'বটে! বিপিনবাবুর স্পর্দ্ধা তো কম নয়!'

তারপর সদানন্দের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত জোর করিয়া ঊর্দ্ধমুখে সদানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, 'আপনি আমার এখানে থাকবেন প্রভু? আমার এত বড় সৌভাগ্য হবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আজ আমার জীবন সার্থক হল। এ বাড়ী আপনার, এ বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ আপনার দাসদাসী।'

ব্যাপারটা কি হইয়াছে, কেন বিপিন হঠাৎ সদানন্দকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, এ ক্ষমতা বিপিন কোথায় পাইল, সকলের মনে এ ধরণের কত যে প্রশ্ন জাগিতেছিল হিসাব হয় না। কিন্তু সদানন্দকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কারও নাই। ভরসা না পাওয়ার জন্যই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক মহেশ চৌধুরীও এ বিষয়ে একেবারে মুখ বুজিয়া ছিল।

অন্য কেউ কথা তুলিবে ভাবিয়া মাধবীলতা একটু অপেক্ষা করে, তারপর খানিক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া বসে, 'আপনাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন বিপিনবাবু?'

সদানন্দ কিছু বলিবার আগেই মহেশ চৌধুরী বলে 'কি যে তুমি বল মাধু? তাড়িয়ে আবার কে দেবে প্রভুকে? উনি রাগ করে চলে এসেছেন তাও বুঝতে পার না?'

সদানন্দ বলে, 'না মহেশ, বিপিন আমায় তাড়িয়েই দিয়েছে।'

মহেশ বলে, 'তাই কি হয় প্রভু! আপনাকে তাড়াবার ক্ষমতা কারও নেই।'

সদানন্দ বলে, 'তা আছে বৈকি। আশ্রমটা বিপিনের সম্পত্তি। আমি আশ্রমের শিক্ষক হিসাবে ছিলাম, ক'বছরের মাইনে ছাড়া আর কিছু দাবী করতে পারব না। বিষয়বুদ্ধি তো নেই—'

'আপনার বুদ্ধির কাছে বিপিনবাবুর বিষয়বুদ্ধি!' মহেশ চৌধুরী একগাল হাসে, 'ক'বিঘা মেঠো জমি বিপিনবাবু নিজের নামে লিখে নিয়েছেন, আপনি জয় করেছেন মানুষগুলিকে। আশ্রম কখনো বিপিনবাবুর সম্পত্তি হতে পারে প্রভু? আপনাকে নিয়ে তবে তো আশ্রম! আপনি যেখানে থাকবেন সেখানটাই হবে আশ্রম। আপনি যখন চলে এসেছেন, আপনার সঙ্গে আশ্রমও চলে এসেছে।'

সজোরে নিশ্বাস ফেলিয়া গভীর আফশোষের সঙ্গে মহেশ আবার বলে, 'প্রথমটা রাগ হয়েছিল, এখন আবার বিপিনবাবুর জন্য মায়া হচ্ছে। বুদ্ধির দোষে মানুষ কি সর্ব্বনাশটাই নিজের করে!'

মহেশ চৌধুরী সদানন্দের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিল। মহেশ চৌধুরীর ঘরবাড়ী সর্ব্বদাই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, ঘষা-মাজা ধোয়া-মোছা নিয়া বিভূতির মা সব সময়েই ব্যস্ত হইয়া আছে। সবচেয়ে ভাল ঘরখানায় তাড়াতাড়ি সদানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। পিতামহের আমলের প্রকাণ্ড খাটে আনকোরা নূতন তোষক পাতা হইল—একটু ছোট হইল তোষকটা। তা হোক, লোকের ব্যবহার করা তোষক তো আর সদানন্দকে দেওয়া যায় না। তোষক ঢাকা পড়িল গায়ে দেওয়ার মুগার চাদরে। বালিশের বদলে দেওয়া হইল ঝালর দেওয়া তাকিয়া, কেবল বিশেষ উপলক্ষে আসর পাতা হইলে যেগুলি কাজে লাগে। ঘরের এক কোণে পড়িল ঘরে বোনা কার্পেটের আসন, দুপাশে জ্বলিতে লাগিল ধূপধুনা আর কোণ ঘেষিয়া একটি মস্ত ঘিয়ের প্রদীপ। অভ্যর্থনার আরও কত ছোটবড় আয়োজনই যে মহেশ চৌধুরী করিল! কিছুকাল আগেও মহেশ চৌধুরীর বাড়ী ছিল নিস্তব্ধ, মহেশ আর তার ভাগ্নে শশধর এবং তাদের দুজনের দুটি স্ত্রী চুপচাপ এ বাড়ীতে দিনরাত্রি কাটাইয়া দিত, কারও মধ্যে যেন প্রাণ ছিল না। তারপর মাধবীলতা আসিয়াছে, বিভূতি আসিয়াছে, আজ আসিল সদানন্দ—মাধবীলতার পদার্পণের

পর সেই যে একটু জীবনের সাড়া জাগিয়াছিল বাড়ীতে, আজ যেন তা চরমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে বিশেষ একটি উৎসবে।

সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য আসিয়াছে, মুখে ফুটিয়াছে কথা। একজন কেবল আগেও যেমন চুপচাপ ছিল এখনও তেমনি চুপচাপ থাকিয়া গিয়াছে। সে শশধরের ঘোমটা-টানা বৌ। কোন ফাঁকে কখন বাড়ীর কোন আড়াল হইতে আসিয়া সে যে সদানন্দের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং আবার নিজের অন্তরালে চলিয়া গেল, কেউ খেয়ালও করিল কিনা সন্দেহ। শশধরের বৌ যে বাড়ীতে থাকে অধিকাংশ সময়ে তা টেরও পাওয়া যায় না।

মহেশ কেবল একবার একরাশি বাসন হাতে খিড়কি পুকুরে যাওয়ার সময় উঠানের কোনে পিছন হইতে তা'কে পাকড়াও করিয়া বলিল, 'বৌমা, তুমিই প্রভুর জন্য রান্না কোরো। চান করে' পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেমন করে ঠাকুরদেবতার ভোগ রান্না কর না, ঠিক তেমনি করে।'

শশধরের বৌ মামাশ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে না। ডাক শুনিয়া মহেশ চৌধুরীর দিকে পিছন করিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ঘোমটার মধ্যে মাথা নত করিয়া সে নীরবে সায় দিল। মহেশ চৌধুরী সরিয়া গেলে আর কিছু বলিবার নাই জানিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল খিড়কির পুকুরের দিকে।

তারপর মহেশ জিজ্ঞাসা করিতে গেল, শশধরের বৌ স্নান করিয়া ভোগ রান্না করিয়া দিলে সদানন্দের আপত্তি নাই তো?

সদানন্দ বলিল, 'বাড়াবাড়ি কোরো না মহেশ, বাড়াবাড়ি কোরো না।'

মহেশ বলিল, 'না, প্রভু।'

'সকলের জন্য যা রান্না হবে আমিও তাই খাব। আমার ওসব নেই জান তো?'

'আপনি অনুমতি দিলে একটু বিশেষ ভাবেই রান্নাটা করাই প্রভু। আশ্রমের কথা আলাদা, এখানে—'

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, 'তুমি আমায় টিঁকতে দেবে না মহেশ।'

মহেশও হাসিয়া বলিল, 'আপনাকে আমি আর ছাড়ব না প্রভু, আজ থেকে আপনি আমার হয়ে গেলেন।'

অন্য কেহ হইলে হয় তো একথার জবাবে তামাসা করিয়া বলিত, আজ তোমার সম্পত্তি হয়ে গেলাম মহেশ? কিন্তু ওসব রসিকতা সদানন্দের আসে না। মহেশ যে তাকে সত্যসত্যই স্থায়ীভাবে এখানে আটকাইয়া ফেলিবার বিরাট আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সদানন্দের এটা যেন ভাল লাগিতেছিল না। বিপিন একবার রাগ করিয়া আশ্রম হইতে কয়েকদিনের জন্য কিছু না বলিয়া যখন চলিয়া গিয়াছিল, আশ্রমের পাশের আমবাগানটি যেবার সে বাগাইয়া আনে, তখন বিপিনের জন্য তার কি রকম মন কেমন করিয়াছিল সদানন্দের মনে আছে। আজ নিজে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াও তার তেমনি মন কেমন করিতেছে। সেবার যেমন কেবলি মনে হইত বিপিন ফিরিয়া আসিবে, আজ তেমনি আশা হইতেছে বিপিন হয়তো ডাকিতে আসিবে, হাতে পায়ে ধরিয়া তা'কে ফিরাইয়া নিয়া যাইবে।

মহেশ চৌধুরী বলে, 'আশ্রম থেকে আপনার জিনিষপত্র সব আনিয়ে নিই প্রভু?'

সদানন্দ বারণ করিয়া বলে, 'না, না, এখন থাক্। তাড়াতাড়ির কি আছে!'

জন্মের মত আশ্রম ত্যাগ করিয়া সদানন্দ চলিয়া আসিয়াছে, বলিয়া আসিয়াছে জীবনে আর কোনদিন বিপিনের ওই জমিদারীতে আর সে পা দিবে না। আশ্রমের সঙ্গে আর তার কিসের সম্পর্ক? তবু তার নিজস্ব জিনিষপত্রগুলি যতক্ষণ আশ্রমে আছে একটু যেন যোগাযোগ বজায় রহিয়াছে ততক্ষণ আশ্রমের সঙ্গে, ওই যোগাযোগটুকুও ঘুচাইয়া ফেলিতে সদানন্দের ইচ্ছা হয় না। তাছাড়া, সদানন্দের একটু ভয়ও হয়। জিনিষপত্রগুলি আনাইয়া নিলে বিপিন যদি আরও রাগিয়া যায়, তা'কে ডাকিয়া ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার সাধ থাকিলেও যদি ওই কারণেই সে মতটা বদলাইয়া ফেলে!

মহেশ চৌধুরীও বোধ হয় এসব কথা অনুমান করিতে পারে। সদানন্দের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আরও একটু বাধা সৃষ্টি করিতে তার আগ্রহ দেখিয়া অন্ততঃ তাই মনে হয়। জিনিষগুলি আনাইবার অনুমতি পাওয়ার জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। পরে আনাইলেও অবশ্য চলিবে, কিন্তু এখন

আনাইলেই বা দোষ কি? এক মুহূর্ত্তের জন্যই বা সদানন্দ সামান্য একটু অসুবিধা ভোগ করিবে কেন? মহেশের তো তা সহ্য হইবে না!

কিন্তু সদানন্দ কিছুতেই অনুমতি দেয় না। বলে, 'আজ থাক মহেশ। কাল যা হয় করা যাবে।'

বিপিন তাকে হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া নিতে আসিবে সদানন্দের এরকম আশা করার একটু কারণ ছিল। বিপিন সত্যই তাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। সহজ ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাও। সদানন্দও রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তা'কে এভাবে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিপিনের মন খারাপ হওয়া আশ্চর্য্য নয়, তাকে ফিরাইয়া নিতে আসাও আশ্চর্য্য নয়।

সেদিন সকালে আশ্রমে বিপিনের বিনা অনুমতিতে মাধবীলতার আশ্রমে আসা এবং সদানন্দের পায়ে বিভূতিকে প্রণাম করানো নিয়া যে কাণ্ডটা হইয়া গিয়াছিল তারপর সারাদিন বিপিন আর সদানন্দের দেখা হয় নাই।

অনেক রাত্রে বিপিন সদানন্দের ঘরে আসিয়াই বলিয়াছে, 'সদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম তোকে। আগের মত আমার কথা শুনে চলবি কি চলবি না তুই?'

'আমি কি তোর মাগনায় কেনা চাকর যে তোর সব হুকুম মেনে চলব?'

'ওসব বাজে কথা থাক। তোর সঙ্গে কোনোদিন আমি ওরকম ব্যবহার করি নি, সে সম্পর্ক আমার নয় তোর সঙ্গে। আমার কথা শুনে চলা মানে আমার হুকুম মেনে চলা নয়। নিজেই ভেবেই ত্থাখ, আমি বুদ্ধি খাটিয়ে আশ্রমের উন্নতির ব্যবস্থা করব, তুই আমার একটা কথা মানবি একটা কথা মানবি না, তা'হলে কি আশ্রম চলে? আশ্রমের জন্য তোকে দরকার আছে, কিন্তু আশ্রম চালাবার ক্ষমতা তোর নেই, তুই যদি—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আসল কথাটা শুনি?'

বিপিন একটু চুপ করিয়া থাকিয়াছে। রাগ করিবে না এবং তর্ক করিবে না ঠিক করিয়াই সে এখন সদানন্দের কাছে আসিয়াছে, কিন্তু আজকাল কথায় কথায় সদানন্দের সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা হয়, ঝগড়া করিবার সাধ জাগে।

'আসল কথাটা এই। আগে যেমন সব বিষয়ে আমার কথা শুনে চলতিস তেমনিভাবে যদি না চলিস, তোকে দিয়ে আমার কাজ হবে না।'

'না হলে কি করবি ?

'তোকে বিদেয় দেব।'

'বিদেয় দিবি! তোর তো স্পর্দ্ধা কম নয়। তোকে কে বিদেয় দেয় ঠিক নেই—'

'আমার আশ্রম থেকে আমাকে কে বিদেয় দেবে ?'—বিপিন হাসিয়াছে।

সদানন্দ সগর্ব্বে বলিয়াছে, 'আমি একটা মুখের কথা বললে সবাই তোকে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে তা জানিস ?'

বিপিন নির্ব্বিকার ভাবেই বলিয়াছে, 'বলেই ছাখ না মুখের কথাটা ?'

কথাটার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। সদানন্দ হুকুম দিলেও আশ্রমের কেউ বিপিনের বিরুদ্ধে যাইবে না। এ বিষয়ে সদানন্দের মনেও বরাবর একটা খটকা আছে। সকলে তাকে ভক্তি করে বটে কিন্তু তার সাধুতার মধ্যে যেমন ফাঁকি আছে, সকলের ভক্তির মধ্যেও তেমনি একটা ফাঁকি আছে বলিয়া সদানন্দের সন্দেহ হয়।

বিপিন একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিয়াছে, 'তুই বড় বোকা সদা। সবাই ঢিপ্ ঢিপ্ করে প্রণাম করে আর তুই ভাবিস তোর জন্য প্রাণ দিতে সবাই ছটফট করছে। প্রাণ পাওয়া অত সহজ নয় রে! আমি তোকে ভড়ং শিখিয়েছি, সেই ভড়ং করে লোকের মনে তুই জন্মিয়েছিস একটা ভয়। তুই থাকিস একটা ধোঁয়ার আড়ালে, তোর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, সকলের সামনে মহাপুরুষের মত চলিস ফিরিস, সবাই তাই তোকে মহাপুরুষ ভেবে রেখেছে। কল্পনা জগতের অবাস্তব প্রমাণ দেখিয়ে দেখিয়ে তোকে আমার মহাপুরুষ দাঁড় করাতে হয়েছে। তুই যে মহাপুরুষ নোস্ তার একটা বাস্তব প্রমাণও কেউ যাতে না পায় সেইজন্যই তোকে আমার লুকিয়ে রাখতে হয়। সকলে তোকে কি রকমের ভয় ভক্তি করে জানিস ? কাল যদি আমি রটিয়ে দিই তোর অত্যাচারে মাধুকে আশ্রম ছাড়তে হয়েছে, সবাই তাই বিশ্বাস করে বসবে। মাধুকে নিয়ে কয়েকটা যে বোকামি করেছিস, সেগুলি হবে তার বাস্তব প্রমাণ। এত বড়

সাধু তুই, কিন্তু তোর সাধুত্বের বাস্তব প্রমাণ নেই কিনা, তাই মাধুর সম্বন্ধে তোর বোকামির ওই কটা তুচ্ছ প্রমাণেই তোর সাধুত্ব ফেঁসে যাবে।'

'মাধুকে নিয়ে কি বোকামি করেছি ?'

'জানিস না ? তা, নাও জানতে পারিস ! চোর কি করে জানিস, যখন দরকার নেই তখন বেশী বেশী সাধু বনে থাকে, আর চুরি করার সময় ভাবে কেউ জানতে পারছে না। তবু চোর ধরা পড়ে জেলে যায়। আজ সকালেই তো সকলের সামনে কেঁদে কেঁদে বললি, একবার আমার ঘরে আসবে না মাধু ? আহা, একটা মেয়ের কাছে কি করুণ মিনতি মহাপুরুষ সদানন্দের ! মাধু মুখ ফিরিয়ে গটগট করে চলে গেল। কথাটা কেউ মনে আনছে না তাই, কিন্তু একবার যদি কেউ সুর তোলে, কারও তু'বার ভাবতে হবে না কিসের মানে কি।'

এবার সদানন্দ রাগ করিয়াছে। বলিয়াছে, বিপিনের মনটাই কদর্য্য। কতদূর কদর্য্য, লাগসই উপমা দিয়াও বুঝাইয়া দিয়াছে। বিপিন যা ভাবে কেউ তা ভাবিবে না। সকলে তো বিপিন নয়, বিপিনের মত কুৎসিৎ মন তো নয় সকলের, বিপিন যেমন বড়লোকের পা-চাটা, ফন্দিবাজ, হীন, বিশ্বাসঘাতক মানুষ—

'তিন দিনের মধ্যে তুই আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাবি। আমি যাই হই, আশ্রমের কুটোটি পর্য্যন্ত আমার তা মনে রাখিস। তুই সত্যি আমার চাকর—তোকে থাকবার কোয়ার্টার দিয়েছি, খেতে পড়তে দিয়েছি, চাইলে মাইনে বাবদ কিছু টাকা পাবি, বাস্। আর কোন কিছু অধিকার তোর নেই।

'আচ্ছা, রাজাসায়েবের সঙ্গে সে বোঝাপড়া হবে।'

'রাজাসায়েব ? রাজাসায়েব কি করবেন ? তুদিন আগে রাজাসায়েবের যা খুসী করার ক্ষমতা ছিল, এখন আর নেই। এখন সমস্ত কিছুর মালিক আমি। তুই কি ভাবিস সেবার গিয়ে আমি শুধু আমবাগানটা বাগিয়ে এনেছি ? সব নিজের দখলে এনেছি। টাকা পয়সার মালিক তো ছিলাম প্রথম থেকেই, এবার জমিজমারও মালিক হয়েছি। কি করবেন বল্ রাজাসায়েব, ক'বিঘা জমির জন্য ছেলেকে তো আর জেলে পাঠাতে পারেন না।'

'জেল !'

'আমি না বাঁচিয়ে দিলে মাধুর জন্য নারাণবাবুর জেল হত বৈকি।'

'ও!'

সদানন্দ চুপ করিয়া থাকিয়াছে অনেকক্ষণ।

'আশ্রমের আয়ে প্রথম থেকে তোর অধিকার ছিল?'

'ছিল বৈকি। আমার নামে আশ্রম হল, আশ্রমের আয় আমার হবে না? লোকসান হলেও অবশ্য আমার ঘাড়ে চাপত। প্রথমে ক'জনকে নিয়ে কতটুকু আশ্রম হয়েছিল মনে আছে সদা? তখন তোরা ভাবতেও পারিসনি একদিন আশ্রম এতবড় হবে—দিনরাত কেবল কাণের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতিস, আশ্রম চলবে না, আশ্রম চলবে না। রাজাসায়েবও আশ্রমের এ রকম উন্নতির কথা ভাবতে পারেননি, তাই প্রথম দফার অল্প জমি আমাকে একেবারে দান করে দিয়েছিলেন। পরের দফায় যখন জমি দিলেন, তখন করলেন কি জানিস, এত সব অধিকার চেয়ে বসলেন যে আশ্রম নিয়ে যা খুসী করতে পারেন। আমি তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। জানতাম, একদিন সমস্ত ক্ষমতা আবার আমার হাতেই ফিরে আসবে।'

এক মুহূর্তের জন্য বিপিন থামিয়াছে, তারপর আবার বলিয়াছে, 'এসব কথা তোকে বলতাম না, তোকে আর রাখা চলবে না বলেই বললাম। আমার আশ্রম ছেড়ে তুই চলে যা ভাই, দোহাই তোর। গোলমাল তুই করতে পারিস, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না, যেতে তোকে হবেই। গোলমাল না করে যদি চলে যাস, আশ্রমের এতদিনের লাভের একটা ভাগ বরং তোকে দেব, যতই হোক, এতদিন তে: তুই আশ্রমের উন্নতিতে সাহায্য করেছিস, কিছু দাবী তোর আছে। ওই টাকায় যেখানে খুসী নিজের একটা ছোটখাট আশ্রম তুই খুলতে পারবি।'

রাত্রি বাড়িবার জন্যই ঘরের আলোটার জ্যোতি যেন একটু ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছে। দুজনে চুপ করিয়া থাকিয়াছে। বিপিন একবার ভাল করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে সদানন্দের, সদানন্দ একবার ভাল করিয়া মুখখানা দেখিয়াছে বিপিনের। ব্যাপারটা গুরুতর, তাই তারা ভিন্ন কে বুঝিবে কি গুরুত্ব সেই দেখার! দুজনে তারা বন্ধু, বন্ধুর মধ্যে ছাড়া এমন ব্যাপার ঘটে না, এ রকম বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় না। সদানন্দ কি বলিত

অনুমান করা কঠিন, বিপিন একটা খাপছাড়া কথা বলিয়া বসায় সে আর মুখ খোলে নাই।

'আরও একটা জিনিষ তোকে দিলাম সদা। মাধুকে তুই নিস্। ওকে দিয়ে আমার আর দরকার নেই।'

বিপিনের শেষ কথাটার কোন মানে হয়? মাধবীলতাকে সে দান করিয়া দিল, মাধবীলতা যেন তার সম্পত্তি! আশ্রমটা সম্পূর্ণরূপে নিজের দখলে আনার জন্য এতদিন মাধবীলতাকে তার দরকার ছিল, এখন আর দরকার নাই তাই বন্ধুকে দিয়া দিয়াছে! কেমন লাগে কথাটা ভাবিতে? মনটা কি রকম জ্বালা করে? কে বলিয়াছে বিপিনকে, মাধবীলতাকে তার দরকার আছে?

তবু বিপিনের কথার একটা ইঙ্গিত নিন্দনীয় অভিপ্রায়ের ধারাবাহিক অবাধ্যতার মত মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়ায়। মাধবীলতাকে নিয়া সদানন্দ এবার যা খুসী করিতে পারে, বিপিনের দিক হইতে এতটুকু বাধার সৃষ্টি হইবে না। মাধবীলতাকে বিপিন আশ্রমে আনিয়াছিল কিন্তু ওর সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তার শেষ হইয়া গিয়াছে। হয়তো এতটুকুই ছিল বিপিনের আসল বক্তব্য। মাধবীলতার সম্বন্ধে বন্ধুকে অভয় দেওয়া।

মহেশ যখন সদানন্দকে তার ঘরে একা বিশ্রাম করিবার সুযোগ দিয়াছে, সকলকে বারণ করিয়া দিয়াছে ঘরে যাইতে, তখন মাধবীলতা আসিয়া হাজির হয়।

'ব্যাপার কি বলুন তো?'

'এসো মাধু। বোসো।'

'বসছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি হল?'

'ব্যাপার আর কি হবে, ঝগড়া করে চলে এলাম। ও রকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে মানুষের পোষায়? এতদিন সহ্য করেছিলাম, আর সহ্য হল না।'

মাধবীলতা মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, 'আপনাদের দিয়ে কোন ভাল কাজ হতে পারে না। খালি নিজেদের মধ্যেই মারামারি করবেন তো কাজ হবে

কি। ছি ছি, নিজের নিজের স্বার্থচিন্তাই যদি করবেন দিনরাত, এসব কাজে কেন আসেন আপনারা ?'

সদানন্দ গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলে, 'স্বার্থচিন্তাই যদি করতাম মাধু, আশ্রম ছেড়ে আজ চলে আসতে হত না। বিপিনের বদলে আশ্রমটা আমিই দখল করতাম।'

'পারলে তা করতেন।'

মাধবীর মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়া বলে, 'আমাকে কি তুমি বিপিনের মত অপদার্থ ভাব ?'

'বিপিনবাবুকে আমি অপদার্থ ভাবি না।'

'মহাপুরুষ ভাব বুঝি ?'

সদানন্দের ব্যঙ্গের জবাবে মাধবীলতাও ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'বিপিনবাবু কেন মহাপুরুষ হবেন, মহাপুরুষ তো আপনি !'

মাধবীলতা আর সে মাধবীলতা নেই। সদানন্দের কাছে সব রকম চাপল্য হারাইয়া আর সে জড়সড় হইয়া যায় না, ভয়ে ভয়ে হিসাব করিয়া কথা বলে না, অনায়াসে ব্যঙ্গ করে। মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের ব্যবহারও অবশ্য বদলাইয়া গিয়াছে। বাহিরের সকল ভক্তের সঙ্গে আলাপ করার অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই প্রথম প্রথম সে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ করিত, মাঝে মাঝে সব গোলমাল হইয়া যাইত বটে কিন্তু তাও যেন ছিল ছেলেমানুষী ভাবপ্রবণতার আবরণে মানবীকে দেবতার প্রশ্রয় দেওয়া, দেবতার বাড়াবাড়ি অন্তরঙ্গতার জবাবেও যাতে মাথা তুলিবার সাহস মানবীর হয় না। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মাধবীলতার সঙ্গে আলাপ করাটা তার নামিয়া গিয়াছে বিপিনের সঙ্গে আলাপ করার স্তরে।

মাধবীর আগের মন্তব্যে সদানন্দ রাগ করিয়াছিল, এবারকার ব্যঙ্গে হাসিয়া বলে, 'তোমার কাছে তাই বটে। আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নেই !'

'কেন ?'

'তোমাকে যে তাহলে দ্বিচারিণী হতে হবে।'

মুখ মাধবীর লাল হয় না, বিবর্ণ হইয়া যায়। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়।

সদানন্দ নীচু গলায় ব্যগ্রভাবে বলে, 'রাগ করলে মাধু? শোন, শুনে যাও—'

কিন্তু মাধবীলতা আজকাল বড়ই অবাধ্য হইয়াছে, কোন কথাই শুনিতে চায় না।

সদানন্দ যতই আশা করুক, বিপিন তো আসেই না, আশ্রম হইতে কোন শিষ্যও আসে না। সদানন্দ কারও কাছে কিছু বলিয়া আসে নাই, আশ্রমের শিষ্যদের কিছু জানাইবার কথা ভাবিতেও তার সঙ্কোচ হইতেছিল। বিপিন তাদের কি বুঝাইয়াছে সেই জানে। হয়তো আশ্রমের কেউ এখনও জানিতেই পারে নাই, সদানন্দ চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে অথবা সদানন্দ বাগবাদায় মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছে। হয়তো বিপিন তাদের বুঝাইয়াছে, সদানন্দ বিশেষ কারণে কিছুদিন মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে বাস করিতে গিয়াছে, তাকে গিয়া কারও দর্শন করা বারণ। বিশেষ কারণটাও হয়তো বিপিন সকলকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিয়াছে। মাধবীলতার আকর্ষণ।

মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলে বিপিন যে এমন একটা ইঙ্গিত করার সুযোগ পাইবে, এখানে আসিবার আগে সদানন্দের সেটা খেয়াল হয় নাই। যাই হোক, এখন নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথাটা সে ভাবে। মাধবীলতা এখানে আসিবার কয়েকদিন পরে সেও আসিয়া হাজির হইয়াছে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া কলঙ্ক রটনার পক্ষে এ একটা জোরালো যুক্তিই বটে। ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিলে এই বলিয়া সদানন্দ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় যে, বিপিন কি বলিয়াছে কি বলে নাই না জানিয়া নিজের মনের অনুমান নিয়া বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নাই। হয়তো ক্ষতিকর কিছুই বিপিন বলে নাই, সদানন্দের অন্তর্দ্ধানের একটা সাধারণ ও সঙ্গত কারণই সকলকে জানাইয়াছে। আর যদি সত্য সত্যই তাকে ফিরাইয়া নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা বিপিনের জাগিয়া থাকে, তবে হয় তো সেই সঙ্গে একথাও সকলকে জানাইয়া দিয়াছে যে কয়েকদিন পরেই সাধুজী আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

আশ্রমের কেউ না আসুক, আশে পাশের গ্রামের নরনারী দলে দলে সদানন্দকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসে। প্রথমে ঝোঁকের মাথায় সদানন্দ এখানে সকলের কাছে নিজের আশ্রম ত্যাগের ভিতরের ব্যাপারটা ঘোষণা করিয়া ফেলিয়াছিল, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া মহেশ চৌধুরীকে বলিয়া দিয়াছে, কথাটা কয়েকদিন যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়।

'এখন সকলকে জানিও, আমি এম্‌নি কয়েকদিন তোমার এখানে থাকতে এসেছি।'

'প্রভু?'

সদানন্দ বুঝিতে পারিয়াছে।

'না, মিথ্যে কথা তোমায় বলতে বলিনি মহেশ। তোমরা যে জানো আমি কেন আশ্রম ছেড়ে এসেছি একথা অস্বীকার করবে কেন? শুধু বলবে যে কারণটা এখন প্রকাশ করা হবে না।'

পরদিন সকালেই দলে দলে দর্শনার্থীর সমাগম ঘটায় মহেশ বারণ না মানিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে ভাবিয়া সদানন্দ প্রথমটা বড়ই রাগিয়া যায়।

মহেশ চৌধুরী বলে, 'আজ্ঞে না, আমি কিছুই বলি নি। আপনি এখানে এসেছেন জেনে সকলে প্রণাম করতে আসছে।'

'আমি এখানে এসেছি একথাটাও এত তাড়াতাড়ি নাই বা ছড়িয়ে দিতে মহেশ? দু'দিন একটু শান্তিতে থাকতাম।'

'আপনি এসেছেন একথা কি ছড়িয়ে দেবার দরকার হয় প্রভু? মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে যায়। সূর্য্যকে কি লুকিয়ে রাখা চলে প্রভু! কাল সকালে যখন এলেন, তখনি গাঁয়ের অর্দ্ধেক লোক জেনে গেছে আপনি এসেছেন। কালও অনেকে এসেছিল, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে দিই নি। আজ আসতে বলে দিয়েছিলাম।'

সকলে আসে, প্রণাম করিয়া যায় এবং অনেকে প্রণামীও দেয়। মাধবীলতা কাছে উপস্থিত থাকিলে কেউ কেউ কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকে ছাখে, কৌতূহলের সঙ্গে মেশানো থাকে ভয়। কে জানে মাধবীলতার সম্বন্ধে তাদের মনে কি কল্পনার ছায়া ভাসিয়া আসিতে সুরু করিয়াছে! মেয়ে দরকার হয় এমন

সাধনাও তো সাধু পুরুষেরা করে, শব-সাধনার মত যে সব সাধনার কাল্পনিক বিবরণ শুনিলেই সাধারণ মানুষের রোমাঞ্চ হয়।

প্রণামী নিয়া একটু বিপদ হয়। প্রণামী নেওয়া হইবে কিনা সদানন্দও ঠিক করিতে পারে না, মহেশও ঠিক করিতে পারে না। প্রথমে মুখ খোলে মহেশ।

'কি করব প্রভু ?'

'তুমি কি বল মহেশ ?'

'আমার মনে হয় প্রণামী এখন না নেওয়াই ভাল। এখন প্রণামী নিলে যেন নিজের জন্য নেওয়া হবে প্রভু। আশ্রম খোলা হলে তখন আশ্রমের জন্য প্রণামী নিলে দোষের হবে না।'

শুনিয়া সদানন্দ ভাবে, মহেশ তবে তাকে নিয়া নূতন একটি আশ্রম খুলিবার কল্পনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ? কে জানে প্রথম হইতেই মনে মনে মহেশের এ মতলব ছিল কি না! হয়তো এ রকম একটা উদ্দেশ্য নিয়াই তাকে বাগানোর জন্য এতকাল মহেশ হাজার অপমান সহিয়াও আশ্রমে যাতায়াত করিয়াছে, অতিভক্তির বন্যায় তাকে ভাসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। প্রথম প্রথম মহেশকে একটু বোকা মনে হইত, কিন্তু এখন সময় সময় তাকে সদানন্দের বিপিনের চেয়েও চালাক মনে হয়।

না, ঠিক বিপিনের চেয়ে চালাক নয়, বিপিনের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে হয়। বিপিনের সঙ্গে মহেশের পার্থক্য এত বেশী প্রকট যে দুজনের বুদ্ধিকে এক শ্রেণীতে ফেলিতে মনে খটকা লাগে। মহেশও হয় তো বিপিনের মতই ভাল উদ্দেশ্যে ভড়ং করে, মিথ্যার আশ্রয় নেয়, মনে মনে ধারণা পোষণ করে যে রোগীকে আর শিশুকে ভুলানোর মত জগতের পীড়িত বয়স্ক শিশুগুলিকেও দরকার মত ভুলাইলে দোষ হয় না, তবু যেন বিপিনের বেলা এসব মনে হয় অন্যায় কিন্তু মহেশের বেলা অন্যায়ের প্রশ্ন মনেও আসে না।

তবে, একথাও সত্য যে বিপিনের ঘোরপ্যাঁচ বুঝা যায়। উদ্দেশ্য তার অতি মহৎ এটা বুঝা গেলেও প্যাঁচ যে কষিতেছে সে অতি জটিল, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। মহেশের উদ্দেশ্য না বুঝিলেও কখনও জোর করিয়া

ভাবা চলে না তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ আছে, মতলব হাসিল করিবার জন্য তলে তলে সে চালিতেছে চাল।

কেন এমন হয়? দশজনের ভালর জন্য একজনের সর্ব্বনাশ করাটা বিপিন অন্যায় মনে করে না কিন্তু কারও সামান্য একটু ক্ষতি করার চিন্তা মহেশের পক্ষে মনে আনাও সম্ভব নয়, এইজন্য? সদানন্দের মনে হয়, আরও অনেক কারণ আছে। মহেশের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে, বিপিনের যা নাই। বিপিনের মধ্যে এমন কতকগুলি দোষ আছে, মহেশের যা নাই। কিন্তু আসল গুণ বা দোষ, যার শাখা প্রশাখাই মানুষের মধ্যে ছোট বড় নানা রকম দোষগুণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, মানুষের তো দশটা থাকে না? কি সেই গুণ মহেশের এবং কি সেই দোষ বিপিনের অথবা কি সেই দোষের অভাব মহেশের এবং কি সেই গুণের অভাব বিপিনের যার জন্য দু'জনের মধ্যে এতখানি পার্থক্য সম্ভব হইয়াছে?

ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ আনমনে বলে, 'আচ্ছা, এখন তবে প্রণামী নিও না।'

মনে হয়, সাধু সদানন্দ যেন মহেশ চৌধুরীকে এই কয়েকটি কথার মধ্যে নূতন একটি আশ্রম খুলিবার অনুমতিই দিয়া ফেলিয়াছে, মহেশ চৌধুরীর মুখখানা আনন্দে এমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

(ক্রমশঃ)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

Will to Civilisation—by John Katz
(Secker and Warburg).

কিছুকাল পূর্ব্বে বার্ট্রাণ্ড রাসেল একখানি বই-এ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে মার্কসীয় দর্শন আমরিকায় প্রবর্ত্তিত instrumentalism-এর সমগোত্রের। রাসেলের অন্যান্য বাক্যের মতনই এটাও ছিল আংশিকভাবে সত্য এবং নিতান্ত চমকপ্রদ। বৎসর দুই তিন পরে কাৎস্ ইতিহাসের রীতিনীতি ব্যাখায় বলছেন প্রায় সেই একই ধরণের কথা। তিনি পুরাপুরি মার্কসিষ্ট নন, কারণ মার্কসিজমে এমন অনেক অংশ আছে যা তাঁর মতে এম্পিরিক্যাল নয়। কাৎস্ তার পরিবর্ত্তে এম্পিরিসজিমের সাহায্যে ইতিহাস বুঝতে এবং তাকে ভিন্নপথে নিয়ে যেতে তৎপর। Instrumentalism যে Empiricism-এরই বংশধর কে না জানেন ?

কাৎস্ যা বলছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সভ্যতা যত রকমেই হোক তার প্রধান সমস্যা সমাজ সৃষ্টি ও রক্ষা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন সভ্যতাই এ কার্য্যে সফল হয় নি। হিন্দু সভ্যতা জাতিবিচার দিয়েই তার অসমর্থতা প্রমাণ করেছে। তেমনই বৌদ্ধ-সভ্যতা নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের এবং খৃষ্টান সভ্যতা চার্চ্চের দ্বারা। নির্ব্বাণ মানুষকে, অতএব সমাজকে জীবন থেকে সরিয়ে এনেছে, এবং খৃষ্টান চার্চ্চ হার-স্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সমাজ জীবনধর্ম্মী, অতএব সভ্যতার প্রথম প্রক্রিয়া জীবনধর্ম্মকেই অগ্রসর করবে। কাৎস্ নানা রকমের প্রক্রিয়াকে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে তাদের প্রকৃতি জীবনের বিমুখ, ও প্রতিকূল। অতএব সভ্যতার সংস্কারের প্রয়োজন। উপায় হল empirical দৃষ্টিভঙ্গী। যারা মৃত্যুমুখী তাদের দ্বারা সংস্কার সম্ভব নয়। যারা জীবন থেকে বঞ্চিত তারাই একাজ পারবে। সভ্যতার ভার তাদেরই উপর।

এ প্রকার মন্তব্য যে একবারে নতুন তা নয়। অবশ্য লেখকের ভঙ্গী নতুন,

ভাষাও চমৎকার। কিন্তু এ যেন অসম্পূর্ণ বাক্য। দোষ কাৎসের নয়, দোষ empiricism-এর। মার্কস যখন হেগেল-দর্শনকে পায়ের ওপর দাঁড় করাতে যান তখন তাঁর মনে নিশ্চয়ই হয়েছিল যে জ্ঞান ও কর্ম্মের বোঝাপড়া না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাসিয়ান ষ্টেটের পুনরাবৃত্তি নিতান্ত স্বাভাবিক। তারই জোরে তিনি জ্ঞানকে আধিভৌতিকের ছায়া পর্য্যন্ত বলতে রাজী হন। তারপর যখন মার্কস ফরাসী দর্শনের প্রভাবে আসেন তখন মানবিকতার স্পর্শ তাঁকে জ্ঞানপথ থেকে কর্ম্মপথে নিয়োজিত করে। সেইখানে থামলে তিনি জোর বাকুনিনের সমস্তরের হতেন। তা তিনি থামেননি। ডায়েলেক্‌টিকের নিয়মানুসারে তিনি ইতিহাসের ধারা দেখিয়ে দিলেন, এবং তাই বুঝে কাজ করতে উপদেশ দিলেন। সেইজন্য মার্কসিজম আজ কর্ম্মবীরের ধর্ম্ম। এই ডায়েলেক্‌টিকের অভাবে কাৎসের কেন, হিউম্‌, পিয়ার্স, ডিউই-এর এম্পিরিসিজমও ধনিকতন্ত্রকে একচুলও হটাতে পারেনি। এম্পিরিসিজমের সাহায্যে সমালোচনা হয়, কিন্তু সমালোচনায় বিপ্লব আনে না। ধাক্কা দেওয়া এবং ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে গড়া এ দুটি পৃথক ক্রিয়া। প্রথকটির দর্শন দ্বিতীয়টির অনুপযুক্ত। অতএব সমাজ সমস্যার নিরাকরণ, অর্থাৎ সমাজসৃষ্টি, এম্পিরিসিজমের কর্ম্ম নয়, যদি না অবশ্য সমাজসৃষ্টিটাকেই এম্পিরিসিজম নাম দিই। আমার সন্দেহ হয় কাৎস্‌ সাহেব তাই করেছেন। যা বাঞ্ছনীয় তার পদ্ধতিকে বাঞ্ছনীয় পদ্ধতি বলাতে এম্পিরিসিজম হেগেল-দর্শনের পুনরাবৃত্তি করে।

হিন্দু-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কাৎস্‌ যা লিখেছেন তার বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ করা স্বাভাবিক। হিন্দু-সমাজ যে সমাজসৃষ্টি করতে অক্ষম, এবং সেই অক্ষমতার আবরণ স্বরূপ যে তার দর্শনপ্রীতি, দার্শনিক স্পৃহা ও ব্রহ্মবাদ—এ-ধরণের বিচার অনেকেই মানবেন না। এটা এতই অদ্ভুত যে কাৎস্‌কে পণ্ডিত বলতে সাধারণের দ্বিধা হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। এই সম্পর্কে অবশ্য স্পেংগলারের একটা বাক্য আমার মনে পড়ছে—কোথায় তিনি যেন লিখেছিলেন যে অশোকের পর ভারতের সমাজ আর বৃদ্ধি পায় নি। স্পেংগলারেরও ইঙ্গিত ছিল ঐ প্রকারের, যদিও তাঁর তর্করীতি ভিন্ন। আমরা ভারতবাসীরা অবশ্য গত কয়েক বৎসর ধরে শুনে আসছি যে চলিষ্ণু জাতির পক্ষে সমাজ রক্ষার দুটি নিয়ম আছে, অন্য জাতিকে মেরে ফেলা এবং অন্য জাতিকে বাঁচিয়ে রাখা

নিম্নজাতি হিসেবে ; আর্য্যজাতি দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করেছিলেন, তাই আজ অষ্ট্রেলিয়ায় মাওরিবংশ নির্ব্বংশ হয়েছে এবং ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যের দল এখনও বর্ত্তমান। আমরা আরো শুনেছি যে ভারতীয় সমাজের মূল কথা শান্তিরক্ষা, এবং শান্তির আশীর্ব্বাদে আমরা জার্ম্মাণ, রুশিয়ান, পাঠান সৈন্য জয় করব। মনু-বর্ণিত (বর্ণিত কি কল্পিত ?) হিন্দুসমাজ এতই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও পাকা যে ডাঃ ভগবান দাসের মতে তাতে শ্রেণী-সমস্যারও সমাধান হয়ে গিয়েছে। আধুনিক ভারতবর্ষীয় ঐতিকহাসিকদের মধ্যে যারা প্রাচীন ভারত নিয়ে কারবার করেন, তাঁদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসন্ধানের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস সর্ব্বদাই উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমাজতাত্ত্বিকের মধ্যে একাধিকের ধারণা ঐ ধরণের।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে অস্পৃশ্যতা ও হিন্দু-মুসলমানের বর্ত্তমান দ্বন্দ্ব—এই দুটির অস্তিত্ব কাৎসের মন্তব্যকে অনেকটা সমর্থন করছে। জাতিবিচারের বহু সামাজিক গুণ থাকা সত্ত্বেও তার অস্তিত্বটাই কি সমাজ-বোধের হার মানা নয়? জাতিবিভাগের জন্য সামাজিক সংস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, তার প্রয়োজনও ছিল খুব, কিন্তু সংস্থান-বোধ বৃহত্তর সমাজ-ঐক্যের সহায়তা কখনও করেনি। বরঞ্চ এতদূর পর্য্যন্ত বলা চলে যে জাতি বিচারের ফলে সামাজিক গঠন সুদৃঢ় ও কার্য্যকরী হবার জন্যই রাষ্ট্র-সৃষ্টি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। বাধাও দিয়েছিল প্রমাণ পাওয়া শক্ত নয়। অথচ রাষ্ট্রসৃষ্টি সমাজের স্বাভাবিক পরিণতি, এবং রাষ্ট্র তৈরী হলে সমাজবোধ পাকা হয়। ভারতীয় সমাজ-বন্ধন রাষ্ট্রসৃষ্টি যে করতে পারেনি সেটা প্রধানত বন্ধনেরই দরুণ। যে-সব অন্তর্নিহিত পদ্ধতিতে সমাজ বিষ ও বাধা বর্জ্জন করতে করতে নতুন রূপ ধারণের পথে অগ্রসর হয়, যার জোরে সমাজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর গণ্ডীতে উপনীত হয় এবং সেই সঙ্গে নতুনতর অনুষ্ঠানের সাহায্যে ঐক্যবোধকে সদাজাগ্রত রাখে তার সহায়ক অনেক প্রক্রিয়া ভারতীয় জাতি-বিচারের ইতিহাসে বর্ত্তমান থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত তার ফলে সমাজ-বোধ সার্ব্বজনীন হয়ে ওঠে নি। চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষ, পুলকেশীন, অবশেষে আকবর, শিবাজী পর্য্যন্ত চেষ্টার কেউ কশুর করেন নি। গ্রীক, শক ও হুণ, তাতার, মোগল, ইংরেজরা অনেকেই এসেছে এ-দেশে, কিন্তু হল কি? তার

ফল যদি পরাধীনতা, হিন্দুস্থান-বিভাগ, ডেলিভারেন্স-ডে ও সন্ত্রাস-বাদ হয় তবে কি আজ ভারতীয় সমাজকে সমাজ হিসেবে সার্থক বলব? আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম্মরাজ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত অনেকে হয়ত বলবেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যও আমাদের ধাতে বসে নি। বিধর্ম্মীকে নিধংস করার দৃষ্টান্ত অনেক। কেউ তর্ক তুলবেন, এতদিন যে বেঁচে রয়েছে এইটাই সমাজ-শক্তির পরিচয়। মানি, জীবজগতে যে যতদিন সংখ্যাবাহুল্যের জন্য বেঁচে থাকতে পারে তার ততটাই কৃতিত্ব। পল্লীসমাজ দেড়শ' বছর আগেও বেঁচে ছিল, ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি সেদিনও অটুট ছিল। জানি, কিন্তু কচ্ছপও বহুকাল বাঁচে, খোলার পরিবর্ত্তনও হয় না। অভ্যাসের বশে বাঁচা ও নিজের জোরে বাঁচা দুটো যে পৃথক তিনি বুঝবেন যার বাড়ীতে বুড়ি দিদিমা কি দিদি শ্বাশুড়ী আছেন।

কাৎসের মন্তব্য তাই আমি গ্রহণ করি। তিনি অবশ্য কারণ দেখান নি। আগে যা লিখলাম তা আমার কথা। শ্রেণীবোধের অভাবের হেতু বিচার করতে চাই না এখানে, কিন্তু মনে হয় তার সঙ্গে সমাজ-বোধ অভাবের সম্পর্ক আছে। কাৎসের community ম্যাকআইভার কিংবা অন্য দু এক জন জার্ম্মাণ পণ্ডিতের community থেকে বিশেষ পৃথক নয়। অতএব তার ব্যাখ্যা না থাকলেও অর্থটি দুর্গম নয়। সংজ্ঞাটির প্রধান দোষ এই যে প্রাথমিক ও পরিণত communityর পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া community এমন কোনো homogeneous substance নয় যার পরিণতি নেই। অবশ্য কাৎসের প্রয়োগে সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে।

লেখকের হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে অন্য মন্তব্য আমি গ্রহণ করি। আমরা কেবল অন্নকষ্টে দার্শনিক নই, কুৎসা রটাতেও দার্শনিক, পরের সর্ব্বনাশ করতেও দার্শনিক। শুধু কি দার্শনিক, সঙ্গে সঙ্গে ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম ও দর্শনের এমন মিলন ও প্রভাব জাতীয় অবচেতনায় একটা কোনো ভীষণ নিষ্ফলতার অস্তিত্বেরই সূচনা দেয়।

সে যাই হোক, বইখানি পড়বার মতন বই। আত্মীয়স্বজনেরই কাছে মতের মিল চাওয়া প্রশস্ত, লেখকের কাছে নয়।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Democracy Today and Tomorrow—by Edward Benes, (Macmillan), 7/6.

The Defence of Democracy—by John Middleton Murry, (Cape), 10/6.

সমাজে যখন সঙ্কট আসে, তখন "বিশুদ্ধ" গণতান্ত্রিকদের যে কি বিড়ম্বনা ঘটে, এ বই দুখানি তারই প্রমাণ।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি ডক্টর বেনেশ্ যে একজন অসাধারণ লোক, তা সকলেই জানেন। তাঁর গুরু মাসারিক আর তিনি নিজে ছিলেন পৃথিবীর কাছে চেকোশ্লোভাকিয়ার অবিসম্বাদী দেশমুখ্য। চেক্ স্বাধীনতার জন্য তিনি নানা বাধা বিপত্তি তুচ্ছ ক'রে বহুকাল লড়াই করেছিলেন। গত মহাযুদ্ধের পর চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্র যখন স্থাপিত হল, তখন তিনি প্রেসিডেণ্ট মাসারিকের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। গুরুর মৃত্যুর পর তাঁকেই সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গুরুর স্থান নিতে হল। চেকোশ্লোভাকিয়াই ছিল বেনেশের দিবারাত্রির স্বপ্ন।

পনেরো মাস আগে হিট্লারের হুম্কিতে সেই চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল। চেকোশ্লোভাকিয়া ঐ অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল, আর তাকে সর্ব্বৈব সাহায্য করতে রাজী ছিল একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন। এ খবর এসেছিল শুধু সোভিয়েটের "অন্ধ" ভক্তদের কাছ থেকে নয়; ইংরেজ সাংবাদিক Gedye "Fallen Bastions"-এ, আর খুব সম্প্রতি বেনেশের বন্ধু ও সহকর্ম্মী ডক্টর হিউবার্ট রিপ্কা "Munich—Before and After"-এ সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিরোধের কোন চেষ্টা হয় নি; বেনেশ ভাবলেন যে "গণতান্ত্রিক" ব্রিটেন আর ফ্রান্স যখন প্রতিশ্রুতি দিল যে চেকো-শ্লোভাকিয়ার নূতন সীমানার আর কোন অদল বদল চলবে না, তখন আর ভয়ের কারণ নেই। প্রতিশ্রুতির ফলাফলের জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় নি; মার্চ্চ মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ হল। পশ্চিম ইয়োরোপের "গণতান্ত্রিক" নেতারা তখন নাৎসিদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যাপারে কি ভাবে

একযোগে কাজ করা যায় স্থির করার জন্য ড্যুসেলডর্ফে আর দক্ষিণ আমেরিকার নানা যায়গায় ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত রইলেন।

ইয়োরোপে যখন এ ব্যাপার ঘট্‌ছে, বেনেশ তখন আমেরিকায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একটা করুণ বিবৃতি দেওয়া ছাড়া বিচলিত হওয়ার আর কোন লক্ষণ এ বইয়ে তিনি দেখান নি। 'লিবারল' তত্ত্বের সান্ত্বনাই তাঁর কাছে যথেষ্ট হয়েছে; তাই ম্যুনিকে যারা তাঁকে বারবার ভয় দেখিয়ে হিটলারের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করেছিল, তাদের সম্বন্ধে একটা কটু কথাও তাঁর মুখ থেকে বেরোয় নি। তারাই যখন আবার "গণতন্ত্র" রক্ষার জন্য লড়াই করতে লাগ্‌ল, তখন তিনি জোর গলায় তাদের স্তুতি গাইলেন। বেনেশের মত বিশুদ্ধ লিবারলরা হচ্ছেন ফ্রান্সের বুরবঁ রাজবংশের মত; তাঁদের অভিজ্ঞতা কিছু শেখায় না, তাঁদের পুরোণো সংস্কার কিছুতেই যায় না।

শিকাগোতে বেনেশ্‌ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে বহু রত্নের সাক্ষাৎ মিলবে। একটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ "The man who in modern history has been taken as a symbol of brute force, Napoleon, has declared ;—'There are in the world two powers—the sword and the spirit. The spirit has always vanquished the sword'. In this statement I agree with the words of Napoleon." টীকা করতে ইচ্ছা করে—সাবাশ!

তাঁর মনের বহু কামনার কথা বেনেশ্‌ সাহেব এই বইয়ে জানিয়েছেন। গরীবের দুঃখকষ্টের জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যথিত, তাই তিনি চান্‌ যে গণতন্ত্র আরও গভীর, আরও সম্পূর্ণ হোক্‌, সহৃদয় হোক্‌। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থে যে সঙ্ঘর্ষ ঘটে, তাকে তিনি চাপা দিয়ে যেতে চান্‌; মানুষের মন বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গে সে সঙ্ঘর্ষ শেষ হবে।

বেনেশের "humanitarian democracy" এসে পৌঁছানো পর্য্যন্ত তাহলে আশান্বিত চিত্তে অপেক্ষা করে থাকাই সঙ্গত। বিপদ শুধু এই যে আমাদের চেয়ে ইতিহাসের ধৈর্য্য কম হওয়াই সম্ভব, আর "গণতন্ত্রের" নতুন পাণ্ডাদের সঙ্গে ছুটতে গিয়ে শেষে হিতে বিপরীত না ঘ'টে পড়ে।

চিন্তাশীল ইংরেজ লেখকদের মধ্যে যাঁরা আজকাল ভারতবর্ষের ছোঁয়াচ্ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মিড্‌ল্‌টন্ মরি একজন প্রধান। এককালে কাব্য-সমালোচনায় বেশ সুনাম অর্জ্জন ক'রে তিনি এখন স্থির করেছেন যে মার্কস্‌বাদ আর খ্রীষ্টধর্ম্মের এক সমন্বয়ই হল তাঁর জীবনের ব্রত। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে কয়েকখানা বইও তাঁর লেখা হয়ে গেছে ; আলোচ্য বইখানা তাদের মধ্যে সব চেয়ে টাট্‌কা।

মরি সাহেব হচ্ছেন একজন সোজাসুজি 'মিষ্টিক্'। গান্ধীজীর তিনি ভক্ত ; 'হিন্দ্ স্বরাজের' প্রশংসায় তিনি শতমুখ। কার্ল মার্কসের সঙ্গে তাঁর একটা ঝগড়া আছে—মার্কস্ চেয়েছিলেন সমাজকে বদ্‌লানো, মরি সাহেবের মত হচ্ছে যে আদত দরকার হচ্ছে মানুষ বদ্‌লানো, সমাজের ব্যবস্থা তাহলে আপ্‌না থেকেই হবে। গণতান্ত্রিকরা নাকি মার্কস্‌বাদকে বাতিল করে, কারণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রত্যেকের স্বকীয় আধ্যাত্মিকতা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আর তার সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস হচ্ছে গণতন্ত্রের সারবস্তু, আর এ সব বিষয়ে মার্কস্‌বাদীরা হয় বিদ্রূপ করে নয় উদাসীন থাকে। এ হচ্ছে অত্যন্ত অন্যায়, কারণ মরি সাহেবের মতে মার্কসের ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটেছিল, আর তাই তিনি সিদ্ধপুরুষের মত সমাজের অত্যাচার অনাচারকে অনাবৃত ক'রে দিয়ে যথার্থ আধ্যাত্মিকতাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন। মার্কস্‌বাদের সঙ্গে ধর্ম্মের যে ঝগড়া, তাকে মরি মেটাতে বসেছেন।

বর্ত্তমান সমাজে যে ধর্ম্মের লক্ষণ অতি অল্প, তা মরি ভাল ক'রেই বোঝেন। তাই তিনি বলেছেন যে যেমন আইন আদালত থাকার অর্থ এ নয় যে আমরা ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করি, তেমনি ইংলণ্ডে খ্রীষ্টান গির্জ্জা থাকার অর্থ এ নয় যে সে দেশে ভগবানে বিশ্বাস যথার্থই আছে। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও মরি সে বিষয়ে খুব কড়া কথা ব্যবহার করতে পশ্চাৎপদ হন্ নি—"a sickly and bastard child......brought into being and matured into capitalism...to ensure freedom of the individual to make a profit out of others."

সমাজতন্ত্রের দিক থেকে সাম্যবাদের প্রতি মরির যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে ; জার্ম্মাণ বা ইটালিয়ান ফ্যাশিজ্‌মে শ্রদ্ধা করার মত কিছুই তিনি দেখেন নি।

তাই সাম্যবাদ আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ স্থাপন করতে তিনি ব্যাকুল হয়েছেন।

গান্ধীজীর অহিংসা নীতিতে মরি সাহেবের পূর্ণ আস্থা। "আমাদের উপর বোমা পড়ুক, আমরা কোথাও বোমা ফেলব না"—এই হচ্ছে তাঁর মনোভাব। ধর্ম্মতাত্ত্বিকের ভাষায় তিনি সকলকে আহ্বান করেছেন সমাজের বহুযুগসঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্তে। চিত্তশুদ্ধিই হবে সেই প্রায়শ্চিত্ত।

কিন্তু মরি সাহেবই এ বইয়ে গত বৎসরের মিউনিক্ চুক্তির সমর্থন করেছেন। তাই বলতে ইচ্ছে করে যে ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত রয়েছে, তখন তাকে টেনে বার করার চেষ্টা না করাই শ্রেয়।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

রাণুর দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস)। মূল্য—এক টাকা বারো আনা।

রাণুর দ্বিতীয় ভাগ কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। উপন্যাসের মত ছোট গল্পের পরিসর ব্যাপক ও পরিধি বিস্তৃত নয়। সেখানে পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় ও বিশদ বিশ্লেষণের স্থান নাই, তার কার্য্যক্ষেত্র অল্প এবং প্রসারের পথও সীমাবদ্ধ। জীবনের অভিজ্ঞতাপুষ্ট শোক-দুঃখ, রাগ-বিরাগ, আনন্দ-কৌতুক প্রভৃতি যে-কোন একটি সুনির্ব্বাচিত ভাবকে বহির্জগতের ছোটখাট ঘটনার দ্বারা স্বল্পায়তনের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সুস্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তোলাই ছোট গল্পের ভাবসূত্র। সুতরাং ছোট গল্প লেখকের ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য বহুলাংশে সীমাবদ্ধ এবং প্রয়োজনের বাইরে তার ব্যাপ্তির ক্ষেত্র এতটুকুও প্রশস্ত নয়। সে-কারণ ছোট গল্প লেখকের মনঃসমীক্ষণ, বিষয়-নির্ব্বাচন ও অবধি-বোধের প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকার প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথমে। তাই একটু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্প লিখে আমাদের দেশে নাম করেছেন অতি অল্প জন এবং এই অল্প কয়েকজনের মধ্যে মাত্র কয়েকটি গল্পই বাংলা সাহিত্যের কারেন্সিতে বহুদিন পর্য্যন্ত সচলতার দাবী রাখতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস।

সকল দেশেই এক এক শ্রেণীর সাহিত্যিক দেখা যায় যাঁদের রুচি ও কল্পনার প্রসার এক এক দিকে চলমান ও আসক্ত। অন্ততঃপক্ষে কিয়ৎপর্য্যায় কালের

জন্য এক জনের মধ্যে এক এক রকম বিলাস ও মানসতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত এঁরা দুটি বিশিষ্ট পর্য্যায়ে বিভক্ত; অর্থাৎ একদল ভাববাদী—idealism এর উপাসক, অপরদল বস্তুতন্ত্রবাদী অর্থাৎ realism-এর ভক্ত, কিন্তু এই ভাববাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদের মধ্যেও আবার বাদানুবাদ ও বিভিন্ন স্তর আছে। অর্থাৎ কারো মধ্যে মানবজীবনের প্রবলতম প্রবৃত্তি কাম বা কামনাবিলাস প্রকট, কারো বিজ্ঞানী মন নীতিগত আদর্শ প্রচারে আস্থাবান; কারো মধ্যে অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিকের আভাস, কেউ বা দুঃখবাদী আবার কারো মধ্যে বা হাস্যরসাবেগ প্রধান। বিভূতিবাবুর গল্পগুলির মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত রস-প্রাচুর্য্যই পরিস্ফুট বেশি। এই বিভাব বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের আদি ও বিষাদ রসের বিষাক্ত আবহাওয়াকে এবং জীবনযুদ্ধের ধাক্কায় দুর্বহ নৈরাশ্যবাদী মনকে যে বহুলাংশে বিমুক্ত করে তাতে আর সন্দেহ নাই। হাস্যরসের মধ্যে জীবনের যে প্রচ্ছন্ন প্রসার ও নিজেকে লঘুবোধ করার মন্ত্রগুপ্তি রয়েছে তার প্রমাণ সম্বন্ধে বোধ হয় মতান্তর হবে না। সাহিত্যের সাহায্যে জাতীয় জীবনে কেবলমাত্র এই প্রয়োজনটুকুও যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে বহির্জগতের 'কচুরি-পানা' নিধনের মত অন্তর্জগতের কুরুচি-পনাও যে বিশেষ ভাবে বে-খরচায় বিনষ্ট হবে তাতে আর সন্দেহ কোথা! পরশুরাম, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পরিণত রসিকরা স্বাভাবিক ভাবে এ দিকটায় সম্মিলিত হ'য়ে বাংলা সাহিত্যকে যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অনুগৃহীত করেছেন তা অকপটে স্বীকার্য্য। পরবর্ত্তী কয়েকজনের মধ্যে বিভূতিবাবুকে নিঃসন্দেহে এই শ্রেণীর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তাঁর 'বরযাত্রী', 'শিক্ষাসঙ্কট' প্রভৃতি কয়েকটি গল্পের প্রতিযোগী বিরল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। 'কুইন অ্যান' প্রভৃতি দু'একটি গল্পে হাস্যরসাবেগের মধ্যে চরিত্র বিশেষের উপর ব্যঙ্গোক্তির চিহ্নও বর্ত্তমান। 'তাপস' গল্পের হাস্যরস অদ্ভুত ভাবে পরিণতদের শ্রেণীতে পরিণতি লাভ করেছে। অর্থাৎ গল্পের প্রারম্ভে পাঠকচিত্তে শিশু-সাহিত্যের রসাস্বাদ উপলব্ধি হলেও, মাঝপথে অতি কৌতুকজনক ভাবে তার রসপরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং তাপস ও তাপসের খুল্লতাতের আলাপ-আলোচনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হাস্যরসের চলোর্ম্মি পাঠকের চিত্ত-চত্বরে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করেছে। 'মেঘদূত' গল্পে শ্যামাপদের টাইপ অভিনব। যক্ষরাজ হিসাবে

শ্যামাপদের ভ্রাতা অভয়পদ ও যক্ষবধূ হিসাবে শ্যামাপদের ভ্রাতৃবধূ অনিমা রায়ের মধ্যে দৌত্যকর্ম্মে নিয়োজিত সারমেয় 'জিমি'র ধরা পড়াটাও কৌতুকপ্রদ। অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে অতি সাধারণ বিষয় বস্তুর থেকেও বিভূতিবাবু যে-সব হাল্‌কা হাস্যরসের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন, তাতে তাঁর অভিনব ক্রিয়াশীল রসিক মনের পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ছোট গল্পের আয়তন ও ব্যাপ্তির ক্ষেত্র সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি, কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর কয়েকটি গল্প এই অনুশাসন লঙ্ঘন করেছে বলেই আমার ধারণা। স্থান বিশেষে এই পরিধি-বোধের বৈধতাভাব 'বাদল', 'দাঁতের আলো' প্রভৃতি দু'একটি গল্পের মুখ্য ভাব-সূত্রগুলির ঘন রসাস্বাদকে ক্ষুণ্ণ করেছে ব'লেই প্রতীতি জন্মে। পুস্তকের প্রথম গল্প হিসাবে 'দাঁতের আলো'কে যে কেন স্থান দেওয়া হ'ল তাও ভাব্‌বার বিষয়। এই নির্ব্বাচন প্রথার মধ্যে লেখকের কোন ব্যক্তিগত কারণ সংশ্লিষ্ট থাকলেও, সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করার সময় গল্পের গুণাগুণ অনুযায়ী পর্য্যায়ক্রমেই সেগুলির স্থান পাওয়া উচিত ব'লে মনে করি।

অবশ্য আমার এই স্বকীয় মত যদি ত্রুটি হিসাবেই স্বীকৃত হয়, তাহলে এও স্বীকৃত হবে যে, বিভূতিবাবুর গল্পগুলির সবচেয়ে যা বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে: সেগুলি আমাদের আটপৌরে সমাজের অতি নিকট ও পরিচিত বিষয়বস্তু থেকেই উদ্বুদ্ধ। তাদের মধ্যে লোকোত্তর, উদ্ভট, অস্বাভাবিক ও অতি আধুনিকের মিথ্যা আড়ম্বর নেই—তারা প্রত্যেকেই সহজ ভাবপ্রসূত এবং নিরাভরণেও অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

বৌ—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীভবন। দাম দেড় টাকা।
বিদ্রোহিণী—শশিভূষণ দাসগুপ্ত। রসচক্র সাহিত্য-সংবাদ। দাম দুই টাকা।

বাঙালী জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব। এজন্য উপন্যাসের উপকরণ তা'তে যদি বা খুঁজে পাওয়া যায়, তবু তা'র অপরিসরতা অনিবার্য্য। বলা বাহুল্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে সেই বর্ণান্ধকারী একঘেয়েমি-ও রসলোকের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। তা' হ'লেও উপকরণের অভাব সম্বন্ধে এ-দেশের সকল ঔপন্যাসিকের-ই একটা অলিখিত অভিযোগ র'য়ে গেছে। স্বল্প পরিধির মধ্যে জীবনের কোন একটি

অংশ জমাটভাবে ফুটিয়ে তুলতে ছোটো গল্প-ই সবচেয়ে কার্য্যকরী। এইজন্য, বাঙালী বিশেষ ক'রে বাঙালী লেখকের কাছে ছোটো গল্পের ক্ষেত্র যথেষ্ট উর্ব্বর। শক্তিমানের স্পর্শে এখানে সোনা ফলানো যেতে পারে।

আটটি গল্পের সন্নিবেশে প্রায় পৌণে দুশো পাতায় সম্পূর্ণ মাণিকবাবুর বর্ত্তমান বইখানি প'ড়ে শেষের কথাটি মনে হ'লো। নরনারীর চরিত্র বিশ্লেষণের যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং যে প্রতিভাসাপেক্ষ গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আমরা তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রচনায় পেয়েছি, এ বইয়েও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাঁর অবাধ গতিবিধি। তাই, দোকানী, কেরাণী, পূজারী, রাজা—লেখকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি থেকে এঁরা কেউ-ই মুক্তি পাননি। দোকানীর বৌ সরলা এবং রাজার বৌ যামিনী পাঠকের কাছে সমান প্রত্যক্ষ। অবশ্য এ কথা স্বীকার ক'রতে বাধা নেই যে তাঁর কল্পনা অধিকাংশ স্থলেই ব্যাধিগ্রস্ত, ইংরাজীতে যাকে বলে morbid,—এবং এই বই-এর মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। কিন্তু তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো অনুযোগ যে গল্পটির সম্পর্কে, তার নাম "কুষ্ঠরোগীর বৌ"। এই গল্পের সুচনায় যে আশ্চর্য্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল, এর উপসংহারে তার দুর্ব্বল পরিণতি আমাকে হতাশ ক'রেছে। যতীনের কুষ্ঠরোগ ধরা পড়ার সময় থেকে যে অদ্ভুত আবহের মধ্যে গল্প এগিয়ে চলে, সেই আবহ-সৃষ্টির ক্ষমতা আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথাই মনে করিয়ে দেবে। রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণের" মধ্যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হয় তো'র মধ্যে অথবা ইংরাজীতে Edgar Allan Poe-র রহস্যের গল্পে যে দুর্লভ শক্তির বিকাশ, মাণিকবাবুর এই গল্পটিতে তার কিছু পরিচয় আছে। কিন্তু যতীনের পাশে মহাশ্বেতা শেষ পর্য্যন্ত নিষ্প্রভ। মাণিকবাবু লিখেছেন—"সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে (কুষ্ঠরোগাক্রান্ত) আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালোবাসে।......এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ বুদ্ধির অনায়াসবোধ্য কথা।"

মহাশ্বেতা-র এই ঘৃণা এতো অস্পষ্ট যে পাঠকের চোখে পড়ে না,—তার মানসিক সংঘাতের প্রকাশও অস্পষ্ট এবং এই কারণে শেষ পর্য্যন্ত মহাশ্বেতাকে গল্পের চরিত্র ব'লে মনে হয় না;—মনে হয় শান্ত রসের একটি শাস্ত্রোক্ত প্রতীক।

দ্বিতীয় বই 'বিদ্রোহিণী' একখানি উপন্যাস। বালিগঞ্জের এক সঙ্গতিপন্ন পরিবারের বি-এ-পড়া মেয়ে মীরার কাছে পুরুষের প্রেমে স্বামিত্ববোধ অথবা অনুগ্রহ দুঃসহ। অথচ দাসগুপ্ত মহাশয় ঠিক ইব্‌সেনের ছাত্র নন। মীরার বিদ্রোহ অনাগত যৌবন ও কৈশোর-সীমান্তের মধ্যবর্ত্তী মানসিক চাঞ্চল্য হিসাবে ব্যাখ্যা করলেই বোধ হয় সহজবোধ্য হবে (যদিও তার বয়স চব্বিশ)।

ভাষা সাবলীল। ছাপা-বাঁধাই ভালো।

হরপ্রসাদ মিত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত এবং গীতা প্রচারক কার্য্যালয় হতে প্রকাশিত।

এই দুই খণ্ডে গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল, অন্বয়, বাংলা অনুবাদ ও ও বিশদ ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থকার সুপরিচিত, ধর্ম্ম ও জাতি সম্বন্ধে তাঁর একটি বিশিষ্ট চিন্তাপদ্ধতি আছে, এবং সেই পদ্ধতিই গীতার এই ব্যাখ্যায় অনুসৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে এ গ্রন্থ "শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে সম্পাদিত"। তিনি যে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা নানা গ্রন্থে প্রচার করেছেন তা সকলেই জানে, কিন্তু গীতার বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের দায়ীত্ব কতটুকু তা গ্রন্থ হতে স্পষ্ট বুঝবার উপায় নাই। গীতার নানা মামুলি ব্যাখ্যা হতে এ গ্রন্থের মূল্য অনেক বেশী, এ ব্যাখ্যায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তা নূতন, এবং নানা স্থানে যে সমস্ত সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে আমাদের জাতীয় ব্যক্তিগত জীবনে সে গুলির স্পষ্ট প্রয়োজন আছে। সুতরাং এ গ্রন্থ যে সকলেই সাদরে গ্রহণ করবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্ড্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়

৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৪৬

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা

আমরা পূর্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি, পঞ্চাগ্নি বিদ্যার দুইটি ভাগ। প্রথম ভাগে সাধকের পিতৃযান অথবা দেবযান মার্গে পরলোকে গতি এবং দ্বিতীয় ভাগে পিতৃযানীর স্বর্গভোগান্তে আবৃত্তি বা পুনর্জন্ম। পুনর্জন্মের কথা আমরা আগামী অধ্যায়ে আলোচনা করিব। সম্প্রতি ঐ পিতৃযান ও দেবযান মার্গই আমাদের আলোচ্য।

এ সম্পর্কে উপনিষদের ঋষি বলেন—সাধক দ্বিবিধ। এক গৃহস্থ সাধক—যাঁহারা গ্রামে 'ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে', এবং অন্য বাণপ্রস্থ সাধক—যাঁহারা অরণ্যে 'শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে'। প্রথম শ্রেণীর সাধকের পিতৃযান গতি হয় এবং স্বর্গে নীত হইয়া স্বর্গভোগান্তে তাঁহাদের আবৃত্তি বা পুনর্জন্ম হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক দেবযান পথে দেবলোক অতিক্রম করিয়া মহঃ জনঃ তপঃ সত্য প্রভৃতি উর্ধতন লোকে উন্নীত হন। তাঁহাদিগের আর আবৃত্তি হয় না--অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।

উভয় শ্রেণীর সাধকেরই উৎক্রমণ হয়—

তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে—তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রমতি * * তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি—বৃহ, ৪।২।২

বৃহদারণ্যক বলেন, চিতায় মৃতের শরীর অগ্নি-দগ্ধ হইলে 'পুরুষঃ ভাস্বর-বর্ণঃ সম্ভবতি' এবং সেই পুরুষ জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া পিতৃযান অথবা দেবযান পথে উর্ধলোকে উত্থিত হন।

অথ এনম্ অগ্নয়ে হরন্তি * * তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং জুহ্বতি। তস্যা আহুত্যৈ পুরুষো ভাস্বর-বর্ণঃ সংভবতি—বৃহ, ৬।২।১৪

(ভাস্বর-বর্ণঃ=দীপ্যমানশরীরঃ—রঙ্গরামানুজ)

ঐ পিতৃযান সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এই বিবৃতি করিয়াছেন ঃ—

অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্ ইত্যুপাসতে তে ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্‌রাত্রিং রাত্রেরপর পক্ষম্ অপরপক্ষাৎ যান্ ষড়্ দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্ নৈতে সংবৎসরং প্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদ্ আকাশম্ আকাশাচ্চন্দ্রমসম্। এষ সোমো রাজা তদ্দেবানাম্ অন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি।

"আর যাঁহারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন) প্রাপ্ত হন, (তাঁহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না)। মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমা—ইনি রাজা সোম। তাঁহারা দেবতাদিগের অন্ন হন, দেবতারা তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করেন।"*

পিতৃযান সম্পর্কে বৃহদারণ্যকের বিবৃতি এইরূপ—

অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি, তে ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্‌রাত্রিং রাত্রেঃ অপক্ষীয়মানপক্ষম্, অপক্ষীয়মানপক্ষাৎ যান্ ষড়্‌মাসান্ দক্ষিণা আদিত্য এতি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্ পিতৃলোকাৎ চন্দ্রম্। তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি। তান্ তত্র দেবা যথা সোমং রাজানম্ আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব ইত্যেবং এনান্ তত্র ভক্ষয়ন্তি—বৃহ, ৬।২।১৬

"আর যাঁহারা যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপের দ্বারা লোকসকল জয় করেন—তাঁহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন; ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য দক্ষিণে আসেন), মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে চন্দ্র। তাঁহারা চন্দ্রে উপস্থিত হইয়া অন্ন হন; দেবতারা যেমন রাজা সোমকে হ্রাসবৃদ্ধি সহকারে ভক্ষণ করেন, সেইরূপ তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করেন।" ইহাই পিতৃযান গতির পরিচয়।

* 'পিতৃযানী দেবতাদিগের অন্ন হন' একথার অর্থ কি? শঙ্করাচার্য মূলের ভাষ্যে এইরূপ বলিয়াছেন :—অন্নম্ ইতি উপকরণমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। ন হি তে কবলোৎক্ষেপেণ দেবৈঃ ভক্ষ্যন্তে। কিং তর্হি? উপকরণমাত্রম্ দেবানাম্ ভবন্তি তে স্ত্রী-পশু-ভৃত্যাদিবৎ। অর্থাৎ, দেবতারা যে তাঁহাদিগকে গ্রাসে গ্রাসে ভক্ষণ করেন এরূপ নহে; তবে তাঁহারা দেবতাদিগের বশবর্তী হন, ভোগ্য হন, উপকরণ হন।

দেবযান গতি সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন ঃ—

যে চেমে অরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তে অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি অর্চিষোঽহঃ অহ্ন আপূর্য্যমাণ পক্ষম্, আপূর্য্যমাণ পক্ষাদ্ যান্ ষড়্ উদঙ্ এতি মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সংবৎস্তরাদ্আদিত্যম্আদিত্যাৎচন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম-গময়তি এষ দেবযানঃ পন্থেতি।—ছা, ৫।১০।১-২

অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্বন্তি যদিচ ন, অর্চিষমেবাভিসং ভবন্তি অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্য-মাণপক্ষম্ অপূর্য্যমাণ পক্ষাদ্ যান্ ষড়্উদঙ্এতিমাসান্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাৎ আদিত্যম্আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি এষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবম্ আবর্তং নাবর্ত্তন্তে।—ছা, ৪।১৫।৫

'যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অর্চিঃ প্রাপ্ত হন ; অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয় মাস (যখন সূর্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ। এক অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান ; ইহাই দেবযান পন্থা।'

'আর এরূপ ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কেহ করুক বা নাই করুক, তিনি অর্চিঃ প্রাপ্ত হন ; অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয় মাস (যখন সূর্য উত্তরে উদিত হন), মাস হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ। এক অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান ; ইহাই দেবযান পথ। এ পথে গমনকারীকে আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।'

দেবযান সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদের বিবৃতি এইরূপ ঃ—

তে য এবমেতদ্ বিদুঃ যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে,* তে অর্চ্চিঃ অভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্যমাণ পক্ষম্, আপূর্যমান পক্ষাৎ যান্ ষড়্মাসান্ উদঙ্ আদিত্য এতি, মাসেভ্যো দেবলোকং, দেবলোকাদ্ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্। তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এতৎ ব্রহ্মলোকান্ গময়তি। তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি। এষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।—বৃহ, ৬।২।১৫

---

* যে চ অমী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে=শ্রদ্ধাপূর্বকং হিরণ্যগর্ভাখ্যং ব্রহ্ম উপাসতে—নিত্যানন্দ। শ্রদ্ধাং পুরস্কৃত্য সত্য-শব্দিতং পরমাত্মানং প্রত্যগাত্মনি উপাসতে—রঙ্গরামানুজ

'যাঁহারা বিদ্বান্, যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক সত্যকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন; অর্চ্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য উত্তরে আসেন), মাস হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে বৈদ্যুত; ঐ বৈদ্যুত-প্রাপ্ত দিগকে এক 'মানস পুরুষ' আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান (ইনিই ছান্দোগ্য উপনিষদের 'অমানব পুরুষ')। সেই ব্রহ্মলোকে তাঁহারা প্রকৃষ্ট অবস্থায় শতসংখ্যক ব্রাহ্ম সংবৎসর বসতি করেন; তাঁহাদের পুনরায় আবৃত্তি হয় না।'

বৃহদারণ্যকের অন্যত্রও দেবযানের কথা আছে।

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণঃ
মাং স্পৃষ্টো অনুবিত্তঃ ময়ৈব।
তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ
স্বর্গং লোকম্ ইত ঊর্দ্ধ্বো বিমুক্তাঃ॥
তস্মিন্ শুক্লম্ উত নীলমাহুঃ
পিঙ্গলং হরিতং লোহিতং চ।
এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তঃ
তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ॥—বৃহ, ৪।৪।৮-৯

(ঊর্দ্ধ্বঃ=ঊর্দ্ধ্বং অনন্তরম্। ব্রহ্মণা=ব্রাহ্মণেন। তেজসি শুদ্ধসত্ত্বে ভবঃ তৈজসঃ
—নিত্যানন্দ)

"এক পুরাতন অনুতম পন্থা বিস্তৃত আছে—যে পথে ব্রহ্মবিৎ দেহান্তে শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। ঐ পথ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে—আমার দ্বারা বিদিত হইয়াছে। ঐ পথে* শুক্ল নীল পিঙ্গল হরিত লোহিত জ্যোতিঃ। ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজস (শুদ্ধসত্ত্ব) ব্রাহ্মণেরা ঐ পথ জ্ঞাত আছেন।"

গীতাতেও এই পিতৃযান ও দেবযানের প্রসঙ্গ আছে। ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন :—

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভারতর্ষভ।

* তস্মিন্ অর্চিরাদিকে মার্গে শুক্লং নীলং পিঙ্গলং হরিতং লোহিতম্ ইত্যাহুঃ—'অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ (ছান্দোগ্য, ৮।৭।১)—রঙ্গরামানুজ

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়ণম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিম অন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥—গীতা, ৮।২৩-২৬

'হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! যে কালে যোগী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হয়, সেই কালের বিষয় বলিতেছি। অগ্নি, জ্যোতিঃ. দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস—তখন প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। আর ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণ ছয়মাস—তখন যোগী চন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া আবার আবর্ত্তন করেন। শুক্ল ও কৃষ্ণ—জগতের এই চিরন্তন দুই গতি; একের দ্বারা আবৃত্তি ও অন্যের দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ হয়।'

কৌষীতকী উপনিষদেও এই পিতৃযান ও দেবযানের প্রসঙ্গ আছে। ঋষি বলিতেছেন :—

যে বৈ কে চ অস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি। এতৎ বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যঃ চন্দ্রমাঃ।—কৌষী, ১।২

অর্থাৎ, যে কেহ ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হয়, সেই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়; চন্দ্রমাই স্বর্গলোকের দ্বার। ইহাই পিতৃযান। কিন্তু 'তং যঃ প্রত্যাহ তম্ অতি-সৃজতে—অর্থাৎ, যিনি স্বর্গলোক প্রত্যাখান করেন, তিনি চন্দ্রমাকে লঙ্ঘন করিয়া স্বর্গ হইতে উচ্চতর যে ব্রাহ্মাদিলোক—সেখানে উন্নীত হন।*

কোন পথে?

স এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্য-লোকং। স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকম্—কৌষীতকী, ১।৩

'তিনি এই দেবযানপথে অগ্নিলোকে গমন করেন, বায়ুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে, ব্রহ্মলোকে।'

---

* তং চন্দ্রমসং দক্ষিণমার্গাখ্যং যো অধিকারী অমানিত্বাদিগুণঃ প্রত্যাহ নিরাচষ্টে—অহম্ এতস্মিন্ সংততসংপাতে ন গমিষ্যামি ইতি তং নিরাকৃত-চন্দ্রমসম্ অতিসৃজতে, চন্দ্রমসম্ অতীত্য বিদ্যুদাদি-আতিবাহিকেষু সৃজতে উৎপাদয়তি, উপাসনা-সংকল্পো ব্রহ্মলোকং নয়তি—শংকরানন্দের দীপিকা

ঐ সকল উচ্চতর লোক লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য একস্থলে বলিয়াছেন—

দ্বাবিংশেন (অক্ষরেণ) পরম্ আদিত্যাৎ জয়তি—তৎ নাকং তৎ বিশোকম্—ছা, ২।১০।৫

'সপ্তবিধ সামের দ্বাবিংশ অক্ষর দ্বারা সাধক আদিত্যের পরপার জয় করেন—যাহা বিশোক, যাহা নাক* (Pure Bliss) ।'

মুণ্ডক উপনিষদেও এই পিতৃযান ও দেবযানের প্রসঙ্গ আছে। পিতৃযানীর স্বর্গ হইতে পতন হয়—আর যিনি দেবযানী, তিনি সূর্যদ্বারে উর্ধলোকে উন্নীত হইয়া সেই অমৃত অব্যয় পুরুষের সমীপস্থ হন।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎতেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥
ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥
তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে, শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি, যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥—মুণ্ডক, ১।২।৯-১১

"সকাম কর্মীরা মূঢ়—অবিদ্যার বহুধা বশবর্তী। তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ রাগের ফলে কর্ম করিয়া নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে কিন্তু কর্মক্ষয়ে স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। তাহারা ইষ্টাপূর্তকেই† বরিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠতম) মনে করে—অন্য শ্রেয়ের কথা জানে না। ফলে স্বর্গলোকে সুকৃতের ফলভোগান্তে এই লোকে অথবা হীনতর লোকে প্রবিষ্ট হয়। আর যাঁহারা অরণ্যে তপঃশ্রদ্ধার সাধন করেন,—যাঁহারা শান্ত বিজ্ঞ ভিক্ষাচারী—তাঁহারা রজোহীন হইয়া সূর্যদ্বারে সেই লোক প্রাপ্ত হন—যাহা অমৃত অব্যয় পুরুষের ধাম।"

প্রশ্ন-উপনিষদেও এই পিতৃযান ও দেবযানের কথা আছে। ঋষি বলিতেছেন—

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতি স্তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ। তদ্যে হ বৈতদ্ ইষ্টাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্তন্তে। তস্মাদেত ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযানঃ ॥

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্য আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে। এতদ্ বৈ প্রাণানাম্ আয়তনম্—এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ পরায়ণম্। এতস্মাৎ ন পুনঃ আবর্তন্তে ইত্যেষ নিরোধঃ—প্রশ্ন, ১ ৯-১০

---

* 'নাকম্' কি? কম্ ইতি সুখং—তস্য প্রতিষেধঃ অ-কম্। তন্ন ভবতি ইতি নাকং, কম্ এব ইত্যর্থঃ—শঙ্করাচার্য

† ইষ্টং যাগাদি শ্রৌতং কর্ম। পূর্তং বাপীকূপতড়াগাদি স্মার্তম্—শঙ্কর।

"সম্বৎসর হন প্রজাপতি—তাঁহার দুই অয়ন দক্ষিণ ও উত্তর। যাহারা ইষ্টাপূর্তরূপ কর্মমার্গের অনুসরণ করে, তাহারা চন্দ্রলোক জয় করে। তাহাদের নিশ্চিত পুনরাবৃত্তি হয়। সে জন্য যে ঋষিরা প্রজা কামনা করেন, তাঁহারা দক্ষিণ অয়ন অবলম্বন করেন। ইহাই পিতৃযান—রয়ি।

আর যাঁহারা উত্তরায়ণে তপস্যা ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা বিদ্যা দ্বারা আত্মার অন্বেষণ করেন, তাঁহাকে সূর্যকে জয় করেন। উনিই প্রাণ সমূহের আয়তন—অমৃত, অভয়, পরায়ণ। ঐ স্থান হইতে আর আবৃত্তি হয় না। ইহাই নিরোধ।"*

আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিয়া পিতৃযান ও দেবযানের 'ব্যাবর্তনা' প্রদর্শন করিলাম। ঐ সকল বচনের বিচার করিয়া উভয় যানের ভেদ এইরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে ঃ—

(১) পিতৃযানীর সাধন ইষ্টাপূর্ত ও দেবযানীর সাধন শ্রদ্ধা-তপঃ।

(২) পিতৃযানী সাধক গ্রামে থাকিয়া সাধনা করেন, অর্থাৎ তিনি গৃহস্থ; এবং দেবযানী সাধক অরণ্যে বাস করিয়া সাধনা করেন, অর্থাৎ তিনি বানপ্রস্থ।

(৩) পিতৃযানীর গম্য স্থান চন্দ্রলোক; দেবযানীর গম্য স্থান সূর্যদ্বারে উচ্চতর লোক।

এজন্য গীতা পিতৃযানীর সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ—

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি†র্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে।

দেবযানীর সম্বন্ধে ছান্দোগ্যের শেষ কথা এই ঃ—

অথ যত্রৈতৎ আত্মা শরীরাৎ নিক্রমতি অথ এতৈরেব রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধম্ আক্রমতে * * স যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ, তাবদ্ আদিত্যং গচ্ছতি—ছান্দোগ্য, ৮.৬।৫

(৪) পিতৃযানীর মার্গের পর্ব (Statious)—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণ ইত্যাদি; এবং দেবযানীর মার্গের পর্ব—অর্চ্চিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ইত্যাদি।

এই পর্বগুলি কি স্থান না স্থানী? ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ন বলেন অর্চ্চিঃ প্রভৃতি মার্গ-চিহ্ন বা ভোগ-ভূমি নহে; ইঁহারা পথ-প্রদর্শক দিব্য পুরুষ—যাঁহারা পিতৃযানী ও দেবযানীকে যথাক্রমে স্ব স্ব অধিকৃত পর্ব পার করিয়া দেন।

* শঙ্কর বলেন নিরোধের অর্থ বাধা—আদিত্যাৎ হি নিরুদ্ধা অবিদ্বাংসঃ। নৈতে সংবৎসরম্ আদিত্যম্ আত্মানং প্রাণং প্রাপ্ন বন্তি। রঙ্গরামানুজ বলেন—নিরোধ অর্থে পুনরাবৃত্তিনিরোধ। ইহাই সঙ্গত মনে হয়।

† চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ সম্ভবতঃ=Lunar form.

অতিবাহিকা স্তল্লিঙ্গাৎ।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৪-৫

অর্থাৎ, 'অর্চ্চিঃ দিবা প্রভৃতি অতিবাহিক পুরুষ।' অধ্যাপক ডয়সন্ একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন ঃ—

The meaning of the whole is that the soul on the way of the Gods (দেবযান) reaches regions of ever-increasing light, in which is concentrated all that is bright and radiant, as stations on the way to Bramhan, who is himself the 'light of lights' (Jyotisham jyotis). The Pitriyana or the way of the Fathers was next explained after the analogy of this Devayana. As every thing that was bright and radiant was directed to the latter, so to the former the counterpart of darkness and gloom—Deussen p. 335.

এ মতদ্বৈধ স্থলে বিচারের ভার পাঠকের উপর, তবে আমার মনে হয় ডয়সনের কথা অসঙ্গত নহে।

(৫) পিতৃযানী ও দেবযানীর উৎক্রান্তির প্রকারেও প্রভেদ আছে। পিতৃযানী যে-সে নাড়ী দিয়া শরীর হইতে বহির্গত হন ; কিন্তু দেবযানী মূর্ধণ্য সুষম্না নাড়ী দ্বারা সূর্য রশ্মি অবলম্বন করিয়া নির্গত হন—

'শতাধিকয়া। রশ্ম্যনুসারী ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৭-৮

শতং চৈকাচ হৃদয়স্য নাড্যঃ

তাসাং মূর্দ্ধানমভি নিঃসৃতৈকা।

তয়োর্দ্ধমায়ন্ অমৃতত্বমেতি

বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥—ছান্দোগ্য, ৮।৬।৬ ও কঠ, ৬।১৬

(৬) কিন্তু পিতৃযানী ও দেবযানীর মর্মান্তিক প্রভেদ এই যে, পিতৃযানীর স্বর্গ ভোগান্তে পুনর্জন্ম হয়—যাহাকে আবৃত্তি বলে ; কিন্তু দেবযানী 'অমৃতত্বম্ এতি' অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে অনাবৃত্তি। এই অনাবৃত্তি আত্যন্তিক না আপেক্ষিক—absolute না relative ? এ বিষয়ের আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। কিন্তু আগামী অধ্যায়ে প্রথমতঃ আমাদের পুনর্জন্ম বা আবৃত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

নাটক

অনেক গবেষণার পর নাট্যকার ঠিক করলেন তিনি তাঁর নায়িকাকে শেষ-অঙ্কে মেরে ফেল্‌বেন। চিন্তায় চিন্তায় তিনি কাটালেন কয়েকটা দিন, এবং শেষ-মেশ ঠিক হ'লো নায়িকাকে কোনো-রকমে হত্যা করতে পারলেই নাটকের চূড়ান্ত রসের স্বাদ নিতে ও সবাইকে দিতে পারবেন। তাই তিনি শেষ-অঙ্কে নায়িকাকে মেরে ফেল্‌লেন। কিন্তু যবনিকা এখানে পড়্‌লো না।

প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নাটকটি সর্ব্বসাধারণের কাছে অনেক হাততালি পেলো। নাট্যকারের তা'তে মাথা যে একটু গরম না হ'লো এমন নয়। নতুন নাট্যকারের প্রথম সাফল্যে ও-রকম একটু-আধটু হয়। কাগজেও এ নিয়ে কিছু-কিছু লেখালেখি হ'য়েছে, তাদের মতে এই নাটকের ওই অদ্ভুত পরিণতি নাট্যসাহিত্যে নাকি বিরল। নাট্যকারও চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেন, হ্যাঁ, বিরলই বটে। আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন তিনি। চেয়ারটি টেনে নিয়ে জমাট হ'য়ে ব'সে তিনি নতুন নাটকের নতুনতর পরিণতি সৃষ্টি ক'রে জনসাধারণকে নতুন ক'রে তাক্ লাগাবার দিকে মন দিলেন। কিন্তু কাজটা অত সহজ নয় বুঝলেন তিনি, তবু অবুঝ হ'তে তাঁর ভারি ভালো লাগ্‌লো। মনে মনে খুব চেষ্টা চালালেন অক্লান্তভাবে। এ-সময় তাঁর মনের অবস্থা খুব চঞ্চল হ'লো। এ-বাসায় তাঁর মন টি'ক্‌লো না, তিনি নতুন বাসার সন্ধান আরম্ভ করলেন। আর একটি নতুন নাটকও সুরু হ'য়ে গেলো—যেদিন তিনি চিত্রলেখাদের পাশের একটি ফ্ল্যাটে উঠে এলেন।

মিষ্টি মেয়ে এই চিত্রলেখা। তবে, বড্ড ঘর-কুনো আর মন-মরা। সে নাটক-ফাটক ছ্যাখে না, অত তার সখ নেই। এই নাটকের কথা সে শুনেছে অবশ্য, কিন্তু একটা মেয়েকে মেরে ফেলেছেন ব'লেই সবাই এত হাততালি দিচ্ছে কেন, সে তা ভেবে পায় না। অদ্ভুত মানুষের রুচি, চিত্রলেখা ভাবে। গল্পটা শোনার পর থেকেই সে নাটকের ও নাট্যকারের ওপর তেতে আছে। তারপর যখন সে শুন্‌লো যে তাদেরই পাশের ফ্ল্যাটে সশরীরে সেই নাট্যকারের আবির্ভাব ঘ'টেছে, তখন তার রাগের মাত্রা যেন আরো বেড়ে গেলো। ঘর-কুনো আর

মুখ-চোরা মানুষের মন বোঝা শক্ত চিত্রলেখার এই মনোভাবের কারণ বোঝা কষ্টকর।

তাকিয়ে তাকিয়ে ছাখে সে নাট্যকারের চলা-ফেরা, বিশ্রী লাগে, ভারী কুৎসিত লাগে তার। আর, বলতে বাধা নেই,—তার মনে কী-রকম যেন এক ঘৃণার ভাব জেগে ওঠে। এত বিদ্বেষের কারণ কী, চিত্রলেখা নিজেই তা জানে না। অন্যায়টা ভদ্রলোক যে কি ক'রছেন তা-ও সে বুঝিয়ে বলতে নারাজ। তবে, ভদ্রলোককে সে কোনো দিক থেকেই পছন্দ করতে পারলো না, এইটেই আসল কথা। ভদ্রলোকটিও এক নম্বরের উদাসীন, নিজেকে নিয়েই নিজে একেবারে মশগুল্। থাকবার মধ্যে আছে একটি চাকর—দারুণ অনুগত। গম্ভীর গলায় মাঝে-সাঝে নাট্যকার আদর ক'রে ডাকেন—'মহেশচন্দ্র।' কাঁধের গামছা দিয়ে প্লেট মুছতে মুছতে চাকর সমুখে এসে দাঁড়ায়, কি যেন বলে, সেটা আর শোনা যায় না। অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুলে নাট্যকার তার দিকে তাকান, বলেন, 'এসেছিস্ ?—ভাগ্ !' চিত্রলেখার কানে আওয়াজ আবছা-আবছা এসে পৌঁছয়, চাকরটা মুচকি হেসে পালায়। চিত্রলেখার গা জ্বলে! এ-যেন কী এক অদ্ভুত ধরণ।

জান্‌লায় ব'সে থাকা চিত্রলেখার বাই, দোতলার জান্‌লায়। এখান থেকে রাস্তা একটুখানি মাত্র দেখা যায়, কিন্তু নাট্যকারের ঘরের পুরোটা। নাট্যকার অবশ্য তাকে দেখ্‌তে পান্ না, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি চিত্রলেখার। ভদ্রলোকটি কোনো কারণে এদিকে একটু মুখ ফেরালেই সে টুপ্ ক'রে পর্দা টেনে দেয়। জালি-কাপড়ের পর্দা, তার এপাশ থেকে দৃষ্টি ওপাশে যায়, কিন্তু ওপারের দৃষ্টি ভেতর পর্যন্ত পৌঁছয় না, পর্দার বাইরেই আট্‌কে যায়।

চিত্রলেখা চেয়ার টেনে উল বুনতে বসে, কিংবা কুশি। ওটা তার উপলক্ষ্য কিংবা অবলম্বন। আসলে সে বাইরের দিকেই বেশি দৃষ্টি রাখে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে রোজকার। এমন-কি গভীর রাত্র পর্যন্তও চিত্রলেখা জেগে কাটায়। এ-অভ্যাস তার হালের নয়, অনেকদিনের। মন-মরা মানুষদের কাছে রাত্রিটাই বেশি উপভোগ্য—সাধারণত।

নাট্যকারের দীর্ঘ দরজাটা রাত্রে পর্দায় ঢাকা পড়ে। জানলাটা থাকে অবারিত। তার ওপাশে চেয়ার আর টেবিল, আর থাকে-থাকে বই—সব

এলোমেলো অবশ্য। কোনো কিছুই গোছগাছ করার ফুরসৎ তাঁর নেই—চাকরটাও আহাম্মক কম নয়, সে আছে সুধু ফরমাস খাটতে—মাথা চালিয়ে কাজ করতে নয়।

অনেক রাত্রে চিত্রলেখা দেখ্‌তে পায় নাট্যকারের পর্দার ওপর একটা ছায়া ধীরে ধীরে জেগে ওঠে, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'য়ে যায়, আবার জাগে—আবার মেলায়। বাতাসে পর্দার কোন একটু উড়লে দেখা যায় হাতে একটা বই নিয়ে নাট্যকার পায়চারী করছেন। পরণে ঢলঢলে আলখাল্লা। এ আবার কোন্‌-দেশী ফ্যাশান চিত্রলেখা বোঝে না। তবে, তার গায়ের মধ্যে রী-রী করে। নাটক লিখলেই যে নট সাজতে হবে তার কী মানে আছে? তার ওপর, সে আবার এমনি নাটক যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। একটা মেয়েকে মেরে ফেলেছেন। উঃ, কী প্যাথেটিক পরিণতি! চিত্রলেখা হাতের কাজ দেরাজে চালান্‌ ক'রে গালে হাত দিয়ে বসে। ঢং ঢং ক'রে রাত্তির দু'টো বেজে যায়। নাট্যকার এ দিকে পেছন দিয়ে টেবিলের সাম্নে বসেন, এই বুঝি এসে গেছে তাঁর কথার স্রোত। চিত্রলেখা একটু উঁকি দেয়। দ্যুৎ, ছাতের দিকে মাথা তুলে চেয়ারে কাঁধ বাধিয়ে তিনি ভাবতে ব'সেছেন! ব'য়ে গেছে তার আর জাগ্‌তে, টুপ ক'রে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

চিত্রলেখা একা। কেন একা, পাঠকপাঠিকা সে-কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। লেখকদের সব সময় চ্যালেঞ্জ্‌ ক'রে বস্‌লে গল্পের বাঁধন ঢিলে হ'য়ে যায়। তা'তে লোকশান আমার চেয়ে আপনাদেরই বেশি। তবে, সামান্য একটু কৈফিয়ৎ অবশ্য আছে। সে দেখতে মিষ্টি হ'লেও মুখ নাকি তার মিষ্টি নয়। তার কথার ঝাঁজে সঙ্গিসাথীরা তাই তাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু মুখ যার ঝাঁজালো, বুক তার নরম তুলতুলে হয় এটুকু সাধারণ ধারণা তাদের নেই। সুধু বাইরেটা দেখেই চম্‌কালে চল্‌বে কেন, সম্‌ঝে দেখ্‌তে হবে। তা তারা দ্যাখেনি, তারা ঠ'কেছে ও চিত্রলেখাকে ঠকিয়েছে। কিন্তু আমি, এই আখ্যায়িকার লেখক সুশীল রায়, তার ভেতরকার নরম স্বাদ পেয়ে তার কাছে একটা স্নেহে আট্‌কে প'ড়েছি—এটা অবশ্য গল্পের ভেতরকার খবর নয়।

ঘড়ির টিকটিক্‌ শব্দ শুন্‌তে শুন্‌তে সে-রাত্রে চিত্রলেখা ঘুমিয়ে পড়লো, ঘুম ভাঙলো বেলায়। জান্‌লা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো নাট্যকারের দরজা জান্‌লা বন্ধ—

উঃ, চিত্রলেখা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন! অ্যাদ্দিন বাদে তিনি তাহ'লে ঘরের বা'র হয়েছেন! ঘর-কুনো মানুষদের চিত্রলেখা এমন অপছন্দ করে! (পাঠকপাঠিকা হাস্‌বেন না)। নিচে নেমে গেলো সে, সকালের কাজকর্ম সেরে আবার ওপরে উঠে এলো। বস্‌লো জান্‌লার ধারে। কতদিন বাদে সে যেন আজ একটু মুক্ত—তার গান পেলো, কিন্তু গান সে জানে না। তাতে ক্ষতি নেই, মিন্ মিন্ ক'রে সে গাইতে আরম্ভ করলো। গতকাল সন্ধ্যায় রেডিয়োতে যে-গানটা শুনেছিলো, সেইটে। কিন্তু দূর ছাই, গলা কাঁপাতে গেলেই গলা ঘ্যাড়-ঘ্যাড় ক'রে ওঠে, কেশে কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে নিলেও পরিষ্কার হয় না! নিজের মনেই চিত্রলেখা হাসে। ডান দিকের বাড়ির বৌটা—ওরে দুষ্টু বৌ—সক্কালবেলাই বরের সাথে ফাজলামো আরম্ভ করেছে, কিচ্ছুতে টাই বাঁধ্‌তে দেবে না! আচ্ছা মেয়ে যা হোক্! এমন হাসিই হাস্‌তে পারে ও—কই, চিত্রলেখা তো কোনোদিন অমন হাস্‌তে পারে না! আবার মতি ফিরে গেলো এরি মধ্যে? বাটি বাজিয়ে বাজিয়ে ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। কী কথাটা, কি বলছে যেন? 'উড়ন-পাখায় আয় রে, বাতাস, দুধ জুড়িয়ে দে। কেঁদে কেঁদে যাদুমণির দু'চোখ ফুলেছে॥' বাঃ বেশ তো! চিত্রলেখার হাল্কা মন হঠাৎ ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো।

খবরের কাগজ এখনো দেখা হয়নি। চিত্রলেখা কাগজ নিয়ে এলো, মেঝেতেই চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়তে আরম্ভ করলো। ইস্, এখনো মহাসমারোহে? সমারোহের যে আর অন্ত নেই দেখ্‌ছি! এত লোক যাচ্ছে, একদিন গেলেও হয়, নাটকটা দেখে এলে ক্ষতি কি? দ্যুৎ নাটক, খড়-খড় শব্দে কাগজ একপাশে সরিয়ে দিয়ে সে ধড়মড় ক'রে উঠে নিচে নেমে গেলো। তার ব'লে কতো কাজ! তিনখানা টেবিল-ক্লথ, দু'টো বীক্, আর ইয়ে—কি বলে গিয়ে—যাক্‌গে! নিচে নাম্‌লো সে।

মা বললেন, 'আজ না কলেজ আছে?'

'কিসের কলেজ? নেই, যাবো না!'

'কেন?'

'এম্‌নি,—ইচ্ছে!'

তরতর ক'রে আবার ওপরে উঠে এলো। কেন যেন দেরাজ টেনে বা'র

করলো, টেবিলের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালো—কি বার আজ ? নাঃ, এখনো দু'দিন ছুটি। মা তাকে বাইরে পাঠাতে পারলে যেন বাঁচেন। এ-কথাটা অবশ্য সত্যি। রাতদিন ঘরে থাকা তাঁর পছন্দসই নয়। বাইরের বাতাস একটু নাকি শরীরের পক্ষে দরকার। মেয়েমানুষ হ'লেই মহাভারত অশুদ্ধ হয় না—তাদেরও বাইরে বেরোনো দরকার—এই তাঁর মত।

তা তো হ'লো, কিন্তু চিত্রলেখা তো সারা ছুটিটা কুঁড়েমি ক'রেই কাটিয়ে দিলো—পড়াশুনা তো মোটেই করলো না। বজ্রাঘাত হ'লো যেন মাথায়, ভাগ্যিস্ মা মনে ক'রে দিলেন! দূ্যৎ, উল আর দূ্যৎ ক্রুচেট! ওইগুলো সময় নষ্ট করার মূল!

চিত্রলেখা বই নিয়ে বস্‌লো।

আজ সে পর্দা টেনে সরিয়ে বুক ভ'রে বাইরের বাতাস নিলো।

এই তো এক বিদেশী নাটক তার হাতে। এতে একবিন্দু হত্যা নেই, তবু রসের কম্‌তি কোথায় ? এ-নাটকের নাম তো যথেষ্ট! হত্যার নাটক, আত্ম-হত্যার নাটকও সে অবশ্য প'ড়েছে, তবে সে অমন নিষ্ঠুর হত্যার গল্প কোথাও পায় নি! (টীকা। সদাশয় হত্যার সংবাদ লেখকের জানা নেই)। একটা মেয়েকে নাকি পিষে মেরে ফেলা হ'য়েছে, বুকে চেপে! অদ্ভুত! চিত্রলেখা নাট্যকারের বন্ধ দরজার দিকে তাকালো। দরজা যে আর খোলার নামটি নেই, মহেশচন্দ্রও বুঝি সঙ্গদোষে নাট্যকার হ'য়ে গেছে। সেও বেরিয়েছে বুঝি।

বিকেলের দিকে দরজা খুললো, মুখে চুরুট নাট্যকার রেলিঙে এসে দাঁড়ালেন। চিত্রলেখা ভালো ক'রে নাট্যকারের আপাদমস্তক দেখ্‌তে লাগলো। উঁহু, নামটাই আছে—চমকপ্রদ কিছু নেই চেহারায়। এমন কি শ্রদ্ধা পাবার মতো বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই সর্ব্বাঙ্গে! কিন্তু চিত্রলেখার নাকটটি দেখার একটু সখ হ'লো। সখ ঠিক নয়, কৌতূহল। যা নিয়ে এত হৈ চৈ, সে ব্যাপারটা কি—স্বচক্ষে সে দেখ্‌বে ভাবলো।

কিন্তু দেখ্‌তে তাকে যেতে হ'লো না। এক অপ্রত্যাশিত সন্ধ্যায় তারি ঘরে দু'টা গানের পরে ঘোষিত হ'লো এবার নাটকটি আরম্ভ হবে। বটে ? চিত্রলেখার বড় হাসি পেলো। কই, কাগজে সে লক্ষ্য করেনি তো! তাড়াতাড়ি কাগজ খুলে সে দেখ্‌লো—সত্যিই তাই, নাট্যকারের নাটক অভিনীত হবারই কথা

আছে। কাঠের চেয়ার ছেড়ে চিত্রলেখা ইজিচেয়ার টেনে আন্‌লো জান্‌লার কাছে, আরাম ক'রে বস্‌লো, ঘরের বাতি দিলো নিভিয়ে।

নাট্যকার রেলিঙে এসে দাঁড়ালেন। তিনি হয়তো নাটক শোনবার মতলব ক'রেছেন, কিন্তু নিজের ঘরে কল নেই, চিত্রলেখার ঘরের আওয়াজটার ওপরই নির্ভর করছেন। জান্‌লা অবারিত খুলে, পর্দা সরিয়ে চিত্রলেখা অন্ধকার ঘরে ব'সে নাটক শুনতে লাগ্‌লো।

নায়ক আর নায়িকা। দু'জন দু'জনকে ছেলেবেলা থেকে জানে শোনে। ভালোবাসে। যৌবন এলো, ভালোবাসা গাঢ় হ'লো। ভালবাসা নিয়ে বাধলো দ্বন্দ্ব। কে বেশী ভালোবাসে, কে কতটা ভালোবাসে তারি পরিমাণ মাপামাপি নিয়ে বচসা। না, বচসা ঠিক নয়, কলহ। না, কলহও বলা চলে না—উপযুক্ত কথাটা চিত্রলেখার মনে আসচে না। যাই হোক্, দু'জনের মধ্যের এই ভালবাসার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনটে অঙ্ক শেষ হ'য়ে গেলো! একেবারে মামুলি প্লট, একটুও নতুনত্ব চিত্রলেখা পেলো না। সে কানে শুনছে নাটক, আর চোখে দেখ্‌ছে নাট্যকারকে। আহা বেচারা! ভদ্রলোকটি যেন দাপাদাপি ক'রে ঘর-বার করছেন! নিজের জিনিষকে মানুষ এমন অন্ধ চোখেই দেখে! নইলে, এই নাটকের জন্য নাট্যকারের অত চঞ্চল হবার মানে হয় না।

তারপর আরম্ভ হ'লো শেষ অঙ্ক। চিত্রলেখা হত্যার দৃশ্যটি শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে কান খাড়া ক'রে বস্‌লো। দৃশ্যের পর দৃশ্য পেরিয়ে শোচনীয় জায়গায় এসে নাটকটি ঠেকেছে। নায়ক প্রাণপণে ভালবাসছে নায়িকাকে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে সে নায়িকাকে আলিঙ্গন ক'রেছে। (হাসি পাচ্ছে চিত্রলেখার)। উঃ, নায়কের কি দারুণ হুঙ্কার! হঠাৎ সব থাম্‌লো! ওদিকে নাট্যকার স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে একটু একটু শব্দ পাওয়া গেলো, নায়ক ডাকছে নায়িকাকে, সাড়া পাচ্ছে না। একি, নায়িকা ম'রে গেল নাকি? আতঙ্কে পাংশু হ'য়ে নায়ক চীৎকার ক'রে ডেকে উঠ্‌লো : 'মা-ধু-রী!' নাট্যকার চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন : 'মহেশ,—জল!'

এতদিনে জিনিষটা চিত্রলেখার কাছে জল হ'য়ে গেলো। এই ব্যাপার! সে ভেবেছিলো কী না কী! নাট্যকার ঘরে পায়চারী করছেন, পায়চারী ঠিক নয়, ওকে বলা যায় ছুটাছুটি! এই নাটকেই এত বাহাদুরী? হায় রে অদৃষ্ট!

চিত্রলেখাও উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল খেলো। তার গলা থেকে নাটকটা নেমে গেলো যেন।

চিত্রলেখার মনে হ'লো, নাট্যকার নিশ্চয় মেয়েদের বিদ্রূপ ক'রে এই নাটক লিখেছেন। নইলে, কোনো মেয়ে কক্‌খনো কোনো ছেলেকে 'কতখানি ভালো-বাসো' 'কতখানি ভালোবাসো' ব'লে পাগল ক'রে তোলে নাকি? ঠিক হয়েছে নায়িকার, যেমন পাকামি, নায়কও তেমনি উচিত শিক্ষাটি দিয়ে দিয়েছে—ঠিক হয়েছে! আর জীবনে তা'কে ভালোবাসার নামটি করতে হবে না। কিন্তু তক্ষুণি তার মনে পড়লো এ-তো সত্যি সত্যি কোনো মেয়ে বলতে যায় নি, নাট্যকার এটা নিজের মাথা থেকে বের ক'রেছেন। অম্‌নি তার সব আক্রোশ গিয়ে পড়লো নাট্যকারের ওপর। ইচ্ছে হ'লো, ছুটে গিয়ে কড়া ক'রে কতক-গুলো কথা সে শুনিয়ে দিয়ে আসে, কিন্তু সে তো আর তাঁর নায়িকার মত অমন বেহায়া নয়। সে চুপ ক'রো বস্‌লো। তবে, ঝাঁজালো ক'রে একটা চিঠি দিলে মন্দ হয় না। বোকা মানুষের ওতেও অহঙ্কার বাড়ে।

দেখি! আচ্ছা ফাজিল তো বৌ-টা! চিত্রলেখা জান্‌লায় দাঁড়ালো। ভদ্রলোকটিও কম ফাজিল নয়! ঘরে আলো জ্বেলে অমন রসিকতা করে, ওদের কি বুদ্ধি নেই। দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না, তবু সে একটু উঁকি না দিয়ে পারে না। বেশ আছে হু'টি! চিত্রলেখা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

নাট্যকারেরও হয়ত অম্‌নি একটি মাধুরী দেবী আছেন—কিছুই বিচিত্র নয়। মেয়েটার বরাৎ! মেয়েটা আর মানুষ পেলে না বুঝি?

চিত্রলেখার মনটা কেন যেন তেতো হ'য়ে গেলো। সে শুয়ে পড়লো বিছানায়। আর আহত সাপের মতো মাঝে মাঝে নাট্যকারের ওপর, না, নিজের ওপর রুখে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

শুয়ে শুয়ে কারো ওপর কোনোরকম আক্রোশ না রেখে সে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে চেষ্টা করলো। আচ্ছা, নাট্যকার অমন ছুটোছুটি করছিলেন কেন? তাঁর জীবনে কি ও-রকম কোনো দুর্ঘটনা ঘ'টেছে নাকি? তাঁর প্রবল ভালো-বাসা পেয়ে কোনো মেয়ের শোচনীয় মৃত্যু ঘটার পরই কি তিনি এমন একটা প্লট খাড়া ক'রে সেই দুর্ঘটনাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন? তা যদি হয়, তবে সে নিতান্ত দুঃখের কথা। পর মুহূর্তেই তার মত আবার গেলো বদ্‌লে।

দূর, তা কি কখনো হয় ? এটা খেয়ালের বশে কুৎসিত ক'রে তিনি মেয়েদের চরিত্র এঁকেছেন। চিত্রলেখা উঠ্‌লো। বাজে সময় নষ্ট আর নয়, এবার সে পড়তে বস্‌বে।

আলো জ্বেলে সে পড়তে বস্‌লো, কিন্তু ওকি ? নাট্যকারের ঘর অন্ধকার। তিনি রাত ক'রে বেরিয়ে গেছেন বুঝি ? খেয়ালের অন্ত নেই। বই খুলে চিত্রলেখা পড়তে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। মনে মনে নাট্যকারের ওপর সে ফুল্‌তে লাগ্‌লো। অদ্ভুত লোক যা হোক্‌!

পড়ার চেষ্টা শেষ ক'রে, খাওয়া-দাওয়া সেরে সে অনেক রাত্রে ওপরে এলো। এখনো ও-ফ্লাটের আলো জ্বলেনি। মনিবের সঙ্গে সঙ্গে চাকরটাও বুঝি আড্ডা মারতে বেরোয় ? আচ্ছা জুটেছে ছু'টি! নাঃ, ওদেরও ঘর অন্ধকার। দুষ্টু বৌটিও ঘুমিয়ে পড়েছে। চিত্রলেখা এখন ভীষণ একা! কি ক'রে যে সে সময় কাটাবে, তা সে ভেবে পেলো না, ঘুমও পাচ্ছে না তার। এত অল্প রাতে সে ঘুমাতে ভালোবাসে না। রোজ কলেজে যাচ্ছে বটে, সঙ্গে সঙ্গে রাতও জাগছে সে—এটা তার চিরকেলে অভ্যেস।

ব'সে ব'সে সে যা-তা কথা ভাবতে আরম্ভ করলো, অনেক সময় অপব্যয় করলো। রাত ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, হঠাৎ, 'মহেশচন্দ্র!'

চিত্রলেখা টেবিলের ওপর থেকে মাথা তুলে তাকালো : নাট্যকার ফিরেছেন, রাত ছু'টো। এর মানে ? এতক্ষণ উনি ছিলেন কোথায় ? রাত্রি গভীর ক'রে না ফিরলে বুঝি নাট্যকার হওয়া যায় না ? এতে পাড়ার লোকে বলে কি ? চিত্রলেখার বড় রাগ হয়, সে ঘরে পায়চারী করে, এবার সে ঘুমাবে ঠিক করেছে —তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। মাথা ধরবে নাকি আবার, দেরাজ খুলে একটা ভেরামন খেলো। নাঃ, কিন্তু তার ভালো লাগছে না কেন যেন! চারদিকে তার ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে। অসুখ-বিসুখ করবে না তো ?

নাট্যকার পড়ার টেবিলে খাবার খাচ্ছেন। কোন কিছুর যদি নিয়ম থাকে! সবই অদ্ভুত! কি-যে ভাবেন আর কি-যে করেন তার কিছু বোঝা যায় না! এত রাত্তির ক'রে ফিরলে মানুষের ঘৃণা তাঁর ওপর বাড়বে, না, কমবে ? বিতৃষ্ণায় চিত্রলেখার সমস্ত শরীর কাঁপে। কিন্তু ও কি ? চিত্রলেখা উঁকি

দিয়ে দেখলো। মহেশটা আচ্ছা নির্বোধ তো। খাবার দিয়েছে, এক গ্লাস জল দিতে পারে নি ?

যাক্‌গে। সে শুলো। তার শরীর এখন বিশ্রাম চায়। কিন্তু শুয়েও তার ঘুম আসচে না। কই, তার মনের অবস্থা এত খারাপ তো কোন দিন হয়নি ? আজ এমন হ'লো কেন ? সে উঠলো, দাঁড়াল গিয়ে জানলায়। চারদিক অন্ধকার। একা চিত্রলেখা জেগে !

তারপর কখন সে শুয়েছে, কখন ঘুমিয়েছে তার মনে নেই। মা দরজা ধাক্কা দিয়ে যখন তাকে তুললেন তখন বেলা অনেক। কলেজেরও সময় প্রায় হ'য়ে এসেছে। কিন্তু সে নাকি কলেজ যাবে না—তার শরীর খুব খারাপ। শুভ।

মা নেমে গেলেন।

'মহেশ, মহেশ !'

ডাক শুনে চিত্রলেখা তাকালো। সে কি ? ও-ফ্ল্যাটের জিনিষপত্র ঘরের মেঝেয় স্তূপ করা। মহেশটা বাঁধা-ছাঁদা করছে। এর হেতু ? আবার চল্‌লেন নাকি ? কিছুক্ষণ দেখে শুনে চিত্রলেখা বুঝলো, সত্যিই তাই। যদি চ'লে যেতেই হবে, তবে মিছি মিছি আসা কেন ? এই বাউণ্ডুলে-বৃত্তি না রাখ্‌লে কি ওঁর চলে না ?

চিত্রলেখা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। নিচে যেতে তার ইচ্ছে হ'লো না এখন। মহেশ জিনিষপত্র মাথায় ক'রে নিচে যাচ্ছে আর আস্‌চে। নিচে হয়ত গাড়ি আছে, এখান থেকে দেখা যায় না। অবশেষে নাট্যকার ঘরের চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে ছড়ি হাতে নেমে গেলেন।

অনড় দাঁড়িয়ে রইলো চিত্রলেখা। তার সমস্ত শরীর ভীষণ ভারী হ'য়ে উঠলো। তার মাথা নতুন ক'রে ঝিমঝিম করছে। ও-বাড়ির বৌটা গালে হাত দিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে—ভদ্রলোক বেরিয়ে গেছেন নিশ্চয়। চিত্রলেখার এখন কি কি যেন কাজ আছে ? সব তার ভুল হ'য়ে যাচ্ছে। নাঃ, সে কিছু বুঝতে পারলো না। সব যেন কেমন কেমন হ'য়ে গেলো। ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় নাট্যকারের ওপর সে জ্বল্‌তে লাগ্‌লো।

সুশীল রায়

রেণে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ

অমরাবতী

যেমন গান্ধারে, তেমনি দাক্ষিণাত্যে, কৃষ্ণানদীর নিম্নতীরস্থিত অমরাবতীতে সেই সময়েই বৌদ্ধধর্ম আর একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকম শিল্পকলার প্রেরণা দান করেছিল। অমরাবতীর স্তূপের গোড়াপত্তন মৌর্য যুগে হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু তার কারুকার্য সমাধা হয়েছে সম্ভবতঃ ২০০ খৃঃর দিকে (?)।

অমরাবতীর সংজ্ঞা এইরূপ নির্দিষ্ট করা যেতে পারে ; যেখানে ভর্হুত সাঁচি গান্ধারের নিপুণতা আয়ত্ত করেছে, অথচ সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবাপন্ন রয়ে গেছে,— তাকেই বলে অমরাবতী।

এই স্বদেশীভাব রক্ষিত হবার কারণ সম্ভবত ভৌগোলিক। গান্ধারের মত একটি সীমান্ত প্রদেশে, প্রায় ভারতবর্ষের বাইরে, গ্রীক প্রভাব পতিত হলে তার ভারসাম্যবিধান করবার মত কিছু থাকেনা। সেই একই প্রভাব দ্রাবিড় দেশের মধ্যে, একেবারে তামিল তেলুগু প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে অনুভূত হলে, তাকে মধ্যস্থতা মানতে হয়, পরিবেশের সঙ্গে বনিয়ে নিতে হয়, স্বদেশী হতে হয়। অনেক হিসেবে অমরাবতী কেবলমাত্র ভারতীয়-গ্রীক সমন্বয় নয়, পরন্তু দ্রাবিড় আলেকজান্দ্রীয় সমন্বয়। বিশেষতঃ তার নগ্নমূর্তিতে যেমন গ্রীক শারীরবিদ্যা প্রকাশ পায়, তেমনি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অভ্যাসও পরিলক্ষিত হয় ; যেমন গান্ধারীয় গাত্রবস্ত্র পার্শ্ববর্তী পামিরের জলবায়ু সূচিত করে।

তাছাড়া গান্ধারের শিক্ষা (অথবা সমুদ্রপথে আগত কোনপ্রকার আলেক্-জান্দ্রীয়-রোমক প্রভাব) অন্যথা বেশবিন্যাসেও অনুমিত হয় (যথা—অমরাবতীর ছিন্নমস্তবুদ্ধ, মাদ্রাজ যাদুঘরে দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু গান্ধারের অমন নির্বিকার শিল্পকলার এখানে এসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। খর্বাকার স্থূল মূর্তি ও গুরুভার আচ্ছাদনের পরিবর্তে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই তনিমা ও মহিমাপূর্ণ দীর্ঘাকৃতি নমনীয় নগ্নদেহ, যার মধ্যে প্রাণের একটি তপ্ত ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বিরাজমান (মাদ্রাজের যাদুঘরে দুটি

তরুণীর সঙ্গে কথোপকথনরত অশ্বারোহী পুরুষ, এবং স্তূপের প্রস্তরভিত্তির উপরিভাগে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান সুন্দর মূর্তিগুলি দ্রষ্টব্য)। অপরপক্ষে সাঁচির সম্পূর্ণ স্বভাবানুগত শিল্পকলা একটি উচ্চতর প্রভাববশে আধ্যাত্মিকতা লাভ করেছে। সে প্রভাবে মনুষ্যজীবনকে নিজের ঊর্ধ স্তরে তুলে ধরে, এবং সমগ্র-চিত্রে একটি আবেগপূর্ণ গতি সঞ্চার করে (মাদ্রাজের যাদুঘরে মার-কন্যাদের মূর্তি, হাতীর বশ্যতা স্বীকার, রাহুলের পরিচয় প্রদান ইত্যাদির বৃত্তচিত্র দ্রষ্টব্য)।

এই সকল গুণবশত অমরাবতীতে পরবর্তী গুপ্তযুগের সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাঁদের চারুশিল্পের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

গুপ্তসাম্রাজ্য

যে মগধপ্রদেশ (দক্ষিণ বিহার) কিছুকাল আগে মৌর্যবংশ নামক প্রথম ভারতীয় সাম্রাজ্যের জন্মদান করেছিল, বর্তমানকালের প্রথম তিন শতাব্দী যাবৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে তার আর বিশেষ কোন প্রতিপত্তি অবশিষ্ট ছিলনা। তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ হল একটি স্বজাতীয় নব মহাবংশের অভ্যুদয়ে। তার নাম গুপ্তবংশ। তার রাজত্বকাল অনুমান ৩১৮-৩২০ থেকে ৫৩৫ পর্যন্ত, এবং তার দ্বারা মৌর্যসাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপিত হয়।

মহাপ্রতাপশালী গুপ্তরাজগণের মধ্যে প্রথম ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৩০-র দিকে)। তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল সমস্ত গাঙ্গেয় প্রদেশে (বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা ও দোয়াব) এবং পাটলিপুত্র (পাটনা) ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর ছেলে সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০—৩৮০-র দিকে) দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধাভিযান করেন ; তার ফলে তিনি ভারতীয় উপদ্বীপবাসীদের কাছ থেকে কর আদায় করেন, বিশেষত কর্ণাটের পল্লব জাতির কাছে। উত্তরাঞ্চলে তাঁর আধিপত্য নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কিন্তু সিন্ধু প্রদেশকে স্পর্শ করেনি। ভারতের বাইরে ৩৬০-র দিকে সিংহলরাজ মেঘবর্ণ তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, যিনি তারপর রাজত্ব করেন (৩৮০-৪১৫-র দিকে), তিনি ৩৮৮ ও ৪০১-এর মধ্যে ক্ষত্রপদের যে শকরাজ্য আত্মসাৎ করেন,—মালব, গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড় (সুরাষ্ট্র) তার অন্তর্গত। অনন্তর তিনি তাঁর রাজসভা পাটলিপুত্র থেকে অযোধ্যায় ও যমুনাতীরস্থ কৌশাম্বীতে স্থানান্তরিত করেন ; কারণ এত

বিস্তৃত রাজ্য পরিচালনা করবার পক্ষে এই সহরগুলির অবস্থান ছিল বেশি উপযোগী। বিক্রমাদিত্য নামে তিনি ভারতীয় কিম্বদন্তীতে বিখ্যাত। গুপ্ত সাম্রাজ্য তার চূড়ান্ত গরিমার শিখরে ওঠে কুমারগুপ্তের অধীনে (৪১৫—৪৫৫-র দিকে)। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের শেষাশেষি নাগাদ (৪৫৫—৪৬৭) তার অধোগতির সূত্রপাত হয়, ও তিনি হূণদের প্রথম আক্রমণ দেখে যান।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বোধহয় গুপ্তযুগই উজ্জ্বলতম অধ্যায়। সাহিত্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এবং সমুদ্রগুপ্তের কালে—অন্তত পেরি সাহেবের নব্য যুগনির্ণয় প্রচেষ্টার মতানুসারে (৩০০—৩৫০-এর দিকে ?) —অসঙ্গ ও বসুবন্ধু নামক দুই বৌদ্ধ মহাদার্শনিক জীবিত ছিলেন, যাঁরা বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার নামক মহাযানী আদর্শবাদের প্রবর্তক। এমন কি বসুবন্ধু সমুদ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন ব'লে প্রবাদ আছে। অপরদিকে মাঁস-উর্সেল সাহেব ৩৫০ থেকে ৪০০-র মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কালে ফেলেন ব্রহ্ম (বা বেদান্ত) সূত্র। সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ যে অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়, এটি তারই দার্শনিক ব্যাখ্যার সূত্রাকার। অতঃপর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের কালে মহাকবি কালিদাস লিখেছিলেন অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও বিক্রমোর্বশী নামক তাঁর অমরনাট্য, মালবিকাগ্নিমিত্র নামক তাঁর প্রণয়ঘটিত মিলনান্ত নাটক, এবং মেঘদূত নামক তাঁর সুমধুর কল্পনাপ্রবল কাব্য। সম্ভবত মালব ছিল তাঁর দেশ, এবং তিনি বাস করতেন উজ্জয়িনীতে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কালিদাস তাঁর এই রচনার একস্থানে রাজা স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক ৪৫৫-এ হূণদের পরাজয়ের উল্লেখ করেছেন ব'লে স্পষ্টই মনে হয়। উপরন্তু ভারতবর্ষের অপর মহা নাট্যকারকেও গুপ্তযুগে স্থাপন করা যায়, অর্থাৎ শূদ্রক, যিনি মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা (ষষ্ঠ শতাব্দী ?) এবং দণ্ডিন, যিনি দশকুমারচরিত নামক উপন্যাস রচনা করেছিলেন (ষষ্ঠ শতাব্দী)।

আমরা গুপ্তযুগের ভারতবর্ষের একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাই, চীনা বৌদ্ধ ফা-হিয়ানের কাছ থেকে, যিনি ৩৯৯-এ পুণ্যভূমি মগধে তীর্থ করতে আসেন। মধ্য আসিয়ার পথ দিয়ে এসে (টুয়েন-হুয়াং ও হোটান), তিনি গান্ধার ও গাঙ্গেয় প্রদেশে ছয় বৎসর কাল অবস্থান করেন (তন্মধ্যে তিন বৎসর পাটলিপুত্রে

কাটে)। অনন্তর তিনি তাম্রলিপ্ত (তমলুক) থেকে জাহাজে ক'রে সিংহল রওনা হন ও সেখানে দুই বৎসর থাকেন। তিনি সমুদ্রপথে চীনদেশে প্রত্যাগত হন মধ্যে একবার জাভায় যাত্রাভঙ্গ ক'রে (৪১২—৪১৩)। তাঁর বিবরণে প্রমাণ পাওয়া যায় যে যদিও গুপ্তগণ সাধারণতঃ বৈষ্ণব ছিলেন, তবু তাঁদের সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি কিছু কম ছিল না।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্ণ অভ্যুদয়ের মধ্যেই তার উপর একটি ভীষণ উপদ্রব এসে পড়ল—হূণ হেফথালীট বা শ্বেত হূণদের আক্রমণ (সংস্কৃত : হূণ ;—চীনে : যে-টা)। এই বর্বর জাতি সম্ভবত আদিতে মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী ছিল, পরে ৩৮৫ ও ৪২০-র মধ্যে ট্র্যান্সক্সিয়ানা এবং ৪২৫-এর দিকে ব্যাক্ট্রিয়া অধিকার করে, ও পরে পারস্য সাসানীড সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। বাহ্রাম গুর কর্তৃক সেদিকে পরাস্ত হয়ে (৪২৮) তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, কিন্তু স্কন্দগুপ্ত দ্বারা বিতাড়িত হয় (৪৫৪-এর দিকে)। তারা অন্ততঃ ব্যাক্ট্রিয়াতে রয়ে গেল ও সেখানে বামিয়ানে তাদের দলবল আস্তানা গাড়লে (প্রাচীন বাদঘীস্)। কুশান বংশের শেষ বংশধরগণ সম্ভবত সাসানীড আধিপত্যের অধীনে তখন পর্যন্ত এই সকল প্রদেশ বা তার কতকাংশ রক্ষা করেছিলেন ;—তাঁরা আশ্রয় নিলেন প্রথমে গান্ধারে, পরে গিল্‌গিটে। সাসানীডগণ পুনরায় এই ঝড়ের ঝাপ্‌টা ভারতবর্ষ থেকে অন্যত্র ফেরালেন, কারণ তারা ব্যাক্ট্রিয়ার অধিকার নিয়ে হূণদের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে। কিন্তু ৪৮৪তে বর্বরগণ কর্তৃক বাহ্লের পূর্ব্বদিকে সাসানীড রাজ পেরোজ পরাজিত ও নিহত হলেন। তখন তারা ব্যাক্ট্রিয়ার দখল পেয়ে এবং পারস্য আতঙ্ক থেকে মুক্তি লাভ ক'রে তাদের সমস্ত শক্তি ভারতবর্ষের প্রতি প্রয়োগ করবার সুযোগ পেলে,—যে-ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের বিলক্ষণ লোভ ছিল। তাদের সর্দার তোরমাণা (৫০২-এর দিকে ?) ও পরে তার পুত্র দুর্ধর্ষ মিহিরকুল (৫০২-৫৪২ ?) সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ অধিকার ক'রে নিল। পঞ্জাব দেশস্থ শাকল (শিয়ালকোট) ছিল তাদের দলবলের আস্তানা। এখান থেকে মালবের অভ্যন্তর পর্যন্ত তারা ছারখার ক'রে দিতে লাগ্‌ল (৪৯২-৫০০)। অবশেষে ৫২৮-এর দিকে মুলতানের নিকটস্থ কাহরোরে উজ্জয়িনী রাজ যশোধর্মন কর্তৃক মিহিরকুল পরাজিত হন। এই মহৎ কার্যের জন্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় তিনি অপর এক "বিক্রমাদিত্য" নামে খ্যাত হলেন।

হূণরাজ অতঃপর কাশ্মীরে প্রস্থান করেন, এবং প্রায় ৫৬৫ পর্য্যন্ত সে দেশ তাঁদের হস্তগত থাকে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁর আক্রোশ বেশি ছিল ব'লে শোনা যায়। বিশেষত গান্ধারের বৌদ্ধগণ তাঁর জয়যাত্রার পর আর মাথা তুলতে পারেনি, ও তাদের ভাস্কর্যের কেন্দ্রগুলি চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে গেল।

তাঁর পরে হেপ্‌থালীটগণ মগ্‌ডিরিয়ানা ও ব্যাক্‌ট্রিয়া অধিকার ক'রে রইল, যতদিন না ৫৬৬-র দিকে তুর্কী ও সাসানীডগণ কর্ত্তৃক সেগুলি বিনষ্ট হয়; এবং অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উত্তর পশ্চিমের ভারতীয় প্রদেশগুলিও তাদের অধীন রইল। কিন্তু ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশে তারা আর ভীতি সঞ্চার করত না। অপর পক্ষে গুর্জর নামক যে এক অজ্ঞাতকুল গোষ্ঠী তাদের আক্রমণের সঙ্গে মিলিত ছিল, যারা বর্তমান রাজপুতদের একাংশের পূর্ব পুরুষ, তারা রাজপুতানায় বসবাস করতে লাগল, এবং হিন্দু সভ্যতার আচারব্যবহার গ্রহণ করলে। ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ অবশেষে তাদের সদলবলে ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত ক'রে নিলে।

গুপ্ত সাম্রাজ্য হূণ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। সে বংশের দুটি শাখা রাজত্ব করতে লাগল বটে,—একটি মগধে এবং অপরটি মালবে,—কিন্তু তাদের ক্ষমতাও ছিল না, গৌরবও ছিল না। সামন্ত রাজ্যগুলি ক্রমশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতে লাগ্‌ল। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিল বলভী রাজ্য। সেটি ৪৯৫-র দিকে ক্যাথিয়াবাড় ও গুজরাটে মৈত্রক বংশ দ্বারা স্থাপিত হয়। তারা সম্ভবত ইরাণী বংশোদ্ভূত। এই বংশের প্রথম প্রতিনিধি ভটার্ক হূণদের সঙ্গে যুদ্ধে বীরত্বপ্রদর্শনের জন্য প্রসিদ্ধ। বলভী রাজ্য পূর্বভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল, এবং কতকগুলি মেধাবী রাজার অধীনে ৪৯৫ থেকে ৭৬৬ বা ৭৭০ পর্যন্ত বর্তমান ছিল; সে রাজাদের প্রায় সকলেরই নাম ছিল ধরসেন, ধ্রুবসেন বা খারগ্রহ। হয় কোন একটি আরব আক্রমণের ফলে, নয় চালুক্য নামক গুর্জর বা "রাজপুত" গোষ্ঠী দ্বারা উক্ত রাজ্য ৭৭০-এ বিধ্বস্ত হয়। এই আকস্মিক বিপ্লবের পরে চালুক্য বংশের কোন শাখা বলভী রাজগণের স্থান অধিকার করে।

হর্ষ শিলাদিত্য। হিউয়েনৎ-সাঙের তীর্থযাত্রা

এই সকল ভাগবাঁটোয়ারার মধ্যে থেকে শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি রাজ্য প্রাধান্য লাভ করেছিল, সেটি হচ্ছে যমুনার দক্ষিণ তীরস্থ থানেশ্বর (স্থানীশ্বর, স্থানেশ্বর)। সিন্ধু প্রদেশে সর্বদা অধিষ্ঠিত হূণ বাহিনীর বিরুদ্ধে দোয়াবকে রক্ষা করবার জন্য এটি একপ্রকার যুদ্ধসীমান্তের কাজ করত। সুতরাং থানেশ্বরের রাজাগণ বংশানুক্রমে বীরপুরুষ ও যোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রভাকরবর্ধন নামে একজন (৬০৫) বহুযুদ্ধে বারম্বার হূণদের পরাস্ত ক'রে নিজের জমিদারীকে একটি পাকা রাজ্যে পরিণত করে নিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন। তিনি মালবরাজকে পরাস্ত করলেন, যিনি ইতিপূর্ব্বে তাঁর ভগ্নীপতি কান্যকুব্জের রাজাকে মেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বঙ্গদেশের এক রাজা কর্তৃক নিহত হলেন। তাঁর ছোট ভাই হর্ষ বা হর্ষবর্ধন—যিনি শিলাদিত্য নামেই বেশি পরিচিত—৬০৬-য়ে সিংহাসনে আরূঢ় হলেন। হত্যাকারীর বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে হর্ষ কনোজ অধিকার করলেন এবং সেখানেই রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজাই তখন তাঁর আধিপত্য স্বীকার করেছিল ব'লে বোধ হয়,—কেউ কেউ স্বেচ্ছায়, যেমন মগধের গুপ্তগণ ও কামরূপের (আসামের) রাজা; অপরাপর কেউ অস্ত্রবলে বাধ্য হ'য়ে, যেমন বলভীর দ্বিতীয় ধ্রুবসেন ও মধ্যবঙ্গ এবং মালবের ভিন্ন ভিন্ন সামন্তরাজগণ। হর্ষ কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যেই বাধাপ্রাপ্ত হন, যখন তিনি মহারাষ্ট্র পর্যন্ত জয়যাত্রা বিস্তার করতে মনস্থ করেন। প্রবলপরাক্রান্ত চালুক্য বংশের দ্বিতীয় পুলকেশিন নামক মহারাষ্ট্রের রাজা সম্পূর্ণভাবে তাঁর গতিরোধ করেন।

হর্ষ ছিলেন ভারতীয় সাহিত্যের একটি প্রসিদ্ধতম পৃষ্ঠপোষক। কথাকার বাণ (এবং ময়ূর কবি) তাঁর রাজসভায় থাকতেন, ও তাঁর সম্মানার্থে হর্ষচরিত রচনা করেন। হর্ষ নিজেও অনেকগুলি নাটকের রচয়িতা ব'লে খ্যাত,—প্রধানত রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা ও নাগানন্দ।

ধর্মের দিক থেকে হর্ষ মহাযানপন্থী বিশিষ্ট ভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন। হিউয়েন-ৎ-সাঙের বিবরণ থেকে তাঁর এ সম্বন্ধীয় মনোভাব আমরা ভালরূপেই জানতে

পাই। এই বিখ্যাত চীনা তীর্থযাত্রী গোবি ও তুর্কিস্থানের পথ দিয়ে ৬২৯-এ চীন থেকে যাত্রা করেছিলেন (কুশ, ইসিখ্-কোল, সমরকন্দ ও কুন্দুজ)। বাহ্লি দেখবার উদ্দেশ্যে তিনি কুন্দুজ থেকে একটু ঘুরে গেলেন। সে সহরে তখনো শতাবধি মঠ বর্ত্তমান ছিল, সব হীনযানী। তারপর বামিয়ানে নেবে গেলেন, সেখানকার বৌদ্ধ মঠও সব হীনযানপন্থী; পরে কাপিশে এসে, সেখানে ৬৩০-এর বর্ষাকাল যাপন করলেন। গান্ধার প্রদেশের রাজ্যে গেলেন, সেগুলি সাধারণত মহাযানী,—গান্ধার, উড্ডীয়ান, তক্ষশিলা ও কাশ্মীর। এই নব বৌদ্ধ পুণ্যভূমি বুদ্ধদেবের নানা কাল্পনিক ভ্রমণের স্মৃতিপূর্ণ এবং নানা স্তূপে আকীর্ণ, অশোক (চীনা বু-য়ু) এবং কনিষ্ক (কিয়া-নি-চো-কিয়া) রাজদ্বয়ের নাম সংশ্লিষ্ট;—সম্প্রতি অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর জন্ম দ্বারাও গৌরবান্বিত হয়েছিল, যেহেতু তাঁদের আদি নিবাস ছিল পুরুষপুর। কাশ্মীর-রাজ এই পরিব্রাজকের সম্বর্দ্ধনার্থে একটি স্থানীয় সভা আহ্বান করলেন। তারপর পূর্ব-পঞ্জাব ও জালন্ধর দিয়ে হিউয়েন-ৎ-সাং মথুরায় পৌঁছলেন; তিনি সগর্বে সেখানকার বহু স্তূপের উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি যান সম্রাট হর্ষের রাজধানী কান্যকুব্জে, অযোধ্যায় (সেখানে অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর মঠ দর্শন করেন), প্রয়াগে ও কৌশাম্বীতে। পূর্ব্ব গাঙ্গেয় প্রদেশে উপনীত হয়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের পুণ্যস্থানগুলিতে ভক্তিনিবেদন করেন: শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বারাণসী, বৈশালী, বোধগয়া এবং বোধিবৃক্ষ। বোধগয়ার নিকটেই মঠবহুল নালন্দা সহর বিরাজিত ছিল। হিউয়েন-ৎ-সাং নালন্দা বা তৎসন্নিহিত মঠে বহুদিন অতিবাহিত করেন, নালন্দার প্রধান আচার্য বৃদ্ধ প্রবীণ শীলভদ্র ও নিকটস্থ এক মঠের আচার্য জয়সেন এবং অন্যান্য মহাযানী আচার্যদের সহবাসে। তিনি তাঁদের উপদেশে মহাযানী আদর্শবাদ শাস্ত্রে নিজেকে পারদর্শী ক'রে তোলেন,—চীনে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সেখানে প্রচার করবার মানসে। এই যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ সম্প্রদায় অসঙ্গ ও বসুবন্ধু কর্তৃক তিন শতাব্দী পূর্বে প্রবর্তিত হয়েছিল। নালন্দা বাসকালীন হিউয়েন-ৎ-সাং মাঝে একবার দাক্ষিণাত্যে ঘুরে এলেন। এইরূপে তিনি যান কর্ণাটের (কাঞ্চির) পহ্লব দেশে ও মহারাষ্ট্র রাজ্যে। তখন সেখানকার রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশিন; তাঁর যুদ্ধসজ্জার তিনি সুখ্যাতি করেন। তারপর যান মালবে, সেখানকার

অধিবাসীদের সাহিত্যরুচির উল্লেখ করেন (আমরা ইতিপূর্ব্বেই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে রাজধানী উজ্জয়িনীর প্রাধান্য লক্ষ্য করেছি); পরে বলভীতে (গুজরাট), যে দেশ পূর্ব ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে বাণিজ্যবশত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। পুনরায় কিছুদিন নালন্দায় অবস্থানপূর্বক হিউয়েন-ৎ-সাং কামরূপে (আসাম) যান, সেখানকার রাজার অনুরোধে। কামরূপ থেকে ফিরে আসবার পর রাজা হর্ষ তাঁকে রাজসমীপে আহ্বান করেন ও ভক্তির প্রাবল্যে তাঁকে বিশেষ রূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। হর্ষ চীনা পরিব্রাজককে কনোজে আহূত একটি বৌদ্ধ সভায় নিমন্ত্রণ করেন, সেখানে মহাযানের মতামত সসম্ভ্রমে গ্রহণ এবং হীনযানকে বর্জন করা হয় (৬৪৩)। লক্ষ্য করবার একটি বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় এ স্থলে হর্ষকে হত্যা করবার একটা চেষ্টা হয়। সভার কার্য সমাপনান্তে হিউয়েন-ৎ-সাংসহ রাজা প্রয়াগধামে যান, ও সেখানে সাধারণ্যে বহু দানখয়রাৎ করেন। অতঃপর নানা উপঢৌকনে অভিভূত হয়ে হিউয়েন-ৎ-সাং রাজার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি পঞ্জাব, কাপিশ ও কাশ্‌গারী দিয়ে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন ও ৬৪৫-এ চাং-এ্যানে পৌঁছান।

চৈনিক টাং বংশের আধিপত্য তখন সমগ্র মধ্য-আসিয়ায় বিস্তৃত ছিল, এবং তাঁদের সঙ্গে হর্ষ রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। (পেলিও সাহেবের মতে প্রথম বার ৬৪৩-৬৪৬-এ ও দ্বিতীয়বার ৬৪৯-এ)। যখন ওয়াং হিউয়েন-ট্‌-সো দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন, তখন হর্ষ সবেমাত্র মারা গেছেন (৬৪৭)। তাঁর স্থান একজন অনধিকারী জুড়ে বসেছিল (তীরভুক্তি বা ত্রিহুতের রাজা?) তিনি চীনাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করলেন ও তাদের সহযাত্রীদের লুটপাট করলেন। ওয়াং-হিউয়ন-ট্‌-সো তিব্বত ও নেপালের রাজাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে গেলেন। তাঁরা ছিলেন চীনের প্রজা বা আশ্রিত। তাঁদের কাছে যে লোকবল পেলেন, তাই দিয়ে তিনি তাঁর আক্রমণকারীকে বন্দী করলেন ও ভালরকম পাহারা সহ চাং-এ্যানে পৌঁছে দিলেন (৬৪৮)।

এই সকল ঘটনার পরে, কনোজ রাজ্যের ক্রমশ অধঃপতন হয়। যশোবর্মনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার আবার পুনরুত্থানের লক্ষণ দেখা দিল। তিনি হর্ষের পদাঙ্ক অনুসরণে কবিদের পোষকতা করতেন, বিশেষত ভবভূতির,

যিনি মালতীমাধব নাটকের রচয়িতা। কিন্তু মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য নামক কাশ্মীরের রাজা ৭৪০-এর দিকে যশোবর্মনকে পরাজিত ও কনোজকে বিধ্বস্ত করেন।

বঙ্গদেশ। পাল রাজগণ

গাঙ্গেয় প্রদেশের আধিপত্য তখন কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশের পাল রাজবংশের হস্তগত হয় (৭৫০-১০৬০)। পাল বংশের প্রসিদ্ধতম রাজা ছিলেন ধর্মপাল (৭৬৬-এর দিকে), যিনি কনোজসহ মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকা জয় করেন (অনুমান ৮১০); এবং তাঁর পুত্র দেবপাল (৮১২ বা ৮১৩-র দিকে), যিনি আসাম ও কলিঙ্গ দেশ জয় করেন (অনুমান ৮৫০)। পাল রাজগণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন, কিন্তু তাঁরা যে বৌদ্ধধর্ম মানতেন সেটি ক্রমশই তান্ত্রিক ধর্মঘেঁসা হয়ে পড়তে লাগল, অর্থাৎ প্রচলিত শৈবধর্মের অনুকরণলব্ধ আলৌকিক মন্ত্রের সমষ্টি। দেবমূর্তি গঠনশাস্ত্রের দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁদের শিল্পকলা ছিল গুপ্তশিল্প সম্ভূত, কিন্তু কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা সহজেই তার থেকে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারা যায়, যথা: অলঙ্কারের প্রাচুর্য, অঙ্গসৌষ্ঠবের কৃশতা, নিতম্ব দেশের অতিবৃদ্ধি, ভঙ্গিমার কালোয়াতী, ইত্যাদি। ধর্ম ও শিল্পকলা উভয়তঃই পালগণ তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন (১০৩৮-এর দিকে রাজা নয় পাল কর্তৃক অতীশের প্রচারসজ্ঘ তিব্বতে প্রেরণ)।

পালগণের পরে বাঙ্গলার রাজসিংহাসন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী সেন বংশ দ্বারা অধিকৃত হয়। তাঁরা ১০৬০-১২০২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, ও শেষোক্ত তারিখে মুসলমানগণ এ দেশ জয় করে। সেন রাজাদের কালেই বাঙ্গালী কবি জয়দেব (দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) তাঁর "গীত গোবিন্দ" নামক গীতিকবিতা রচনা করেন। সেটি বৈষ্ণব ধর্ম্মের একপ্রকার song of songs-এর মতন, এবং তাতে দৈহিক প্রতীক অবলম্বনে কৃষ্ণের সঙ্গে ভক্ত আত্মার রহস্যাত্মক মিলন বর্ণিত হয়েছে।

গুপ্ত যুগের পরবর্তী উত্তর ভারত। রাজপুত

মধ্যযুগে রাজপুতগণ ঠিক একটি স্বতন্ত্র জাতি ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন একপ্রকার অস্ত্রধারী অশ্বারোহীর দল, যাদের উৎপত্তি কতক বিদেশী—সম্ভবত শক জাতীয়—এবং কতক স্বদেশী। তাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজে ক্ষত্রিয়রূপে প্রবেশ লাভ করেছিলেন। এইরূপে আমরা দেখেছি যষ্ঠ শতাব্দীতে হূণদের আক্রমণের সঙ্গে মিলিত গুর্জর নামক এক গোষ্ঠী "রাজপুতানায়" বসবাস করেছিলেন, ও তার থেকে সে দেশের নাম হয়েছে গুজরাট। নবম শতাব্দীতে প্রতিহার বা পরিহার নামক একটী গুর্জর সম্প্রদায় কনোজ দখল ক'রে বসলেন, এবং প্রায় তিন শতাব্দী যাবত সেখানে আধিপত্য করলেন (অনুমান ৮৬০-১০৮০)। মিহিরভোজ আদিবরাহের অধীনে (৮৪০-৮৯০-র দিকে) এই নব বংশ কিছুকালের জন্য হর্ষের সাম্রাজ্যের উন্নতি সাধন করতে পেরেছিল। তোমর, চৌহন, পরমার এবং চালুক্যগণও এইরূপ বিদেশী বংশজাত। অপর পক্ষে, যদিও একই সামাজিক শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু রাষ্ট্রকূট বা রাঠোরগণ ও চন্দেলাগণ ছিলেন দেশীয়, এমন কি আদিম জাতির বংশধর। রাষ্ট্রকূটগণ মরাঠা জাতীয়, এবং চন্দেলাগণ গোন্দ বংশীয়।

একাদশ শতাব্দীতে তোমরগণ দিল্লীতে অধিষ্ঠান করলেন। সেখান থেকে অনতিদূরে আজমীড়ে চৌহানগণ একটি প্রতাপশালী রাজ্য স্থাপন করলেন। চৌহান পৃথ্বীরাজ বা পৃথারাজ (১১৭৯-এর দিকে) দিল্লীকে তাঁর রাজ্যভুক্ত ক'রে নিলেন। আজমীড়-দিল্লীর এই রাজ্যের প্রতিপক্ষে দাঁড়াল কনোজ রাজ্য। প্রতিহারদের রাজত্বকালের শেষাশেষি ১০১৯-এ গজ্‌নভীয় তুর্কীদের অতর্কিত আক্রমণ ও লুঠতরাজের ফলে কনোজের তখন ভগ্নদশা, কিন্তু গহরওয়ারগণ প্রতিহারদের উত্তরাধিকারী (১০৯০-র দিকে) হওয়ায় তার নব যৌবনের সঞ্চার হয়েছিল। দুই প্রধান গহরওয়ার নৃপতি ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র (১১০০-১১৬০-র দিকে) ও জয়চন্দ্র (১১৭৬-এর দিকে)। শেষোক্ত তাঁর রাজধানী বারাণসীতে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর অধীনে কনোজ রাজ্য তার চরম উন্নতিশিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিবেশী আজমীড়-দিল্লীর পৃথ্বীরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনি তাঁর শক্তির অপব্যবহার করেন, কারণ শেষোক্ত তাঁর কন্যা হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে ইতিপূর্ব্বেই গাঙ্গেয় প্রদেশের রাজপুত রাজ্যগুলিকে গজ্‌নভীয় তুর্কীদের আক্রমণের বেগ সহ্য করতে হয়েছিল। তারা ছিল গোঁড়া মুসলমান, এবং আমরা দেখেছি যে, পঞ্জাবে অধিষ্ঠান ক'রে তারা ১০১৯-এ কনোজ ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলি লুটপাট করেছিল। আক্রমণ-কারীর প্রস্থানের পর দেশ আবার মাথা তুলেছিল। কিন্তু ঠিক যে-সময়ে আফগান সুলতান মহম্মদ ঘোরির চালিত দ্বিতীয় এক মুসলমান আক্রমণ দোয়াবের উপর পড়বার উপক্রম হল, সেই সময়ে আজমীড়ের পৃথ্বীরাজ এবং কনোজের জয়চাঁদের এই আত্মকলহ রাজপুত শক্তিকে দুর্বল ক'রে ফেলেছিল। পৃথ্বীরাজ মুসলমানদের প্রথম ধাক্কা সামলালেন। প্রথমে তিনি কর্নাল ও থানেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী তরাইন, তলাওয়ারী বা তিরাওয়ারীতে জয়লাভ করেন (১১৬১), পরের বৎসরে মহম্মদ ঘোরি কর্ত্তৃক সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই পরাস্ত হন, এবং পালাতে গিয়ে মারা পড়েন (১১৯২)। জয়চাঁদ তখনো লড়তে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি এটাওয়ার নিকটস্থ চান্দ্‌ওয়ারে মহম্মদ কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন (১১৯৩)। মুসলমানগণ দিল্লী, কনোজ ও বারাণসীতে প্রবেশ করেন। দোয়াব ও অযোধ্যা বহু দীর্ঘ শতাব্দী যাবৎ মুসলমান রাজ্যে পরিণত হল।

মধ্যভারতে রাজপুত যুগের দুই প্রধান রাজ্য ছিল চন্দেলা ও পরমার। আমরা দেখেছি চন্দেলাগণ ছিল গোন্দজাতীয় আদিম বংশজাত। কিন্তু অন্য সকল রাজপুতের মত এরাও সম্পূর্ণ হিন্দু হ'য়ে গিয়েছিল, এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এমন তেজোদৃপ্ত জাত আর ছিলনা। বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের কালিঞ্জরে এরা এক প্রতাপশালী রাজ্য স্থাপন করেছিল। এই বংশের প্রসিদ্ধতম রাজা ছিলেন ধঙ্গ (৯৫০—৯৯৯), যিনি খজুরাহোর প্রকাণ্ড হিন্দু মন্দির নির্মাণ করান। গজ্‌নভীয়দের প্রথম মুসলমান আক্রমণ (১০২০) তাঁর উত্তরাধিকারী গন্দরাজার উপর দিয়ে যায়। দুই শতাব্দী পরে আসে মৃত্যুবাণ স্বরূপ আক্রমণ। তখনকার চান্দেলরাজ সবেমাত্র তাঁর প্রতিবেশী আজমীড়ের পৃথ্বীরাজের সঙ্গে একটি যুদ্ধে হেরে এসেছিলেন। তিনি মুসলমানদের কর্ত্তৃক পরাস্ত হন, এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কালিঞ্জরের গৌরবরবি অস্তমিত হয় (১২০৩)। অপরপক্ষে পরমার বংশ ছিল মালবে স্থাপিত, ও তার রাজধানী ছিল ইন্দোরের নিকটস্থ ধার নগর। এই

বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল নৃপতি ছিলেন ভোজরাজা (অনুমান ১০১৮—১০৬০)। তিনি আজও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক বলে ভারতবর্ষে বিখ্যাত এবং ভোজ-প্রবন্ধ নামক কাহিনীতে বল্লাল তাঁর মহিমাকীর্ত্তন করেছেন। ভোজরাজা তাঁর প্রতিবেশীগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হলে তাঁর বংশের অধঃপতন হয়। অবশেষে ১২২০-র দিকে মুসলমান কর্ত্তৃক সে বংশ ধ্বংস এবং মালব অধিকৃত হয়।*

[ক্রমশঃ]

* শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী কর্ত্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত "রেনে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ" সম্পূর্ণ আকারে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ প্রকাশ করিবেন।

নাবিক

কোথাও তরণী আজ চ'লে গেছে আকাশ রেখায়—তবে—এই কথা ভেবে
নিদ্রায় আসক্ত হতে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক ;—
সূর্য্য যেন পরম্পরাক্রম আরো—অইদিকে—সৈকতের পিছে
বন্দরের কোলাহল—পাম সারি ;—তবু তার পরে স্বাভাবিক

স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য্য যেন সোনালি চুলের ধর্ম্মযাজিকার চোখে ;
গোধূম ক্ষেতের ভিড়ে সাধারণ কৃষকের খেলার বিষয় ;
তবু তার পরে কোনো অন্ধকার ঘর থেকে অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়
বল্লমের মত দীর্ঘ রশ্মির ভিতরে নিরাশ্রয় ;—

আশ্চর্য্য সোনার দিকে চেয়ে থাকে ; নিরন্তর দ্রুত উন্মীলনে
জীবাণুরা উড়ে যায়—চেয়ে দেখে—কোনো এক বিস্ময়ের দেশে।
হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্য্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু ?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরসী থেকে ফেঁসে

অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও—দুপুর বেলায় ;
বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেকজান্দ্রিয়ার
মোমের আলোকগুলো র'য়েছে পিছনে প'ড়ে অমায়িক সঙ্কেতের মত ;
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নাই। আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার

প্রয়োজন র'য়ে গেছে,—যতদিন স্ফটিক পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে ;—এয়ারোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস
নীলিমাকে খুলে ফেলে যতদিন ;—ভুলের বুনুনি থেকে আপনাকে মানবহৃদয় ;
উজ্জ্বল সময় ঘড়ি নাবিক—অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।

শ্রীজীবনানন্দ দাশ

প্রান্তবর্ত্তী

ঘৃণিত পতন আছে আশেপাশে যোজন-গভীরে ;
অসম্ভব অভিপ্রায় দোলায় শিকড়-ফাটা মাটি ;
দ্বিখণ্ডিত শেষ রশ্মি নিরুদ্দিষ্ট দিগন্ত-সমীরে।

বঞ্চিত সে দ্বিপ্রহর পুড়ে পুড়ে হয়েছে কি খাঁটি ?
দীর্ঘশ্বাসে তীক্ষ্ণ ধার, কলঙ্ক পড়েছে সাদা চাঁদে ;
ঊর্দ্ধরেখা হ্রস্বতর, হ্রস্বতর মনের কথাটি।

দুবাহু ঘেরাও করে বার বার অভ্যস্ত আহ্লাদে
সোনার হরিণ আর স্মরণের ছত্রভঙ্গ সোনা ;
দু হাতে পাথর-কাটা কঠিন কাঠামো বুঝি বাধে।

হৃদয়ের আন্দোলন ঘড়ির কাঁটায় যায় শোনা

শ্রীঅরুণকুমার মিত্র

প্রস্তাবনা

লাল জীবনের জাল জটিল আকাশে।
অযুত কামনা চোখে পরমায়ু ক্ষীণ।
উতলা বাতাসে শোনো মহাকাল হাসে।
নিপীড়িত রাত্রি জেগে অবস্থা সঙীন।

দস্যু মৃত্যু আসে যায় ভ্রান্ত ব্যর্থতায়।
পৃথিবী তো ন্যুব্জপৃষ্ঠ, সভ্যতা স্থবির।
বৃথাই স্বপনে ভাসা মর-অলকায়।
ছাখো চেয়ে শূন্যে-শূন্যে আকাশ গভীর।

জানি না কীসের টানে সম্মুখের পানে
অলস চরণ, চোখে মরুতৃষা জ্বলে।
জড়িত হৃদয়ে ঢেউ অচেনা আহ্বানে।
জন্ম, মৃত্যু, প্রজনন পৃথিবীতে চলে।

উতলা বাতাসে শোনো মহাকাল হাসে।
শেষ উদ্দামতা যেন নিতল নয়নে।
শেষবার ভবিষ্যের মধুর আশ্বাসে
এসো না অকূলে ভাসি নীরবে দু'জনে।

আজো চলে ঘরে-ঘরে অরণ্য-রোদন।
উদ্ধত ফাক্টরী ঘোরে আকাশের নিচে।
জীবিকার স্রোতে ভাসে বিহঙ্গ যৌবন।
দুরূহ অসহ তাপ জীবনের পিছে।

অযুত কামনা চোখে পরমায়ু ক্ষীণ।
নিরুত্তাপে ফল্গুস্বপ্ন ম্লান হ'য়ে আসে।
বিমানে ও বেয়োনেটে অবস্থা সঙীন।
উতলা বাতাসে শোনো মহাকাল হাসে॥

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ক্ষণিকবাদ (৩) *

ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে জৈমিনীয়গণ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন ঃ—

> নন্থ চ প্রত্যভিজ্ঞানং স এবেত্যুপজায়তে।
> অক্ষব্যাপারসদ্ভাবে নিষ্প্রকম্পমবাধিতম্ ॥ ৪৪৪ ॥
> ততঃ প্রত্যক্ষবাধেয়ং দুর্বারা সর্বহেতুষু।
> ক্ষণভঙ্গপ্রসিদ্ধ্যর্থমুপাত্তেষু প্রসজ্যতে ॥ ৪৪৫ ॥

অর্থাৎ, বস্তুতে ইন্দ্রিয় সংযোগের ফলে যে "ইহা তাহাই" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান (recognition) জন্মে তাহা সুনিশ্চিত এবং অবাধিত ; ক্ষণভঙ্গ প্রমাণ করিবার জন্য যত প্রকার হেতু দেখান হইয়া থাকে তাহার সকলগুলির বিরুদ্ধেই প্রত্যক্ষরূঢ় এই যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।—মীমাংসক এখানে যাহা বলিতেছেন তাহা ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মানুষেই ভাবিয়া থাকিবে। প্রত্যেক বস্তু যদি প্রতি ক্ষণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তবে লোকে কিরূপে বলিতে পারে "আমি পূর্বে যে বস্তুটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এটি সেই বস্তু" ? অথচ ব্যাবহারিক জগতে মানুষ নিয়তই এইরূপ কথা বলিতেছে! কোন কোন বস্তু স্বরূপ পরিবর্তন করিলেও যে ব্যাবহারিক জগতে অনন্য বলিয়াই পরিগণিত হয় তাহা দেখাই যায়, যেন পুনর্জাত কেশ, নখ, তৃণ ইত্যাদি। কিন্তু সেইজন্য বলা যাইতে পারে না যে বজ্রাদি বস্তুও তৃণাদির ন্যায় নিয়ত পুনর্জাত হইতেছে। চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কেশহীন স্থানেও কেশ দেখা যাইতেছে মনে করে বলিয়া সুচক্ষু ব্যক্তি যখন সত্যই কেশ দেখিতে পায় তখন তাহাও কি অবিশ্বাস করিতে হইবে ? সুতরাং যেখানে সংশয়ের কোন কারণ নাই সেখানে পূর্বের বস্তু বর্তমানেও অক্ষুণ্ণ আছে মনে করাই সঙ্গত।

বৌদ্ধ এইবার আপত্তি করিয়া বলিতেছেন ঃ—

> ন খলু প্রত্যভিজ্ঞানং প্রত্যক্ষমুপপদ্যতে।
> বস্তুরূপমনির্দেশ্যং সাভিলাপং চ তদ্যতঃ ॥ ৪৪৬ ॥

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, No. 18.

ভ্রান্তং চ প্রত্যভিজ্ঞানং প্রত্যেকং তদ্বিলক্ষণম্।
অভেদাধ্যবসায়েন ভিন্নরূপেঽপি বৃত্তিতঃ ॥ ৪৪৭ ॥

অর্থাৎ, প্রত্যভিজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনুরূপ নহে; কারণ বস্তুর রূপ নির্দেশ করিয়া দেওয়া যায় না, অথচ প্রত্যভিজ্ঞান সর্বত্র ইঙ্গিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞান ভ্রান্ত, যে-হেতু তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে বিলক্ষণ, এবং যে-হেতু তাহা ভিন্নরূপ হইয়াও প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।—প্রত্যক্ষজ্ঞান (perceptual cognition) ও প্রত্যভিজ্ঞানের (re-cognition) মধ্যে সম্বন্ধ দেখাইয়া মীমাংসক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে পূর্বক্ষণের বস্তু পরক্ষণেও বর্তমান থাকে। বৌদ্ধ ইহাতে বলিতেছেন, প্রত্যক্ষ হইতে বস্তু সম্বন্ধে যে-জ্ঞান জন্মায় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অনির্বাচ্য, কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞান কখনও অনির্বাচ্য হইতে পারে না, কারণ ইঙ্গিতই* প্রত্যভিজ্ঞানের স্বরূপ। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞান ও প্রত্যভিজ্ঞান যে-হেতু সম্পূর্ণ অসমজাতীয়, এ-দুইয়ের মধ্যে কোন প্রকার তুলনা সম্ভব নহে, এবং সেই প্রকার তুলনার ভিত্তিতে যদি কোন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাহাও অগ্রাহ্য। কমলশীল কারিকাটির উপর এইরূপ টিপ্পনী করিয়াছেন :—

প্রত্যভিজ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব অসিদ্ধ, কারণ বস্তুত্বের যাহা লক্ষণ তাহা শব্দসহযোগে প্রকাশ করা যায় না। বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানসিক জল্পনা মাত্র, তাহা কল্পনার দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সেইজন্য বলিয়া থাকেন যে প্রত্যক্ষজ্ঞান কল্পনার দ্বারা অনির্ধারিত (কল্পনাপোঢ়) এবং অভ্রান্ত; কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞান কল্পনাপোঢ় নহে, কারণ তৎসম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে "ইহা তাহাই"। তাহার উপর প্রত্যক্ষজ্ঞান অভ্রান্ত, কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞান অভ্রান্ত নহে, কারণ এতদ্দ্বারা ভিন্ন পদার্থও অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য দিঙ্‌নাগ বলিয়া গিয়াছিলেন যে জ্ঞান কল্পনাপোঢ়†; কমলশীল এখানে দিঙ্‌নাগের কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন মাত্র। জ্ঞান কিরূপে জন্মায় তাহা সর্বদেশীয় দর্শনের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইউরোপীয় empiricist

* এখানে কেবল শব্দরূপ ইঙ্গিত বুঝিতে হইবে।

† দিঙ্‌নাগ বলিয়াছেন :—প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং নামজাত্যাদ্যসংযুতম্॥ প্রমাণসমুচ্চয়, প্রথম পরিচ্ছেদ।

দার্শনিকগণ বলিতেন "nihilest in intellectu quod non ante fuerit in sensu"। অর্থাৎ, তাঁহাদের মতে কল্পনার সাহায্য ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি জ্ঞানে পরিণত হইতে পারে না। বৌদ্ধগণ কিন্তু কল্পনার দ্বারা যাহা নির্ধারিত হয় তাহা জ্ঞান বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিচারে এই সম্পর্কে সুবিস্তীর্ণ আলোচনা করা হইবে।

প্রত্যভিজ্ঞান যে কেন পূর্বজ্ঞানের অনুরূপ হইতে পারে না তাহাই বুঝাইবার জন্য এইবার বলা হইতেছে :—

পূর্বং সংবিহিতাকারগোচরং চেদিদং ভবেৎ।
জায়েত পূর্বমেবেদং তাদর্থ্যাৎ পূর্ববুদ্ধিবৎ ॥ ৪৪৮ ॥

অর্থাৎ, প্রত্যভিজ্ঞান হইতে যে-জ্ঞান জন্মায় তাহা যদি পূর্বজ্ঞান হইতে পৃথক্ না হয় তবে পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যভিজ্ঞানও জন্মান উচিত, যে-হেতু জ্ঞানের বিষয় উভয়ত্রই এক।—এ-কথার তাৎপর্য এই যে জ্ঞান যখন বিষয়সাপেক্ষ, এবং সেই বিষয় যখন পূর্বপক্ষীর মতে অপরিবর্তিতই রহিয়াছে, তখন তদ্বিষয়ক সকল জ্ঞান এক সঙ্গেই ঘটিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু জ্ঞান ও প্রত্যভিজ্ঞান যখন এক সঙ্গে ঘটে না তখন স্বীকার করিতে হইবে যে ইহাদের বিষয় অভিন্ন নহে।

নচৈবং তেন নৈবেদং তদর্থগ্রাহকং মতম্।
তজ্জ্ঞানকাল উৎপাদাদ্বিষয়ান্তরবুদ্ধিবৎ ॥ ৪৪৯ ॥
অভেদাধ্যবসায়েন ভিন্নরূপেঽপি বৃত্তিতঃ।
মায়াগোলকবিজ্ঞানমিব ভ্রান্তমিদং স্থিতম্ ॥ ৪৫০

অর্থাৎ, জ্ঞান ও প্রত্যভিজ্ঞান অভিন্ন হইতে পারে না কারণ উভয়ের গ্রাহ্য বিষয় এক নহে। প্রত্যভিজ্ঞান যখন তাহারই বিশিষ্ট কালে উৎপন্ন হইয়া থাকে তখন তাহা অন্য বিষয়ের জ্ঞানেরই সামিল। এবং ভিন্ন পদার্থও যে-হেতু প্রত্যভিজ্ঞানে অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় সেই হেতু আরও স্বীকার করিতে হইবে যে তাহা মায়াগোলকের বিজ্ঞানের মতই ভ্রান্ত।—মায়াগোলক যে কি তাহা কমলশীল বলিয়া যান নাই; প্রসঙ্গ হইতে অনুমান হয় যে ইহা kaleidoscope জাতীয় কোন পদার্থ।

পরবর্তী কারিকায় শান্তরক্ষিত আর একটি বিরুদ্ধ যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন ; তিনি বলিতেছেন, স্মৃতির ন্যায় প্রত্যভিজ্ঞান জ্ঞাত বিষয়েরই জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে, প্রকৃত জ্ঞান তদ্দ্বারা উৎপন্নই হয় না। সুতরাং পূর্বপক্ষী প্রত্যভিজ্ঞালব্ধ যে-জ্ঞান আশ্রয় করিয়া বস্তুর স্থিরভাব প্রমাণ করিতে উৎসুক তাহার যখন অস্তিত্বই নাই তখন পূর্বপক্ষীর সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত।—স্মৃতি জ্ঞানের কারক কি না তাহা লইয়া কেবল ভারতীয় দর্শনে কেন সর্বদেশীয় দর্শনেই বহু বিচার আছে। একদিক হইতে ইহা কিন্তু অতিশয় বিস্ময়কর। স্মৃতি ব্যতিরেকে যখন অনুমানই সম্ভব হয় না তখন স্মৃতির প্রামাণ্য অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝা দুষ্কর। যখনই বলা হয় "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" তখনই অগ্নির সহিত ধূমের অবিনাভাব সম্বন্ধ "স্মরণ" করিতে হয়। Bertrand Russell-এর মতে পূর্ব-জ্ঞান ভবিষ্যতে project করাই হইল অনুমান, - ইহা যে স্মৃতি ভিন্ন সম্ভব নহে তাহা বলাই বাহুল্য। অদ্বৈতবেদান্তে স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করা হইয়াছে, মীমাংসক কিন্তু তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। ন্যায়েও স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় নাই, কিন্তু নৈয়ায়িকের যুক্তি অসঙ্গত নহে ; তিনি বলেন স্মৃতির যখন বাস্তব অনুভব নাই তখন তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। বৌদ্ধ অবশ্যই স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না এবং এইজন্য বৌদ্ধ অনুমানও অস্বীকার করিতে দ্বিধা করেন নাই*। শান্তরক্ষিত এইজন্যই পরবর্তী কারিকায় বলিতেছেন যে প্রত্যভিজ্ঞা স্মৃতির অনুরূপ হওয়ায় প্রামাণ্যবর্জিত :—

নিষ্পাদিতক্রিয়ে চার্থে প্রবৃত্তেঃ স্মরণাদিবৎ।
ন প্রমাণমিদং যুক্তং করণার্থবিহানিতঃ ॥ ৪৫১ ॥

অর্থাৎ, প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্য স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, কারণ যে বিষয়ের ক্রিয়া পূর্বেই নিষ্পাদিত হইয়া গিয়াছে তৎপ্রতিই স্মৃতির ন্যায় প্রত্যভিজ্ঞার প্রবৃত্তি ; প্রত্যভিজ্ঞার করণার্থই কিছু নাই, সুতরাং স্বীকার করা যায় না যে তাহা প্রমাণ।—পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, প্রত্যভিজ্ঞার পৃথক্ প্রামাণ্য না থাকিলেও পূর্বার্থই যখন তাহার বিষয় তখন তদ্দ্বারা ক্ষণভঙ্গিত্ব বাধিত হইতেছে। কিন্তু এ-কথা ঠিক নহে। পূর্বার্থ প্রকৃত পক্ষে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়

* অনুমানের বিচারে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করা হইবে।

হইতেই পারে না ; কেবল বিভ্রমের বশেই মনে হইয়া থাকে যে প্রত্যভিজ্ঞায় পূর্বপ্রত্যক্ষীকৃত বস্তু গৃহীত হইতেছে। প্রত্যভিজ্ঞার প্রকৃতিই এ-রূপ যে তাহা ভ্রান্ত না হইয়া পারে না। সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে অক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইবে ?

এইবার কুমারিল ভট্টের মত আলোচিত হইবে। কুমারিল বিশ্বাস করিতেন না যে প্রত্যভিজ্ঞায় কেবল গৃহীতেরই গ্রহণ হয় ঃ—

> ইদানীন্তনমস্তিত্বং ন হি পূর্বধিয়া গতম্।
> তদস্ত্যস্য বিশেষশ্চেৎ স্মরণে যো ন বিদ্যতে ॥ ৪৫২ ॥
> পূর্বপ্রমিতমাত্রে হি জায়তে স ইতি স্মৃতিঃ।
> স এবায়মিতীয়ং তু প্রত্যভিজ্ঞাতিরেকিণী ॥ ৪৫৩ ॥

অর্থাৎ, প্রত্যভিজ্ঞার সময়ের অস্তিত্ব প্রথম প্রত্যক্ষের অস্তিত্বের অন্তর্গত নহে ; প্রত্যভিজ্ঞার এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা স্মৃতিতে পাওয়া যায় না। যাহা পূর্বেই প্রমিত হইয়াছে কেবল তৎপ্রতিই স্মৃতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেইজন্য স্মৃত বস্তু সম্বন্ধে মানুষ কেবল বলিয়া থাকে "উহা" ; প্রত্যভিজ্ঞায় কিন্তু আমরা বলি "ইহাই উহা" ; সুতরাং প্রতভিজ্ঞায় স্মৃতির অতিরিক্ত আরও কিছু বর্তমান।—পূর্বপ্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তুর ইদানীন্তন অস্তিত্বটি অধিগত হওয়া অসম্ভব, কারণ "ইহাই সেই"—এইরূপ আকার কখনই পূর্ব-প্রত্যক্ষের হইতে পারে না। অথচ ইহাই হইল প্রত্যভিজ্ঞার প্রকৃত রূপ। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা এক নহে। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞাও হইল একটি বিশিষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞা সিদ্ধ হইলেই কি ক্ষণিকত্ব বাধিত হইয়া যায় ? অনুমান করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হয় তাহার ব্যতিক্রম তো প্রায়ই দেখা যায়! পিতা-মাতার গায়ের রং দেখিয়া হয়তো অনুমান করা হইল যে পুত্র শ্যামবর্ণ হইবে, কিন্তু প্রত্যক্ষের সময় দেখা গেল সে গৌরবর্ণ! সেইরূপ বস্তুর নিত্যত্ব প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা আপাততঃ সিদ্ধ হইলেও উত্তরকালে যখন দেখা যায় যে বস্তুর কার্যাবলী ক্রমিক তখন তদ্দ্বারা বস্তুরও ক্রমিকত্ব (অর্থাৎ ক্ষণিকত্ব) প্রমাণিত হইতে বাধা কি ? ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন ঃ—

বিজ্ঞাতোঽপীতরৈরর্থঃ প্রত্যক্ষেণান্যথা ভবেৎ।
প্রত্যক্ষেণাবরুদ্ধে তু নেতরোৎপত্তিসম্ভবঃ ॥ ৪৫৫ ॥

অর্থাৎ, অনুমানাদি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা বস্তুর রূপ যাহাই দাঁড়াক না কেন, প্রত্যক্ষে তাহা অন্যরূপ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যক্ষে যাহার যে-রূপ প্রমাণিত হইয়াছে, অন্য প্রমাণ সহযোগে তাহার তদিতর অন্য রূপ সিদ্ধ হইতে পারে না।—অর্থাৎ মীমাংসকের মতে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, অনুমানে তাহার হানি হইতে পারে না, কারণ:—

কো হি জ্যেষ্ঠপ্রমাণেন দৃঢ়েনার্থেঽবধারিতে।
দুর্বলৈরিতরৈঃ পশ্চাদধ্যবস্যেদ্বিপর্যয়ম্ ॥ ৪৫৬ ॥

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষই হইল শ্রেষ্ঠ প্রমাণ; প্রত্যক্ষের দ্বারা যে সিদ্ধান্ত দৃঢ়রূপে অবধারিত হইয়াছে, তাহা কি কখনও দুর্বলতর অন্য প্রমাণের দ্বারা বিপর্যস্ত হইতে পারে? বৌদ্ধ এইবার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন:—

নম্বিদানীন্তনাস্তিত্বং যদি ভিন্নং ত্বয়েষ্যতে।
পূর্বভাবাত্তদা ভেদস্ত্বয়ৈব প্রতিপাদিতঃ ॥ ৪৫৭ ॥

অর্থাৎ, বস্তুর যে ইদানীন্তন অস্তিত্ব প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়, তাহা যদি পূর্বপক্ষীর মতে পূর্বপ্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পৃথক্ হয়,—তবে উভয়ের ভেদ পূর্বপক্ষীর দ্বারাই স্বীকৃত হইতেছে। অপর দিকে:—

অনন্যত্বেঽপি সত্ত্বস্য কথং পূর্বধিয়া গতম্।
তস্যাগতৌ হি বস্ত্বেব নোপলব্ধং প্রসজ্যতে ॥ ৪৫৮ ॥

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে এতদ্দ্বয় অনন্য, তবে জিজ্ঞাস্য পূর্বপ্রত্যক্ষের সময়েই প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়টি সমধিগত হয় নাই কেন? বস্তুর প্রত্যক্ষ ও তাহার প্রত্যভিজ্ঞানের বিষয়ের অনন্যত্ব সত্ত্বেও যদি প্রত্যক্ষকালে প্রত্যভিজ্ঞান না জন্মায় তবে তাহা হইতে ইহাই কি প্রতিপন্ন হয় না যে বস্তুটিরই উপলব্ধি ঘটে নাই?

পূর্বপক্ষী কিন্তু এখনও বলিতে পারেন যে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যভিজ্ঞান অনন্য-বিষয় হইলেও যে প্রত্যক্ষকালেই প্রত্যভিজ্ঞান ঘটিতেই হইবে তাহা বলা যায় না। বৌদ্ধ নিজেই বলেন যে ক্ষণিকত্ব শব্দাদি বস্তু হইতে অভিন্ন, কিন্তু তথাপি শব্দ শ্রবণের সময় যে ক্ষণিকত্বের উপলব্ধি হয় না তাহা বৌদ্ধও স্বীকার করিয়া

থাকেন। সেইরূপ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যভিজ্ঞানের বিষয়ের অনন্যত্ব সত্ত্বেও যদি প্রত্যক্ষকালে প্রত্যভিজ্ঞা না জন্মায় তবে তাহাতে বৌদ্ধের আপত্তি করিবার কি আছে ?

পূর্বপক্ষীর এ-কথা ঠিক নহে। এ-কথা বলা যায় না যে ধর্মী শব্দ গৃহীত হইলেও তাহার ক্ষণিকত্বরূপ ধর্মের গ্রহণ হয় না। প্রকৃতপক্ষে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্ম ক্ষণিকত্বেরও গ্রহণ ঘটে ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই ক্ষণিকত্বের নিশ্চয়জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে এমন কোন কারণের অভাববশতঃ তাহা অনিশ্চিত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র অনুভব হইতেই নিশ্চয়জ্ঞান জন্মায় না; তজ্জন্য অভ্যাসাদিরও প্রয়োজন। পূর্বপক্ষী কিন্তু এ-সকল যুক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না, কারণ তাঁহার মতে পূর্বপ্রত্যক্ষ হইল অবধারিত জ্ঞান। সেই অবধারিত জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর রূপ প্রমিত হইলে তাহা হইতে (পূর্বপক্ষীর মতে) অভিন্ন প্রত্যভিজ্ঞার জ্ঞানও পূর্বপ্রত্যক্ষের সময়েই নিশ্চিত হওয়া উচিত। আর তাহা যদি না হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে বস্তুর স্বরূপই পূর্বপ্রত্যক্ষের সময় অনিশ্চিত থাকে। যাঁহারা বলেন যে বস্তু সম্বন্ধে সন্দেহ প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত হয় বলিয়াই প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্য স্বীকার্য, তাঁহাদের মত খণ্ডনের জন্যও আর নূতন কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আবার এ-কথাও বলা যায় না যে প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা সন্দিগ্ধ বস্তুর স্বভাব নির্ণীত হয়; কারণ পুনর্জাত কেশাদি সম্পর্কে দেখা যায় যে একটির পর আর একটি তৎসদৃশ কেশ জন্মান সত্ত্বেও প্রত্যভিজ্ঞায় কেশ অনন্যই আছে এইরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান জন্মায়।

যাঁহারা বলেন যে প্রত্যক্ষ অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা বাধিত হইতে পারে না তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য :—

প্রত্যক্ষেণ চ বাধায়ামনুমানাদিগোচরে।
নানুমানাদিমানং স্যাদ্বাধাতস্তৈমিরাদিবৎ ॥ ৪৫৯ ॥

অর্থাৎ, অনুমানাদির দ্বারা যাহা লব্ধ হইয়াছে তাহা যদি প্রত্যক্ষের দ্বারা বাধিত হইতে পারে তাহা হইলে সেই বাধার সম্ভাবনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে অনুমানাদির প্রামাণ্য নাই—চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির দৃষ্টিজ্ঞানের মতই তাহা ভ্রান্ত। সুতরাং মীমাংসক যে বলেন অন্য প্রমাণের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান প্রত্যক্ষের

অনুরোধে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করিতে পারে—একথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। আর প্রত্যক্ষকে যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলা হইয়াছে তাহাও ঠিক নহে। কারণ ঃ—

অর্থসংবাদকত্বে চ সমানে দ্বেষ্যতাস্য কা।
তদভাবে তু নৈব স্যাৎ প্রমাণমনুমাদিকম্॥ ৪৬০॥

অর্থাৎ, সর্বপ্রকার প্রমাণের মধ্যেই যখন বাস্তব অর্থের সহিত সংবাদ (correspondence) সমভাবে বর্তমান তখন তাহার কোনটির মধ্যেই প্রামাণ্যহানিকর কিছু থাকিতে পারে কি? আর বাস্তবার্থের সহিত যদি অনুমানাদির সাযুজ্য না থাকে তবে উহাদের প্রামাণ্যই অগ্রাহ্য।

ইহার পরেই শান্তরক্ষিত ভাবিবিক্ত নামক এক নৈয়ায়িকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবিদ্ধকর্ম, প্রশস্তমতি প্রভৃতির ন্যায় ভাবিবিক্তের রচনাবলীও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে ভাবিবিক্ত বলিয়াছেন ঃ—

বিবক্ষিতার্কচন্দ্রাদিবিষয়ং যৎ প্রবর্ততে।
জ্ঞানং তৎকালসম্বদ্ধসূর্যাদিবিষয়ং পরম্॥ ৪৬২॥
পার্থিবাবিষয়ত্বে হি তজ্জ্ঞানত্বাভিধানতঃ।
তদ্যথা প্রথমং জ্ঞানং তৎকালার্কাদিগোচরম্॥ ৪৬৩॥

ভাবিবিক্তের এই দুইটি কারিকাই অত্যন্ত অস্পষ্ট, এবং কমলশীলও এ-গুলির বিশেষ ব্যাখ্যা করেন নাই। কারিকাদ্বয়ের আক্ষরিক অর্থ যাহা দাঁড়ায় তাহার মধ্যে যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। মনে হয়, বস্তুর অভিধেয়ত্ব আশ্রয় করিয়াই ভাবিবিক্ত এখানে ক্ষণিকত্ব খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম কারিকায় বলা হইতেছে যে সূর্যাদিবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞান প্রথম প্রত্যক্ষের বিষয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে; দ্বিতীয় কারিকায় কারণস্বরূপ বলা হইতেছে যে প্রত্যভিজ্ঞান বস্তুর জ্ঞানরূপেই কথিত হইয়া থাকে। কমলশীল "পঞ্জিকা"য় ভাবিবিক্তের আর একটি যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন; এখানেও তাঁহার প্রধান বক্তব্য এই যে যাহা অভিধেয় তাহা আত্মলাভের অব্যবহিত পরেই ধ্বস্ত হইতে পারে না ঃ—

রূপাদি সামান্যের (universal) যাহা আশ্রয় (basis, substratum), সেই আশ্রয়েরও আশ্রয়াবলী, এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, স্মৃতি,

প্রত্যভিজ্ঞা, সিদ্ধদর্শন (=যোগিগণের দিব্যদৃষ্টি), সন্দেহ (আরেক), ভ্রান্ত জ্ঞান (বিপর্যয়), অনুব্যবসায় (consciousness of perception), স্বপ্ন প্রভৃতি প্রজ্ঞানাবলীর আশ্রয় আত্মলাভের অনন্তরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে না, কারণ এইগুলিই জ্ঞেয়, প্রমেয়, অভিধেয় প্রভৃতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পরবর্তী কারিকাদ্বয়ে শান্তরক্ষিতও ভাবিবিক্তের এই যুক্তিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন :—

রূপত্বাদ্যাশ্রয়াঃ সর্বে যে চ তেষাং সমাশ্রয়াঃ।
যে চ তদ্বিষয়াঃ কেচিজ্জায়ন্তে প্রত্যয়াস্তথা ॥ ৪৬৪ ॥
উৎপাদানন্তরং ধ্বংসভাজো নৈব ভবন্তি তে।
প্রমেয়ত্বাভিধেয়ত্বহেতুনঃ খারবিন্দবৎ ॥ ৪৬৫ ॥

অর্থাৎ, রূপত্বাদির আশ্রয়াবলী, সেই আশ্রয়াবলীর আশ্রয়াবলী, এবং তদ্বিষয়ক প্রত্যয়াবলী আকাশকুসুমের ন্যায় উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে না, কারণ সেগুলি প্রমেয় এবং অভিধেয়।—ভাবিবিক্তের এই উক্তি বৌদ্ধমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। বৌদ্ধ বলেন যাহা অক্ষণিক তাহাই আকাশকুসুমের মত অলীক, কারণ কার্য যখন বিশিষ্ট ক্ষণে ভিন্ন হইতে পারে না ক্রিয়াশীল বস্তুর অস্তিত্ব তখন অক্ষণিক হইবে কেন, এবং কার্য ভিন্ন অস্তিত্ব স্বীকার করার কিইবা কারণ আছে ? ভাবিবিক্ত কিন্তু বলিতেছেন যাহা ক্ষণিক তাহাই অলীক।—ভাবিবিক্তের প্রদর্শিত যুক্তি যে অতিশয় দুর্বল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা জ্ঞেয়, প্রমেয় প্রভৃতি বলিয়া "অভিহিত" হইয়া থাকে তাহা কেন ক্ষণিক হইতে পারিবে না ? আর বিজ্ঞানের আশ্রয়াবলীর প্রমেয়ত্বই যখন বিচারের বিষয় তখন সেই প্রমেয়ত্বই কিরূপে যুক্তিরূপে প্রস্তাবিত হইতে পারে ? ইহা হইল petitio principii।—ইহার পর উদ্দ্যোতকরের মত আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু তিনিও বস্তুর অক্ষণিকত্ব প্রতিপাদনের জন্য যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না :—

বিজ্ঞান ও প্রত্যভিজ্ঞান বিভিন্নকালে উৎপন্ন হইলেও তাহাদের বিষয় এক কি না—ইহাই হইল এ-ক্ষেত্রে বিচারের বিষয় ; কিন্তু তাহাদের বিষয় নিশ্চয়ই এক ; কারণ একই শব্দের দ্বারা দুইটিই যখন অভিহিত হয় তখন উভয় প্রত্যয়ের অধিকরণও যে সত্যসত্যই (অব্যুত্থায়ি) অভিন্ন তাহা স্বীকার করিতে

হইবে। একই বস্তু একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ একই প্রত্যয় উৎপন্ন করিতে পারে, এ-ক্ষেত্রেও সেইরূপ একই বস্তু বিভিন্ন সময়ে একই প্রত্যয় উৎপন্ন করিতেছে।—উদ্দ্যোতকরের এই অনুমানের মধ্যে দৃষ্টান্তটিই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিতেছেন, বিষয়ের বিজ্ঞান বিজ্ঞাতার ব্যক্তিভেদেও বিভিন্ন হইতে পারে, অথবা একই বিজ্ঞাতা বিভিন্নকালে বস্তুবিজ্ঞানে নিয়োজিত থাকিলেও বিজ্ঞানে অনুরূপ ভেদোৎপত্তি সম্ভব। এখন, বিভিন্ন ব্যক্তি যখন সমক্ষণে একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করে তখন যদি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ না ঘটে, তবে একই ব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষণে যখন সেই বস্তুটি প্রত্যক্ষ করে তখনই বা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ঘটিবে কেন?—পরবর্তী কারিকাদ্বয়েও উদ্দ্যোতকরের কথাই বলা হইয়াছে ঃ—

বিবাদবিষয়া যে চ প্রত্যয়াঃ ক্রমভাবিনঃ।
একার্থবিষয়াস্তেঽপি সর্ব ইত্যবঘোষণা ॥ ৪৬৬ ॥
অবাধৈকাশ্রয়ত্বে হি সমানোক্তিনিবেশনাৎ।
বর্তমানে যথৈকস্মিন্ ক্ষণে নৈকবিধা ধিয়ঃ ॥ ৪৬৭ ॥

অর্থাৎ, বস্তু সম্বন্ধীয় যে-সকল ক্রমিক বিজ্ঞান জন্মে সে-গুলির বিষয় যে এক—ইহাই আমাদের বক্তব্য; কারণ জ্ঞান ও প্রত্যভিজ্ঞানের একাশ্রয়ত্ব কখনও কোন বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া যায় না (অবাধৈকাশ্রয়ত্ব), এবং উভয়ই একই শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। বর্তমান ক্ষণের বস্তু সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপে বহু ব্যক্তির চিত্তে বিভিন্ন বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, (কিন্তু সেইজন্য কি বৌদ্ধ বর্তমান ক্ষণের বস্তুরও বিবিধত্ব স্বীকার করিবেন?)—নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর এখানে পরতঃপ্রামাণ্যবাদের পক্ষ হইতে বলিতেছেন যে ফলজ্ঞানের ব্যত্যয় না ঘটিলেই বুঝিতে হইবে যে জ্ঞান ভ্রান্তিশূন্য; জ্ঞান ও প্রত্যভিজ্ঞানের সমবিষয়ত্ব বিষয়ক জ্ঞান যখন অপর কোন বিরুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতেছে না তখন স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাই প্রমাজ্ঞান।

বৌদ্ধ এইবার প্রতিবাদ করিতেছেন ঃ—

সাধ্যেন বিকলং তাবদাছে হেতৌ নিদর্শনম্।
হেতুত্বাদ্বিষয়ঃ সর্বো ন হি স্বজ্ঞানকালিকঃ ॥ ৪৬৮ ॥

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষী যে প্রথম হেতুস্বরূপ বলিয়াছিলেন "যে-হেতু প্রত্যভিজ্ঞান পূর্ব বিষয়ের জ্ঞান রূপেই অভিহিত হয়" (তজ্জ্ঞানত্বাভিধানতঃ, কারিকা ৪৬৩), তাহার উদাহরণ সাধ্যবিকলতা (absence of probandum in the probans) দোষে দুষ্ট, কারণ তাহা সম্পূর্ণরূপে হেতুরই অন্তর্গত। উপরন্তু ইহাও বিবেচ্য যে বস্তুর বিজ্ঞান ও অস্তিত্ব সমকালীন না-ও হইতে পারে, (অর্থাৎ, বস্তু বিনষ্ট হওয়ার পরও তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান অসম্ভব নহে)।—এই কারিকাটি ন্যায়ের পরিভাষায় কণ্টকাকীর্ণ। হেতু সাধ্যশূন্য হইলে যেমন অনুমান সম্ভব হয় না, উদাহরণ সাধ্যশূন্য হইলেও সেইরূপ অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না।* বৌদ্ধ এখানে আপত্তি করিতেছেন যে নৈয়ায়িকের দ্বারা প্রস্তাবিত সমর্থক উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হেতুরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাহা অনুমানের সহায়ক নহে। নৈয়ায়িক উদাহরণ স্বরূপ চন্দ্রার্কাদির জ্ঞানের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে এ-সকল বস্তুর জ্ঞান ও প্রত্যক্ষভিজ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। বৌদ্ধ কিন্তু আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে চন্দ্রাদির প্রথম বিজ্ঞানও তৎকালীন চন্দ্রাদি বিষয়ক হইতে পারে না,† কারণ তাহা হইলে যাহা জ্ঞানের হেতু তাহাই হইয়া পড়িবে জ্ঞানের বিষয় (হেতুভূতস্যৈব বিষয়ত্বাৎ)। কর্ম ও কারণের সমকালত্ব কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কথাই আছে যে :—

অসতঃ প্রাগসামর্থ্যাৎ পশ্চাদনুপযোগতঃ।
প্রাগ্ভাবঃ সর্বহেতূনাং নাতোঽর্থঃ স্বধিয়া সহ ॥

অর্থাৎ, যাহা অসৎ, পূর্বেও তাহার কোন অর্থক্রিয়ার সামর্থ্য ছিল না, এবং পরেও তাহার কোন কার্যে উপযোগিত্ব সম্ভব নহে। কারণ মাত্রেই কার্যের পূর্ববর্তী; সুতরাং বস্তু কখনই স্ববিজ্ঞানের সমকালীন হইতে পারে না।—বৌদ্ধ এইখানেই নৈয়ায়িকের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। নৈয়ায়িক পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিতেছেন যে বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান ও প্রত্যভিজ্ঞানের বিষয় যখন এক তখন বস্তু কখনই ক্ষণবিধ্বংসী হইতে পারে না। বৌদ্ধ কিন্তু আপত্তি করিতেছেন যে তথাকথিত প্রত্যক্ষজ্ঞানও একপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞান ভিন্ন আর

---

* ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকদিগের একটি প্রধান আপত্তি এই যে ক্ষণিকত্ব-সমর্থক কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। শান্তরক্ষিত কিন্তু কোথাও এই আপত্তির উল্লেখ করেন নাই।

† প্রথমমপি হি চন্দ্রাদিবিজ্ঞানং স্বকালাবচ্ছিন্নচন্দ্রাদিবিষয়ং ন ভবতি।

কিছুই নহে, কারণ এই জ্ঞানের হেতু স্বরূপ জ্ঞেয় বস্তুটি পূর্ববর্তী না হইয়া পারে না। কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তু সমকালীন না হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়? আর প্রত্যক্ষজ্ঞান যদি সম্ভব না হয় তবে তাহার সহিত প্রত্যভিজ্ঞানের তুলনা করিয়া বস্তুর স্থিরত্ব প্রতিপাদনই বা কিরূপে সম্ভব হইবে?

পূর্বপক্ষী (৪৬২ সংখ্যক কারিকায়) বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে প্রত্যভিজ্ঞানে যে-চন্দ্রাদি উপলব্ধ হয় তাহা যখন পার্থিব কৃত্রিম চন্দ্রাদি নহেই তখন চন্দ্রসূর্যাদির অক্ষণিকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞাত চন্দ্রাদির অকৃত্রিমত্ব স্বীকার করিলেও যে যুক্তিটি অনৈকান্তিক থাকে—তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

যদা সূর্যাদিশব্দাশ্চ বিবক্ষামাত্রভাবিনঃ।
দীপাদৌ বিনিবেশ্যন্তে তজ্জ্ঞানৈর্ব্যভিচারিতা ॥ ৪৬৯ ॥

অর্থাৎ, সূর্যাদি শব্দের ব্যবহার যখন কেবল বক্তার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে, এবং সেইজন্য সূর্যাদি শব্দ যখন দীপাদি সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়াই থাকে, তখন আর প্রত্যভিজ্ঞাত চন্দ্র সূর্য যে কৃত্রিম ও পার্থিব নহে—একথা বলিলেই বা কি লাভ হইবে?* কমলশীল কারিকাটির কোন ব্যাখ্যা করেন নাই।

বৌদ্ধ এইবার (৪৬৪ সংখ্যক কারিকার উত্তরে) শ্লেষের সুরেই বলিতেছেন যে জাতি (universal) প্রভৃতির ক্ষণভঙ্গিতা কোন পক্ষেরই ইষ্ট নহে, কারণ এ-সকল পদার্থের যে অস্তিত্ব নাই† তাহা সুপ্রসিদ্ধ ঃ—

জাত্যাদের্নিঃস্বভাবত্বান্নৈবেষ্টা ক্ষণভঙ্গিতা।
তদভাবপ্রসিদ্ধ্যর্থং নির্দিষ্টং সাধনং বৃথা ॥ ৪৭০ ॥

কমলশীল "পঞ্জিকা"য় বলিয়াছেন যে জাত্যাদি বলিতে জাতি ব্যতিরিক্ত আরও বুঝাইতেছে রূপ, ঘট প্রভৃতি জাতির যাহা আশ্রয় এবং তদ্বিষয়ক প্রত্যয়াবলী; বিহিত বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট আকারেও এ-গুলির কোন অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না‡; সুতরাং তাহাদের ক্ষণিকত্বের অভাব প্রমাণ করিবার জন্য পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন তাহার সমস্তই ব্যর্থ।

* কারিকাটির শেষাংশ "তজ্জ্ঞানৈর্ব্যভিচারিতা" বলিতে কি বুঝাইতেছে?

† বৌদ্ধ দর্শনে সামান্য, বিশেষ প্রভৃতি পদার্থ স্বীকারই করা হয় না। এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

‡ মুদ্রিত পুস্তকের শুদ্ধিপত্র অনুযায়ী "ধর্মিণোঃ সত্বাৎ"-এর পরিবর্তে পড়িতে হইবে "ধর্মিণোঽসত্বাৎ।

পূর্বে (কারিকা ৪৬৬) বলা হইয়াছিল যে বস্তু সম্বন্ধীয় ক্রমিক বিজ্ঞানাবলীর বিষয় একই। এক্ষণে তাহার উত্তরে বৌদ্ধ বলিতেছেন ঃ—

সমানশব্দবাচ্যত্বং দীপাদিপ্রত্যয়েষ্বপি।
বর্ততে ব্যভিচার্যেষ হেতুস্তেন ভবত্যতঃ ॥ ৪৭০ ॥

অর্থাৎ, জ্ঞান ও প্রত্যভিজ্ঞানের বিষয় একই শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত হইয়া থাকে বলিয়াই যে বস্তুর স্থিরভাব প্রমাণিত হইয়া যায় তাহা নহে। কারণ দেখাই যায় যে দীপাদি বস্তু ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও একই সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত হইতেছে। সুতরাং সমসংজ্ঞা স্থিরত্বের অব্যভিচারী হেতু হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষী নৈয়ায়িক এখনও বলিতে পারেন, উদ্দ্যোতকর কেবল সাধারণ ভাবেই বলেন নাই যে জ্ঞান ও প্রত্যভিজ্ঞানের বিষয় এক; তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন "উভয় প্রত্যয়ের অধিকরণও যখন 'সত্যসত্যই' (অব্যুত্থায়ি) এক।" এই অতিরিক্ত বিশেষণ প্রয়োগ হইতেই বুঝা যায় যে পরিবর্তনশীল দীপাদির একত্ব প্রতিপাদন করা উদ্দ্যোতকরের উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে উদ্দ্যোতকরের যুক্তি প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচারী নহে।

বৌদ্ধ কিন্তু বলিতেছেন যে "অব্যুত্থায়ি"—এই বিশেষণ প্রয়োগ সত্ত্বেও উদ্দ্যোতকরের কথা টিকিতে পারে না, কারণ এই বিশেষণ নিজেই অসিদ্ধ। কোন বস্তু যখন দুইটি বিভিন্ন মুহূর্তে কখনই এক থাকিতে পারে না তখন "যাহা সত্য-সত্যই এক থাকে" এরূপ কথা বলার কি সার্থকতা আছে? মনুষ্য, পর্বতাদিও দীপাদির মত নিয়ত পরিবর্তনশীল, কারণ দেখাই যায় যে একই মানুষ কখন বালক, কখন কিশোর, কখন তরুণ; আবার সেইরূপেই দেখা যায় যে একই পর্বত কখন শীত, কখন উষ্ণ। পর্বত যদি "সত্যসত্যই" এক হইত তবে একই সঙ্গে তাহাতে শীত ও উষ্ণের অনুভূতি ঘটা উচিত ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে "অব্যুত্থায়ি" এই বিশেষণ সত্ত্বেও উদ্দ্যোতকরের যুক্তিটি দৃষ্টান্তাভাব বশতঃ অসিদ্ধ। এইবার দেখান হইবে যে উদ্দ্যোতকরের অনুমানেও দোষ আছে ঃ—

বিবাদপদমারূঢ়া নৈকার্থবিষয়া ধিয়ঃ।
ক্রমেণোৎপদ্যমানত্বাদ্বিদ্যুদ্দীপাদিবুদ্ধিবৎ ॥৪৭৩॥
ক্রমভাববিরোধো হি জ্ঞানেষ্বেকার্থভাবিষু।
অস্থৈরকার্যভেদস্য তদপেক্ষাবিরোধতঃ ॥৪৭৪॥

অর্থাৎ, আমাদের বিচারের বিষয়ীভূত জ্ঞান ও প্রত্যভিজ্ঞানের বিষয় একই হইতে পারে না, কারণ এতদ্দ্বয় একসঙ্গে উৎপন্ন না হইয়া ক্রমানুযায়ী উৎপন্ন হওয়ায় বিদ্যুৎ, দীপ প্রভৃতি ক্ষণবিধ্বংসী পদার্থের জ্ঞানের সহিতই তাহাদের সাদৃশ্য। যে বস্তু একার্থভাব (অর্থাৎ অক্ষণিক), তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানাবলী কখনই ক্রমিক হইতে পারে না। আবার এ-কথাও বলা যায় না যে সহকারী কারণের সাহায্যেই বস্তু স্থিরভাব হইয়াও ক্রমিক কার্যাবলী উৎপন্ন করিয়া থাকে, কারণ নিত্যবস্তু কখনই কোন সাহায্যের অপেক্ষা করে না—তাহাতে নিত্যত্বেরই হানি হয়।—এইখানেই "তত্ত্বসংগ্রহে" ক্ষণিকবাদের আলোচনার পরিসমাপ্তি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বৌদ্ধ বা নৈয়ায়িকের কেহই দৃষ্টান্ত সহযোগে তাঁহাদের অনুমান সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। দৃষ্টান্ত উভয়বাদীসম্মত না হইলে গ্রাহ্য হয় না বলিয়াই বোধ হয় উভয় পক্ষের এই সংকোচ। নিত্যবস্তুর দৃষ্টান্তরূপে সাধারণতঃ আকাশের উল্লেখ করা হইয়া থাকে, কিন্তু বৌদ্ধ মতে তাহা অবস্তু—শূন্য মাত্র। বৌদ্ধও দৃষ্টান্ত স্বরূপ এমন কোন পদার্থ দেখাইতে পারেন নাই যাহা নৈয়ায়িকের মতেও ক্ষণবিধ্বংসী। এই দিক হইতে বিচার অমীমাংসিত রহিয়া গেল বলিতে হইবে।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দিন কাটিয়া যায়, আশ্রম হইতে বিপিনও আসে না, কোন শিষ্যও আসে না। সদানন্দ আকাশ পাতাল ভাবে মন খারাপ করিয়া। শিষ্যদের না আসিবার কারণটা যে সদানন্দ মোটামুটি অনুমান করিতে পারে না তা নয়। বিপিনের কোন কারসাজি আছে নিশ্চয়। কিন্তু আশ্রমে কি এমন ভক্ত তার একজনও নাই বিপিনের কোন কথায় কান না দিয়া যে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসাটা দরকার মনে করে? মুখখানা তার বড় বিমর্ষ দেখায়। কেউ সেটাকে ভাবে গাম্ভীর্য্য, কেউ মনে করে গভীর চিন্তার ছাপ। যে বুঝিতে পারে সাধু সদানন্দের মুখখানা বিষণ্ণ দেখাইতেছে সে ভাবে, সাধু সন্ন্যাসী মানুষের আবার মন খারাপ হওয়া কেন? মাধবীলতা মনের দুঃখে মাথা নাড়িয়া ভাবে, নাঃ, লোকটার একটুও মনের জোর নেই।

একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় বিনা খবরে রত্নাবলী আসিয়া হাজির। সঙ্গে কেউ নাই। কার একটা মোটা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া একাই এতখানি রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে।

মাধবীলতা চোখ কপালে তুলিয়া বলে, 'কি করে এলি!'

রত্নাবলী হাসিয়া বলে, 'এলাম।'

মাধবীলতা খুঁত খুঁত করিয়া বলে, 'দিনের বেলা এলেই হত, নয়তো কাউকে সঙ্গে নিয়ে—'

'চুপি চুপি এলাম যে লুকিয়ে।'

'কেন, লুকিয়ে কেন?'

'বিপিনবাবু টের পেলে তাড়িয়ে দেবে না আশ্রম থেকে?'

'দেয় দেবে তাড়িয়ে, এখানে এসে থাকবি তুই।'

'আহা, সেটা জানতে হবে তো আগে? এখানে থাকতে পাব কিনা না জেনে আগে থেকে ওখানকার আশ্রয়টা তো আর ঘুচিয়ে দিতে পারি না।'

রত্নাবলী গোড়া হইতে হাসিতেছিল, এবার হাসিল শশধরের দিকে তাকাইয়া।

ঘরে অনেক লোক, কিছুক্ষণ আগে মহেশ চৌধুরীর চেষ্টায় এ ঘরে বাড়ীর সকলের ঘড়োয়া মজলিস বসিয়াছে। হাতে পায়ে ধরিয়া সদানন্দকেও মহেশ এ মজলিসে টানিয়া আনিয়াছে। সতরঞ্চি বিছান প্রকাণ্ড চৌকীতে অন্য সকলে বসিয়াছে, কিছু তফাতে অন্য একটি ছোট চৌকীতে ঘরে বোনা সুদৃশ্য আসনে সদানন্দের বসিবার ব্যবস্থা। আশ্রমে সদানন্দের কুটীরে মাঝে মাঝে শিষ্য ও ভক্তদের মজলিসে সদানন্দ উপস্থিত থাকিত, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা, সদানন্দকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, এসব অধিকার ভক্তদের কিছু কিছু থাকিত, তবু সে মজলিসের সঙ্গে এ মজলিসের অনেক তফাৎ। যেটুকু স্বাভাবিক হওয়ার স্বাধীনতা সেখানে সকলকে দেওয়া হইত, সদানন্দের সামনে সেটুকু স্বাধীনতা কাজে লাগানর সাহস কারও হইত না, সকলে কথা বলিত ভয় ভয়ে। এখানে মহেশ নিজেই বাজে গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, রত্নাবলী যখন ঘরে ঢোকে বিভূতি রস দিয়া দেশের কাহিনী বলিতেছে, সকলে মন দিয়া শুনিতেছে তার কথা, সদানন্দের দিকে কারও নজর নাই। বিপিন সদানন্দকে আড়ালে রাখিত তার অসাধারণত্ব অটুট রাখিবার জন্য, মহেশের সব ব্যবস্থাই যেন উল্টা, সে যেন সকলের সামনে আনিয়া আনিয়া সদানন্দের কৃত্রিম অসাধারণত্বের আবরণটি ঘুচাইয়া দিতে চায়। বিভূতির গল্প শুনিতে শুনিতে সদানন্দ এই কথাটাই ভাবিতেছিল। বিভূতির মাও ঘরে আসিয়াছে, ছেলের দুর্দ্দশার রসালো কাহিনী শুনিতে শুনিতে তার চোখ ছলছল করিতেছিল। ঘরে আসে নাই কেবল শশধরের ঘোমটা টানা বৌ। তবে তার অনুপস্থিতিটা কেউ একবার খেয়াল করিয়াছে কিনা সন্দেহ। বাড়ীর কারও চেতনায় নিজের অস্তিত্বের সাড়া না তুলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার কঠিন সাধনায় বৌটি প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ফেলিয়াছে।

রত্নাবলীর কথার জবাবে মহেশ চৌধুরী বলিল, 'তুমি তো আমার মেয়ে, মা? এখানে থাকতে পাবে কিনা তাতে তো তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নয় মা!'

রত্নাবলী এবার হাসিল না।—'না না, এমনি কথাটা বলেছিলাম মাধুকে তামাসা করে। থাকতে পাব বৈকি এখানে।'

'তুমি এখানে এসে থাকলে আমরা বড় সুখী হব মা।'

'আমি তো যখন খুসী আসতে পারি, কেবল উমা মাসীর জন্যে—' রত্নাবলী একটু হাসিল।

মহেশ বলিল, 'প্রভু যখন এখানে আছেন, ওঁকে বললে উনি এসে এখানে থাকতে রাজী হবেন না?'

'মনে তো হয় না। উনি বড় চটেছেন।'

রত্নাবলী আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করে নাই। সদানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এবার জিজ্ঞাসা করিল, 'উমা চটেছে কেন?'

'আজ্ঞে, আপনি সন্ন্যাস ছেড়ে দিলেন বলে।'

'সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম? সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম মানে?'

'সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন নি আপনি?'

'বিপিন বলেছে বুঝি?'

রত্নাবলী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, বলিল, 'তা ছাড়া, সন্ন্যাস না ছাড়লে গেরস্তের বাড়ী তিন রাত্রির বেশী বাস করছেন কি করে।'

সদানন্দের তীব্র দৃষ্টিপাতে রত্নাবলী মাথা হেঁট করে, সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। মহেশ চৌধুরী চোখ বুজিয়া হাঁটুতে হাত বুলায়। মাধবীলতা চাহিয়া দেখিতে থাকে সকলের মুখের দিকে।

হঠাৎ সদানন্দ বলিল, 'তাই বুঝি তুমি আজ আমায় প্রণাম করলে না?'

রত্নাবলী মাথা হেঁট করিয়া রাখিয়াই বলিল, 'আজ্ঞে না। আমার আজ কাউকে প্রণাম করতে নেই।'

'ওঃ!' বলিয়া সদানন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।—'আর কি বলেছে বিপিন আমার নামে?'

মহেশ চৌধুরী হাত জোড় করিয়া বলিল, 'প্রভু?'

সদানন্দ অধীর হইয়া বলিল, 'না মহেশ, আমায় শুনতে দাও। বলো রতন, বলো আর কি বলেছে বিপিন?'

রত্নাবলী বলিল, 'আমি আর কি বলব, ওতো সবাই জানে।'

'তবু তুমিই বল না শুনি।'

রত্নাবলী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি জানেন না কিছু?'

সদানন্দ বলিল, 'না। কি জানি না ?'

'তবে তো সত্যি নয় !'—খুব সম্ভব রত্নাবলীর বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায়, কিন্তু সেটা মুখে ভাল করিয়া ধরা পড়ে না, হাসি ছাড়া আর কিছুই রত্নাবলীর মুখে ভাল করিয়া পরিস্ফুট হয় না।—'ওমা, আমি তো সত্যি কিনা জানতেই ছুটে এলাম ! সত্যি নয় তবে ! কি কাণ্ড মা, এঁ্যা ! এমন করেও বলতে পারেন বিপিনবাবু !'

'কি ছ্যাবলামি করছ রতন ? কি সত্য নয় ? কি বলেছে বিপিন ?'

সদানন্দের ধমকে রত্নাবলী মুষরাইয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আর আমি তা উচ্চারণ করতে পারব না। সত্যি যখন নয়,—ছি ছি…'

কিন্তু আর কি এখন উচ্চারণ না করিলে চলে ? কদিন ধরিয়া আশ্রম আর বিপিনের কথা ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দের মাথা গরম হইয়া গিয়াছে, তার উপর রত্নাবলীর এতক্ষণের ভণিতা ! সদানন্দ সিধা হইয়া বসিয়া ডাকে, 'রতন !'—আর সে ডাক শুনিয়া ঘরের সকলের বুক কাঁপিয়া ওঠে।

'আমার দিকে মুখ করে বোসো।'

রত্নাবলী সদানন্দের দিকে মুখ করিয়া বসে।

'চোখের দিকে তাকাও আমার।'

রত্নাবলী সদানন্দের চোখের দিকে তাকায়।

'এইবার বলো।'

রত্নাবলী বলে, তবে বলার আগে চোখ নামাইয়া নেয়। প্রথমে আশ্রমে রটিয়াছিল সদানন্দ সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়াছে। তারপর কয়েকদিন আগে রটিয়াছে, সদানন্দ নাকি মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে। সন্ন্যাস ত্যাগ করার উদ্দেশ্যও তাই। খবরগুলি অবশ্য রত্নাবলী সোজাসুজি বিপিনের কাছে শোনে নাই। তবে আশ্রমে বিপিন ছাড়া এসব খবর আর কে ছড়াইবে ?

আশ্রমের কেউ আসে নাই কেন ? বিপিন একদিন আশ্রমের সকলকে একত্র করিয়া বলিয়া দিয়াছে, যে কারণেই হোক, সদানন্দ যখন কারও কাছে বিদায় না নিয়া আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া উচিত হইবে না। যতই হোক, এতদিন তো সদানন্দ তাদের শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ছিলেন ! যুক্তিটার জন্য যত না হোক, বিপিনের হুকুমের -

বিরুদ্ধে কেউ আসিতে সাহস পায় নাই। বিপিন এইরকম ভাবেই হুকুম দেয়। তা ছাড়া, মনেও সকলের প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। কয়েকজন খুব কাঁদিয়াছে।

সদানন্দ সিধা হইয়াই বসিয়া থাকে কিন্তু নিজেকে তার বড়ই দুর্ব্বল বড়ই অসহায় মনে হইতে থাকে। সে ছাড়া এ জগতে আর সকলেই কি অবস্থা বুঝিয়া হিসাব করিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া নিজের কাজ হাঁসিল করিয়া চলিতে পারে, সেই কেবল সব সময় ঠকিয়া যায়, না পারে গুছাইয়া কোন একটা কাজ করিতে, না পারে নিজেকে বিপদের হাত হইতে বাঁচাইয়া চলিতে? বিপিন যখন ওদিকে তার নামে নানা কথা রটাইয়া আটঘাট বাঁধিয়া নিতেছে, সে তখন ভাবিতেছে কখন বিপিন আসিবে হাতে পায়ে ধরিয়া তাকে ফিরাইয়া নিতে—অনুতপ্ত, লাঞ্ছিত বিপিন! বিপিন যে বলিয়াছিল বাস্তব জগতে তার কোন দাম নাই, কথাটা তো মিথ্যা নয়! কত হিসাব করিয়া বিপিন কাজ করে, প্রত্যেকটি সুযোগ সুবিধা কিভাবে কাজে লাগায়, সে শুধু বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবে। গৃহস্থের বাড়ী তিনরাত্রির বেশী বাস করা যে সন্ন্যাস ত্যাগের কত বড় একটা প্রমাণ সাধারণ মানুষের কাছে, আর এক্ষেত্রে সন্ন্যাস ত্যাগের কারণ হিসাবে মাধবীলতাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়ার উদ্দেশ্য যে কত জোরালো সমর্থক যুক্তি, কিছুই বিপিনের ভাবিতে বাকী থাকে নাই! আর এখানে আসিবার পরে তার শুধু একবার খেয়াল হইয়াছিল মাত্র যে, মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়াইয়া বিপিন কুৎসা রটনার সুযোগ পাইবে।

এখন সদানন্দ বুঝিতে পারে, এর চেয়ে কুৎসা রটানো ঢের ভাল ছিল। কারও কারও মনে একটু খটকা লাগিত মাত্র। মহেশ চৌধুরীর এ বাড়ীতে আজ কত যুগ ধরিয়া একটি পারিবারিক জীবনের ধারা বহিতেছে, বাড়ীতে গৃহিণী আছে, একটি বৌ আছে, মেয়েরা মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করে, এখানে মাধবীলতা আর সাধু সদানন্দের বাস করাটাই তো নিন্দনীয় হইতে পারে না। মাধবীলতার পিছনে পিছনে সদানন্দও মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইয়াছে, কুৎসার স্বপক্ষে শুধু এই যুক্তি। কিন্তু ও যুক্তি বাতিল হইয়া যাইত দু'দিনে, সদানন্দ যখন ঘোষণা করিয়া দিত আশ্রম সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—অনাচার ও ব্যভিচারে ভরা বিপিনের টাকা রোজগারের উপায় যে আশ্রম! কিন্তু বিপিন তার নিন্দা করে নাই, তার বিরুদ্ধে কোন

কথা বলে নাই, কেবল এত বড় সাধু যে সদানন্দ তার সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সংসারী হওয়ার ইচ্ছার জন্য বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। এ গুজবও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যাইবে, কিন্তু লোকের মনে একটা ছাপ থাকিয়াই যাইবে। কত কথাই মনে হইবে লোকের। কেউ ভাবিবে, কোন কারণে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। কেউ ভাবিবে, বিবাহটা বোধ হয় দরকার হইল না, বিবাহ ছাড়াই—

মাধবীলতা সদানন্দের সম্পত্তি, সদানন্দের কোন রোমাঞ্চকর গোপন সাধনার জন্য মাধবীলতাকে প্রয়োজন হয়, এসব কল্পনাও যে ইতিমধ্যে অনেকের মধ্যে দেখা দিয়াছে আশেপাশের গ্রামে, সে খবরটা সদানন্দ জানিত না। নিজে সাধু বনিয়া থাকিয়া সাধু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা যে কি রকম সে বিষয়ে সদানন্দের পরিষ্কার ধারণা নাই। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেও সাধু সন্ন্যাসীর কিন্তু আসিয়া যায় না, স্ত্রীও যদি সন্ন্যাসিনী সাজিয়া থাকে। তখন লোকে তাকে বলে 'মাতাজী' এবং ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া তার পায়েও প্রণাম করে। সাধু সন্ন্যাসীর নামে স্ত্রীলোক সংক্রান্ত কুৎসা বলিয়া কিছু হয় না। সাধু সন্ন্যাসী তো সামাজিক জীব নয়, সাধারণ মানুষ নয়। তাদের কথাই আলাদা। স্ত্রীলোক ছাড়াও তাদের সাধনা চলে, স্ত্রীলোক নিয়াও সাধনা চলে। যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, যে মুক্ত পুরুষ, তার আবার ব্যভিচার কিসের? কত বদমেজাজী সাধু থাকে, কথায় কথায় রাগে আগুন হইয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়, মারিতে ওঠে—কিন্তু সেজন্য কে মনে করে এই সাধুটি ক্রোধ রিপুর বশ, রিপুই যখন দমন করিতে পারে নাই এ আবার সাধু কিসের? রাগারাগি গালাগালির জন্যই বরং লোকের ভয়ভক্তি আরও বাড়িয়া যায়। কামও তো একটা তুচ্ছ রিপুমাত্র।

তবে জটা ভস্ম বিবর্জ্জিত, প্রচলিত কুসংস্কার ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রচারকারী আদর্শবাদী সাধু সম্বন্ধে লোকের মনে অনেক রকম খুঁতখুঁতানি থাকে। এসব সাধু চমকপ্রদ কিছু করে না কিনা, ওষুধ দেয় না, রোগ ভাল করে না, মরা মানুষকে বাঁচায় না, ভবিষ্যৎ গুনিয়া দেয় না, বৃষ্টি নামায় না, হিমালয়ের দুর্গম গুহায় দিন যাপনের কাহিনী শোনায় না, মাটির নীচে কিছুদিনের জীবন্ত সমাধির পর জ্যান্ত উঠিয়া আসে না—এক রকম কিছুই করে না। শুধু বলে, এই কোরো না, ওই কোরো না।

তবে সদানন্দকে লোকে অবিকল এই ধরণের সাধুর পর্য্যায়ে ফেলে না। সদানন্দের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি আর কার্য্যকলাপের বিজ্ঞাপন বিপিন আগে প্রচার করিয়াছিল।

সকলের আগে কথা বলিল মহেশ চৌধুরী।

'বিয়ের কথাটা মিথ্যে নয় মা। তবে বিপিনবাবু একটু ভুল শুনেছেন। সাধুর বিয়ে হবে আমাদের বিভূতির সঙ্গে।'

মাধবীলতার সঙ্গে সদানন্দের বিবাহের গুজব রটিয়াছে শুনিয়া সকলে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল, মহেশ চৌধুরীর কথা শুনিয়া চমকাইয়া গেল। সকলে এমনভাবে মুখ ফিরাইল মহেশ চৌধুরীর দিকে যে ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি লাগিল সকলেরই, বিভূতির পাট করা চুলের কিছু অংশ সিঁথির লাইন ডিঙ্গাইয়া ও পাশে চলিয়া গেল, মাধবীলতার কাণে বিভূতির মার আদর করিয়া পরাইয়া দেওয়া দুল দুটি কাণের সামনে আর পিছনে জোরে জোরে আঘাত করিয়া দুলিতে লাগিল, রত্নাবলীর এলো খোঁপা খুলিয়া গেল।

তারপর খোঁপা ঠিক করিতে করিতে রত্নাবলী বলিল, 'সত্যি ?'

মহেশ চৌধুরী হাসিয়া বলিল, 'সত্যি বৈ কি মা। এখন একটি শুভদিন দেখে—'

'দিন ঠিক হয় নি ?'

'বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে আর দিন ঠিক হতে কতক্ষণ লাগে মা ?'

অন্য সকলে এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এবার সদানন্দ বলিল, 'মহেশ ?'

'প্রভু ?'

সদানন্দ কিছুই বলিল না।

রত্নাবলী বলিল, 'কিন্তু তুই কি মাধু ? আমায় জানাস্ নি কিছু ?'

মাধবীলতাও কিছু বলিল না।

রত্নাবলী একবার এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মাধবীলতার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া এক রকম টানিতে টানিতেই তাকে সঙ্গে নিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তখন বিভূতি গম্ভীর মুখে ডাকিল, 'বাবা ?'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাও। কিন্তু এখন নাই

বা বললি ? ভেবে চিন্তে কথা বলতে কিছু দোষ আছে ? যদি কিছু বলার থাকে, কাল না হয় পরশু বলিস, কেমন ?'

বিভূতি খুব সম্ভব বলার কথাটা ভাবিয়া দেখার বদলে কথাটা এখনই বলিয়া ফেলিবে না ভাবিয়া চিন্তিয়া কাল পরশু বলিবে গম্ভীর মুখে প্রচণ্ডভাবে তাই ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দ বলিল, 'তোমার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না মহেশ।'

'প্রভু ?'

মুখখানা একবার একটু বিকৃত করিয়া সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, 'ঘরে গেলাম মহেশ। ঘণ্টাখানেক পরে একবার শুনে যেও।'

মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া বিভূতিও উঠিয়া গেল।

বিভূতির মা তখন বলিল, 'তুমি আর মেয়ে পেলে না ?'

'কেন, মাধু তো বেশ মেয়ে।'

'আমার অমন ছেলে, তার জন্যে কুড়ানো মেয়ে !'

'অন্য মেয়েকে তোমার ছেলে বিয়ে করলে তো। দ্যাখো, হয়তো শেষ পর্য্যন্ত না বলে বসবে। কথাটা ভেবে দেখতে রাজী হয়েছে, এইটুকু যা ভরসা। আমি তো ভাবলাম, মুখের উপরেই বুঝি বলে বসে—' চোখ বুজিয়া মহেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। পরক্ষণে চোখ মেলিয়া বিভূতির মার ডান হাতটি বুকের উপর রাখিয়া বলিল, 'এখনো বুক কাঁপছে দ্যাখো।'

রত্নাবলীকে আশ্রমের সীমানা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে গেল শশধর। এতক্ষণে মাধবীলতা যেন এতরাতে লুকাইয়া রত্নাবলীর একা এখানে আসার কারণটা বুঝিতে পারিল। একা আসিলেও তাকে যে কেউ পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে যাইবে তা কি আর রত্নাবলী জানিত না ? এবং সঙ্গে যে যাইবে তার শশধর হইতেই বা বাধা কি ?

অন্য সময় মাধবীর মনে ব্যাপারটা পাক খাইয়া বেড়াইত, আজ তার এমন একটা বিষয়েও মাথা ঘামানোর ক্ষমতা ছিল না। কি উদ্ভট মানুষ মহেশ চৌধুরী ! কেমন অনায়াসে বলিয়া বসিল বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে !

কাউকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করিল না। এক মুহূর্ত্ত আগে এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা কি কারও কল্পনাতে ছিল?

অথবা আগেই কথাটা সকলে আলোচনা করিয়াছিল, সেই কিছু জানে না? তাকে না জানাইয়াই সকলে তলে তলে বিভূতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে? কিন্তু, তাও কি সম্ভব।

কি হইবে এবার? মহেশ চৌধুরী তো যা মুখে আসিল বলিয়াই খালাস, ফলটা দাঁড়াইবে কি? সদানন্দ কি বলিবে? কি করিবে সদানন্দ? সদানন্দের সেদিনকার সেই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাধবীলতার মনে ভাসিয়া আসিতে থাকে; আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নেই, তোমাকে যে তা'হলে দ্বিচারিণী হতে হবে।'

সদানন্দের ভয়টাই মাধবীলতার মনে সব চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়। বিভূতিকে বিবাহ করার কথা সে কখনো ভাবে নাই, এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা তার কল্পনাতেও আসে নাই। আজ এ বিষয়ে মাথা ঘামানোই তার পক্ষে উচিত ও স্বাভাবিক ছিল সব চেয়ে বেশী, কিন্তু কথাটা যে বিবেচনা করা দরকার, নিজের মনে তারও যে এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করিয়া করিয়া ফেলিতে হইবে আজকালের মধ্যে, এটা যেন তার খেয়ালও হইল না। বিভূতির জীবন-সঙ্গিনী হইতে নিজে সে রাজী আছে কি নাই নিজেই সে তা এখনো জানে না। তবু সদানন্দ কি ভাবিবে, সদানন্দ কি বলিবে, সদানন্দ কি করিবে কল্পনা করিয়া সর্ব্বাঙ্গে যেন রীতিমত অপরাধমূলক ভয়ের ঢিপ্‌ঢিপানি অনুভব করিতে থাকে।

নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া মাধবীলতা ভাবিতেছিল, কে যেন পাশে আসিয়া বসিল সন্তর্পণে, চোরের মত। মুখ ফিরাইয়া মাধবীলতা দেখিল শশধরের বৌ। ঘোমটা কমাইয়া দিয়াছে, তবু কপাল প্রায় সবখানিই ঢাকা।

'দিদি?'

আজ সে প্রথম ঘোমটা কমাইয়া মাধবীলতার সঙ্গে কথা কহিল, এতদিন কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও মাধবীলতা তাকে কথা বলাইতে পারে নাই। হাত দেখিয়াই বোঝা যায় বৌটির রঙ খুব সুন্দর, মুখের রঙ আরও টুক্‌টুকে।

'ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে দিদি ?'

এমন সুন্দর মুখের এত আনন্দের কথা কি যে বিশ্রী শুনাইল বলিবার নয়। বৌটি ফোক্‌লা।

সদানন্দ বলে, 'তবে কি তুমি বলতে চাও, ওদের মধ্যে কোন কথাই হয় নি, বিভূতি আর মাধুর মধ্যে ?'

মহেশ বলে, 'আজ্ঞে না। তবে দুজনে বেশ ভাব হয়েছে সেটা তো বোঝাই যায়।'

সদানন্দ বললে, 'ভাব তো আর প্রণয় নয় মহেশ! দুজনে সর্ব্বদা মেলামেশা করছে, ওদের ভাব হওয়াটা আশ্চর্য্য কি। কিন্তু বিয়ে হল আলাদা ব্যাপার। সকলের সামনে কথাটা বলার আগে ওদের একবার জিজ্ঞাসা করা তো তোমার উচিত ছিল ? আমার সঙ্গেও তো পরামর্শ করতে পারতে একবার ?'

'সময় পেলাম না যে প্রভু ? আপনার নামে অমন একটা কুৎসিৎ কথা রটেছে শুনে মনে হল, বিয়ে যখন এদের হবেই, আর দেরী না করে মেয়েটিকে কথাটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। মাধুর সম্পর্কে আপনার নামে আর কোন কথাই তা'হলে উঠতে পাবে না।'

'বিয়ে যখন ওদের হবেই মানে ?'

'আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে বিয়েটা ওদের নির্ব্বিঘ্নে হয়ে যাবে প্রভু। ছেলেটার মাথাও একটু ঠাণ্ডা হবে, মেয়েটাও সুখী হবে।'

শুনিলে মনে হয় না, বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহ যে হইবেই সে বিষয়ে মহেশ চৌধুরীর কিছুমাত্র সন্দেহ আছে। কারও মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কারও সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই, যাদের বিবাহ দু'ঘণ্টা আগেও তাদের ইঙ্গিতেও ব্যাপারটা জানানো হয় নাই, তবু যেন মহেশ চৌধুরী জানে এ বিবাহ হইয়া যাইবে। রাগে সদানন্দের গা যেন জ্বলিয়া যায়। একটু ভয়ও হয়। মহেশ চৌধুরীর একগুঁয়েমির কিছু কিছু পরিচয় সে পাইয়াছে।

'জানো মহেশ, তোমার ব্যাপার ভাল বুঝতে পারছি না। বিভূতির একটা

বিয়ে দিতে চাও, ভাল কথা। কিন্তু মাধুর সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে? মাধু আশ্রমে এসেছে, সংসার ওর ভাল লাগে নি বলে, সেবা আর আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ওর জীবনটা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা। আমি ওকে দীক্ষা দেব, নিজে ওকে সাধনপথে চালিয়ে নিয়ে যাব। ওর বিয়ের প্রশ্নই তো উঠতে পারে না।'

'প্রভু?'

'তুমি বুঝতে পার না মহেশ, ও মেয়েটির মধ্যে খাঁটি জিনিষ আছে? আমি কি সাধে ওকে বেছে নিয়েছি! একদিন ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে, হাজার হাজার মানুষের জীবনে একদিন ও সুখশান্তি এনে দেবে। এমন একটা খাঁটি জিনিষ নষ্ট হতে দেওয়া যায়!'

'প্রভু?'

'বল না, কি বলতে চাও? আলোচনা করবার জন্মই তো ডেকেছি তোমায়।'

'বিয়ে না হলে মেয়েটির মন শান্ত হবে না, প্রভু। বিয়ের জন্ম মেয়েটি ছটফট করছে।'

সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'তোমায় বলেছে নাকি, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে দিন, বিয়ের জন্ম আমি ছটছট করছি মহেশবাবু?'

মহেশ হাত জোড় করিয়া বলে, 'আপনার তো অজানা কিছু নেই প্রভু! কেন মনে কষ্ট দিচ্ছেন আমার? কোন মেয়েই অমন করে বলেও না, পারেও না। কিন্তু মেয়েমানুষের মন কি বোঝা যায় না? রাজাসায়েবের ছেলে তো ওকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে বার করে এনেছিল।'

'ছেলেমানুষ হঠাৎ একদিন মনের ভুলে কি করেছিল—'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। নইলে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইতাম? বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছা মেয়েটির মনে প্রবল।'

'কিন্তু মহেশ—'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। বিয়েটা হয়ে যাক্, দুজনকেই আপনি দীক্ষা দিয়ে পায়ের তলে আশ্রয় দেবেন। যেমন চান তেমনি করে গড়ে তুলবেন দুজনকে।

আপনার কাজে দুজনে জীবন উৎসর্গ করবে। ওরা তো আপনারই সন্তান প্রভু ?'

সদানন্দের মনে হয়, মহেশ যেন তাকে ভক্তি মাখা চাবুক মারিয়াছে।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

* কয়েকজন মুখে এবং তিন জন পত্র লিখে আমায় অনুযোগ করেছেন, প্রথম দিকে সদানন্দ, মহেশ এঁরা সব 'করিলেন' 'বলিলেন'-এর পর্য্যায়ে ছিলেন, কয়েক সংখ্যা আগে থেকে এঁরা হঠাৎ 'করিল' 'বলিল'-এর পর্য্যায় নেমে গেলেন কেন? ব্যাপারটা আমার ইচ্ছাকৃত, অসাবধানতা নয়। 'আপনি', 'তুমি' এবং 'তুই'-এর সুবিধা অসুবিধার কথা অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম। চিন্তাগুলি এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমার ধারণা হয়েছে, গল্প উপন্যাসের কোন চরিত্রে আপনিত্ব এবং কোন চরিত্রে তুমিত্ব আরোপ না করাই লেখকের উচিত। প্রথমে সদানন্দ 'করিতেন' এবং বিপিন 'করিত'—অর্থাৎ বিপিনের চেয়ে সদানন্দ যেন লেখকের কাছে অধিক সম্মানের পাত্র! অবশ্য সাধারণের মনে সামাজিক জীবনে কার স্থান কোথায়, কার বয়স কত, এ সম্বন্ধে পাঠকের মনে ধারণা সৃষ্টি করতে 'আপনি' ও 'তুমি'র প্রয়োগ কিছু কাজে লাগে, কিন্তু সেটা খুবই সামান্য। চরিত্রগুলির প্রয়োজনীয় পরিচয় পাঠককে না জানালে তো আর চলে না, 'আপনি' ও 'তুমি'র বদলে কেবল 'তুমি'তেও সে কাজটা অনায়াসে চলে। ভবিষ্যতে আমার সমস্ত লেখার মধ্যেই নরনারীরা 'করিবে', 'বলিবে'......।

লেখক

ভারতীয় মূর্তবাদ

পরাধীন জাতির মস্ত বড় দুটো লক্ষণ হচ্ছে এই :—

(১) যা পছন্দসই হ'ল না তাকে 'বিদেশী' ব'লে ঘৃণা প্রকাশ করা ;

(২) নতুবা নবাবিষ্কারকে সামান্য ক'র্বার প্রচেষ্টায় তাদের নিজেদের অতীতে সেই মেধা খুঁজে ফেরা।

সাম্যবাদ আমার পছন্দ হ'ল না, দিলাম ঠেলে ওটাকে বিদেশীর গায়ে ; উড়ো জাহাজ যদি না পছন্দ হ'ল তো তাকে সোজা নিয়ে গেলাম ঢেঁকিশালায়। যুক্তির জন্য ব'ল্লাম, 'আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশির্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা', এসব পুষ্পকরথ ওরফে এরোপ্লেন না চড়্লে কেউ লিখ্তে পারে ? নারদ ছিলেন একটা মস্ত পাইলট্, অটোজাইরোতে আজ বৈকুণ্ঠে কাল কৈলাসে যেতেন। যোগবাশিষ্ঠতে বিমানচারীদের লড়াই আছে। ওসব ঢের আমাদের দেশে ছিল—কিন্তু ওসবের প্রতিক্রিয়াটা (অর্থাৎ বিষময় ফলটা) দেখ্ছেন তো ? তাইতেই না ঋষিরা আমাদের ধর্মের পথটা বাৎলে দিলেন ?

কথাটা কিন্তু একেবারে মিথ্যেও নয়। ধর্মের পথ বাৎলে দিয়েছেন ঠিকই। কেবল ধৃ ধাতু থেকে কি ক'রে বন্ধনে পৌঁছে গেলাম সেইটেই জানিনে। বিদ্যার প্রসার আর প্রচারটা অত্যন্ত সংকীর্ণ পথেই বেদাধ্যায়ীরা চালাচ্ছিলেন। জ্ঞানটা বড় সোজা ব্যাপার নয় ; সব জেনে-ফেলা বড় মারাত্মক। শাসন-কর্তাদের ঐটুকুই রক্ষা-কবচ—হাত ছাড়া ক'র্লেই মৃত্যু ! শম্বুকের মত যে সব বিদ্রোহী লুকিয়ে ঐ জ্ঞা-ধাতুর রহস্যটা জান্তে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে বশিষ্ঠের মন্ত্রণায় শাসনের হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দিতে হ'য়েছে—বাড়িয়ে যদি না দিয়েছে তো টেনে নিয়ে আসা হয়েছে। তাইতে যতদিন এই জ্ঞানকাণ্ডটা উত্তমপুরুষে আবদ্ধ ছিল ততদিন নিরাপদ ছিল, কিন্তু প্রথম পুরুষ অবধি ছড়িয়ে পড়্তেই ব্রাহ্মণেরা ত্রাহি ডাক ছেড়েছিলেন।

সব ব্যাপারে ঘরোয়া-বিবাদটাই ভীষণ। রাবণ শক্তি, কিন্তু তার ঘরে আছে বিভীষণ। এই বিভীষণের জোরে—অর্থাৎ রাবণ-পজিটিভের ভেতর

বিভীষণ-নেগেটিভ্ বড় হ'য়ে হ'য়ে রামের জয়ের সিন্থিসিস্ হ'ল। সিরাজের শক্তিতে ছিল সিপাইশালার মীরজাফর—ছ'য়ের স্থলাভিষিক্ত হ'ল ইংরেজ। বৈদিকযুগের সীমাবদ্ধ জ্ঞা-ধাতুর ক্ষেত্রে জন্মাল অসন্তোষ; তাই অসামঞ্জস্যরূপে গোকুলে বেড়ে বেড়ে একদিন অকস্মাৎ বুদ্ধের মত অপ্রতিহত শক্তিতে ফেটে পড়্ল।

গৌতমের জীবনে অদ্ভুত একটা শিক্ষা আছে। বৈদিকশিক্ষার নেতিতে অসন্তুষ্ট যুবরাজ-গৌতম ব্যবহারিক জগতের রূপ-পরিবর্তনের কারণ খুঁজ্তে যতদিন সংস্কারবশতঃ বৈদিক উপবাসের শুষ্কপথ ছাড়্তে পারেন নি ততদিন তাঁর পূর্বজ্ঞানই ফিরে এসেছে—অপূর্বজ্ঞান সেইদিনই হ'ল যেদিন স্নান ক'রে (অর্থাৎ পূর্ব সংস্কার সম্পূর্ণ মুছে ফেলে) অত্যন্ত নিষ্ঠায় তৈরী সুজাতার পায়স খেলেন। ব্রেণে যে অব্সেশান ঘুরে ঘুরে একই বৃত্ত আঁকছিল তা হঠাৎ রস-পুষ্ট হ'য়ে ভিন্নপথে উপ্চে পড়্ল। গৌতম বুদ্ধ হ'লেন। তিনি জান্লেন বাসনা থেকেই সৃষ্টি (creation) আর পুনঃসৃষ্টি (procreation)। কামই হ'চ্ছে সর্বমূলাধার। এই ক্রিয়ার নিবৃত্তি হ'লেই নির্বাণ—Nihilism.

বেদের বিরুদ্ধে এতবড় বিদ্রোহ আর ঘটে নি। আজও নয়। আজও আমাদের অতবড় সাহস নেই। বেদের বাইরে কোন কথা বলা তখন কত বড় পাপাচার ছিল পরবর্তী তার্কিকদের গালাগালে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। গৌতম অব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু গৌতমের শিক্ষা ভারতে ও পৃথিবীতে প্রচণ্ড বিপ্লব এনেছিল। মৃত বৈদিক সমাজ এই আঘাতে বেঁচে উঠেছে—বুদ্ধকে দশাবতারের এক অবতার ব'লে তাদের মান্তে হ'য়েছে।

নাগার্জুন প্রভৃতিকে বাদ দিলে বুদ্ধের এই নির্বাণতত্ত্বই বৌদ্ধশিক্ষাকে নির্বাণ দিয়ে গেল। নিষ্ক্রিয়তার আর বৈরাগ্যের ঝুলি কাঁধে ফেলে পৃথিবীতে দাঁড়াবার একতিল জায়গা রাখ্ল না। তাতে ভিক্ষুকের বংশই বাড়্ল—ভিক্ষু থাক্ল না একটিও। চলিষ্ণু স্পন্দমান প্রকৃতি এ সহ্য ক'র্তে পারে না—এল কাপালিকদের কপটাচার। বাসনার নিবৃত্তির পথ বেয়ে হঠাৎ কেমন ক'রে মাংসলোলুপতা এসে গেল। বুদ্ধের কল্পনায় ভিক্ষুণী পর্যন্ত ছিল না—ছিদ্রপথে তারা প্রবেশ করে তান্ত্রিকদের শবসাধনার প্রশস্ত রাজপথ খুলে দিল।

এলেন শঙ্কর। মণ্ডনমিশ্র আর উভয়ভারতীতে যে শেষ মাংসের গন্ধ

লেগেছিল তার খণ্ডনে শঙ্করকেও অপরের দেহ আশ্রয় ক'রে যৌনসম্ভোগ ক'রে আস্‌তে হ'ল। কিন্তু যে নির্বাণ বুদ্ধকে নিবিয়ে দিয়েছে ঠিক সেই মায়াবাদ—শঙ্করের পরম দুর্ভাগ্য—আমাদের জগৎকে কিনা সত্যিই মিথ্যে ক'রে দিল! এরই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ। শঙ্কর জগৎকে কোথাও মিথ্যে বলেন নি, আভাসিত ব'লেছেন, apparent ব'লেছেন, real বলেন নি, তাই এর সত্যিকার অস্তিত্বও স্বীকার করেন নি—ultimate stuff-টাকে চিন্‌তে গিয়ে, তারই সত্তা প্রমাণ ক'র্‌তে, তাকেই সৎ ব'ল্‌তে গিয়ে—সমস্তটাই অসৎ হ'য়ে পড়্‌ল!

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তফাৎ এইখানেই। আমরা জ্যামিতির স্রষ্টা, ইউক্লিড আমাদের শিষ্য; বীজগণিত আমাদের, আরব দেশের নামে অ্যাল্‌জেব্রা হ'য়েছে; পাটীগণিত আমাদের, বিদেশী নাম নিয়েছে মাত্র—জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, আরে, ওতো আমাদের—অর্থাৎ এ সবই আমাদের ছিল এই নিয়ে আমরা দম্ভ করি।*

কিন্তু গেল কেন শুনি?

পাঠান আমলে নাকি আমাদের অনেক পুঁথি গেছে, আর (বৌদ্ধ) নালন্দার সঙ্গে সঙ্গে নাকি আমাদের সমগ্র সংস্কৃতি গেছে। যেতে পারে; হয়তো গেছেও। কিন্তু কথাটা অর্দ্ধসত্য। একটু আগে ব'ল্‌লাম আরবেরা আমাদের এটা নিয়েছে, সেটা নিয়েছে, আজ সেই অস্ত্রশস্ত্র বুমেরাং-এর মত ঘুরে আমাদের

* Although we derive our names for Arithmetic and Geometry from the Greeks we must not forget that the Hindus independently cultivated these subjects, and it is from the Hindus that we derive our present numerical notation. The forms 1, 2, 3 etc., for the numbers are our copies of a variety of symbols used by the Hindus in their writings, and have in modern times replaced both the Greek method of using the letters of their alphabet for this purpose and the clumsy Roman numerals I, II, III, IV, etc. অ্যাল্‌জেব্রা সম্বন্ধে......actually the Hindus had brought this subject to a higher pitch of development than the Greeks, whose peculiar genius was more at home in Geometry. It was from the Hindus that the Arabs learnt this system and brought it to the west. When the Arab, Alkhowarazmi, wrote his treatise, he called it "al-jabr m' wa'l muquabalah"............("Al" is the definite article in Arabic)..............corrupting this into our "algebra".—The Nature of Mathematics, by James Rice.

বিঁধ্ছে। মুসলমান ধর্ম পৃথিবীর সর্বশেষ ধর্ম; এককালে বিশ্বের সংস্কৃতি বা সভ্যতা যদি কারও হাতে বেঁচে থাকে তো মুসলমানদের হাতে; কেবল বাঁচে নি পুষ্ট হ'য়েছে।* তাদেরও ছিল, হিন্দুদেরও ছিল; কিন্তু এই "ছিল" নিয়ে যখন কলিমুদ্দি আর পরাণমণ্ডল লাঠি উচিয়ে তোলে তখনই পরাজয়ের লজ্জা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। আর তা না হোক্, যে শিক্ষা একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিলুপ্ত হয় অথবা অন্য কোন নবাগত সভ্যতার হাতে পরাজিত হয় সে শিক্ষায় এমন কোন গল্তি ছিল যাতে তার আত্মরক্ষার উপায় ছিল না। শিক্ষা সংস্কৃতিরও বাইওলজি আছে, তার স্থিতির লড়াই আছে, সংস্কার আছে, রূপান্তর, রকমভেদ আছে এবং সর্বোপরি উৎকৃষ্টতরের জয় জয়কার আছে। এ স্থিতি-স্থাপকতা যার নেই তার মৃত্যু অনিবার্য্য। আমরা বলি, আমাদের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ জার্মাণরা নিয়েছে; ব'ল্তে কিন্তু আমাদের লজ্জার বালাই নেই; যেন এই নেওয়াটার মধ্যে আমাদের গৌরব। মোট কথা, আমরা অত্যন্ত তামাসিক হ'য়ে পড়েছিলাম, তার দণ্ড আজও শেষ হয় নি। অথবা প্রকৃতির এই-ই নিয়ম। ব্যবহারিক জগৎকে আভাসিত ব'লে জ্ঞানের ক্ষেত্রে রেখে দিলেই ভাল ক'র্তাম, তাতে আর কিছু না হোক্, জ্ঞানটাও থাক্তো, ব্যবহারিক জগৎটাও

* When the Athenian schools of philosophy were closed by Justinian many of the teachers migrated to Syria and Persia.........the Moors crossed over to Spain...... philosophy and science found their way back to Europe through Moslem channels.... The most important Moslem philosophers were Al Kandi (d. 870), Alfarabi (d. 950), Avicenna (980-1037), and Averroes (1126-1198)...Avicenna first gave prominence to the question of the relation between the universal and the particulars subsumed under it ...According to Averroes Matter is eternal......The soul of man is inseparable from his brain and perishes with it. Al Batani...carried on fruitful work in his observatory recalculating the precession of the equinoxes and preparing new astronomical tables. Ibn Yunus made important contributions to the study of solar and lunar eclipses. In medicine Rhazes of Baghdad and Avicenna did work of distinction. In physics Ibn-al-Haithan (965-1020) carried valuable experimental works in optics. Al Biruni (973-1048) determined the specific gravity of precious stones and Omar Khayyam wrote treatises on mathemetics. But of all the sciences chemistry perhaps owes most to Jabir, the father of scientific chemistry.—A Philosophic and Scientific Retrospect—by A. Wolf.

থাক্‌তো। আমার স্ত্রী একথালা ভাত নিয়ে আস্‌ছেন, এর সবটাই আভাসিত—সৎ নয়, ব'লে যদি উঠে পড়ি তবে তার দায় আছে। আভাসিত বস্তুকে সৎ না ব'ল্‌তে পারি, তাই ব'লে তাকে মান্‌বো না কেন? কাপড়টা সুতোর সমাবেশ, সুতোটা তুলোর পাক, তুলোটা আঁশের সমষ্টি, আঁশটা···ইত্যাদি ইত্যাদি, বর্তমান ভাষায় ইলেক্‌ট্রন-প্রটোন—ইলেক্‌ট্রিসিটি; তাহ'লে—কাপড়টা সদ্বস্তু নয় ব'লে ইলেক্‌ট্রিসিটির শক্‌ খাব নইলে দিগম্বর হব?

অথচ এই মারাত্মক পথই আমরা বেছে নিয়েছিলাম। সত্যি সত্যিই আমাদের দেশে নাগার উৎপাত কম নেই। অদ্ভুত! হয় নাগা হব—না হয় কুমারী-সম্ভোগে মোক্ষপ্রাপ্তি হবে—ব্যবহারিক জগৎ আভাসিত ব'লে কিছুতেই আমরা মাঝপথে চল্‌তে পার্‌ব না। উভয়ভারতী পরাজিত হ'লেন বটে এবং আধ্যাত্মিক দর্শনে শঙ্কর আজও বিশ্বে অপরাজেয় বটে, এমন কি নয়া বিজ্ঞান এই ব্রহ্মবাদ হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছে এও সত্যি, কিন্তু ব্যবহারিক জগতের দিক্‌ থেকে আমাদের মস্ত বড় সর্বনাশ হ'য়ে গেল। মূর্তবাদ তাই আমাদের দেশে অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে আছে—তাই সে আজ বিদেশী। কিন্তু ব্যবহারিক জগতের এই অনুত্তেজিত স্বীকার আমাদের দেশেও হ'য়ে গেছে। সে-সব দর্শনের ওপর অকথ্য অত্যাচার* হ'য়েছে এ বেশ বোঝা যায়; রামচন্দ্র জাবালিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, এ দর্শন ছিল বেদজ্ঞদের অস্পৃশ্য—বিজাতীয়। তাই যদিও বা কিছু পাওয়া যায় তাকে তর্ক-খণ্ডনে যথেচ্ছা-উদ্ধৃত অংশে বা ধ্বংসাবশেষে খুঁজ্‌তে হবে। সেইদিক্‌ থেকে এ-মতবাদ কিছু স্থূল। হোক স্থূল, তবু এ বিদেশী নয়, স্বদেশী।

ভারতীয় মূর্তবাদের মধ্যে কপিল সাংখ্য সর্বাধিক ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিক; তার আলোচনার জন্য ভিন্ন প্রবন্ধের প্রয়োজন। আমরা এখানে কেবল অন্যান্য উপেক্ষিত দর্শনতত্ত্বের উল্লেখ ক'র্‌ব। লোকায়ত দর্শন চার্বাকের নামের সঙ্গে

---

* তেমনি ওদেশেও—

......the general attitude of the Christian Church towards philosophy and science was decidedly hostile. In 390 Bishop Theophilus destroyed one of the libraries of Alexandria. In 415 Hypatia, the daughter of Theon the astronomer and herself the teacher of mathematics, was brutally murdered in Alexandria by a mob of Christian fanatics. And to crown it all the Emperor Justinian had all schools of philosophy closed in 529.—A Philosophic and Scientific Retrospect—by A. Wolf.

সংশ্লিষ্ট আছে এবং চর্ব মানে খাওয়া, তাই থেকে এর অত্যন্ত পাশবিক গন্ধ প্রচার ক'রতে বেদজ্ঞদের গায়ে লাগেনি। আসলে লোকায়ত-দর্শন হ'চ্ছে সেই দর্শন যা সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। এখানে এটা প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে মূর্তবাদ লোকায়ত (popular) দর্শন না হ'য়ে পারে না—ইংরেজী materialism-ও তাই বিশ্বের সর্বহারাদের একমাত্র সত্যিকার দর্শন। দর্শনের তর্ক না তুলে একথা ব'ল্লেই ঢের হবে যে যারা আধ্যাত্মিক নয়, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক নয়—নিছক ইহলৌকিক দুঃখে ধুঁক্‌ছে তাদের পক্ষে লোকায়ত দর্শন কেবল স্বাভাবিক নয়—জীবন-কাঠি। তাই ইহলৌকিক দুঃখ কষ্টকে সামান্য ও মায়া ব'লে যাঁরা ওড়াতে চেষ্টা করেন তাঁদের এই সাধুচেষ্টায় লোকায়তীরা যদি মতলব খুঁজে পায়ই তবে তাতে অনেক অখণ্ডনীয় ইহলৌকিক কারণই আছে। এ যেন সেই, দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় আর দাতা চিরং জীবতু; দরিদ্রকে পালন করা আর দান করা একটা মস্ত বড় পুণ্যের কাজ; পৃথিবীকে এত বড় পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা চলে না; কিন্তু দরিদ্র না থাক্‌লে দানের পাত্র থাকে না, অতএব দরিদ্র চাই আর দরিদ্র পাত্রকে রাখ্‌তে হ'লে দানকর্তা চাই; সরল বাংলায় দরিদ্র-পালনের (charity-র) জন্য চাই ধনিকশ্রেণী। এই দরিদ্রকে শিক্ষা দেওয়া হবে না, কারণ তাহ'লে তারা প্রশ্ন ক'রবে, প্রশ্ন ক'র্‌লেই অবাধ্যতা আস্‌বে—দুঃখ কষ্টের কথা উঠ্‌বে। তাইতে দরিদ্রকে অশিক্ষা বা অন্য প্রকার শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ'ল। বলা হ'ল, এ সংসারের রোগ-শোক দুঃখ-জরা ও সব কিছু নয়, পারলৌকিক সুখই সুখ, তারই জন্য যত্নবান্ হ'তে হ'বে; গরীব হবার অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে নিজের অবস্থায় অবহিত থাকাটাই হবে পুরুষকার—এর বেশী নয়। স্বভাবতঃই এ ধরণের দর্শন কার্যক্ষেত্রে বাতিল হ'য়ে যায় ব'লেই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অসাধুতাই এসে পড়ে বেশী; আর্ত লোকে এ নঙর্থক শিক্ষাকে সন্দেহের চক্ষে না দেখেই পারে না, কেবল শাসনের ভয়ে তাদের নিজেদের রক্ত মাংসের দর্শন নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। প্রসারের চেষ্টা যদি বা হ'য়েছে শাসক শক্তি একে ব্যাহত ক'র্‌বার জন্যে কোন ইহলৌকিক পাশবিকতার আশ্রয় নিতেই লজ্জা বোধ করে না। লোকায়ত দর্শন, মূর্তবাদ, মেটিরিয়ালিজ্‌ম্ তাই চিরকাল সাধারণের ভিতর অত্যন্ত আপন জিনিস—অত্যন্ত পপুলার দর্শন।

লোকায়ত পক্ষে তু তত্ত্বং ভূতচতুষ্টয়ম্।
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরিত্যেব নাপরম্॥ ১॥

লোকায়ত দর্শনের মতে ভূত (উপাদান—element) চার প্রকার। পৃথিবী (মাটী), জল, তেজ এবং বায়ু। আয়োনিয়ার গ্রীক দার্শনিক থালেস্ ব'লেছিলেন মূল উপাদান হ'চ্ছে জল (খৃঃ পূঃ ৬৪০-৫৫০) ; য়্যানাক্সিমেনেস ব'লেছিলেন বায়ু (খৃঃ পূঃ ৫৯০-৫২৫) ; য়্যারিষ্টটলের সময় (খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) লোকায়তদর্শনের ঐ চারটি উপাদান (ভূত) চল্‌তি ছিল ; য়্যারিষ্টটল ব'ল্‌লেন, মূল বস্তুর সঙ্গে মূল গুণের বিভিন্ন সমন্বয়ের ফলে বিভিন্ন আকৃতির উদ্ভূতি ঘটে। বৈভাষিক মতে—

প্রপঞ্চজাতমখিলং শরীরং ভুবনাত্মকম্॥ ৭॥
পৃথিব্যাস্থৈর্যরূপাদি দ্রবত্বাদি ভবেদপাম্
উষ্ণত্বং তেজসো ধাতোর্বায়ুধাতোস্তু শীততা॥ ১৪॥
এষাং চতুর্ণাং ধাতুনাং বর্ণগন্ধরসৌজসাম্—॥
পিণ্ডাজ্জাতাঃ পৃথিব্যাদ্যাঃ পরমাণুচয়া অমী॥ ১৪॥

প্রপঞ্চীকরণের ফলে এই অখিল শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে। স্থৈর্য (solidity) রূপ (forms) প্রভৃতি পৃথিবীর (মাটির) গুণ ; দ্রবত্ব জলের গুণ ; উষ্ণত্ব তেজের এবং শৈত্য বায়ুর গুণ। বর্ণগন্ধরস ও উষ্ণত্ব সমন্বিত ঐ চারটি ভূতের সমাবেশের ফলে পৃথিবী ইত্যাদির বিকাশ ; এগুলো পরমাণুর স্তূপ (পিণ্ড) মাত্র।

আয়োনিয়ানরা বস্তুর ওপর জোর দিয়েছিল, পাইথাগোরিয়ানরা দিয়েছিল আকৃতির ওপর, য়্যারিষ্টটল এদের যোগাযোগ স্থাপন ক'রে ব'ল্‌লেন বস্তু আর আকৃতি অচ্ছেদ্যভাবে বর্তমান—কেউ কাউকে বাদ দিয়ে নয়।

এ সমস্তই প্রত্যক্ষ। অপ্রত্যক্ষের স্থান লোকায়ত দর্শনে নেই।

প্রতক্ষ্যগম্য-মেবাস্তি নাস্ত্যদৃষ্টমদৃষ্টতঃ
অদৃষ্টবাদিভিশ্চাপি নাদৃষ্টং দৃষ্টমুচ্যতে॥ ২॥

প্রত্যক্ষ বস্তুই সৎ। অদৃষ্ট বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই কেন না তা দৃষ্ট হয় নি ; অদৃষ্টবাদীও বলে না যে অদৃষ্ট বস্তু দৃষ্ট হয়েছে।

বৈভাষিক মতে অবশ্য অনুমানের স্থান আছে।

প্রত্যক্ষত্বং তু বাহ্যস্য ক্বচিৎদেবানুমেয়তা ॥ ১ ॥

কিন্তু প্রত্যক্ষই হোক্ আর সামান্য অনুমানই হোক্ সৌত্রান্তিক মতে—

জ্ঞানজ্ঞেয়ং বিনা নাস্তি বাহ্যার্থোঽপ্যাস্তিতেন নঃ ॥ ১ ॥

বস্তু ছাড়া জ্ঞান হতে পারে না ; কাজেই আমাদের মতে বাইরের বস্তুও সৎ।*
এবং

বিষয়ত্ব বিরোধস্তু ক্ষণিকত্বেঽপি নাস্তি নঃ
বিষয়ত্বং হি হেতুত্বং জ্ঞানাকারার্পণক্ষমম্ ॥ ৭ ॥

বাহ্যবস্তুর সত্তা সম্বন্ধে ক্ষণিকের জন্যও আমাদের বিরোধ (সংশয়) নেই। কারণ বস্তু হওয়া মানেই জ্ঞানোম্মেষের কারণ অথবা ঘটনা হওয়া।

এই বস্তু কি তা বৈভাষিক বিবরণ দিচ্ছে—

পূর্বপরানুভাবেন পুঞ্জীভূতা সহস্রশঃ
পরমাণব এবাত্র বাহ্যার্থ ধনবৎ স্থিতাঃ ॥ ২ ॥
দূরাদেব বনং পশ্যন্ গত্বা তস্যান্তিকং পুনঃ
ন বনং পশ্যতি ক্বাপি বল্লীবৃক্ষাতিরেকতঃ ॥ ৩ ॥
মৃদো ঘটত্বমায়ান্তি কপালত্বস্তু তে ঘটাঃ
কপালানি চ চূর্ণত্বং তে পুনঃ পরমাণুতাম্ ॥ ৪ ॥

বাহ্যবস্তু আর কিছু নয় ; সহস্র সহস্র পরমাণু একত্র গ্রথিত ক'রেই এই বস্তু-পিণ্ড।† দূর থেকে বন দেখলাম কিন্তু সেই বনের কাছে এগিয়ে এসে আর তো বন দেখতে পেলাম না—কেবলই গাছপালা। বন কোথায় গেল? অর্থাৎ দূর থেকে যেটাকে বন আখ্যা দিয়েছিলাম সেটা আসলে কতকগুলি একক গাছ-পালার সমাবেশ মাত্র। তেমনি কাদার ঢেলা থেকে হ'ল মৃৎপাত্র, তা ভেঙে

* Nothing exists because it is known, but is known because it exists.

This is not because objects must adapt themselves to thought, but rather because thought has learnt to accomodate itself to its objects.—L. T. Hobhouse.

† The "atom" is properly applied only to the ultimate particles of a chemical element. The ultimate particle of a chemical compound which is, of course, formed of the combination of two or more elements, is properly termed a molecule.

—The Physical Nature of the Universe—by J. W. N. Sullivan.

হ'ল খোলামকুচি, তা আবার গুঁড়ো হ'য়ে হ'লো ধূলো, ধূলো মিশে গেল পরমাণুতে।*

পুদ্গল, ইংরাজী matter এবং আমাদের বাংলার বস্তু একার্থবাচক। এই পুদ্গল দুইভাবে অবস্থান করে, অণু আকারে আর স্কন্ধ বা সংহতাকারে। অণু অচ্ছেদ্য, অনাদি, মধ্যহীন এবং অনন্ত। অণু যে কেবল অতি ক্ষুদ্র তা নয়, শাশ্বত এবং মৌলিক। প্রাথমিক পুদ্গল একজাতি-বাচক হওয়ায় এবং অনির্দিষ্ট থাকায়, পরমাণুর সমস্ত ইন্দ্রিয়গোচর গুণ পরিণামের ফলে উদ্ভূত হ'য়েছে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন প্রায় ৪০ খৃষ্টাব্দের সমকালে পরমাণুতত্ত্বে জৈনদের অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। পরমাণুগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণতঃ পুদ্গলের এক কণা ঋণাত্মক হবে এবং অন্যটি ধনাত্মক হবে। তারা তাকে ব'লেছেন বিষম গুণযুক্ত।

---

* The atomic theoiy appears to have been first formulated by Leucippus (c 500-430 B. C.), but is usually associated with the name of his follower Democritus, who is consequently known as "the father of Physics." The atoms, in short, were regarded as the alphabet of the universe. The atoms are not inert but endowed with motion. The atoms moving about spontaneously in all directions get entangled with one another and so form composite bodies of all kinds, including the whole worlds. Under suitable conditions also such composite bodies collide with one another, and some of them break up again into separate atoms.—A Philosophic and Scientific Retrospect—by A. Wolf.

Cosmic evolution is a twofold process, creative as well as destructive, dis-similative as well as assimilative, katabolic as well as anabolic.—Positive Sciences of the Ancient Hindus—by Acharya Brojendranath Seal, p. 22.

In the Nyaya Vaiseshika......the atoms of the same Bhuta class are alike in themselves, homogeneous ; and the variety of substances comprehended under the same Bhuta is ascribed merely to the different arrangements or groupings of the atoms (ব্যূহ) and not of their components, for components they have none.

—ibid, p. 45.

Vachaspati and Udayana contend that among oils, fats, milk, etc., differences in flavour and odour imply differences in kind (জাতি) and in molecular structure, since it is only a variation in such structure that constitutes a variation in natural kind (অবয়ব সন্নিবেশ—তত্তৎসামান্যবিশেষাভিব্যঞ্জকসংস্থানবিশেষা)—ibid, p. 111.

কিং সংযোগমাত্রাদেব সংঘাতো ভবতি। আহোস্বিদস্তি কশ্চিদ্ বিশেষ ইতি। অত্রোচ্যতে। সতি সংযোগে বন্ধস্য সংঘাতোভবতীতি।……ন জঘন্য গুণাম্। …উক্তং ভবতা জঘন্য গুণবর্জানাং স্নিগ্ধানাং রূক্ষেণ রূক্ষাণাং চ স্নিগ্ধেন সহ বন্ধো ভবতীতি।…গুণসাম্যে সতি সদৃশাণাং বন্ধো ন ভবতি।…গুণবৈষম্যে সদৃশাণাং বন্ধো ভবতি ইতি।

এই পরমাণুর প্রকৃতি কি রকম ?

অনবরত পরিস্পন্দমানাপরিমিত পবনাদি পরমাণবঃ—পরিস্পন্দযুক্ত, endowed with motion। এই ঘূর্ণায়মান অবস্থায় তাদের মধ্যে থাকে জোড়া বাঁধবার একটা প্রেরণা।

পরমাণুর বিভিন্ন সমাবেশের ফলে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি।

বৈশেষিক মতে বস্তু ভেঙে গিয়ে সেই সমজাত পরমাণুতে পরিণত হয়, পরমাণুর গুণসম্পন্ন হয়। আবার তাদের নূতন সমাবেশ হয়। এই সমস্ত প্রক্রিয়াই উষ্ণতার প্রভাবে ঘটে থাকে।

এইদিক থেকে আমরা পাশ্চাত্য পরমাণুবাদ থেকে এর পার্থক্যই ধরতে পারি না। পরমাণু পাচ্ছি, বস্তুর বিভিন্ন সমাবেশে উপাদানের বহুলত্বের ইঙ্গিত পাচ্ছি, পরমাণুতে স্পন্দন বা motion পাচ্ছি, আকর্ষণ-বিকর্ষণ পাচ্ছি, ভাঙা-গড়ার খেলা পাচ্ছি—অর্থাৎ বস্তু আভাসিত ব'লে সদ্বস্তুর সন্ধানও মিল্‌ছে। কিন্তু ব্যবহারিক জগতের অত বড় জ্ঞানের ভিত্তি গড়েও আমরা বাঁচলাম না তো! মায়াবাদ প্রকৃতিকে পর্যন্ত গিলে খেয়েছে—বৌদ্ধদর্শনের প্রতি আমাদের এই বিদ্বেষ অভিশাপের মত আমাদের ভিৎ ধ্বসিয়ে দিয়েছে—বজ্র আট্‌কাবার টিকিও আমাদের রক্ষা ক'রতে পারেনি।

তবে এই যে চেতনে আর অচেতনে পার্থক্য দেখা যায়, তার কি জবাব হবে ? লোকায়ত ব'লছে, তারও জবাব আছে—

জড় ভূতবিকারেষু চৈতন্যং যত্তু দৃশ্যতে
তাম্বূলপূগচূর্ণানাং যোগাদ্রাগ ইবোত্থিতম্॥ ৭॥

জড় পদার্থের মধ্যে যে চৈতন্যের উদ্ভব ঘটে সেটা ঠিক পান-সুপুরি-চূণে যে রঙের

সৃষ্টি হয় তার মতো। অর্থাৎ ও তিনটের যোগাযোগে একটি ভিন্ন জিনিষের সৃষ্টি হ'ল তার নাম রং, যাকে বলে, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা।*

কেবল তাই নয়, অবিকশিত বা অপ্রকাশিত সত্তা সম্বন্ধেও ভারতীয় মূর্তবাদ কারও পেছনে ছিল না। সুপ্ত অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তা ছিল সজাগ। তাই কোন জিনিষ সত্তাবিহীন অবস্থা থেকে এলো—অর্থাৎ let there be light and there was light, এ কথা মূর্তবাদীরা মানতেন না। তাই মাধ্যমিক বৌদ্ধ দর্শনে পাই—

যদসৎকারণৈস্তন্ন জায়তে শশশৃঙ্গবৎ
সতাশ্চাৎপত্তিরিষ্টা চেজ্জনিতং জনয়েদয়ম্ ॥ ৮ ॥

যা আদৌ অসৎ তার সত্তা হ'তে পারে না। উদাহরণস্বরূপ খরগোসের শিং। যদি সদ্বস্তুর সৃষ্টি সম্ভব ব'লে গৃহীত হয়, তবে তার অর্থ হবে এই যা রয়েছে

---

* All things, even the so called mental and moral phenomena, follow from the laws and properties of matter —Cabanis (1757-1808)

Change by a spontaneous process, without external influence including isomeric change (স্বাভাবিক পরিণাম) ; e. g. milk—curd ; water—ice.

Change due to combination with other substances (দ্রব্যান্তরসংযোগ). Any new quality thus evolved is called সংহতভূতধর্ম।—Positive Sciences of the Ancient Hindus
—by B. Seal, pp. 89 90

মদশক্তিবৎ বিজ্ঞানং। পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি-তত্ত্বানি।
তেভ্য এব দেহাকার পরিণেতভ্যঃ মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে

—ibid, চার্বাক, p. 249

Buechner regarded life as generated spontaneously out of matter under certain conditions. (1824-1890)

Matter is the only ultimate realtiy, and all things, living as well as lifeless, conscious as well as unconscious, have evolved from it according to iron laws.—E. H. Haeckel (1834-1919).

At each stage there arise things with new characteristics, and at every stage there are new possibilities of further developments.—C. D. Broad (b. 1887).

Just as a "thing" is a synthesised event in the system of Relativity, so an organism is a synthesised section of history, which includes not only its present, but much of its past and even its future.—General F. C. Smuts (b. 1870).

তারই সৃষ্টি হ'ল। অর্থাৎ মূলতঃ কোন সৃষ্টি হ'ল না। আধুনিক বস্তুতন্ত্রের সঙ্গে এর চমৎকার মিল। বস্তু সৃষ্টি করা যায় না। লোকায়ত তাই বলছে—

শিখিনশ্চিত্রয়েৎ কো বা কোকিলান্ কঃ প্রকূজয়েৎ
স্বভাবব্যতিরেকেন বিদ্যতে নাত্র কারণম্ ॥ ৫ ॥

ময়ূরকে কে চিত্রিত করে; কে-ই বা কোকিলকে গান করায়? স্বভাব (প্রকৃতি) ছাড়া আর কোন কারণ নাই। প্রকৃতিই সমস্ত কিছু, আর যে সব কথা শোনা যায় বা প্রচার করা হয় সেগুলো অর্থহীন ও অবান্তর। সেইজন্য বৈভাষিক মতে—

অতিস্তুতিপরৈরুক্তো যস্তু বৈশিষিকাদিভিঃ
ঈশ্বরো নেষ্যতেঽস্মাভিঃ স নিরাক্রিয়তেঽধুনা ॥ ২২ ॥

বৈশেষিক ওঁরা যে ঈশ্বরের কথা বলেন, সে একটা অতিরিক্ত স্তুতিবাদ মাত্র। আমরা ও স্বীকার করি। ঈশ্বর অপ্রমাণিত হ'য়ে গেছে।

দেশে পিপীলিকাদীনাং সংখ্যাজ্ঞ কশ্চিদস্তি কিম্।
সর্বকর্তৃত্বমীশস্য কথিতং নোপপদ্যতে ॥ ২৫ ॥ বৈভাঃ

দুনিয়ায় যত পিঁপড়ে রয়েছে তাদের সংখ্যা কেউ কি জানে? ভগবান সমস্ত জিনিষের স্রষ্টা একথা প্রমাণ করা যায় না।

যদিস্যাৎ সর্বকর্তাঽসাবধর্মেঽপি প্রবর্তয়েৎ
অযুক্তং কারয়ন্ লোকান্ কথং যুক্তে প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ২৬ ॥ বৈভাঃ

তিনি যদি সকল বিষয়ের কর্তা হন, তবে তিনিই মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যান। (অযুক্ত) কুকার্য ক'রবার কারণ হ'য়ে তিনি লোককে কি ক'রে (যুক্ত) সুকার্যে প্রবৃত্ত ক'রতে পারেন?* আর যদি তিনি কেবল সুকার্যেই

* Evil is either caused by God or exists independently; but it cannot be caused by God, as in that case he would not be all-good, nor can it exist hostilely, as in that case he would not be all-powerful. If all-good he would desire to annihilate evil, and continued evil contradicts either God's desire, or God's ability, to prevent it. Evil must either have had a beginning or it must have been eternal; but according to the Theist, it cannot be eternal because God alone is eternal. Nor can it have had a beginning, for if it had it must either have originated in God, or outside God; but according to the Theist it cannot have originated in God, for he is all-good, and out of all-goodness evil cannot originate, nor can evil have originated outside God, for, according to the Theist, God is infinite, and it is impossible to go outside of or beyond infinity.—Humanity's Gain from Unbelief—by Charles Bradlaugh. pp. 28-29.

প্রবৃত্ত করেন তবে তিনি কেবল সুকার্যেরই কারণ, আর কোন নিয়মের কর্তা নন বা হ'তে পারেন না। যদি তা না হন তবে তিনি সমগ্রতার মাত্র একটা দিক্, তিনি অংশ মাত্র—পূর্ণ নন। পূর্ণ না হ'লে ভগবানত্ব ঘুচে যায়। তাঁকে আর সর্বকর্তা বলা চলে না।

কারয়েদ্ধর্মমাত্রঞ্চেদেকশাস্ত্র প্রবর্ত্তকঃ
কথং প্রাদেশিকস্যাস্য সর্বকর্তৃত্বমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥ বৈভাঃ

কেবল তাই নয়,

কর্মানুগুণদাতা বেদীশঃ স্যাদখিলোজনঃ
দানেস্বাতন্ত্র্যাহীনঃ সন্ সর্বেশঃ কথমুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥ বৈভাঃ

ভগবানকে যদি (জীব বা বস্তুর) কর্মানুসারেই দান ক'র্‌তে হয়, তবে সমস্ত জীব বা বস্তুই (অখিলজনই) ভগবান। দান সম্বন্ধে তাঁর স্বাধীনতাই যদি না থাক্‌ল তবে কি ক'রে তাঁকে সর্বনিয়ন্তা বলা চলে? * আরও প্রশ্ন এই—

প্রবর্ততে কিমীশস্তে ভ্রান্তবন্নিষ্প্রোয়োজনে
ছাগাদীনাং পুরীযাদের্বর্তুলী করণেন কিম্ ॥ ৩১ ॥ বৈভাঃ

* Curate—God gave man Liberty.

Doubter—Liberty to fall?

C—If Adam had chosen he might have stood upright; God gave him the noblest gifts. Through Adam's own fault he fell.

D.—Before Adam's fall, could he distinguish good from evil?

C.—No.

D.—How then could he choose between them?

C.—He had God's command to guide him.

D.—Do the commands of the omnipotent guide or compel?

C.—You forget man had free will.

D.—Do you mean that God being infinite, his will was everywhere omnipotent, but that in some places and under some circumstances Adam's will was stronger than that of God?

C.—No. I mean that omnipotent God allowed man to be free.

—Humanity's Gain from Unbelief—by Charles Bradlaugh. pp. 114-115.

ভগবান কি তবে বোকার মতো এমন কাজ করেন যা থেকে কোন ফল পাওয়া যায় না? ছাগ ও অন্যান্য জন্তুর পুরীষের আকার গোল ক'রে কি উদ্দেশ্য সাধিত হ'চ্ছে? তেম্‌নি

অজ্ঞাজন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ
ঈশ্বর প্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা ॥ ৩৩ ॥ বৈভাঃ

নিরীহ জীব (জন্তু) তার সুখদুঃখের কর্তা নয়, ভগবান-প্রেরিত হ'য়েই সে স্বর্গ বা নরকে পরিভ্রমণ করে। লোকায়তের মতে সেজন্য

ইহলোকাৎপরোনান্য স্বর্গোঽস্তিনরকা ন চ
শিবালোকাদয়ো মূঢ়ৈঃ কল্প্যান্তেঽন্যৈঃ প্রতারকৈঃ ॥ ৮ ॥

ইহলোক ছাড়া অন্য কোন লোক নেই। স্বর্গও নেই নরকও নেই। শিবলোক বা অমুকলোক এসব মূর্খ প্রতারকদের কল্পনা মাত্র।

স্বর্গ কি?

স্বর্গানুভূতিমৃষ্টাষ্টির্দ্ব্যাষ্টবর্ষবধূগমঃ
সূক্ষ্মবস্ত্রসুগন্ধস্রক্‌চন্দনাদিনিষেবণম্‌ ॥ ৯ ॥ লোকা

সুখাদ্য ভোজন, যুবতী নারীর সংসর্গ, সূক্ষ্মবস্ত্র, সুগন্ধি, মালা, চন্দন ইত্যাদি ভোগের নাম স্বর্গ। (!)

কমল ব'লেছিল, 'অতিরিক্ত সংযমও একরকম অসংযম, তার দণ্ড আছে।' ইহলোকে একেবারে সর্বহারা ক'রে দেবার এই দণ্ড সমাজকে বইতেই হবে। লোকায়তীরা বস্তুতঃ এত স্থূল নয়, কিন্তু পারলৌকিক ক্রিয়ার ওপর অতিরিক্ত জোরের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার এ বাড়াবাড়ি না হ'য়েই পারে না। কিন্তু নরক?

নরকানুভবো বৈরিশস্ত্রব্যাধ্যাদ্যুপদ্রবঃ
মোক্ষস্তু মরণং তচ্চ প্রাণবায়ু নিবর্তনম্‌ ॥ ১০ ॥ লোকা

অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সত্য বিবরণ। শস্ত্র, শত্রু এবং রোগজনিত দুঃখে আছে নরক-যন্ত্রণা। প্রাণবায়ুর স্তব্ধতাই মৃত্যু; মৃত্যুই মোক্ষ। পাতিব্রত্য ইত্যাদি বিধি সুচতুর দুর্বলেরা উপদেশ দিয়েছে। স্বর্ণদান, ভূমিদান, ভোজনের আমন্ত্রণের আনন্দ (ব্রাহ্মণ ভোজন!) বুভুক্ষ দরিদ্রের বিলাস মাত্র। আইনজ্ঞেরা

ভাত-চোরকে সাজা দেয়, শ্রম-চোরদের মাথায় তুলে নাচে। সমাজের পাণ্ডারা দরিদ্রের মধ্যে পাতিব্রত্য খুঁজে বেড়ায়—জমিদার জীবানন্দকে ভয় ক'রে চলে; অর্থনীতিবিদেরা ছোটলোকের বেহিসাবী খরচা খতিয়েই পি এইচ্ ডি হন, কিন্তু স্পেকুলেশন-রেসকোর্স-বাগানবাড়ী-পুতুলের বিয়ে তাদের চোখে ইন্‌ভেষ্টমেন্ট মনে হয়—ভোগের নৈবেদ্য নিজেরা কেড়ে খেয়ে দুর্ভোগের ডাষ্টবিন দরিদ্রের ঘাড়ে ফেলে দেয়। স্বর্গ নরকের বিকৃত ব্যাখ্যা আর শুষ্ক হিতোপদেশের রাজত্ব তো কম দিন চল্‌লো না। লোকায়তীরা বেদজ্ঞদের এই দর্শনতত্ত্ব সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌তেই তো পারে?

অতএব—

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যদণ্ডনীত্যাদিভির্বুধঃ
দৃষ্টৈরেব সদোপায়ৈর্ভোগা ন নু ভবেদ্ ভুবি ॥ ২৫ ॥ লোকা

অর্থাৎ No Sulphur, no thought.

এদেরকে আমাদের দেশে নাস্তিক বলা হ'য়েছে। নাস্তিক গালাগাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়; তখন তার মানে হ'চ্ছে ভগবানে অবিশ্বাসী বা যে ভগবানকে অস্বীকার করে। আসলে কিন্তু নাস্তিক তাদেরই বলা হ'ত যারা বেদকে তর্কবহির্ভূত গ্রন্থ ব'লে মান্‌তেন না।* বেদের গণ্ডী ছাড়িয়ে

* Atheism, properly understood, is no mere disbelief; is in no wise a cold, barren negative; it is, on the contrary, a hearty, fruitful affirmation of all truth, and involves the positive assertion of action of highest humanity.

—Humanity's Gain from Unbelief—by Charles Bradlaugh, pp. 24-25.

সমসাময়িক ইতিহাস:—

বুদ্ধ: জন্ম ৬২৩ খৃঃ পূঃ; Thales (c. 640-550 B.C.); Anaximenes (c. 590-525 B.C.); Anaximander (c. 610-545 B.C.); Pythagoras (c. 570-500 B.C.); Xenophanes (c. 570-480 B.C.); Parmenides (c. 540-480 B.C.); Zeno (c. 490-420 B.C.); Heraclitus (c. 540-475 B.C).

বুদ্ধের পর: Anaxagoras (c. 500-428 B.C.); Empedocles (c. 483-430 B.C.); Democritus (c. 460-370 B.C.). Leucippus (c. 500-430 B.C.); Socrates (469-399 B.C.).

অশোক: (২৭৪-২৩৬ খৃঃ পূঃ); Plato (427-360 B.C.); Aristotle (384-322 B.C); Euclid (330-275 B.C.); Aristarchus (310-230 B.C.); Archimedes (287-212 B.C.).

তাঁদেরকে অন্য একটি তথ্যের আবিষ্কার ক'র্‌তে হ'য়েছে। আর সে যে কত বিরাট গবেষণা সাংখ্যতত্ত্বে তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে পরাজিত হওয়াটাই যেদিন আমরা বরমাল্য ব'লে মান্‌তে লাগ্‌লাম, সেদিন সাংখ্যতত্ত্ব পর্যন্ত নাস্তিকতার দুর্নাম নিয়ে মরেছে। কিন্তু ম'র্‌তে ম'র্‌লাম আমরাই। আজ যে আমরা বেঁচে আছি এইটেই বরং দুর্ভেদ্য মায়া।

শ্রীপুলকেশ দে সরকার

সমুদ্রগুপ্ত: (৩৩০-৩৭৫ খৃষ্টাব্দ); St. Augustine (A D. 354-430)—Transition from Paganism to Christianity.

470—Epithalites' raid into India.

528—Mihirgula, (Epithalite) overthrown.

529—Justinian closed the schools at Athens.

570—Muhammad born.

পুস্তক-পরিচয়

After Many a Summer—by Aldous Huxley, (Chatto and Windus), 7/6.

একদা আঁদ্রে মেরোয়া বলেছিলেন যে অল্‌ডস্ হাক্স্‌লি পশ্চিমের বায়ুবিদ্ যন্ত্র : রুচির হাওয়া চুল পরিমাণ ঘুরলেও, তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাক খান। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা ; তখন উত্তরসামরিক য়ুরোপ বুদ্ধিবিলাসের আতিশয্যে প্রায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলো, এবং সকল মেধাবীই সমস্বরে রটিয়েছিলেন যে আত্মঘাতী অবিশ্বাস ছাড়া অপর কোনো মনোভাব তাঁদের আদৌ সাজে না। তারপর নিদারুণ ঝড়ে সে-অঞ্চলের সমস্ত উল্‌টে-পাল্‌টে গেছে ; সেখানকার প্রতিবাত পতাকার প্রত্যেকটি তো ধূলিসাৎ হয়েছে বটেই, এমনকি একটি ছিট্‌কে পড়েছে সাত সমুদ্রের পরপারে ন্যু মেক্সিকোর নির্ভার পরিমণ্ডলে যেখানে তার কোনো উপকারিতা নেই। তাহলেও হাক্স্‌লি-সম্বন্ধে উল্লিখিত তুলনা এখনো প্রযোজ্য ; এবং ইদানীং তিনি যদিও স্রোতের মুখে গা ঢেলে দেন না, তবু আজও ব্যারমিটর-নামক চাপমান যন্ত্রই তাঁর উপমান : আজ পর্য্যন্ত তিনিই আমাদের রিক্ত নির্ব্বেদের নিষ্প্রমাদ নিয়ামক ; অন্ততপক্ষে পাশ্চাত্ত্য চিত্তবৃত্তির অধিকাংশ বিকারই তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী মেনে চলে। তবে ইতিমধ্যে তাঁতে আর য়ুরোপে পার্থক্য ঘুচেছে, এখন তিনি সত্য সত্যই তাঁর দেশ ও কালের অদ্বিতীয় প্রতিনিধি ; এবং সেইজন্যে তিনি আর পিছিয়ে পড়ার ভয়ে সর্ব্বাগ্রে ছোটেন না, এ-যুগের মতিগতি তাঁর মজ্জাগত ব'লেই, তাঁকে চিনলে, আজকালকার সব কিছুই আমাদের নখদর্পণে আসে। ফলত নিত্য পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও তাঁকে সম্প্রতি একনিষ্ঠ লাগে, বোঝা যায় তিনি নিজেকে অন্যদের চেয়ে বিজ্ঞ ভেবে তাদের ঠাট্টা করছেন না বা আশু বিলুপ্তির ভয় দেখাচ্ছেন না, মানবসভ্যতার অবস্থা মুমূর্ষু জেনেই উজ্জীবনের উপায় খুঁজছেন তথা সতর্ক থাকতে প্রয়াস পাচ্ছেন।

অর্থাৎ আজ আর তিনি পাইলেট্-এর বৈহাসিক ছদ্মবেশ পরতে চান না ;

বরঞ্চ যেখানে সত্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে, সেখানে তিনি ভারতবর্ষীয় যোগীদের মতো দিগম্বর ; এবং স্বকীয় নাভির রহস্যোদ্‌ঘাটনে যুগ-যুগান্তর কাটিয়ে দিতে তিনি এখনো প্রস্তুত নন বটে, তত্রাচ চক্‌চকে জুতোর দিকে তাকাতে তাকাতে তিনি ইতিপূর্ব্বেই সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েছেন। অবশ্য মানুষী মূঢ়তার দৃশ্য তাঁকে চিরদিনই একসঙ্গে আকৃষ্ট ও বিকৃষ্ট করেছে ; এবং দুর্গন্ধ যেমন আমাদের কৌতূহল জাগিয়েই গা গোলায়, তেমনই মনুষ্যসমাজের কুকীর্ত্তি ও কলুষ তিনি দেখতেও ছাড়েন নি, আবার ভুলতেও পারেন নি। কিন্তু এ-বিষয়ে ফ্লোবেয়র-সুলভ নেতিবাদ আজকাল তাঁর সমর্থন পায় না, সম্প্রতি তিনি নিষ্ফল ঘৃণা ও অনীহ প্রত্যাখ্যান পেরিয়ে এক মরমী বিশ্বাসে পৌঁছেছেন ; এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তি লোকোত্তরে ব'লে, লৌকিক ভাষায় তার অভিব্যক্তি যদিও অসম্ভব, তবু তার তাৎপর্য্য আস্থাবানের বোধগম্য তথা অনুভূতিসাপেক্ষ। বস্তুত সকল দেশের সাধক সদা-সর্ব্বদা সে-বিশ্বাসের প্রশস্তি গেয়েছেন ; এবং সেই অবস্থাই কালাতীত কৈবল্য। সেখানে উঠলে, যে-আনন্দের উপলব্ধি ঘটে, তার আভাসমাত্র মর্ত্ত্যসীমায় দুর্নিরীক্ষ্য ; এবং ইষ্ট যেহেতু নির্ব্বচনগুণেই নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প, তাই সংসারের ক্ষয়-ক্ষতিতে তাকে ধরা যায় না, তার সাক্ষাৎ মেলে শুধু উক্ত অনন্ত শান্তির মধ্যে।

কিন্তু অনন্ত আর অফুরন্ত এক নয় ; এবং ইষ্ট যেমন ন্যায়ত খণ্ড অনুভূতির অতীত, তেমনই অনিষ্টকে তার মেয়াদ পেরতে দেওয়া অনুচিত। হয়তো এই দুই প্রত্যয়ের পরস্পরবিরোধ শুধু ভাষাগত, আসলে একটা অন্যের অর্থপূরণ করে না ; এবং উভয়েই নিজের নিজের অসম্পৃক্ত জগতে চ'রে বেড়ায়, কেউ কারো তোয়াক্কা রাখে না। সেইজন্যেই বার্নার্ড্ শ-র নির্দ্দেশে মানুষের আয়ু বহু গুণ বাড়াতে পারলেও, মনুষ্যজীবনের তুলামূল্য বদলাবে না ; বরঞ্চ কালের কৃপায় যে-অনিষ্ট আজ অবধি অপরিণত রয়ে গেছে, সময়ের অভাব না ঘটলে, তা এমন এক মূর্ত্তি ধরবে যে তাকে আর আঁটা যাবে না। অর্থাৎ মানুষ যদি সত্যই দুর্ম্মরতায় কার্প্-মাছের প্রতিযোগী হয়, তাহলে আমাদের ভিতরকার বানর মানুষের পদে উঠবে না, উল্‌টে বাইরের মানুষই প্রচ্ছন্ন বানরের পর্য্যায়ে নামবে। কারণ প্রাণিবিজ্ঞানের মতে বয়স্ক মানুষের শারীরিক অবস্থা ভ্রূণস্থ মর্কটের মতো ; সে পূর্ণ বিকাশের অবকাশ পায় না ব'লেই, তাতে আর

বানরে অনেক তফাৎ থাকে; দু-তিন শ বছর বাঁচলেই, উক্ত প্রভেদ ঘুচিয়ে সে অতিমানুষের শুভাগমন ঘনিয়ে আনবে। অন্ততপক্ষে পঞ্চম অর্ল্ অফ্ গনিষ্টর-এর ভাগ্যে অনুরূপ প্রতিষ্ঠাই লেখা ছিলো; এবং মার্কিনী ধনকুবের জো ষ্টোয়েট্ যে সেই কপিত্বপ্রাপ্ত অজ্ঞাতবাসীর পারিবারিক নথিপত্র কিনে বিদগ্ধ সমাজের ঈর্ষা জাগিয়েছিলো, সেও নর-বানরের সমন্বয় দেখে দম্‌লো না, কায়িক পরিতৃপ্তির আশায় সেই অতিজীবিত জন্তুর দৃষ্টান্ত মেনে নিলে।

বিধাতা জো ষ্টোয়েট্‌কে ঐহিক সম্পদ বিলিয়েছিলেন অকৃপণ হাতে; এবং বৃদ্ধ বয়সে সে তার নিষ্কপর্দ্দক যৌবনের শোধ তুলেছিলো ক্রোরপতিশোভন যথেচ্ছাচারে। সে থাকতো এক কন্‌ক্রিট্-নির্ম্মিত গথিক্ কেল্লায় যার বিস্তারে জুড়েছিলো একটা গোটা পাহাড়; এবং সেই মায়াপুরীর লিফ্‌টে ঝুলতো ভের্মিয়ের-এর সর্ব্ববিখ্যাত ছবি, বাগানে ছড়ানো ছিলো রিনেসেন্স্-এর প্রসিদ্ধ ভাস্কর্য্য, গুদামে পচতো পৃথিবীর যত অমূল্য পাণ্ডুলিপি। সেখানেই সে রেখেছিলো মিস্ ভর্জিনিয়া মন্সিপ্‌ল্-কে; এবং সে রূপবতীর মধ্যে সদিচ্ছা যেমন উপ্‌চে পড়তো, ধর্ম্মজ্ঞানেরও তেমনই নামগন্ধ দেখা যেতো না। জো ষ্টোয়েট্-এর অসংখ্য লাভজনক সম্পত্তির ভিতরে সব চেয়ে বেশি আয় আসতো এক আশ্চর্য্য গোরস্থান থেকে; এবং সেই তাজ্জব জায়গায় মুসলমানী স্বর্গকে মর্ত্ত্যে নামিয়ে এনে সে শুধু মুমূর্ষুদের টাকা নিজের ভাণ্ডারে ভরতো না, নিজেও মৃত্যুভয় ভোলবার প্রয়াস পেতো। কিন্তু অন্তঃসঙ্গতির অভাববশত এততেও তার লালসা মিট্‌তো না; বরং প্রতিবেশী মিষ্টর প্রপ্টর-এর অনাড়ম্বর জীবন তার ঈর্ষা জাগাতো। কারণ স্বভাবগুণেই মিষ্টর প্রপ্টর বাস করতেন পূর্ব্ববর্ণিত অনন্তলোকে; এবং সেইজন্যে তাঁর কাছে জো ষ্টোয়েট্-এর ধনৈশ্বর্য্য জেরেমি পার্ডেজ্-এর উদারনৈতিক প্রতর্কের মতোই হাস্যকর ঠেকতো। বরং এই দু জনের চেয়ে তাঁর শত গুণ ভালো লাগতো স্থূলবুদ্ধি পিটর বুন্-কে; এবং তিনি যদিচ জানতেন যে সে-বেচারার আদর্শ সাম্যবাদও আগা-গোড়া ভ্রান্ত, তবু তার অপাপবিদ্ধ সহৃদয়তায় তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না।

তবে তিনি সকলকেই অনুকম্পার চক্ষে দেখতেন, এমনকি জো ষ্টোয়েট্-এর গৃহপালিত ডাক্তার জিগ্‌মুণ্ড্ ওবিস্পো-কেও; কেননা তিনি বুঝতেন যে ওবিস্পো-র সয়তানী বিশ্বাসঘাতকতা জো ষ্টোয়েট্-এর স্বার্থপর ভোগবাসনার

অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তাছাড়া ওবিস্পো-র বিজ্ঞাননিষ্ঠা ছিলো ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্যেরও শ্রদ্ধাযোগ্য; এবং ষ্টোয়েট্-এর মৃত্যুভয়কে কাজে লাগিয়ে সে যদিও নিজের আর্থিক অবস্থা দস্তুরমতো ফিরিয়ে নিয়েছিলো, তবু ওবিস্পো কোনো দিনই টাকার লোভে মজে নি, সে অর্থসঞ্চয়ে মন দিয়েছিলো, পেশার চাপ না থাকলে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধা পাবে ব'লে। অর্থাৎ সে চাইতো শুধু জ্ঞান, নিরুদ্দেশ্য, নিরুপকার জ্ঞান; এবং সে-কথা সে নিজে জানতো না, ভাবতো যে দীর্ঘায়ুর উপায় খুঁজে সে অস্থায়ী মনুষ্যসমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধছে। কিন্তু মুখ্যত বিজ্ঞানসেবী হলেও, ওবিস্পো-র অবসর কাটতো কামকলার চর্চ্চায়; এবং সেইজন্যই সে যে-দিন শুনলে যে তার অনুসন্ধান নির্ভুল পথে চলেছে, পঞ্চম অর্ল্ অফ্ গনিষ্টর-ও কার্প্ মাছের কাঁচা পাকস্থলী খেয়েই কালের কবল এড়িয়েছিলেন, সে-দিনে আর নিত্য কর্ম্মে তার মন বসলো না, সে সারা বৈকাল অতিবাহিত করলে মিস্ মন্সিপ্ল্-এর দৈহিক সংসর্গে। ফলত জো ষ্টোয়েট্ অসময়ে বাড়ি আসতে, বেচারা পিটর বুন্-এর ঘটলো অপঘাত; এবং হত্যাকারীকে খুনের দায় থেকে বাঁচিয়ে অপরাধী ওবিস্পো জো আর ভর্জিনিয়া-র সঙ্গে গেলো ইংলণ্ডে অর্ল্ অফ্ গনিষ্টর-নামক অমর বানরের সাক্ষাৎকারে।

আমার সংক্ষেপসাধনে “আফ্টর মেনি এ সামর”-এর উৎকর্ষ নিশ্চয়ই অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হলো। কিন্তু উপাখ্যানটিকে আমি স্বেচ্ছায় আষাঢ়ে গল্পে বদলালুম না; সেজন্যে দায়ী স্বয়ং গ্রন্থকার। আসলে ঠিক এইখানেই তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব: প্রথমত অসম্ভব লাগলেও, কাহিনী যতই এগোয়, পাঠকের আদিম অবিশ্বাস ততই ক'মে আসে; এবং শেষে যখন বইখানির উৎকট উপসংহারে থামা যায়, তখন সে-দৃশ্য যেন চোখের সামনে থেকে সরতে চায় না, ভাবচ্ছবি আরো বেশি ক'রে পেয়ে বসে। অর্থাৎ পুস্তকখানির ছত্রে ছত্রে অতুলনীয় শিল্পচাতুরীর তথা আজন্ম অনুশীলনের স্বাক্ষর আছে; এবং আখ্যায়িকার প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেক উক্তি-প্রত্যুক্তি, স্বতন্ত্র সার্থকতা বজায় রেখেও বাকী সমস্তের সঙ্গে, অন্তত আপাতত, এমনই দুশ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ যে পরিকল্পনার রূপগত সুসঙ্গতি আখ্যানভাগের অঘটনসংঘটনকে অনায়াসে ভুলিয়ে দেয়। উপরন্তু চরিত্রগুলি কার্য্য-কারণের ধার না ধারলেও, প্রত্যেকেই অসাধারণ রকমের প্রাণবন্ত; এবং তারা যদিও ব্যক্তিবাচক নয়, জাতিবাচক, তবু সকলেই

নিঃসংশয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু এই পাত্রপাত্রীদের মধ্যমণি জেরেমি পর্ডেজ্; এবং সে যেহেতু হাক্স্‌লি-রই উন্নাসিক যৌবনের প্রতিমূর্ত্তি, তাই তাকে তিনি এক লুপ্তপ্রায় শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবেই আঁকেন নি, সে-আলেখ্য স্মৃতির হর্ষ-বিষাদে হয়তো তাঁর নিজের কাছেও মর্ম্মস্পর্শী লেগেছে। সর্ব্বোপরি হাক্স্‌লি এই পুস্তকে ডি-এইচ্ লরেন্স্-এর অশুভ প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, অবশ্য দেহ-সম্বন্ধে ভয়-ভক্তির লরেন্সী সংমিশ্রণ ছাড়া; এবং এখনো তিনি নভেলকে "দুঃসাহসিক ভাবুকতা"র উপলক্ষ্য ব'লেই ভাবেন বটে, কিন্তু নিজের চমৎকার বাগ্মিতা শুনতে শুনতে গন্তব্য হারিয়ে ফেলার অভ্যাস তিনি এখানে একেবারে কাটিয়ে উঠেছেন।

খুব সম্ভব এই আত্মসংযম তাঁর অজ্ঞাপনীয় আস্থার ফল; এবং সে-আস্থায় আজ সন্দেহের লেশমাত্র না থাকাতেই তিনি অকাট্য তর্কের দ্বারা নিজের অবিশ্বাস ভাঙেন না, এমনকি বিধর্ম্মীকে দলে টানার চেষ্টা ছেড়ে, নীরবে শিল্প-সৃষ্টিতে মন দেন। ফলে বর্ত্তমান উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরাও প্রতর্কের অবকাশ পাই না; এবং আজকালকার ভালো গ্রামোফোন্ রেকর্ডে যেমন অতিশ্রুতি শব্দতরঙ্গ শ্রোতার কানে না বেজেও শ্রুত সঙ্গীতের স্বরৈশ্বর্য্য বাড়ায়, তেমনই গ্রন্থকর্ত্তার অনুক্ত সিদ্ধান্ত তাঁর কথকতাকে ঘুলিয়ে তোলে না, পাঠকের অজ্ঞাতসারেই অতি তুচ্ছ কথাকেও অর্থগৌরবে গরীয়ান্ করে। তত্রাচ তাঁর বক্তব্য যখন আমাদের অগোচর নয়, তখন সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া সমালোচকের পক্ষে সমীচীন হলেও, অসম্ভব; এবং কবিতা-সম্পর্কে স্বাবলম্বী-বিশেষণটা খাটুক বা না খাটুক, এটা নিতান্ত নিশ্চিত যে গদ্য শুধু বিষয়গুণেই প্রশংসনীয়। উপরন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যে হাক্স্‌লি-ও আজ বীতশ্রদ্ধ; এবং নিজেদের নিরপেক্ষ শিল্পী বিবেচনায় যে-লেখকেরা মানুষী উদ্‌ভ্রান্তির বিচারে অনিচ্ছা দেখান, তাঁদের অবিবেকী আত্মশ্লাঘা তিনি আর সইতে পারেন না। সুতরাং তাঁর অকথিত আশা-ভরসার স্তবগান গেয়েই আমাদের নিষ্কৃতি নেই, যে-উপায়ে তিনি এখনকার অব্যবস্থিত সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আন্‌তে চান, তার উল্লেখও আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য; এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে মতান্তর প্রায় অনিবার্য্য। কারণ অশ্রুত সঙ্গীতের মতো অব্যক্ত বিশ্বাসও কালগত ক্ষয়-পরাজয়ের অধীন; এবং একবার তার সংক্রাম কাটলে, সকলেই

এক বাক্যে মানতে বাধ্য যে হাক্স্‌লি-প্রস্তাবিত প্রতিকার অপূর্ব্ব অথবা অব্যর্থ নয়।

কারণ আত্মসমাহিতি-নামক ত্রৈলোক্যচিন্তামণি সত্য সত্যই বহুপরীক্ষিত; এবং যুগে যুগে তা বিশিষ্ট ব্যক্তির উপকারে লাগলেও, তাতে বারম্বার জন-সাধারণের অশেষ অনিষ্ট ঘটেছে। অবশ্য শুধু সেইজন্যে যোগবিভূতি আমাদের অগ্রাহ্য নয়; এবং ধ্যান-ধারণা দুষ্কর ব'লেই, যদি সংসার থেকে তা নির্ব্বাসিত হয়, তাহলে জোর-জবরদস্তির বিপক্ষে প্লেটো যে-সব যুক্তি দেখিয়েছেন, তার পরেও এই বিংসবাদী বিশ্বে পশুবলকেই চিরদিন অপরিহার্য্য ঠেকবে। কিন্তু অহিংসার মতো সমাধিসাধনাও শুধু অবস্থাপন্নেরই সাধ্য; এবং যখন নিঃসম্বলের অর্থাভাব ঘোচাবার কথা ওঠে, তখনই যত গোল বাধে, তখনই বোঝা যায় অল্‌ডস্‌ হাক্স্‌লি অথবা জেরাল্‌ড্‌ হর্ড্‌-প্রমুখ নববিধানী ঋষিদের আপ্তবাক্য থেকে যে-নূতন সমাজব্যবস্থা জন্মাবে, তাতেও শ্রমবিভাগ অবিলম্বে বদলাবে চাতুর্ব্বর্ণ্যসূচক অধিকার ভেদে। তবে হাক্স্‌লি শুধু পরিবর্ত্তনের মাঝখানকার অবস্থাটাই জানেন না, তার আদ্যন্ত তাঁর নখদর্পণে; এবং আমাদের এই আগা-গোড়ার জ্ঞানটুকুও নেই, ধ্রুবের কথা কোন্‌ ছার। অতএব অসম্পূর্ণতার অপরাধ একা হাক্স্‌লি-কে অর্শানো উচিত নয়। আসলে উপস্থিত অব্যবস্থাকে তিনি কায়মনোবাক্যেই ঘৃণা করেন; এবং তৎসত্ত্বেও তিনি চোখ-কান বুজে অবস্থান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজী নন বটে, কিন্তু সম্প্রতি বিপ্লবীদের ডায়ালেক্‌টিক্‌ আত্মহত্যা দেখে যাদের বুদ্ধি বিগ্‌ড়োয় নি, তারা স্বভাবতই মানবে যে দুর্গতত্রাণ হঠকারী বা সুবিধাবাদীর ধর্ম্ম নয়।

সে যাই হোক, অন্তত অভিব্যক্তির দিক থেকে হাক্স্‌লি-র সমাজবোধ নিন্দনীয় নয়; এবং সত্যদ্রষ্টা হিসাবে তিনি পাঠকসাধারণের সাধুবাদ পান বা না পান, সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে তাঁকে আর উপেক্ষা করা যাবে না। এত দিন তাঁর বিরুদ্ধে এই নালিশ ছিলো যে তিনি প্রারম্ভে যতখানি সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার সমস্তটাই তো এখনো পর্য্যন্ত অপূর্ণ রয়েছে, বরং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বয়সের কথকালিও আর তাঁর সাধ্যে কুলোয় না। এবারে তিনি সে-অভিযোগ খণ্ডালেন; এবং তাঁর বক্তব্য আমাদের কাছে যতই খারাপ লাগুক না কেন, সে-বক্তব্য যে-ভাবসম্বেগের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তা ডান্‌-এর

উপযুক্ত, তাতে সুইফ্‌ট্‌-শোভন শ্লেষ আর প্রসাদ মিশিয়ে তিনি সত্যই এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ লিখেছেন। তবু এ-বই আমাদের আশ্রমবহুল দেশে পাঠ্য কিনা বিবেচ্য। কেননা অধ্যাত্ম জীবনের প্রয়োজনীয়তাই তার প্রতিপাদ্য বিষয়; এবং আমাদের দরকার সে-অনুপকারী আদর্শের মোহমুদ্‌গর রচনা। উপরন্তু এডিংটন্-জীন্‌স্-এর সংশয়বাদেই আমাদের ইংরেজিবিদ্ সন্ন্যাসীদের মধ্যে যখন অতখানি আন্দোলন দেখা গিয়েছিলো, তখন এই স্বতঃপ্রকাশ ভূমানন্দের সাক্ষাতে এখানকার বাক্যবাগীশ মরমীরা যদি বা নিজেদের গলা না ফাটান, তবু আমাদের কানে অতি অবশ্যই তালা ধরাবেন; এবং যেহেতু সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ চির দিনই বেশি, তাই তাঁদের সামলাতে পারলেও, তাঁদের শিষ্যেরা নিশ্চয়ই রক্ষা রাখবেন না।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীঅরবিন্দ (জীবন ও যোগ)—প্রমোদকুমার সেন প্রণীত
(দি কালচার পাবলিশার্স)

আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। লেখক গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহ শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও যোগ আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাকে কোন ক্রমেই যুক্তিতর্কবিহীন অন্ধ ভক্তের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্মজীবন ও তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন উভয়ই গ্রন্থকার যথারীতি বিশ্লেষণ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছেন। পুস্তকের ভাষাও মনোরম। লিখনভঙ্গী গুরুগম্ভীর; অথচ প্রাঞ্জলতার অভাব নাই।

গ্রন্থখানি দুইভাগে বিভক্ত, জীবন-কাহিনী ও যোগ-সাধনা। প্রমোদবাবুর সহিত শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। তিনি বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক নানা পুস্তক হইতে ঘটনাবলী ও উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার অঙ্কিত অরবিন্দ-চিত্রের রেখাপাত সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়াছে। তাহাতে পরিপ্রেক্ষার কোন দোষও দৃষ্ট হয় না।

এই মহাপুরুষের পূর্ণ জীবনচরিত লেখার সময় এখনও আসে নাই। তাঁহার জীবনের অনেক কথা আছে যাহা আজও বলা যায় না। বলিলেও মানুষে বুঝিবে না। উপরন্তু, লিখিবে কে? হয়ত তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্রবাবু ইচ্ছা করিলে লিখিতে পারেন। আর কাহারও কথা আমরা জানি না।

দিলীপবাবুকে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং বলিয়াছিলেন, No one can write about my life because it has not been on the surface for man to see.। ইহা অবশ্য যোগীবর তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন বিষয়ে, তাঁহার সাধনার বিষয়ে, বলিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার লিখিত পুস্তক, প্রবন্ধ ও পত্রাবলী হইতে তাঁহার সাধনাধারা সম্বন্ধে কতকটা কল্পনা করিতে পারা যায় বই কি! একটা ক্রমবিকাশের ধারাও বেশ স্পষ্টরূপে ধরা যায়। যাহা পারা যায় গ্রন্থকার তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার অভিনন্দন করিতেছি।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আমাদের অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। যে লোকে তাঁহার সহিত আমাদের সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল, তিনি এখন তাহা হইতে বহু উর্দ্ধতর লোকে বাস করিতেছেন। এই উর্দ্ধলোক সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। তথাপি একথা ভুলিলে চলিবে না যে তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনেও তিনি বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ যোগী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের আধুনিকতম চিন্তাধারা অনুধাবন করিতে করিতে অনেক সময়ে আমাদের মনে হইয়াছে এ রকম কথা ত তখনকার দিনেও শুনিয়াছি। তাঁহার রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রের কর্ম্মধারা ও যোগীজনসুলভ পারমার্থিক চিন্তাধারা এ দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিয়া বহুবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছি। তিনি বরাবরই উত্তর দিয়াছেন যে ভারত রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্রতা লাভ না করিলে ভারতীয় যোগসম্পদ্ দ্বারা জগতের উদ্ধার সাধিত হইবে না। কেন না পরাধীন ভারতের কথা কেহ শ্রদ্ধার সহিত শুনিবে না। এই ছিল তাঁহার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার প্রেরণা, যতদূর আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

আজ তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যকে হয়ত মুখ্য ব্যাপার মনে করেন না। তবে এখনও তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে বর্ত্তমান অধঃপতিত জগতের ত্রাণ একমাত্র ভারতের যোগবলই করিতে পারিবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি উর্দ্ধতম লোক হইতে অতিমানস শক্তির বা আলোকের আবাহন করিতেছেন।—তাঁহার আজিকার সাধনার যে এই লক্ষ্য তাহা প্রমোদবাবু উত্তমরূপেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই শক্তি জগতে অবতীর্ণ হইলে কোন দেশই আর পরপদানত থাকিবে না, ভারতও নয়, অপর দেশও নয়।

বাস্তবিক সূক্ষ্মদর্শী যোগীর চক্ষে ইউরোপীয় নমুনার রাষ্ট্রীয় আদর্শ সঙ্কীর্ণ

মনে হইবেই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ত সমগ্র মানব সংস্কৃতির এক অংশ মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনার তথাকথিত ক্রমবিকাশ আমরা শুধু এইটুকু দেখি যে আগে হয়ত তিনি ভারতের স্বাধীনতাকে মুখ্য ব্যাপার ভাবিতেন, কিন্তু এখন বুঝিয়াছেন তাহা গৌণ ব্যাপার মাত্র, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। ১৯০৬-৮ সালের অরবিন্দ যে সঙ্কীর্ণচেতা ইউরোপীয় নমুনার রাষ্ট্রবাদী ছিলেন এ কথা মানিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

তাঁহার ছাত্রজীবনের কথা স্বতন্ত্র। তখনও তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন নাই। শৈশবাবধি বিলাতে লালিত পালিত হওয়ার ফলে তিনি শিক্ষায় দীক্ষায় সাহেবই ছিলেন। তাঁহার তখনকার দেশপ্রেম সম্ভবতঃ ইউরোপীয় Patriotism-ই ছিল। লোকমুখে আমরা শুনিয়াছি, যে কেম্ব্রিজে তিনি বিপ্লববাদী ছিলেন। ইহা খুবই সম্ভব। বঙ্গভঙ্গের যুগেও তিনি হিংসা-পন্থী বিপ্লবের নেতা ছিলেন, ইহা অনেকে বলেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আদালতের বিচারে তিনি রাজদ্রোহ সম্বন্ধে বেকসুর খালাস পাইয়াছিলেন। আর হিংসাবাদ বলে কাহাকে? মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ কি হিংসাপন্থী ছিলেন? তাঁহার প্রিয় শিষ্য পার্থ কি হিংসাপন্থী ছিলেন? যদি তাঁহাদিগকে হিংসাবাদী বলা যায়, তাহা হইলে হয় ত ১৯০৮ সালের অরবিন্দকেও বলা যায়। নহিলে নয়। কেন না, অরবিন্দ যে চিরদিনই নিষ্কাম অনাসক্ত কর্ম্মী ছিলেন, এ তাঁহার অতি বড় শত্রুকেও কবুল করিতে হইবে।

শ্রীঅরবিন্দের বড়োদার জীবনযাত্রার কথা গ্রন্থকার পাইয়াছেন প্রধানতঃ দীনেন্দ্রবাবুর 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' হইতে। দীনেন্দ্রবাবু বাহির হইতে যাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। অরবিন্দের সরল অনাড়ম্বর চালচলন ও গভীর বিদ্যানুশীলনের তিনি সরস বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অরবিন্দ কিরূপে যোগ-সাধনার দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইলেন, তাহা দীনেন্দ্রবাবু বলিতে পারেন নাই। আজ যদি যোগীবরের বন্ধু কেশব রাও দেশপাণ্ডে জীবিত থাকিতেন তিনি হয়ত অনেক কথাই বলিতে পারিতেন। কিন্তু কয়েকমাস হইল সেই সাধকশ্রেষ্ঠ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অরবিন্দের অনুগত শিষ্য কাপ্তান মাধবরাও যাদব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি জীবিত থাকেন ও তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় ত প্রমোদবাবু তাঁহার নিকট গুরুবরের

আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ার দিকের অনেক খবর পাইবেন যাহা দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে।

বড়োদায় থাকার কালেই অরবিন্দ নর্ম্মদা তীরস্থ গঙ্গনাথ মঠের ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করেন। ১৯০৭ সালে আমরা যখন গঙ্গনাথ গিয়াছিলাম তখন ব্রহ্মানন্দজী তিরোহিত, তাঁহার শিষ্য কেশবানন্দ মহারাজ মঠাধ্যক্ষ, তাঁহার কাছে আমরা ব্রহ্মানন্দ ও অরবিন্দ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম। কেশবানন্দজী স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, অরবিন্দবাবু একদিন মস্ত বড় যোগী হইবেন। অরবিন্দকে ঐ অঞ্চলের সাধু সন্ন্যাসীরা কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম ছারোডীর সর্ব্বজনমান্য যোগী সাখরিয়া বাবার সহিত কথাবার্ত্তায়।

অরবিন্দ-জীবনের একটি ব্যাপার প্রমোদবাবুর সন্ধানে আসে নাই। ১৯০৫-৬ সালে, হয়ত তাহার এক বৎসর পূর্ব্বেই, যোগীবর উত্তর ভারতের কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে এক ভবানী মন্দির ও তাহার সংলগ্ন এক মঠ স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে এই মঠে দেবী মন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মচারীগণ সমবেত হইয়া দেশহিতার্থ নানামুখী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। এই কল্পিত মঠের সহিত রাষ্ট্রনীতির কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ শ্রীঅরবিন্দের ভবানীমন্দির নামক ইংরেজী ও বাঙ্গলা পুস্তিকা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অর্থ সংগ্রহেরও কিছু কিছু ব্যবস্থা হইল। আর তার পর অকস্মাৎ তিনি তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন, হয়ত দুই চারিজন জড়বুদ্ধি বন্ধু ও সহকর্ম্মীর প্ররোচনায়। তখনকার মত মঠ ও দেশহিতকামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সংঘটনের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। আজিকার পণ্ডিচেরী মঠের কর্ম্ম বা চিন্তাধারার সহিত কল্পিত ভবানী মঠের উদ্দিষ্ট কার্য্যধারার কোন সম্বন্ধ নাই। হয়ত শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় যে বিশাল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতেছেন তাহার প্রেরণা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আসিয়াছে শ্রীঅরবিন্দের তখনকার সর্ব্বত্যাগী নিষ্কাম কর্ম্মী-সংঘটনের কল্পনা হইতে।

১৯০৬ সালের পরে অরবিন্দ অতি সহজেই বঙ্গের প্রগতিশীল রাষ্ট্রীয় দলের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। জাতীয় বিদ্যাপীঠ পরিচালনা, দৈনিক বন্দেমাতরম্ পত্রের সম্পাদন, অগণিত সভা-সমিতি, সারা বঙ্গ জুড়িয়া কর্ম্মী সংগঠন ইত্যাদি

কার্য্যে সমস্ত দেহমন ঢালিয়া দিলেন। বাঙ্গালার লোক সত্ত্বগুণাশ্রিত সাধক যোগীর রাজসিক শক্তির বিকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। মাঝে মাঝে তাঁহার কথা শুনিয়া, মুখের ভাব দেখিয়া ক্ষাত্র ঋষি বিশ্বামিত্রের কথা মনে হইত। একদিন সরকারের চণ্ডনীতির কথার আলোচনা হইতেছিল। একজন কে বলিলেন, "বঙ্গ সরকার মনে করেন ত তোমাদিগকে কয়েকদিনের মধ্যে crush করতে পারেন।" অরবিন্দের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "Crush! We shall take a lot of crushing, sha'n't we— !"

আমরা কেহ কেহ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিতেছিলাম। বুঝিতে পারিতেছিলাম যে যোগীর হৃদয়কন্দরে একটা ভীষণ ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে। অবশেষে সুরত কংগ্রেসের পরে নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া ১৯০৮ সালের প্রারম্ভে অরবিন্দ যখন কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন, তখন তাঁহার শ্রান্ত অবসন্ন ভাব দেখিয়া আমরা প্রমাদ গণিলাম। বারীন্দ্র বাবু প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া তাঁহার গুরুবন্ধু লেলেকে কলিকাতায় আনাইলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ কাল লেলে ও অরবিন্দ গঙ্গাতীরস্থ এক নির্জ্জন বাগান বাড়ীতে একত্র রহিলেন। সেখানে লেলে কি উপায় প্রয়োগ করিলেন তাহা আমরা জানি না। তবে তাঁহারা যখন কলিকাতায় ফিরিলেন তখন অরবিন্দের ঘোলা চোখ, অবসন্ন মূর্ত্তি কতকটা চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের রাজসিক কর্ম্মতৎপরতা আর ফিরিয়া আসিল না। মে মাসে রাজদ্রোহের জন্য গেরেপ্তার ও পরে কারাজীবনের নির্জ্জনতায় আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ এ দুই ব্যাপারই যেন তাঁহার হৃদয়স্থ ঘাত প্রতিঘাতের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

জেল হইতে তিনি যখন বাহির হইলেন তখন পরিবেশ বদলাইয়া গিয়াছে। কর্ম্মযোগিন-এ অরবিন্দ লিখিলেন, পরিবেশ প্রতিকূল, বড় রকমের সংগঠন এখন করিতে পারিবে না, ছোট ছোট loose and elusive দল গঠন করিবে। নিজে লাগিয়া গেলেন দেশের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার কাজে। কিছুদিনের মধ্যে এ কার্য্যেও বাধা পড়িল। অরবিন্দ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ফরাসী রাজ্যে আশ্রয় লইলেন।

তারপর পণ্ডিচেরীতে আশ্রম স্থাপন ও যোগীবরের সাধনার চরম পরিণতি। প্রমোদ বাবু নবম পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ধারা বিশদ ও প্রাঞ্জলরূপে

বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিব না, কেন না তত্ত্বানুশীলনের উচ্চতর স্তর-সমূহ আমাদের অনধিগম্য। অন্ততঃ অনধিগত ত বটেই। আমরা বৃন্দাবনের কানুর দরিদ্র রাখাল সখা। পার্থসারথির যোগ-সম্পদের কথা কি জানি! কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে অরবিন্দ ধর্ম্ম-এ লিখিয়াছিলেন, "ভারতের শক্তি অন্তর্মুখী হইয়াছে। যখন আবার বহির্মুখী হইবে, আর সে স্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সেই ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া অমৃতস্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।"

"ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তি-প্রদর্শন এবং জগতময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার।"

এই ইঙ্গিত অনুযায়ী শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণভাবে যোগজীবন গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বর উপলব্ধি কারাবাসেই তাঁহার ঘটিয়াছিল, কিন্তু যোগীবর তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। আজ বহু বৎসর ধরিয়া একাগ্র সাধনায় মগ্ন রহিয়াছেন, ঊর্দ্ধলোক হইতে অতিমানস দিব্যশক্তির অবতারণা পূর্ব্বক জগৎ উদ্ধারের পন্থা সুগম করিবেন। একাধিক রাষ্ট্রীয় নেতা তাঁহাকে আবার কর্ম্মক্ষেত্রের কোলাহলের মাঝে নামাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। যেদিন অন্তর্মুখী ভারতের শক্তি আবার বহির্মুখী হইবে সেদিন সকলে দেখিবে, বুঝিবে, যে কি মহাসাধনায় এই মহাযোগী এতকাল নিমগ্ন ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার দেশবাসী কি করিবে! ভবানী মঠের পুস্তিকায় অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, "আর কিছু না দাও, সরল প্রাণে প্রার্থনা করিয়া আমার সহায়তা কর।" আজ আমরা যদি সমাহিত হইয়া সকলে ভগবানকে ডাকি ত তাহা নিশ্চয়ই নিষ্ফলে যাইবে না।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "জেলে থাকিতে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা ব্রহ্মোপলব্ধি। কিন্তু এই উপলব্ধিতে তিনি তৃপ্ত হইলেন না, এই উপলব্ধি হইল * * * তাঁহার পূর্ণযোগের ভিত্তি। তিনি পরম জ্ঞান পরম প্রেম পরম শক্তির আধারের পূর্ণ সত্তাকে মানব আধারে বিকাশ করিবার ব্রতে ব্রতী হইলেন এবং তাঁহার সংকল্প হইল দিব্যের তুরীয় আলোকে মানব জীবনকে আলোকিত করিয়া দিব্য শক্তির সহায়তায় তাহার রূপান্তর করা।"

কেবল বুদ্ধির সাহায্যে এই সাধনার রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। কি উপায়ে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে তাহা স্বয়ং গুরু ছাড়া আর কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। নানা পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার নিগূঢ় সাধনার আভাস দিয়াছেন। এই সাধনার প্রতিকূল সমালোচকেরও অভাব নাই। এরূপ কথাও শোনা যায় যে বুদ্ধ খৃষ্টাদি যুগাবতার যাহা পারেন নাই অরবিন্দ তাহা কিরূপে করিবেন! কিছুই হইবে না, যতদিন জগৎ থাকিবে ততদিন লাজ মান রাগ ভয় হিংসা দ্বেষ থাকিবে। কিন্তু ইহা ত পঙ্গুর কথা! যাঁহারা জগতের পুরুষ-সিংহ তাঁহারা চিরদিনই লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া আপন তালে কাজ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দও করিতেছেন। তিনি নবীন যুগের প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে তর্ক বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া তপঃসিদ্ধ মহাযোগী অসাধ্য-সাধনের ব্রত মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে নতশিরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ত কঠিন কাজ নয়! কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তবেই ধর্ম্মের জয় সম্ভব হইয়াছিল। আজ অরবিন্দ তাঁহার মোহান্ধ দেশবাসীকে অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়া তাহাকে আবার সেই মহান্ মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য যোগাসনে বসিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস যোগীবর দিব্যালোকের আবাহনে কৃতকার্য্য হইবেন, জগতে ধর্ম্মের জয় হইবে। ইতিমধ্যে আমরা পাঠককে মাত্র এইটুকু বলিতে পারি, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

পরিশেষে একটি কথা বলিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ লেখার সার্থকতা আমরা বুঝিলাম না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Language and Reality—by Wilbur Marshall Urban, (George Allen & Uwin Ltd.), 21s.

দার্শনিক মহলে সুপরিচিত Library of Philosophy-তে প্রকাশিত আলোচ্য পুস্তকখানি অধ্যাপক আরবানের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করবার পক্ষে সাহায্য করবে। মূল্যবোধ বিষয়ে তাঁর রচনাবলী প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত; 'The

Intelligible World' বইখানিতে তিনি যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, আলোচ্য গ্রন্থখানি তারই পরিণতি। অবশ্য ভাষা ও প্রতীকবাদ সম্পর্কে বিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক ক্যাসিরারের প্রামাণ্য গ্রন্থ দ্বারা আরবান খুবই প্রভাবিত হয়েছেন, সন্দেহ নাই ; আর সে কথা তিনি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করে নিতেও কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু যে পটভূমিতে তিনি ক্যাসিরারের গবেষণাকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বিশিষ্ট প্রয়োগ করেছেন, তা তাঁর নিজস্ব ; কাজেই যাঁদের আরবানের পূর্ব্ব প্রকাশিত লেখার সঙ্গে পরিচয় নাই, বিশেষতঃ তাঁর উল্লিখিত বইখানা যাঁরা পড়েন নাই তাঁদের পক্ষে এই বইখানির মূল সূত্র নির্দ্ধারণ করা হয়তো একটু কষ্টকর ; অবশ্য রচনার প্রসাদগুণে এ বাধা দুর্লঙ্ঘ্য বলে পাঠকের মনে হয় না। আর যেখানে যেখানে তাঁর আগেকার বইয়ের আলোচিত বিষয়ের উল্লেখ আছে, সেই সব যায়গায় কিছু পূর্ব্বানুবৃত্তি ও পুনরুক্তির ফলে পাঠকের বইখানির মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয় না।

ভাষা, প্রতীক ও সাঙ্কেতিক সম্বন্ধে দার্শনিক প্রশ্ন ভিয়েনার নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদীদের মহলে খুব বেশী আলোচিত হয়েছে ; আর এই নব্য মতবাদ এখন প্রায় প্রত্যেক সভ্যদেশের দার্শনিকদের মধ্যে অনেক বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি করেছে। নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদীদের মতে তথা-কথিত Metaphysics বা তত্ত্ববিজ্ঞান অসম্ভব, অযৌক্তিক ও শেষ পর্য্যন্ত অর্থহীন শব্দসমষ্টি মাত্র। আর এর প্রতিষ্ঠাভূমিতে রয়েছে ভাষাগত জটিলতার বিশ্লেষণের অভাব ; কাজেই দার্শনিক বিশ্লেষণ, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদীদের মতানুযায়ী বিশ্লেষণ যত বেশী প্রসার লাভ করে ততই তত্ত্ববিজ্ঞানের অসম্ভাব্যতা পরিস্ফুট হতে থাকে। অন্য কথায় বলতে গেলে বাক্যের অপব্যবহারই তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রাণস্বরূপ ; কাজেই যখন বাক্যকে বাক্যাভাস থেকে আলাদা করে বুঝবার মত বিশ্লেষণের সাহায্য গ্রহণ করা হবে, তখন তত্ত্ববিজ্ঞানের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদ হিউমের মতবাদের ও কাণ্টীয় ডায়ালেক্‌টিকের নেতিবাচক সিদ্ধান্তের চরম পরিণতি মাত্র ; আর যাঁরা এ নব্যতন্ত্রের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন, তাঁরাও এর অনেক গুরুতর দোষ ত্রুটী দেখিয়েছেন ; দৃষ্টান্ত স্বরূপ Weinberg-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত

সত্যের গণিতের সাঙ্কেতিক ভাষায় রূপান্তরিত পরিণামের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষবাদীরা দিতে পারলেও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যার প্রয়োগ অসম্ভব বলেই অনেক সমালোচকের ধারণা। আর বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করলেও কোথাও কোথাও বিজ্ঞানের প্রত্যয়গুলির পরিবর্ত্তন সাধন প্রত্যক্ষবাদীদের পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে পড়াতে তথাকথিত তত্ত্ববিজ্ঞানের সঙ্গে এ নব্য মতবাদের কোন মৌলিক পার্থক্য আছে কি না, তাও আলোচনার বিষয় হয়ে পড়েছে। তারপরে দার্শনিক মতবিরোধের চিরন্তন ইতিহাসের চূড়ান্ত উপসংহারের যে প্রচেষ্টা নব্য প্রত্যক্ষতন্ত্রের মূলসূত্র স্বরূপ, তাকে ব্যঙ্গ করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এ নব্য দর্শনের বিভিন্ন দল উপদল ও তাদের মধ্যে সেই সনাতন সজ্বর্ষের শোচনীয় পুনরাবৃত্তি।

অবশ্য ভিট্‌গেনষ্টাইনের Tractatus Logico-philosophicus গ্রন্থের শেষাংশ ও পরবর্ত্তী লেখার ভিত্তিতে একথা বলা হয়ত অসঙ্গত নয় যে মনোবিকলন যেমন মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রত্যক্ষবাদও সেই রকম ন্যায়বিকলন বা তত্ত্বজিজ্ঞাসা ব্যাধির চরম ঔষধ বিশেষ। নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষ-তান্ত্রিক বিশ্লেষণের ফলে যখন মানুষ দেখতে পাবে যে তত্ত্বজিজ্ঞাসার মূলে ভাষা বিভ্রাট ছাড়া কিছুই নাই, তখন এই শব্দ-বিন্যাসবিলাসী দার্শনিক বাগাড়ম্বর-প্রবৃত্তির অবশ্য বিলোপ ঘটবে, আর তত্ত্ববিজ্ঞানের স্থান হবে প্রাচীন অতীতের যাদুঘরে। প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব-বিজ্ঞানের স্থান আছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য ডায়ালেক্‌টিক বস্তুতন্ত্রের সঙ্গে নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদের হয়তো শেষ পর্য্যন্ত মতান্তর ঘটবে না, যেমন রাষ্ট্রলুপ্তি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সাম্যবাদের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু সাম্যবাদী যেমন তাই বলে রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্তের বৈপ্লবিক চেষ্টায় জলাঞ্জলি দিয়ে নৈরাজ্যতান্ত্রিক বিলাসের কোলে ঢলে পড়তে পারেন না, বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিকও তেমনি বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শ অনুযায়ী বৈপ্লবিক বিশ্বদৃষ্টি পরিহার করে ও প্রত্যক্ষবাদের শতধাবিচ্ছিন্ন আণবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আবদ্ধ হয়ে চিন্তাজগতে নৈরাজ্যের আবাহন করতে পারেন না।

দার্শনিক ভাবাদর্শের ক্ষেত্রেও ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের অন্তর্বিরোধের ছায়া পড়েছে।

কার্য্যত সামাজিক বৈষম্যের সংরক্ষক বা সমর্থক ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের দার্শনিক রাজ প্রতিনিধি ভাববাদ যেমন একদিকে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে তেমনি বৈপ্লবিক সম্ভাবনাময় বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শ সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমপরিণতির ফলে নব্য বস্তুতন্ত্ররূপে ক্রমে শক্তিসঞ্চয় করছে। যখন নূতন সামাজিক পরিস্থিতির ফলে ভাববাদের অহিফেন সেবনের বিরুদ্ধে মানুষের চিত্তবৃত্তি বিদ্রোহ করে, তখন বস্তুবাদের বৈপ্লবিক আঘাতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার পক্ষে সরকারী ভাবাদর্শের হিউমপন্থী প্রত্যক্ষবাদের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই প্রত্যক্ষবাদ ও সংশয়বাদেরই এক প্রাক্তন পর্য্যায়ের বিরুদ্ধে লেনিন তাঁর Materialism and Empirio-Criticism গ্রন্থে লেখনী চালনা করে গিয়েছেন। আধুনিক নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদ তদানীন্তন মাখ্ ও এ্যাভেনেরিয়াসের মতবাদের চেয়ে সূক্ষ্মতর ও এর প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারিত। কারণ, যদি শেষ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকে সুসম্বদ্ধ করে কোন রকম দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পদ্ধতিমাত্রেই অযৌক্তিক শব্দবিভ্রম বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে বৈপ্লবিক বিশ্বদৃষ্টিও শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বা তথাকথিত তত্ত্ববিজ্ঞানের কোঠায় গিয়েই পড়ে; সুতরাং এখানে যুক্তি বা তর্কের একান্ত স্থানাভাব, বিশ্বাসই একমাত্র সম্বল। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে যুক্তিতর্ক বা বিজ্ঞানে বিশ্বাসী লোকের পক্ষে বৈপ্লবিক দর্শনে আস্থা স্থাপন একান্ত অসম্ভব। কিন্তু মানুষের সামাজিক চেতনা সমষ্টিগত, সেই রকম দর্শনের ক্ষেত্রেও জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সমগ্র দৃষ্টি ছাড়া মানুষের চলে না। কাজেই জগৎ ও জীবনকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিভিন্ন কোঠায় ফেলে বিজ্ঞানের পরিপুষ্টি হয় বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে একটা সমগ্র দৃষ্টি না থাকলে বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় মানুষের জীবন হয় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, আর নয়তো ধার্ম্মিক ভাবোন্মাদের মধ্যে সমগ্রতার সন্ধান করে। আর যেহেতু জীবনের ধর্ম্মই গতিশীলতা, কাজেই একটা সমগ্র বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের অভাবে মানুষের মন স্বতই ভাববাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়। দার্শনিক নৈরাজ্যতন্ত্রী প্রত্যক্ষবাদের আকাঙ্ক্ষিত তত্ত্ববিজ্ঞানের পরম বিলোপ সমাজ ও বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়; আবার তাই বলে ভাববাদের অন্তর্ধার্ম্মিক ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকতেও মানুষের আধুনিক চেতনা রাজী হতে পারে না। কাজেই ভাববাদের আধ্যাত্মিক সমগ্রতা ও প্রত্যক্ষতন্ত্রের

আণবিক যান্ত্রিকতা, এই দুই সীমান্ত রেখার মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ রাখতে হলে ডায়ালেক্‌টিক বস্তুতন্ত্রের আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আরবান তাঁর নূতন বইখানিতে প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করলেও, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভাববাদীই রয়ে গিয়েছে। ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেমন প্রগতিশীল সাম্যবাদের দিক থেকে ও পশ্চাদগামী সনাতনী মনোবৃত্তির আশ্রয়ে, এই দুই রকমেই ঘটতে পারে, নব্য প্রত্যক্ষবাদের সমালোচনাও তেমনি ভাববাদ ও বস্তুবাদ, এই উভয় দিক থেকে পারা যায়। অবশ্য তত্ত্ববিজ্ঞানের অবলুপ্তি সম্পর্কে প্রত্যক্ষবাদীর মত রক্ষণশীল সনাতনীর চেয়ে অসহিষ্ণু নৈরাজ্যবাদীর মতের সঙ্গেই বেশী তুলনীয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ডায়ালেক্‌টিক বস্তুতন্ত্রের বিরোধিতার ব্যাপারে উভয়েই সমধর্ম্মী। কিন্তু আরবানের বইখানির আলোচ্য বিষয় কেবল নব্য প্রত্যক্ষবাদের সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই ; দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি অনেক বিষয়ে বহু আলোচনা বইখানিতে আছে। পুনরুক্তি দোষ মাঝে মাঝে ঘটলেও ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও আলোচনার ভঙ্গীও খুব মনোজ্ঞ ; আর লেখার গুণে দুরূহ দার্শনিক আলোচনাও সাধারণ পাঠকের দুরধিগম্য হয় নাই। প্রসঙ্গত প্লেটো, অ্যারিষ্ট-টল, সেণ্ট টমাস্ অ্যাকুইনাস, কাণ্ট, হেগেল, বার্গসন, হুসার্ল, রাসেল, হোয়াইট-হেড প্রভৃতি দার্শনিকের সম্পর্কে আলোচনায় আরবান অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের দেশের দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রচনাবলীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা হয়তো তাঁর মতের সঙ্গে আরবানের মতের কোথাও কোথাও সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। বিশেষত Libary of Philosoplyতে প্রকাশিত রাধাকৃষ্ণন্ ও মূইয়ার হেড সম্পাদিত Contemporary Indian Philosophy গ্রন্থখানিতে আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্রের Concept of Philosophy শীর্ষক প্রবন্ধের সঙ্গে আরবানের আলোচ্য বইখানির কয়েকটি মূল বিষয়ে ঐক্য আছে। কৌতূহলী পাঠক উভয়ের রচনা তুলনা করে পড়লে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে গভীরতম তত্ত্বের সন্ধান পাবেন ; অবশ্য ডায়ালেক্‌টিক বস্তুবাদের সন্ধান করতে গেলে উভয়কেই নিরাশ হতে হবে। আরবানের এই নূতন বইখানি দার্শনিক ও দর্শনানুরাগী সাধারণ পাঠকমহলে আদৃত হবে বলে আশা করা যায়।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

পথের সঞ্চয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী), আট আনা।

অসীম প্রকৃতির ভাণ্ডার অফুরন্ত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সসীম জীবনের অসীম সৃজনী-প্রতিভা সত্যি বিস্ময়ের বস্তু। বিশ্বপ্রকৃতি যে-দিন থেকে তাঁর বালক-চিত্তে প্রতিফলিত হয়ে ভাষায় ছায়াপাত করেছিল, সে-দিন থেকেই তাঁর রস-সৃষ্টির সুরু। তারপর থেকে তাঁর অকৃপণ ও অবিরত বিচিত্র দান স্বদেশকে করেছে সমৃদ্ধ ও অভিভূত, বিদেশকে করেছে চমৎকৃত। ছন্দ, রূপ ও সত্য রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে এমনি ভাবে ধরা দিয়েছে যে তাঁর অনবধান মুহূর্তের দু-চারটে বিচ্ছিন্ন পংক্তিতেও তারা সুষ্ঠু সমগ্রতা নিয়ে পরিস্ফুট হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত সব কিছুই সাহিত্যের ভাণ্ডারে সম্পদ হিসেবে সঞ্চিত হয়ে চলেছে। আলোচ্য 'পথের সঞ্চয়' কতকগুলো চিঠির সমষ্টি। এ দেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই ব্যক্তিগত চিঠিপত্রকে সাহিত্যের সুউচ্চ পর্য্যায়ে উন্নীত করেছেন। পৃথিবীময় বিস্তৃত রবীন্দ্রনাথের পথ, সঞ্চয়ও তাঁর অপরিসীম। ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি তৃতীয়বার বিলেত যাত্রা করেন এবং ইংলণ্ড আমেরিকা হয়ে ১৩২০ সালে আশ্বিন মাসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই পুস্তকের অধিকাংশ পত্রই সেই সময়ের মধ্যে লিখিত।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ও 'ছিন্ন পত্রের' সঙ্গে বাংলা-দেশের সুধীপাঠক মাত্রই সুপরিচিত। 'ছিন্ন পত্রের' পত্রগুলি কবির সজাগ মনের সৃষ্টি এবং সেখানে বিষয়বস্তু খুবই ব্যাপক; কিন্তু আলোচ্য পুস্তকের বিষয় অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে এবং প্রবাসকালে তাঁর অভিজ্ঞতার সহজ সংক্ষিপ্ত রেখা-চিত্র মাত্র—যেন ঝরঝরে অপরিসর শীর্ণকায়া নির্ঝরিণী, বিনা প্রয়াসে অতিক্রম্য ও উপভোগ্য। ভ্রমণের বৃত্তান্ত আছে অথচ ভ্রমণ-বৃত্তান্তের গুরুগম্ভীর ভাষা ও বর্ণনা-বাহুল্যের দুস্তর ঊর্ম্মিমালার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয় না। তরতরে হালকা ভাষায় লিখিত চিঠিগুলি কিছুমাত্র মানসিক শ্রম ব্যতিরেকেই আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করা যায়। অসতর্ক মুহূর্ত্তে মনের উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে পরিপার্শ্বের যে-রূপ যখন যে-ভাবে কবির উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছে তারই বিভিন্ন রেখা-চিত্রে চিঠিগুলির পটভূমি সমৃদ্ধ। কবির ভাবপুঞ্জ যেন শরৎকালের মেঘের মত ভারিক্কি ভাব ত্যাগ করে' অকস্মাৎ বিনা আড়ম্বরে কিছুটা বর্ষণ করে'

হালকা কিন্তু সরস দিকটার পরিচয় দিয়ে গেছে। এ চিঠিগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্চে যে এতে ব্যক্তিগত সংস্পর্শের আভাস পাওয়া যায়, এবং কবিকে আমরা অনেকটা আটপৌরে ভাবে কাছে পাই। এ চিঠিপত্রের মারফৎ দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ ও জীবন যাত্রার খবর দিতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় কবি যে সকল মূল্যবান মন্তব্য করেছেন তা' পাঠককে দেশ ও বিদেশ সম্পর্কে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণে বহুল সাহায্য করবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসিকে প্রকাশিত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চিঠিগুলির এই একত্র সমাবেশে বাংলাদেশের পাঠকবর্গ বিশেষ উপকৃত হবে সন্দেহ নেই।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

শিলালিপি—মণীশ ঘটক। কবিতা-ভবন, ২০১, রাসবিহারী এভিনিউ। দুই টাকা।

নতুনখাতা—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। দেড়টাকা। } মিত্র এণ্ড ঘোষ,
বিজয়িনী—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। দেড়টাকা। } ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট।

চিত্রলেখা—খগেন্দ্রনাথ ঘোষ। পাঁচসিকা। এম-সি-সরকার অ্যাণ্ড সন্স।

আলোচ্য চারখানি কবিতা-পুস্তক বিভিন্ন কবির রচিত হইলেও এক বিষয়ে তাহাদের মস্ত মিল আছে—প্রত্যেকটিই অত্যন্ত সহজপাঠ্য, দুর্ব্বোধ্য কথায় ও বন্ধুর ছন্দের ব্যাঘাতে এই পুস্তকচতুষ্টয়ের কবিতা পাঠের সময়ে পদে পদে হোঁচট খাইতে হয় না। বর্ত্তমান উৎকট কবিতার যুগে অনেক পাঠক এই জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন। এইরূপ সহজ সরল সাবলীন কবিতা আজকাল ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং দুষ্প্রাপ্য হওয়া যদি মূল্যনিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি হয় তাহা হইলে এই কবিতাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান সন্দেহ নাই।

কিন্তু বাংলা কবিতার ঠিক বর্ত্তমান যুগে যাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে বর্ত্তমানের অব্যবহিত পূর্ব্বকালেই তাহা ছিল অতিমাত্রায় সুলভ এবং বর্ত্তমানে যে উৎকটতার দিকে ঝোঁক দেখা যায় তাহা যে সেই সুলভতারই প্রতিবাদ একথা বিস্মৃত হইলে চলিবেনা। আমি এই উৎকটতার পক্ষপাতী নহি, বরং বিরোধী। কিন্তু তবু এই কথা স্বীকার না করিয়া পারি না যে এই উৎকটতার ঐতিহাসিক

মূল্য আছে, ইহার মধ্য দিয়াই একদিন বাংলা কাব্য গতানুগতিকতার ঘানি হইতে মুক্তি পাইবে এবং এই মুক্তির আভাস বর্ত্তমান যুগের একাধিক কবির রচনার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায়।

দুঃখের বিষয় এই মুক্তির ক্ষীণতম আভাস আলোচ্য একখানি পুস্তকের মধ্যেও আমি পাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের রচয়িতারা যে অ-কবি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। অন্তত 'নতুন খাতা'র প্রণেতা কিরণধন চট্টোপাধ্যায় ও 'শিলালিপি'র প্রণেতা মণীশ ঘটক এই দুইজনের মধ্যেই যে যথেষ্ট কবিত্বশক্তি আছে কোনো রসজ্ঞ সমালোচক তাহা অস্বীকার করিবেন না।

দিনমণি ডোবে চম্পকবন পারে
সিন্দুর লেপি' পম্পার পয়োধারে।
শান্তি-নিবিড় স্নেহ-অঞ্চল ছায়া
প্রসারে সন্ধ্যা স্নিগ্ধশ্যামল কায়া॥ (শিলালিপি)।

অসাধারণ না হইলেও ইহা যে কবিতা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার সমপর্য্যায়ের রচনার দৃষ্টান্ত 'শিলালিপি' হইতে একাধিক আহরণ করা যায়—এবং আলোচ্য চারখানি পুস্তকের মধ্যে একমাত্র 'শিলালিপি' হইতেই।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের সর্ব্বাপেক্ষা সার্থক রচনা তাঁহার লঘু কবিতাগুলি এবং এইগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য 'আব্দারের আধঘণ্টা' :—

বেল ফুল চাই না, জুঁই ফুল দাও!
ও গানটা গেওনা, এই গান গাও!
কেন ভালোবাসলে বল—বলনা;
হাস্‌লে কেন তুমি?—কথা কবনা।
কাল্‌কের গল্প আজ কর শেষ;
আজকের রাতটা লাগ্‌চেনা বেশ?
সারাটা বেলা ধরে বাঁধলুম চুল,
দেখলে না চেয়ে তা এম্‌নিই ভুল!
জুঁই-ফুল চাই না বেল-ফুল দাও;
এ গানটা গেওনা, ঐ গান গাও!......

এই জাতীয় কবিতা লিখিয়া বহু পাঠকের চিত্তবিনোদন করা যাইতে পারে, যদিও অমর কবি হওয়া যায়না। কিন্তু 'নতুনখাতা' পড়িয়া মনে হয় তাহার লেখকের বৈদগ্ধ্য ও মাত্রাজ্ঞান এতখানি ছিল যে অসামান্য কবিতা রচনার ব্যর্থ-প্রয়াসে তিনি স্বকীয় সামান্য ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই।

এই বৈদগ্ধ্য ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব বশতই সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ও খগেন্দ্রনাথ ঘোষের রচনায় অমরত্বের নিদর্শন দূরের কথা চিত্তবিনোদনের উপকরণও দুর্লভ। তাঁহাদের রচনায় একমাত্র যাহা পাওয়া যায় তাহা রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি হইলেই যে কবিতা মূল্যহীন হয় তাহা বলিতেছিনা। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি আধুনিক কালের যাঁহারা সার্থক কবি অল্পবিস্তর রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি ইঁহাদের সকলের কবিতাতেই পাওয়া যায়—বুদ্ধদেবের কবিতায় হয়তো সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, বিষ্ণুদের কবিতায় সর্ব্বাপেক্ষা কম। কিন্তু তবু ইঁহাদের সকলের কবিতাতেই স্বকীয় সুর ও স্বকীয় ভঙ্গী আছে বলিয়াই তাহা সার্থক হইয়াছে। মণীশ ঘটকের কবিতায় শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, বিষ্ণুদেরও প্রতিধ্বনি শোনা যায়ঃ

লক্ষ্মী, তোমার লক্ষণ বরাভয়,
সম্মোহ করো সংহার, করো জয়!

কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার স্বকীয়তা আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু 'বিজয়িনী'র বা 'চিত্রলেখা'র কবির মধ্যে স্বকীয়তার আভাসমাত্র কোথাও পাইলাম না, তদুপরি পাইলাম অসামান্য কাব্য সৃজনের ব্যর্থ প্রয়াস। অথচ ছন্দ বা ভাষার কোনো ত্রুটি ইহাদের মধ্যে নাই—এই দিক হইতে দেখিলে একেবারে নিখুঁৎ এই কবিতাগুলি। শুধু ইহাদের মূলে রহিয়াছে প্রেরণার পরিবর্ত্তে আত্মপ্রবঞ্চনা।

দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্ঃ

নাই, নাই, আজ কিছু নাই;
নাই তৃষা, নাই আশা,　　　　নাই প্রেম ভালবাসা,
নাই সুখ, নাই দুখ, নাই বেদনাই।

অসময়ে অবসান সব ;
ভাঙা দেহ মন ল'য়ে, জীবনের শূন্যালয়ে,
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি' কিসের উৎসব ! (চিত্রলেখা)।

এবং

দেহের রহস্য মাঝে, অদেহের রহস্য মিলায়ে,
নারীত্বের যুগবার্ত্তা কঙ্কণে বাজায়ে ;
চিরন্তনী সেই মহা বিশ্বমানবীর
মহাস্রোত মাঝে মোরা হারাইব ধারা ;
মোদের প্রেমের বীর্য্যে বিশ্ববাসী জাগিয়া উঠিবে,
খণ্ড হ'য়ে চূর্ণ হ'বে মৃত্তিকার কারা। (বিজয়িনী)।

এই জাতীয় কবিতা সম্বন্ধে আর কোনো মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। কিন্তু একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। 'চিত্রলেখার' পরিচয় প্রদানপ্রসঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি কাজি নজরুল ইসলাম লিখিতেছেন ; "......বিরহে মহাসিন্ধুর তীরে প্রিয়াহারা একা কবি যে গান গাইলেন, তাতে সমুদ্রে উঠ্‌ল কলকল্লোল, বাতাসে জাগলো ঝঞ্জার (sic) হিল্লোল, জ্যোৎস্নার আঁচল ছড়িয়ে পূর্ণিমা-বিভাবরী উঠল কেঁদে ! সে কি ভাষা, সে কি উপমা !..." ইহাই হইল 'চিত্রলেখা' সম্বন্ধে যোগ্যতম মন্তব্য। আক্ষেপের বিষয় শুধু এই যে কাজির হাত দিয়া ইহা বাহির হইল।

হিরণকুমার সান্যাল

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্তৃক আলেক্‌জান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীবুদ্ধভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৪৬

পরিচয়

আবৃত্তি বা পুনর্জন্ম

বুদ্ধদেব বলিতেন—যাহা কিছু ‘সমুদয়-ধর্মী’ তাহাই নিরোধ-ধর্মী—যৎ কিঞ্চ সমুদয়-ধম্মং সব্বং তং নিরোধ-ধম্মং—অর্থাৎ, যাহারই উদয় আছে তাহারই বিলয় আছে। ইহা উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি। উপনিষদ্ নানা ছন্দে বলিয়াছেন—নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—কর্মের ফল কখনও অবিনশ্বর হইতে পারে না। এই যে পিতৃযানী—ইষ্টাপূর্তের পুণ্য-ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হইলেন, সেখানে তাঁহার স্থিতি কি চিরস্থায়ী? আমরা দেখিয়াছি, উপনিষদের ঋষিরা অনন্ত স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহাদিগের শিক্ষা এই যে, পরলোকে কাল আমাদের সুকৃতের আয়ুঃ হরণ করে।

স্বর্গং লোকম্ অভিবহতি—অহোরাত্রৈর্বা
ইদং সযুগ্‌ভিঃ ক্রিয়তে—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১।২

‘(পুণ্য দ্বারা) জীব স্বর্গলোকে বাহিত হয় বটে—কিন্তু অহোরাত্রি তাহার সুকৃত ভক্ষণ করে।’

উপনিষদে এ কথা বারংবার শুনিতে পাই। ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

তদ্ যথা ইহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে
—ছান্দোগ্য, ৮.১৬

বৃহদারণ্যকে আমরা একথা আরও স্পষ্টভাবে শুনিতে পাই।

যদ্ ইহ বা অপি অনেবংবিৎ মহৎ পুণ্যং কর্ম করোতি তদ্ধ অস্য অন্ততঃ ক্ষীয়ত এব।
—বৃহ, ১।৪।১৫

'ইহলোকে অজ্ঞ (কর্মী) যদি বা মহৎ পুণ্য কর্মও করে, অন্তে তাহা নিঃসন্দেহ নিঃশেষ হয়।'

পুনশ্চ—

যো বা এতদ্ অক্ষরং গার্গি! অবিদিত্বা অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপঃ তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি, অন্তবৎ এবাস্য তদ্ভবতি ; যো বা এতদ্ অক্ষরং গার্গি! অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদ্ অক্ষরং গার্গি! বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ—বৃহ, ৩.৮।১০

যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্যার স্তুতি করিয়া গার্গীকে বলিতেছেন—'যে কেহ সেই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোকে বহু বর্ষসহস্র ধরিয়াও হোম করে, যাগ করে, তপস্যা করে—তাহার ফল মাত্র নশ্বর হয়। যে কেহ সেই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, সে কৃপণ (দীন)—কিন্তু যিনি তাঁহাকে জানিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।'

শতপথ ব্রাহ্মণেও ঐরূপ উক্তি শুনা যায় ঃ—

তে য এতদ্ বিদুঃ যে বা এতৎ কর্ম কুর্বতে, মৃত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি। তে সম্ভবন্ত এব অমৃতত্বম্ অভিসংভবন্তি। অথ য এবং ন বিদুঃ যে বা এতৎ কর্ম ন কুর্বতে মৃত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি তে এতস্যৈব অন্নং পুনঃ পুন র্ভবন্তি—শতপথ, ১০।৪।৩।১০

অর্থাৎ, যাঁহারা এইরূপ জানেন বা এইরূপ কর্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর আবার উত্থিত হন এবং উত্থিত হইয়া অমৃতত্ব অর্জন করেন। কিন্তু যাঁহারা ইহা জানেন না অথবা এইরূপ কর্ম করেন না, তাঁহারা মৃত্যুর পর উত্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ উহার অন্ন হন (become again and again the prey of death)।

অতএব ইষ্টাপূর্তের ফল কখনই চিরস্থায়ী হয় না। এই কারণেই নচিকেতাঃ যমের নিকট বর চাহিয়াছিলেন—'ইষ্টাপূর্তয়োঃ অক্ষিতিঃ' (imperishableness) (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।১১।৮)।

কিন্তু এ বর ত দিবার নহে—এ যে অসম্ভব প্রার্থনা! তাই কঠ-উপনিষদে যমের উত্তরে শুনিতে পাই—

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং যৎ। —কঠ, ২।১০

'শেবধি' (পুণ্যফল) কখন নিত্য হয় না—অধ্রুব (অনিত্য) দ্বারা ধ্রুব (নিত্য) ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?' নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—নশ্বর দ্বারা অনশ্বরের অর্জন অসম্ভব।

এ প্রসঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের নিম্নোক্তি স্মরণীয়—

স এষ সর্বৈঃ কামৈঃ সম্পন্নঃ * * স এষ অকামঃ সর্বকামঃ ন হ্যেতং কশ্চন কামঃ।

তদ্ এষ শ্লোকো ভবতি—
বিদ্যয়া তদ্ আরোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিন ইতি ॥

ন হৈব তং লোকং দক্ষিণাভির্ণতপসা অনেবংবিৎ অশ্নুতে এবংবিদাং হৈব স লোকঃ —শতপথ, ১০।৫।৪।১৫-৬

'তিনি সমস্ত কামে সম্পন্ন হয়েন—তিনি অকাম, সর্বকাম—তাঁহার কোন কামনা নাই। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—

বিদ্যাদ্বারা তাঁহারা সেই লোকে আরোহণ করেন যেখানে সমস্ত কাম পরাগত। দক্ষিণা সেখানে পৌঁছিতে পারে না—অবিদ্বান্ তপস্বীও নয়। সে লোক দক্ষিণা দ্বারা বা তপস্যা দ্বারা জয় করা যায় না। যিনি বিদ্যাবিদ্, সে লোক তাহারই লোক।'

পিতৃযানী ইষ্টাপূর্তের ফলে স্বর্গলোক জয় করেন বটে কিন্তু স্বর্গ-ভোগের দ্বারা অর্জিত পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

তেনাতুরাঃ ক্ষীণালোকাশ্চ্যবন্তে—মুণ্ডক, ১.২।৯

এই স্বর্গ হইতে চ্যুতিকে ঋষিরা 'পুনর্মৃত্যু'* বলিতেন। ইহলোকে মৃত্যুর পর পরলোক—আবার পরলোক হইতে চ্যুতির পর ইহলোক। অতএব ঐ চ্যুতির সার্থক নাম পুনর্মৃত্যু (Death over again)। এই মৃত্যু একবার নয়, দুইবার নয়—পুনঃ পুনঃ। সেইজন্য ইহার নাম আবৃত্তি (Repetition) —তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ (বৃহ, ৬।২।১৫)—ইমং মানবম্ আবর্তং ন আবর্তন্তে (ছান্দোগ্য, ৪।১৫)।

অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি যোঽগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে য উ চৈনম্ এবং বেদ

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১১।৮।৬

---

* অধ্যাপক ডয়সন্ 'পুনর্মৃত্যু'র অর্থ ঠিক ধরিতে পারেন নাই। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—'To the evil-doers was assigned পুনর্মৃত্যু'। আবৃত্তি সম্পর্কে শ্রীশঙ্করাচার্যের একটি উক্তি আমাদের স্মরণীয়—'পুনঃ পুনঃ ঘটীযন্ত্রবৎ গমনাগমনায় কর্ম কুর্বন্ কুলালচক্রবৎ বা তির্যক্ ভ্রমণায় যাবৎ কর্মণা উপাত্তম্ আয়ুঃ তাবৎ জীবতি—৫।৯।৩ ছান্দোগ্যের শঙ্করভাষ্য।

'যিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন এবং যিনি উহাকে ঐরূপ জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন।'

অতি হবৈ পুনর্মৃত্যুং মুচ্যতে, য এবম্ এতাম্ অগ্নিহোত্রে মৃত্যোরতিমুক্তিং বেদ

—শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।৩।৩।৯

'যিনি অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর অতিমুক্তিকে অবগত হন, তিনি পুনর্মৃত্যু হইতে অতিমুক্ত হন।'

অন্তরেণ হবা এতং অশনায়া চ পুনর্মৃত্যুশ্চ। অপ অশনায়াং চ পুনর্মৃত্যুঞ্চ জয়ন্তি যে বৈষুবতম্ অহঃ উপয়ন্তি—শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ, ২৫।১

'যিনি বিষুবৎ দিন (the day of the Equinox) চরণ করেন তিনি ক্ষুধাকে জয় করেন, পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন। তাঁহাকে ক্ষুধা ও পুনর্মৃত্যু স্পর্শ করে না।'

অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি সর্বম্ আয়ুরেতি, য এবং বিদ্বান্ এতয়া ইষ্ট্যা যজতে—শতপথ, ১১।৪।৩।২০

'যিনি এইরূপ জানিয়া ঐ ইষ্টি দ্বারা যজন করেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, সর্ব আয়ুঃ লাভ করেন।'

তস্মাৎ বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ।
অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি স এবং বেদ—বৃহ, ৩।৩।২

'যিনি বায়ুই ব্যষ্টি বায়ুই সমষ্টি—এইরূপ জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন।'

এই পুনর্মৃত্যুর পর মর্ত্যলোকে পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি—গীতা, ৯।২২
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা
ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি—মুণ্ডক, ১।২।১০

'স্বর্গলোকে ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে জীব ইহলোকে বা নিম্নতর লোকে প্রবেশ করে-ই।'

ইহা লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা × × পুনর্নিবর্তন্তে—৫।১০

'সম্পাত (অর্থাৎ পতন পর্য্যন্ত), স্বর্গে বসতি করিয়া (জীব) ইহলোকে আবার ফিরিয়া আইসে।'

উপনিষদে এইরূপ ভূয়োভূয়ঃ জন্মান্তরের উপদেশ আছে। কঠ উপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিতেছেন—

হন্ত তেদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুম্ অন্যেঽনুসংযন্তি যথা-কর্ম যথা-শ্রুতম্॥

—কঠ, ২।২।৬-৭

'হে গৌতম, তোমাকে আমি গুহ্য সনাতন ব্রহ্ম উপদেশ করিব এবং মৃত্যুর পর আত্মার যে গতি হয়, তাহাও বলিব। কোন কোন জীব শরীর ধারণ করিবার জন্য মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, কেহ কেহ বা স্থাণু (স্থাবর যোনি) প্রাপ্ত হয়। যাহার যেরূপ কর্ম, যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারে তাহার গতি হয়।'

এই মর্ম্মে ঐতরেয় উপনিষদের উক্তি এই:—

সোঽস্য অয়ম্ আত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথ অস্যায়ম্ ইতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি। স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে তদস্য তৃতীয়ং জন্ম—ঐতরেয়, ৪।৪

'তাহারই ঐ পুত্ররূপ আত্মা পুণ্যকর্ম্মের জন্য ইহলোকে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ অবস্থান করে; এবং তাহার অন্য আত্মা, অর্থাৎ সে স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়া বয়ঃস্থ হইলে প্রয়াণ করে। সে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে। এই তাহার তৃতীয় জন্ম।' (প্রথম জন্ম মাতৃকুক্ষিতে, দ্বিতীয় জন্ম পুত্ররূপে; সেইজন্য বলা হয় "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—আত্মাই পুত্ররূপে জাত হন)।

অন্য ভাবে প্রশ্ন-উপনিষদ্ ঐ একই উপদেশ দিয়াছেন—

স যদি একমাত্রম্ অভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যাম্ অভিসম্পদ্যতে। তম্ ঋচো মনুষ্যলোকম্ উপনয়ন্তে। স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানম্ অনুভবতি। অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিম্ অনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে।—প্রশ্ন, ৫।৩-৪

'সে যদি ওঁকারের একটি মাত্র মাত্রা ধ্যান করে, তবে সে শীঘ্রই পৃথিবীতে ফিরিয়া আইসে। ঋক্ মন্ত্রসকল তাহাকে মনুষ্যলোকে উপনীত করে। সে এখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করে। আর সে যদি ওঁকারের দ্বিমাত্রা মনে ধ্যান করে, তবে সে যজুঃ-মন্ত্র দ্বারা অন্তরিক্ষ সোমলোকে উন্নীত হয়। সে সোমলোকে বিভূতি অনুভব করিয়া পুনরায় এখানে ফিরিয়া আইসে।'

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপদেশও আমাদের প্রণিধান-যোগ্য—

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতিঃ পাপঃ পাপেন। অথ খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে যৎ কর্ম কুরুতে তৎ অভিসম্পদ্যতে।

তদেষ শ্লোকো ভবতি।—

তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি। লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তম্ অস্য ॥
প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈম্যে লোকায় কর্মণে ॥—বৃহ, ৪।৪ ৫-৬

'যাহার যেইরূপ কার্য, যেরূপ আচরণ, সে সেইরূপ হয়। সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়। পুণ্য কর্মের দ্বারা পুণ্য হয়, পাপ কর্মের দ্বারা পাপ হয়। জীবকে 'কামময়' বলা হইয়াছে। তাহার যেমন কামনা, সেইরূপ ভাবনা হয়। যেরূপ ভাবনা হয়, সে সেইরূপ কর্ম করে। যেরূপ কর্ম করে, তাহার সেইরূপ গতি হয়। এ বিষয়ে এই শ্লোকটি প্রচলিত আছে। "তাহার মন যেখানে আসক্ত, সে কর্মের দ্বারা সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে সে যে কর্ম করিয়াছে, পরলোকে সেই কর্মের ক্ষয় হইলে আবার কর্ম করিবার জন্য তাহাকে সেই লোক হইতে ইহলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়।'

অন্যত্র বৃহদাণ্যক বলিয়াছেন--

পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৩।২।১৩

ইহার নিত্যানন্দ-বিরচিত ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে—পুণ্যেন শাস্ত্রবিহিতেন কর্মণা দেবাদিষু জায়মানঃ পুণ্যঃ পুণ্যাত্মা ভবতি, পাপেন শাস্ত্রনিষিদ্ধেন কর্মণা স্থাবরাদিষু জায়মানঃ পাপঃ পাপাত্মা ভবতি।

এই যে স্থাবরাদিতে জন্ম—গীতা যাহাকে 'মূঢ়যোনিষু জায়তে' বলিয়াছেন —উপনিষদের অন্যত্র ইহার বিস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা স্থকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥—ছান্দোগ্য ৫।১০।৭

'যাঁহাদের আচরণ শুভ, তাঁহারা অচিরে শুভ ব্রাহ্মণ যোনিতে বা ক্ষত্রিয় যোনিতে বা বৈশ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। আর যাহাদের আচরণ অশুভ, তাহারা অচিরে অশুভ কুকুর যোনিতে, স্থকর যোনিতে বা চণ্ডাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।'

এ সম্পর্কে কৌষীতকী উপনিষদ্ বলেন—

য এনং ন প্রত্যাহ তম্ ইহ বৃষ্টির্ভূত্বা বর্ষতি। স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা পরশ্বা * বা পুরুষো বা অন্যো বা এতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথা কর্ম যথাবিদ্যম্—কৌষী ১।৩

'আর যাহারা চন্দ্ররূপ স্বর্গলোক প্রত্যাখ্যান না করে, তাহারা মেঘের দ্বারা ইহলোকে বর্ষিত হয়; এবং এখানে কীট বা পতঙ্গ বা শকুনি বা ব্যাঘ্র বা সিংহ বা মৎস্য বা পরশ্বা বা পুরুষ বা অন্য জঙ্গম দেহে—সেই সেই স্থানে 'যথা-কর্ম যথাশ্রুত'-অনুসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।'

জীবের এই বারংবার জন্ম-মৃত্যু লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক বৃক্ষের সহিত তাহার উপমা দিয়াছেন—

যথা বৃক্ষো বনস্পতিঃ তথৈব পুরুষোঽমৃষা—বৃহ, ৩।৯।২৮।১

'যেমন বৃক্ষ অক্ষয়, তেমনি জীব অব্যয় (অমৃষা) ।'

বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, পল্লবিত হয়, বিটপিত হয়, পুষ্পিত হয়, ফলিত হয়—তারপর? মাটিতে তিরোহিত হয়। কিন্তু তথাপি বৃক্ষ একেবারে বিনষ্ট হয় না—বীজরূপে রক্ষিত থাকে। সেই বীজ হইতে প্ররোহ হয়, আবার পল্লব, আবার বিটপ, আবার পুষ্প, আবার ফল উদ্ভূত হয়—বীজগর্ভ ফল। বৃক্ষ—বীজ, বীজ—বৃক্ষ, অনাদি হইতে অনন্তকাল এই পর্য্যায়-ধারায় আবির্ভাব ও তিরোভাব চলে—তিরোভাবের পর পুনশ্চ আবির্ভাব, আবার আবির্ভাবের পর পুনশ্চ তিরোভাব।†

যদ্ বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলাৎ নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্যঃ স্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি॥
—বৃহ, ৩।৯।২৮।৪

বৃক্ষের এই যে বারংবার 'প্রেত্য-সম্ভব' (পুনরুৎপত্তি), তাহার নিদান ঐ বীজ—

ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষঃ অঞ্জসা প্রেত্য-সম্ভবঃ।

* পরশ্বা = দন্দশূকবিশেষঃ—শঙ্করানন্দ

† Mankind is like a plant. Like this it springs up, develops and returns finally to the earth. Not entirely, however. But as the seed of the plant survives, so also at death the works (karma) of a man remain as seed, which sown afresh in the realm of ignorance (Avidya), gives rise to a new existence, in exact correspondence with his character.—Deussen's Philosophy of the Upanisads, pp. 313-4.

জীবের এই যে পুনরুৎপত্তি, বারংবার ঐরূপে তিরোভাব ও আবির্ভাব (ন্যায় দর্শনে যাহার নাম 'প্রেত্যভাব')—তাহার নিদান কি? বৃহদারণ্যক বলেন, তাহার নিদান কর্ম—জন্মে জন্মে অনুষ্ঠিত ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টা (Thoughts, Desires and Actions)। ঐ কর্মই জন্মান্তরের বীজ।

বৃহদারণ্যক অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছেন—

অথো খল্বাহ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে যৎ কর্ম কুরুতে তদ্ অভিসম্পদ্যতে।—বৃহ, ৪।৪।৫

'এই পুরুষকে 'কামময়' বলা যায়। সে যে প্রকার কামনাযুক্ত হয়, সেই প্রকার ভাবনা করে; যে প্রকার ভাবনাযুক্ত হয়, তদনুরূপ কর্ম করে; যে প্রকার কর্ম করে, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়।'

অতএব জন্মের পক্ষে কামই মূলাধার। এই কামকে গীতায় 'সঙ্গ' বলা হইয়াছে ('সঙ্গং ত্যক্ত্বা', 'মুক্তসঙ্গঃ' ইত্যাদি); বুদ্ধদেব উহাকে 'তন্‌হা' বলিয়াছেন। (তন্‌হা 'তৃষ্ণা' শব্দের পালি অপভ্রংশ)। অবিদ্যাজনিত এই তন্‌হা হইতেই জন্ম-জন্মান্তর এবং তন্‌হা-ক্ষয়েই জন্মনিবৃত্তি।*

কোন বৃক্ষকে যদি সমূলে উৎখাত করা যায়, তবে যেমন তাহা হইতে আর বৃক্ষান্তর উৎপন্ন হয় না—সেইরূপ কোন জীবের কর্মমূল অর্থাৎ 'কাম' বা বুদ্ধদেবের কথিত 'তন্‌হা' যদি নিঃশেষে উৎসারিত হয়, তবে তাহার 'প্রেত্যভাব' হইবে কিরূপে?—কারণ,

সতি মূলে তদ্‌বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ—যোগসূত্র, ২।১৩

'মূল থাকিলে তবেইত' তাহার বিপাকে—জন্ম আয়ুঃ ভোগ হইবে।'

যদি মূলই বিনষ্ট হয়, তবে প্রেরোহ কখনই সম্ভব নয়।† বৃহদারণ্যক এই কথাই বলিয়াছেন—

* Verily it is this thirst (Tanha) or craving, causing the renewal of existence, accompanied by sensual delights, seeking satisfaction now here now there—the craving for the gratification of the passions, for continued existence in the worlds of sense.—Buddhist Suttas, S. B. E. Vol. XI p. 148.

† Hence it is this (Tanha or thirst) which must be completely eradicated, root and branch, during our present life time—if at death we want to get out of the cycle of rebirth.—The Doctrine of the Buddha, p. 312.

যৎ সমূলম্ আবৃহেয়ু বৃক্ষং ন পুনঃ আভবেৎ।
মর্ত্যঃস্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্নঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি।
জাত এব ন জায়তে কোম্বেনং জনয়েৎ পুনঃ॥—বৃহ, ৩৯৷২৮৷৬-৭

'বৃক্ষকে যদি স-মূলে উৎপাটিত করা যায়, তবে তাহা হইতে আর বীজ জন্মে না। মানুষ যদি মৃত্যু কর্তৃক বৃক্ন হয়§ তবে কোন্ মূল হইতে আবার অঙ্কুর জন্মিবে? এবার জন্ম হইয়াছিল—আর সে জন্মিবে না। কে আর তাহাকে জন্মাইতে পারিবে?'

অর্থাৎ, এই তাহার শেষ-জন্ম ও শেষ-মৃত্যু।

অধ্যাপক ডয়সন্ বলেন, 'In no Vedic texts earlier than the Upanishads can the doctrine (জন্মান্তরবাদ) be certainly traced'. অপরে বলিয়াছেন যে, হিন্দুজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ যে ঋগ্বেদসংহিতা—তাহাতে কোথাও জন্মান্তরের উল্লেখ নাই। অতএব জন্মান্তরবাদ অর্বাচীন এবং বেদ-বিরুদ্ধ।

এ সম্পর্কে আমি আমার 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর' গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'বেদের সংহিতাভাগে জন্মান্তরের উল্লেখ নাই বলিয়া জন্মান্তরবাদ অবৈদিক, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। কারণ, বৈদিক যজ্ঞসমূহে যে সকল মন্ত্রের ব্যবহার হইত, বেদের সংহিতাভাগে মাত্র সেই মন্ত্রসমূহই সংকলিত হইয়াছে; ঐ সংহিতা ঋষি-সমাজে প্রচলিত অধ্যাত্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলন-স্থান নহে। বৈদিক যুগে ঋষি-সমাজে ব্রহ্মতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব-উপদেশ প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্ অংশেই সেই সকল তত্ত্ব-উপদেশ সংকলিত হইয়াছিল; জীবের উৎক্রান্তি, জীবের পরলোকগতি, জীবের জন্মান্তর প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জ্ঞান যথাস্থানেই সংকলিত হইয়াছে। উপনিষদ্ই তাহাদের প্রকৃত সংকলনস্থান—সংহিতা নহে। অতএব সংহিতায় জন্মান্তরের উল্লেখ না দেখিয়া জন্মান্তরবাদকে বেদবিরুদ্ধ বলা অসঙ্গত। টড্ হাণ্টারের বীজগণিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবদ্দশায় সংকলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভিক্টোরিয়ার কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতে কি আমরা সিদ্ধান্ত করিব, ভিক্টোরিয়া বলিয়া কোন রাজ্ঞী ইংলণ্ডে কখনও রাজত্ব করেন নাই? রাজা রাণীর কথা ইতিহাসে থাকিবে, গণিতে নহে।

† বলা বাহুল্য, এ মৃত্যু Death নহে। অগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ (বৃহ, ৩৷২৷১০)—এই মৃত্যু জ্ঞানাগ্নি, যাহার স্পর্শে সমস্ত কর্মপাশ ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

ইতিহাস গ্রন্থে ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ না থাকিলে তাঁহাকে কাল্পনিক ব্যক্তি অনুমান করা সঙ্গত, কিন্তু বীজগণিতে তাঁহার উল্লেখের আশা করা অসঙ্গত। বেদের সংহিতাভাগ মন্ত্রের সংকলন-গ্রন্থ। তাহাতে জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি অধ্যাত্ম-তত্ত্বের উল্লেখ থাকিবে কেন?

দ্বিতীয় কথা। উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায়, অনেক দিন পর্যন্ত এই জন্মান্তর-বাদ গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সাধারণ্যে তাহার প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। বহুকাল পর্যন্ত এই জন্মান্তর-তত্ত্ব তত্ত্বদর্শী রাজর্ষিসম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ঐ তত্ত্বকে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' নামে অভিহিত করা হইত। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে সংশয় থাকে না।'

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য হইতে প্রবাহন জৈবলি ও শ্বেতকেতুর উপাখ্যান আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি—তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়েও ঐ প্রবাহন জৈবলি ও শ্বেতকেতুর উপাখ্যান আছে। সেখানেও দেখি জৈবলি বলিতেছেন—ইয়ং বিদ্যা ইতঃপূর্বং ন কস্মিংচিৎ ব্রাহ্মণে উবাস (বৃহ, ৬।২।৮)—'ইতিপূর্বে এই বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণে বাস করে নাই।'

যে জন্মান্তরবাদ এইরূপ গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যজ্ঞে ব্যবহার্য মন্ত্রের সংগ্রহের মধ্যে তাহার উল্লেখ না থাকা কি বিচিত্র? এবং সেজন্য জন্মান্তরবাদকে বেদবিরুদ্ধ বলা কি সঙ্গত?

কিন্তু, উপনিষদের পূর্ববর্তী গ্রন্থে জন্মান্তরের কোন ইঙ্গিত নাই, একথা কি প্রমাণসিদ্ধ? ঐতরেয় উপনিষদ্ বামদেব ঋষির প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া জন্মান্তরের সমর্থন করিয়াছেন। ঐতরেয়ের বিবরণ এইরূপ—

তদুক্তম্ ঋষিণা—গর্ভে নু সন্ অন্বেষাং অবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীঃ অরক্ষন্ অধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্॥ ইতি গর্ভে এব এতৎ শয়ানো বামদেব এবম্ উবাচ—ঐত ৪।৪-৫

গর্ভে থাকিয়া যে শ্লোক বামদেব ঋষি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের ৪।২৭।১ মন্ত্র। শ্রীশঙ্করাচার্য ঐ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন—

মাতৃকুক্ষিতে শয়ান থাকিয়া জন্মান্তরীন সংস্কার শুদ্ধির ফলে (অনেক জন্মান্তর-ভাবনা পরিপাক বশাৎ) বমাদেবএইরূপ বলিয়াছিলেন—'এই সকল দেবতার (বাগ্-অগ্ন্যাদীনাং) সমস্ত জন্ম আমি জানিয়াছি। শত আয়সী (লৌহময়ী) পুরী আমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। শ্যেন

যেমন জাল ছিন্ন করিয়া বেগে বহির্গত হয়, আমিও সেইরূপ আত্মজ্ঞান-শক্তিতে (আত্মজ্ঞান-কৃত সামর্থ্যেন) নির্গত হইয়াছি।

এই বামদেব ঋষির কথা আমরা বৃহদারণ্যকেও প্রাপ্ত হই।

ব্রহ্ম বা ইদম্* অগ্র আসীৎ তদাত্মানমেব অবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ। তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথা ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাং। তদ্ধৈতৎ অপশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি। তদিদম্ অপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি।—বৃহ, ১.৪।১০

এই যে মন্ত্র 'অহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি—ইহা ঋগবেদের ৪।২৬।১ শ্লোক। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—

অগ্রে এসমস্তই ব্রহ্ম ছিলেন। যিনি আপনাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইভাবে জানিলেন তিনিই সর্ব হইলেন (স্বাভাবিকম্ সর্বত্বং প্রাপ্তম্)। দেবতাদিগের মধ্যে যিনি জানিলেন, ঋষিদিগের মধ্যে যিনি জানিলেন, মনুষ্যদিগের মধ্যে যিনি জানিলেন, তিনি সর্ব হইলেন। ইহা জানিয়া ঋষি বামদেব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন—'আমি মনু হইয়াছি, সূর্য হইয়াছি।'

অতএব ঋগ্‌বেদের দুইস্থলে আমরা জন্মান্তরের ইঙ্গিত পাইলাম।

শতপথ ব্রাহ্মণেরও একস্থলে জন্মান্তরের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আমরা সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তে য এবম্ এতদ্ বিদুঃ। যে বৈ তৎকর্ম কুর্বতে পুনঃ সম্ভবন্তি। তে সম্ভবন্ত এব অমৃতত্বম্ অভিসম্ভবন্তি। অথ য এবং ন বিদুঃ যে বৈ তৎকর্ম ন কুর্বতে মৃত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি তে এতস্যৈব অন্নং পুনঃ পুনর্ভবন্তি—শতপথ, ১০।৪।৩।১০

'যাঁহারা এইরূপ জানেন বা এইরূপ কর্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর উত্থিত হন এবং অমৃতত্ব সংপ্রাপ্ত হন (they rise again to immortality) ; কিন্তু যাহারা ইহা জানে না বা এরূপ কর্ম করে না, তাহাদের মৃত্যুর পর যে উত্থান, তদ্দ্বারা তাহারা পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অন্ন হয় (they become again and again the prey of death).

অন্যত্র—

দক্ষিণে অগ্নৌ পাবয়ন্তি পবিত্রাভিঃ। পিতন্ এব তৎ মর্তান্ সতঃ অমৃতযোনৌ দধাতি মর্তান্ সতঃ অমৃতযোনেঃ প্রজনয়তি।—শতপথ, ১২।৯।৩।১২

* ইদং=শরীরস্থং প্রমাত্রাদি-সাক্ষিভূতম্ ত্বং-পদলক্ষ্যম্—অর্থাৎ জীব। নিত্যানন্দ।

ইহার Julius Eggeling-কৃত অনুবাদ এই :—

On the southern fire they offer libations * * The Fathers, whilst being mortal, he (যজমান) thus places in the immortal womb ; and them that are mortal, he causes to be born (again) from out of the immortal womb.

এই মন্ত্রে অগ্নিক্রিয়ার ফলে পিতৃগণের প্রেতলোক হইতে অমৃতধাম স্বর্গ-লোকে উন্নয়ন ও সেখান হইতে পৃথিবীলোকে পুনরাগমন যে সূচিত হইতেছে, ইহা মনে করা আদৌ অসঙ্গত নহে। অতএব ডয়সন্ যে বলিলেন, উপনিষদের পূর্ববর্তী গ্রন্থে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ নাই—এ মত ভিত্তিহীন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বঞ্চনা

সকাল বেলা বারবাড়ীর লম্বা কৌচটায় গা' ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলাম, আর মনে মনে ভেঙে চুরমার করছিলাম পাশের বাড়ীর গানের কলটাকে। একটা কোরাস-গান বার বার চালিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলবার যোগাড় করেছে।

কাগজের উল্‌টো দিক থেকে প্রশ্ন এল, 'ধূপকাঠি রাখবেন স্যার ?'

মুখের উপর থেকে কাগজ না সরিয়েই ধমকে উঠলাম, 'না, রাখবো না। গণ্ডগোল করো' না—যাও !'

'বি-এ পাস করে আন্‌এম্‌প্লয়েড্‌ ঘুরে বেড়াচ্ছি, আপনারা একটু সহানুভূতি না দেখালে...'

একদিকে 'জনগণ-মন-অধিনায়ক', অন্য দিকে আন্‌এম্‌প্লয়েড্‌ গ্রেজুয়েট—কাগজ রেখে উঠে বসতে হলো। একটি যুবক আরও দু ধাপ এগিয়ে দরজায় উঠে দাঁড়ালো। দেখতে রোগা, লম্বা। ফেকাসে মুখের উপরে ম্লান এক জোড়া চোখ। শীতের পোষাক বলতে সার্টের উপর একটা হাত-কাটা গরম গেঞ্জী, পায়ে রাবারের জুতো, হাতে য়্যাটাশে-কেস।

যুবকটি পুনরায় সুরু করলো, 'বি-এ পাশ করে ছ' বছর ঘুরেছি চাকরির আশায়, তারপর এই...'

'অতদিন ঘোরা ঠিক হয়নি।' বললাম, 'বসুন।'

কুণ্ঠিত ভাবে সে বললো, 'না, এই দাঁড়িয়েই ..'

বসতে ভরসা পাচ্ছে না ভেবে একটা কৌচ দেখিয়ে বললাম, 'বসুন, বসে কথা বলুন।'

যুবকটি তথাপি দাঁড়িয়ে থেকেই বলতে লাগলো, 'তারপর এই সেন্‌টেড ধূপকাঠি তৈরী করতে সুরু করেছি। বাজারের—' কথার মাঝখান থেমে এবার নিজে থেকেই এগিয়ে এসে সে আসন গ্রহণ করলো। 'চলতি ধূপকাঠির গন্ধ দু-দিনেই উবে যায়, কিন্তু—'

কথা শেষ না করেই পুনরায় উঠে দাঁড়াতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি, চল্লেন ?'

সত্যি কথাটা গোপন করবার মত মুখ করে বললো, 'আজ্ঞে না, এই বসছি—যা বলছিলাম...'

গ্রামোফোন চলা ও থামার সঙ্গে লোকটির এই বসা ও দাঁড়ানর যোগাযোগটা লক্ষ্যে পড়তেই হেসে বললাম, 'গানটা বোধহয় ওরা শিখছে, আরও বার পঞ্চাশ চালাবে, আপনি বসতে পারেন।'

'ন্যাশনাল সঙ্...'

'বুঝেছি।'

এতটা বাড়াবাড়ি হাস্যকর সন্দেহ নেই। কিন্তু যে-জিনিষ স্বাভাবিক আবহাওয়ায় জন্ম নেয়নি তাকে জোর করে পুঁতে জবরদস্তি বাঁচিয়ে রাখতে হলে অমন একটু বাড়াবাড়ি হয়তো বা দরকারই হয়। যুবকটির মোটামুটি বক্তব্য এই, ছ-বছর ঘুরে এটা সে বেশ ভাল করেই বুঝেছে, বাঙালীর ব্যবসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই সামান্য কিছু মূলধন নিয়ে এ কাজে সে নেমে পড়েছে। তার জিনিষের মূল্য একটু বেশি বটে কিন্তু এটা সে বড়াই করে বলতে পারে যে এ জিনিষ এক বৎসর ঘরে ফেলে রাখলেও সুগন্ধ এর তিল মাত্র নষ্ট হবে না।

বললাম, 'ধুপকাঠি তো কেউ ঘরে ফেলে রেখে গন্ধের স্থায়ীত্ব পরখ করবার জন্যে কেনে না, এ জন্যে দাম বেশি দিতে রাজি হবে কেন ? আপনি একজন শিক্ষিত যুবক, দশজনের সহানুভূতি নিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন, তাই বলছি।—এ বিলাসিতার জিনিষ কিনে এ দেশের ক'টা লোক সহানুভূতি দেখাতে পারবে ! এ কাজ যখন করছেন আপনারই ভাল জানবার কথা ; আমার কিন্তু মনে হয় দেশের অবস্থা অনুযায়ী নিত্যকার প্রয়োজনের কোন কিছু নিয়ে সুরু করা-ই উচিত ছিল।'

যুবকটির মুখে চিন্তার রেখাপাত হলো। বললো, 'বাড়ী বাড়ী ঘুরে ক'দিন কথাটা আমার মনেও জেগেছে। এক জজের কথায় না ভেবে চিন্তে সুরু করে' দিলাম..., আচ্ছা, খুব অল্প মূলধনে ও-রকম কি কাজ হাতে নেওয়া যায় ? আপনারা বিজ্ঞ লোক—'

এ সম্পর্কে বিজ্ঞতা আমার মোটেই নেই। কিন্তু 'বিজ্ঞ' আখ্যা পেলে বিজ্ঞতা যেন আপনা থেকেই গজিয়ে ওঠে। বললাম, 'এ নিয়ে ভেবে তো দেখিনি কখনো।...এই তো সে-দিন একটা হিন্দুস্থানী ছিট-ওয়ালার মুখে শুনলাম, মাসে নাকি ত্রিশ-চল্লিশ টাকা তার আয়। ঐ রকম একটা কিছু—'

যুবকটির মুখের ভাবে উৎসাহ দেখা দিল। বললো, 'কথাটা তো মন্দ নয়। আশ্চর্য্য, এমন সাধারণ জিনিষটা এতদিন লক্ষ্য করিনি! এটার ষ্টক ফুরলেই সুরু করে দেব।'

লাগসই একটা উপদেশ দিতে পেরে আমারও উৎসাহ বেড়ে গেল। বিশেষ অজ্ঞ হয়েও বিশেষজ্ঞের মত অনেক কথা বলে গেলাম। যে-কোন শিল্প বা ব্যবসার জন্মকালে সহানুভূতির ধাত্রীত্ব অপরিহার্য্য হলেও তার 'ওপরে নির্ভর করে যে তার পরিণত অবস্থার দিন চলতে পারে না, সে বিষয় নিয়ে ছোটখাট একটা বক্তৃতার মতই দিয়ে ফেললাম। যুবটিও সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনে যেতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর কথার ফাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে সে বললো, 'আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম। যদি অনুমতি করেন তো নূতন কাজটা হাতে নেবার আগে আর একদিন আসবো; আমার আরও দু-একটা বিষয় জেনে নেবার আছে। আমার নাম বিনোদ, বিনোদ বিহারী দত্ত। থাকি—'

'এ সব লাইনে যারা আছে তাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন। আমি কতটুকুই বা খবর রাখি।'

'আজ্ঞে তা—লাইনে আমিও তো আছি, কিন্তু কই, এত কথা কি জানতাম।' একটু চুপ করে থেকে বললো, 'আর, কিছু যদি মনে না করেন...আপনি বড়লোক...আমার এই ষ্টকটা...অবিশ্যি আপনি যদি দরকার বোধ করেন।'

এতক্ষণ যে-লোকটি আমার বিজ্ঞতার কাছে মাথা নীচু করে বসেছিল, এমন কি আমার উপদেশ অনুযায়ী জীবিকা অর্জ্জনের পন্থাটা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করবে বলে' স্থির করে' ফেলেছে, তাকে একেবারে নিরাশ করা চলে না। এক টাকা খরচ করে' সবচেয়ে ভাল রকমের দু' বাণ্ডিল কাঠি রেখে নিলাম। বিনোদ নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিল।

বিনোদ চলে' যাওয়ার পর কিন্তু মনে হলো, বাণ্ডিল দুটো বিক্রি করবার জন্যেই সে এতটা সময় এখানে বসে ছিল।

দিন তিন-চার পর বিনোদ একদিন সশরীরে হাজির হয়ে আমার সে-ধারণার অমূলকত্ব প্রমাণ করে' দিল। হাতে তার দাগকাটা পেতলের শিক, পেছনে মুটের মাথায় পাঁজা-করা ছিট কাপড়। এসে জানালো, আমি নাকি তার প্রথম গ্রাহক, আমাকে দিয়েই এ ব্যবসায় সে বউনি করতে চায়।

তার সাফল্য কামনা করে গৃহিণীকে খবর পাঠালাম। ধূপকাঠিগুলো হাতে দেবার সময় বিনোদ সম্পর্কে সব কথা মিনতিকে বলেছিলাম। আমার টাকা দিয়ে আমার উপদেশের সার্থকতা প্রমাণ করতে মিনতি যেন উঠে পড়ে লেগে গেল। মিনতির উপস্থিতিতে যে-কোন যুবকেরই উৎসাহ বোধ করবার কথা; তার বর্ণ ও চেহারার সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে ছিটের পর ছিট বিনোদ গছিয়ে দিতে লাগলো। মিনতি তার শুভ্র-সুগোল-বাহুতে গাঢ়-নীল একটা রেশমী ছিটের অংশ জড়িয়ে গ্রীবাভঙ্গির সঙ্গে লক্ষ্য করে' দেখছিল সেটা তার মেদুর মেদকে কতটা রূপায়িত করে তুলতে পারে। বিনোদের চোখে প্রশংসা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠলো। উভয়ের এই যুগ্ম উৎসাহের কোনটাকেই আর অগ্রসর হতে দেওয়া সমীচীন মনে হলো না। হিসেবান্তে আটটা টাকা বের করে দিয়ে সেদিনকার মত বউনির কাজটা শেষ করা গেল।

তারপর কিছু দিনের মধ্যে আমার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতিতে বহুবার এসে শুধু কাপড় নয়, অনেক কিছিমের জিনিষ সে মিনতির কাছে বিক্রি করে গেছে। মিনতির কথাবার্ত্তা থেকে যে আভাস পেয়েছি তা'তে মনে হয় বিনোদের সঙ্গে পরিচয়টা তার ঘনিষ্ঠ ভাবেই হয়েছে, বিনোদের পারিবারিক খবরও সে অল্প-বিস্তর রাখে। শুধু তা-ই নয়, বিনোদের প্রতি কৃপামিশ্রিত একটু স্নেহের দৃষ্টিও তার আছে।

সেদিন আইন-সংক্রান্ত জরুরী একটা আলোচনা উপলক্ষে একবার যেতে হলো সমরেশবাবুর বাড়ী। সমরেশবাবু একটি মক্কেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত ছিলেন, সমাপ্তির অপেক্ষায় দৈনিক কাগজটা হাতে নিয়ে পড়া-খবরের

উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলাম। অকস্মাৎ দেখি বিনোদ ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে থমকে গেল। তার মুখ চেয়ে বেশ বুঝা গেল এখানে আমার উপস্থিতি সে প্রত্যাশা করে নি।

তাকে প্রবেশ করতে দেখেই সমরেশবাবু বলে উঠলেন, 'কি হে বিনোদ, আর ক'টা মেসিন বিক্রি করলে ?'

বিনোদকে বড় বিব্রত দেখা গেল। 'আজ্ঞে এই হচ্ছে এক রকম। আপনি ব্যস্ত আছেন, আসবো আর এক সময়।' বলে একটা নমস্কার ঘুরিয়ে তিন জনকে পরিবেশন করে' ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে গেল।

অমরেশবাবু যে-ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে' জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের মেসিন, ও মেসিন বিক্রি করে নাকি ?'

'হ্যাঁ। প্রায় এক হপ্তা হলো আমিই লাগিয়ে দিয়েছি এ কাজে। লাইফ ইনসিওর করাতে এসে একদিন খুব দুঃখটুঃখ করছিল। বি-এ পাশ করে' ঘুরে বেড়াচ্ছে, সারাদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করেও নাকি কিছু করে উঠতে পারছে না। যে-কোন রকম পরিশ্রম করতে রাজি; ভারি ধরে পড়লো একটা পথ বাৎলে দেবার জন্যে। জানিনে, চিনিনে, তবু উৎসাহ দেখে আনন্দ হলো। টাকা নয়, পয়সা নয়, শুধু একটা সাজেস্সন্—একটু না ভেবে পারলাম না। তখন টাইপরাইটার কিনবার চেষ্টায় ছিলাম। অনেক এজেণ্ট হাঁটাহাঁটি করছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে' অনেক তথ্যও সংগ্রহ করেছিলাম। বললাম, লেগে পড়, ব্যাপারে চাহিদা আছে, লাভও মন্দ থাকে না। এজেণ্টগুলোকে হাঁকিয়ে দিয়ে ওরই মারফৎ মেসিনটা কিনে ষ্টার্ট দিয়ে দিলাম। রেস্পন্স্ নাকি ভালই পাচ্ছে। প্রায়ই আসে দু' একটা সাজেস্সন্ বা ইনট্রোডাক্সনের জন্যে। ছেলেটি ভাল।'

ভদ্রলোকটি বেশ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনছিলেন, শেষ হলে বললেন, 'বা, বেশ তো! দিন পাঁচেক হলো কি একটা ব্যাঙ্কের সেয়ার বিক্রি করতে গিয়ে আমার কাছেও ঠিক এই রকম দুঃখ করে একটা সাজেস্সনের জন্যেও ধরে পড়েছিল। কিছু ভেবে না পেয়ে বললাম, বিলিতি বই-এর এজেন্সি নেও। সে উল্লসিত হয়ে চলে গেল। সাব-এজেণ্ট হিসেবে কাজ সুরু করে' দিয়েছে বলে' গতকাল একসেট বই গছিয়ে দিয়ে বউনি করে' গেছে।'

বউনি আমাকে দিয়েও করিয়ে নিয়েছে। স্রেফ চেপে গিয়ে চুপ করে রইলাম।

সমরেশবাবু বললেন, 'এমন ফক্কড় বলে তো ভাবতে পারিনি—পাকা চিট্!' যে বিজ্ঞতার কাছে আবেদন করায় তুষ্ট হয়েছিলেন, সেই বিজ্ঞতায় আঘাত পড়ায় রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, 'স্কাউনড্রেল। বাংলাদেশের ইয়ংম্যানদের যে কতটা অধঃপতন হয়েছে···এবার এলে—' সে সুযোগ আর পাবেন না ভেবেই হয়তো কথাটা আর শেষ করলেন না।

আমার মোটেই রাগ হলো না, বরং কৌতুক বোধ করলাম। বললাম, 'চিট্ কেন বলছেন, জিনিষ দিয়েই তো টাকা নিয়েছে। মনে করুন না ও জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার। আমি কিন্তু ওর বুদ্ধির তারিফ করি। কোথাও আমল না পেয়ে এটা বেশ আবিষ্কার করেছে যে দাতব্য উপদেশালয়ে হাত পাতলে ব্যবস্থাপত্রের সঙ্গে রোগ চেপে রাখবার মত ওষুধও যৎকিঞ্চিৎ মেলে।'

সমরেশবাবু বললেন, 'চিট্ না হোক ব্লাফার তো। আপনি এই ব্লাফ্ দেওয়াটা সমর্থন করেন?'

ভদ্রলোকটি বললেন, 'আর এ করে ওর ক'দিন চলবে। He cannot bluff all people for all time.'

বললাম, 'Some people for some time-ই যে ওরকম একটা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট।'

কাজ সেরে গাড়ীতে এসে যখন বসলাম, আইনের জটিল প্রশ্নজাল ভেদ করে বিনোদের কথাটা মনের উপর ভেসে উঠলো। লোকটির শান্ত সরল অভিব্যক্তি ভ্রান্তিকর বা ইচ্ছাকৃত বলে' ভাবতে মন যেন সায় দিতে চাইলো না। অন্যায়কে আশ্রয় করবার প্রবৃত্তি না থাকলেও খানিকটা প্রশ্রয় এরা বুঝি বাধ্য হয়েই দেয়। বিদ্যা ও বুদ্ধি নিয়ে স-ক্লান্তি পরিশ্রম করেও বেঁচে থাকার মত পথ যারা খুঁজে পায় না, তাদের গভীর ব্যর্থতাকে বাদ দিয়ে সামান্য ত্রুটি নিয়ে বিচার করতে বসলে বিচারে ভুল হবারই কথা। বুদ্ধিটা স্বাভাবিক রাস্তায় পথ না পেয়ে থমকে থাকে বলেই দুষ্ট পথ দিয়ে চুইয়ে বের হয়। ওর ছিট-কাপড়ের ব্যবসার কথা মনে পড়ে' হাসি পেল। আমার

উপদেশটা নেহাৎই বাজে হয়েছে ওর পক্ষে। নিশ্চয়ই সামান্য কমিশনে কোন ফিরিওয়ালাকে পাকড়াও করে' একটা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে।

বাড়ী ফিরে মিনতিকে ঘটনাটা বললাম। শুনে সে যা জবাব দিল তাতে আশ্চর্য্য হলাম। সে নাকি সব কথাই জানে, বিনোদ নিজে থেকেই তাকে বলেছে।

বললাম, 'আমাকে বলনি তো!'

'কথা দিয়েছিলাম বলবো না। তা ছাড়া শুনে হয়তো চটে উঠবে, বেচারা খেটেখুটে ছুটো পয়সা রোজগার করছে—'

'অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়াটা তোমার পক্ষেও উচিত হয়নি।'

'ইস, ভারি তো অন্যায়!' মিনতি এগিয়ে এসে একটা কৌচের হাতলের উপর বসলো। 'বেচারা খেতে পাচ্ছিল না, তবু দশজন বড় লোককে ধরে' এমনি করে' ছুটো পয়সা আজকাল পাচ্ছে।' মিনতি মুখ টিপে হাসলো। 'বাপ ভূরি ভূরি টাকা রেখে গেছেন, তোমরা কি বুঝবে বাপু। জান, মা আর পাঁচটি ভাইবোন নিয়ে—'

'থাক, অত কথা জানতে চাইনে।' মিনতিকে থামিয়ে দিলাম। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে এ দেশের লোকের পরিচয়টা এত ঘনিষ্ঠ যে গল্প-উপন্যাসে পর্য্যন্ত অতি সুকৌশলে তার অবতারণা না করলে প্রাত্যহিকতার দোষে পাঠকের আগ্রহ শিথিল হয়ে পড়ে। খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরার একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি না শুনে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু ও তোমার কাছে সব কথা খুলে বললো কোন ভরসায়; আর বল্লোই বা কেন?'

'তার কি জানি। বলার মত মানুষ পেলেই বলে।'

'তবে আর কি, জানই তো দেখছি।'

'...ক'দিন থেকে ভাবছি একটা কথা তোমাকে বলবো—'

'কি, বিনোদের কোন কথা?'

'হুঁ...না থাক।' মিনতির মুখে লজ্জার ভাব দেখা দিল।

চাকরি বা টাকার আবেদন বলে মনে হলো না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভ্রুকুটি করে মিনতি বললো, 'অমন করে তাকিয়ে আছ কেন, এমন কিছু একটা সাংঘাতিক কথা নয়।'

'তবে বলেই ফেল না।'

'একদিন এসে বললো, ও নাকি একটা স্বপ্ন দেখেছে—' বলেই মুখে আঁচল চেপে হাসতে লাগলো।

'ভারি আশ্চর্য্য তো, সচরাচর এমন ঘটে না!'

'আঃ, তা-ই যেন বললাম। স্বপ্নে দেখেছে আমি ওর মা; সেই থেকে আমাকে "মা" বলে ডাকে।'

'হুম, "ঠাকুরমা" দেখে যে তা-ই ডাকতে সুরু করেনি সেও একরকম ভাল। অবিশ্যি তা দেখবে না, সে জানি। আমাকে লুকিয়ে হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ওকে বলে দিও, এ বাড়ীতে যেন আর না ঢোকে! মা হবার জন্যে ভাবনা নেই, এখনও নিরাশ হবার মত সময় আসে নি।'

'ধ্যাৎ।' আমাকে এতটা গম্ভীর দেখে বললো, 'এতে রাগ করবার কি আছে! যা-ই বল ওর কোন মৎলব নেই, লোকটি ভাল।'

এখন বুঝলাম বিনোদের জন্য মিনতির এতখানি দরদ কেন। 'মা' শব্দটার তলায় যেন ওদের জীবনের সমস্ত রস সঞ্চিত হয়ে আছে, যেমন তেমন করে সেখানটায় চাপ দিতে পারলেই আর নিরাশ হবার ভাবনা থাকে না। কিন্তু এ ধরণের বিশুদ্ধ রাস্তা দিয়ে যে-সব পুরুষ অন্দরে ঢুকবার পথ করে নিতে চায়, তাদের আমি সইতে পারি নে। মনস্তত্ব ঘেঁটে আমাদের তো জানবার বাকি নেই এর প্রেরণা আসে কোথা থেকে। তা ছাড়া অর্থ আদায়ের অভিসন্ধিও নিশ্চয়ই খানিকটা আছে। লোকটার প্রতি যেটুকু সহানুভূতি ছিল নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এমন একটা দুষ্ট লোককে একেবারেই বুঝতে পারিনি বলে' নিজের উপর রাগ হতে লাগলো।

গম্ভীর মুখে পাইচারি করছিলাম। মিনতি বললো, 'এবার এলে নিষেধ করে দেব এভাবে ব্যবসা করতে। তুমি একটু সাহায্য ক'রো তবেই একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে।

মিনতির এতখানি দরদ ও দাবি মোটেই ভাল লাগলো না। হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে হওয়াতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এ ঘরের দেয়ালে

টাঙানো মিনতির ফটোটা ক'দিন হলো ওখানে নেই। একবার জিজ্ঞেসও করেছিলাম, বলেছে একজনকে দিয়েছে। অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বলেই লোকটিকে জানবার তেমন প্রয়োজন বোধ করিনি। মনে সন্দেহ জাগাতে প্রশ্ন করলাম, 'এই ফটোটা কা'কে দিয়েছ, সত্যি করে' বল দেখি?'

মিনতি ভীত হয়ে জবাব দিল, 'ভয়ানক ধরে পড়েছিল তাই……।' 'তাই উপহার দিয়েছি। তুমি এত বড় একটি 'ননসেন্স' আমার ধারণা ছিল না। এই ফটো নিয়ে আড্ডা জমিয়ে যে-সব রসালো আলোচনা চলছে, দশকান হয়ে ঘরে যখন আসবে তখন বুঝবে। তোমার বোম্বেটে খোকাটি কি ধরণের গল্প ফেঁদে বন্ধুদের কাছ থেকে বাহবা নিচ্ছে, আমি ঘরে বসেই বলে দিতে পারি। ছি ছি এর পর লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হবে।'

ফটোটাকে কেন্দ্র করে কত কি কুৎসিত আলোচনার সৃষ্টি হতে পারে ভাবতে গিয়ে রাগ আমার ক্রমশ চড়তে লাগলো।

মিনতির চোখ ছলছল করছিল। ভয়ে ভয়ে বললো, 'সত্যি কিন্তু এ দিকটা আমার মনেই আসেনি। ভাবলাম……আমি ওর ঠিকানা জানি—'

'সে-ঠিকানায় সে বসে রয়েছে তোমার জন্যে—সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কিনা। একটা অজ্ঞাতকুলশীল ইতর, তার পিছনে ছুটে বেড়াই এখন।'

তথাপি ঠিকানাটা জেনে নিয়ে রাগের ঝোঁকে তখনই গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কালীঘাটের একটা ঘিঞ্জি গলির মুখে এসে গাড়ী রাখতে হলো—সেখানে গাড়ীর প্রবেশ-পথ নেই। অপরিচ্ছন্ন আঁকাবাঁকা গলি ধরে' নম্বর দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। এ ভাবে অনেকটা এগিয়ে যাবার পর প্রার্থিত নম্বর পাওয়া গেল।

শাড়ীর পাড় দিয়ে তৈরী একটা পরদা সঙ্কুচিত অবস্থায় দরজার একপাশে ঝুলছে, সেটা ধরে' আঠার কি উনিশ বছরের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'এ বাড়ীতে বিনোদ থাকে?'

'হ্যাঁ, থাকে।'

মেয়েটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি রোয়াকে উঠে দাঁড়াতেই বললো, 'আমি আপনাকে চিনেছি।' বলে আপত্তি অগ্রাহ্য করে নীচু হয়ে সে প্রণাম করলো। বললো, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

'বিনোদ কোথায় ? তার কাছে—'

'আপনি বসুন, দাদা এক্ষুণি হয়তো এসে পড়বে।'

বাধ্য হয়ে মেয়েটির সঙ্গে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলাম।

একটা লোহার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সে বললো, 'আপনাকে বসতে দিতে পারি এমন কিছু অবিশ্যি আমাদের নেই, তবু দয়া করে যখন এসেছেন…'

আমরা কতটা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছি তা মেয়েটির চিনতে পারা থেকেই বুঝলাম। বসে দেয়ালের দিকে নজর পড়তে দেখলাম মিনতির ফটোখানা সেখানে ঝুলছে ; তাকে ঘিরে আছে আধ-শুকনো একটা ফুলের মালা। ন্যাশনাল সঙ্-এর সেই হাস্যকর আদর্শবাদের কথা স্মরণ হলো। ঘরের অবস্থা দেখে বুঝলাম একটি ঘরের মধ্যেই পুরো সংসার এবং তার মধ্যে মিনতির ফটোখানাই সব চাইতে সম্মানিত বস্তু। অন্তরের রাগটা অবলম্বন অভাবে একটা অস্বস্তি জাগিয়ে তুললে। তবু অনেকটা জোর করেই বলতে গেলাম, 'বিনোদ বুঝি বাড়ী নেই। আমি এসেছি…'

কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই মেয়েটি বললো, 'দাদা গেছে আমার ফিজের টাকা জমা দিতে, আজই শেষ তারিখ কিনা। আমি তো কাল কেঁদেকেটে একশা। ভাবলাম এবারও বুঝি গতবারের মত টাকার অভাবে পরীক্ষা দেওয়া হলো না। শেষ পর্য্যন্ত রাত্রে মা টাকা দিলেন বলেই না…', মেয়েটি চোখ তুলে মিনতির ফটোর দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকালো।

বোঝা গেল টাকাটা কোথা থেকে এসেছে। ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় মেয়েটিকে বড় ভাল লাগলো। বললাম, 'কিসের ফিজ ?'

'ম্যাট্রিকের। কেন আপনি শোনেন নি ?'

মনে পড়ার ভান করে বললাম, 'ও, বলেছিল বটে।'

'দাদা বলেছে পাশ করতে পারলেই আপনি একটা চাকরি করে দিতে পারবেন। আমার একটা চাকরি হলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।'

অর্থাৎ নিম্নতর খাওয়া পরার একটা সংস্থান হয়। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক যুবতীর নিশ্চিন্ততার ধারণা আজ কোথায় নেমে এসেছে।

মেয়েটি কা'র ডাকে যেন ভেতরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ছোট-বড়

দুটি ছেলে ও একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললো, 'মা বলছেন, আমরা আপনাদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো—মা'কেও বলবেন।'

পর পর ভাইবোন তিনটি প্রণাম করে গেল।

মিনতি জানেও না সামান্য কয়টি টাকা দান করে একটি ভদ্র পরিবারের মনকে এমন ভাবে জয় করে সে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। তার প্রাপ্য সবটুকু কৃতজ্ঞতা এরা আমার গায়ে ঢেলে দিল; সেই ভারাক্রান্ত পা নিয়ে ধীরে ধীরে আমি রাস্তায় নেমে এলাম।

একটা আশীর্ব্বাদের কথাও বুঝি আমার স্মরণ ছিল না।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়

॥ ৪ ॥ মধ্যযুগের দাক্ষিণাত্য

ষষ্ঠ-ত্রয়োদশ শতাব্দীকাল—মহারাষ্ট্র রাজবংশ : চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটগণ।

মারাঠা বা মরাঠীদেশ (বর্তমান বোম্বাই প্রদেশ, নিজামরাজ্যের উত্তর-পশ্চিম) মূলত দ্রাবিড়, কিন্তু ভাষা ও সভ্যতায় সম্পূর্ণরূপে আর্যভাবাপন্ন : পুরাকাল অবধি মহারাষ্ট্রী সাহিত্যিক প্রাকৃতের শীর্ষস্থানীয় এবং কাব্যের প্রিয়-ভাষা রূপে পরিগণিত ছিল। খৃঃ পূঃ ২০০ থেকে প্রায় ২৫০ খৃঃ পর্যন্ত এই দেশ এবং কৃষ্ণা ও নিম্ন গোদাবরী নদীর অন্তর্গত তেলুগু প্রদেশ, এই দুইয়ে মিলে গঠিত হয়েছিল পূর্বোক্ত ভারতবর্ষীয় অন্ধ্ররাজ্য। ২২৫এর দিকে কর্ণাটের পল্লবগণ অন্ধ্রদেশ ধ্বংস করেন। কেউ কেউ মনে করেন এরা দাক্ষিণাত্যে বিদেশাগত কোন পার্থীয় গোষ্ঠী ; খুব সম্ভব এরা কেবল অন্ধ্রদের অধীন কোন স্থানীয় বংশমাত্র। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে চালুক্য নামক একটি রাজপুত বংশ (গুর্জর) মারাঠা খণ্ডবংশগুলির ঐক্যসাধন করত একটি প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করলেন, তার রাজধানী ছিল বিজাপুরের নিকটস্থ বাতাপী বা বাদামী। এই সহরের ভূগর্ভস্থিত সুন্দর মন্দির (ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ) চালুক্যগণের শিল্পকলাজ্ঞান ও বৈষ্ণব ধর্মভক্তির পরিচায়ক। দ্বিতীয় পুলো-কেশিন (৬০৮-৬৪২) নামক একজন চালুক্য নৃপতি তাঁর রাজ্যকে যে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন, তার প্রতাপ ছিল সমগ্র দাক্ষিণাত্যব্যাপী। আমরা দেখেছি যে ৬২০-র দিকে তিনি (নর্মদাতীরে ?) কনোজরাজ হর্ষের এক আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন। কর্ণাটের পল্লবদেরও তিনি জয় করেছিলেন, এবং তাদের কাছ থেকে মুসলিপটমের নিকটস্থ বেঙ্গীদেশ কেড়ে নিয়েছিলেন। সেখানে তৎক্ষণাৎ চালুক্যদের একটি কনিষ্ঠ শাখার অধিষ্ঠান হল (পূর্ব চালুক্য বংশ)। কিন্তু ৬৪২-এ পল্লবগণ বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে নিহত করে (?)। তাঁর উত্তরাধিকারী বিক্রমাদিত্য এর প্রতিশোধ স্বরূপে পল্লবদের রাজধানী লুট করলেন,—কাঞ্চিপুর বা কাঞ্চি (বর্তমানে মাদ্রাজের নিকটস্থ কাঞ্জীবরম, ৬৭৪)।

ধর্মসম্বন্ধে পুলকেশিনগণ তাঁদের সমসাময়িক অন্যান্য রাজন্যের ন্যায় সর্বধর্ম-সমন্বয়েরই পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও নিজেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তবু তাঁরা স্বরাজ্যে বৌদ্ধধর্মকে নিরাপত্তে প্রশ্রয় দিতেন, যেমন আমরা হিউয়েন-ৎ-সাং-এর বিবরণে জানতে পাই। অজন্তার ১ম ও ২য় গুহার প্রাচীরচিত্র তাঁদেরই রাজত্বকালের সমসাময়িক। তবুও, অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতিই হতে লাগল,—যেমন অন্যত্রে, তেমনি মহারাষ্ট্রেও।

৭৫৭-এর দিকে বাতাপীর চালুক্যগণ রাষ্ট্রকূটদের মারাঠা বংশ কর্তৃক পরাজিত হন (রাজধানী বোম্বাইয়ের নিকটস্থ নাসিক, পরে মান্যক্ষেট বা মালখেড)। তাঁরা ৯৭৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

রাষ্ট্রকূটদের পূর্ববর্তী রাজাদের ন্যায় তাঁরাও ভারতবর্ষীয় শিল্পকলার প্রধানতম প্রোৎসাহকদের মধ্যে গণ্য। তাঁদেরই মধ্যে একজন, কৃষ্ণরাজ (৭৫৭-৭৮৩-র দিকে) শিবের নামে এলোরার কৈলাস মন্দির একটি প্রস্তর কাটিয়ে খনন করান; এবং ঐ বংশের দ্বারাই এলিফাণ্টার শেষ মন্দির নির্মিত হয় (৫ম-৯ম শতাব্দী)। এই দুই মন্দিরের অর্ধোৎকীর্ণ মূর্তিগুলি ভারতবর্ষের মধ্যে সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয় সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রকূটগণ পল্লবদেরও উচ্ছেদ সাধন করলেন, পরে তাদের স্থানানন্তর চোল নামক কর্ণাটের পরবর্তী তামিল শাসনকর্তাদের সঙ্গেও লড়তে লাগলেন। ৯৪৯-এর দিকে চোলদের বিজেতা রাষ্ট্রকূট তৃতীয় কৃষ্ণরাজ তাঞ্জোর পর্যন্ত বলপূর্বক প্রবেশ করলেন। ধর্মের দিক থেকে দেখা গেল যে, রাষ্ট্রকূটগণ দ্বারা মূলত শৈবধর্মের অভ্যুত্থানের কোন বাধা হয়নি। উপরন্তু অমোঘবর্ষ নামক তাঁদের মধ্যে একজন (৮১৫-৮৭৭-এর দিকে) জৈনধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম, যেমন ভারতবর্ষের অন্যত্র, তেমনি মহারাষ্ট্র থেকেও তখন বিদায় নিলে।

৯৭৩-এ চালুক্যগণ মহারাষ্ট্রের রাজসিংহাসনে আবার অধিরূঢ় হলেন। এই দ্বিতীয় চালুক্য বংশ, বোম্বাইয়ের নিকটস্থ তাঁদের রাজধানীর নামে কল্যাণীর চালুক্য বলে পরিচিত। তাঁরা চোলরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বিরত হননি। কখনো হেরেছেন, যেমন ১০০০ খৃঃ চোলরাজ রাজরাজের কাছে; আবার কখনো জিতেছেন, যেমন ১০৫২-১০৫৩-এ তাঁদের রাজা সোমেশ্বর যখন কৃষ্ণাতীরস্থ কম্পামে চোলরাজ রাজাধিরাজকে নিহত ক'রে শোধ তোলেন। বিক্রমাণকা বা

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে (১০৭৬) তাঁরা গৌরবের চরম শিখরে উপনীত হয়েছিলেন ব'লে বোধ হয়, কিন্তু তার পরেই তাঁদের দ্রুত অধোগতি হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে তাঁদের রাজ্য নগণ্য পদবীতে নেমে আসে। যাদব নামে তাঁদের প্রধান সামন্ত বংশ দ্বারা তাঁদের স্থান অধিকৃত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী যাবৎ যাদবগণ দেবগিরিকে (দৌলতাবাদ) রাজধানী করত মহারাষ্ট্র প্রদেশ শাসন করেন। মহীশূরের হয়সল রাজাদের সঙ্গে তাঁদের নিত্য বিরোধ লেগে থাকৃত। ১২৯৪ খৃঃ গঙ্গাতীরে অবস্থিত মুসলমানগণ মহারাষ্ট্রকে আক্রমণ করত দেবগিরি অধিকার করেন, এবং রাজা রামদেব তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৩১৮ খৃঃ তাঁরা পাকাপাকিভাবে দেশটিকে আত্মসাৎ করেন।

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস

পল্লবগণ : চোলদের সসাগরাশক্তি

দক্ষিণাপথ অনেক পরিমাণে দ্রাবিড় জাতিদ্বারাই অধিকৃত রয়ে গেছে,—বর্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্যে তেলুগু, কর্ণাটে তামিল ও মহীশূরে কানাড়ীগণ। এরা সকলেই ভারতবর্ষীয় ধর্ম গ্রহণ করলেও, নিজ নিজ ভাষা ও সভ্যতা রক্ষা করেছে। সর্বাপেক্ষা তামিলগণই আপন বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। যেমন ইন্দো-চীনে তেমনি এখানেও বিদেশাগত আর্যগণ যত না জয় করেছেন তত সভ্যতা দান করেছেন। তা' ছাড়া তামিলগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করবার আগে থেকেই একটি বিশিষ্ট মৌখিক সাহিত্যের অধিকারী ছিল বলে মনে হয়। তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রাহ্মণরা তাদের লিখতে শেখান। তখন তাদের প্রধান ধর্ম ছিল শৈবধর্ম (তার মধ্যে দ্রাবিড় দেবতারাও অঙ্গীকৃত হয়েছিলেন)। তারপর এল জৈনধর্ম ও পরে বৈষ্ণবধর্ম। রোমক যুগ থেকে কর্ণাটে দুটি তামিল রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, যথা ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর কেন্দ্রে চোলদের, এবং মাদুরাকেন্দ্রে পাণ্ড্যদের।

চোলরা ছিল শৈব ; পাণ্ড্যরা কতকাংশে জৈন। (এমন কি কিম্বদন্তি এই যে, ভদ্রবাহুর অধিনায়কত্বে খৃঃপূঃ ৩৬০-এ অনেকগুলি জৈন সাধু মগধ থেকে মহীশূর ও পাণ্ড্যদেশে সমাগত হয়েছিলেন।) ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি যে,

এই দুটি তামিল রাজ্য মিশরের রোমক প্রদেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করত সমৃদ্ধ হয়েছিল।

পুরাকালের শেষাশেষি দাক্ষিণাত্যের মধ্যপ্রদেশ পল্লব নামক একটি তৃতীয় জাতির হস্তগত হয়। তারা অন্ধ্র দেশের তেলেগু রাজ্য অধিকার করে, এবং চোল ও পাণ্ড্যের দুই তামিল রাজ্যকে নিম্ন পদবীতে নামিয়ে দেয়। আমরা পূর্বেই পল্লবদের উৎপত্তির অনিশ্চয়তার উল্লেখ করেছি। কখনো বলা হয় তারা পার্থজাতি সংশ্লিষ্ট ; আবার আজকাল তাদের দক্ষিণাত্যের কোন উপজাতি ব'লেই গণ্য করা সমীচীন বোধ হয় ; ওদিকে শকজাতি এস্থলেও অনুপ্রবিষ্ট কিনা তাও বলা যায় না। এ জাতির রাজধানী ছিল মাদ্রাজের নিকটস্থ কাঞ্চীনগর [কাঞ্জীবরম]। পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু চোল ও পাণ্ড্যদের বিনাশ করে (৬০০-র দিকে) তাঁর বংশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬২৫-এর দিকে) যদিও চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলোকেশিন কর্তৃক পরাস্ত হন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী প্রথম নরসিংহ বর্মন (অনুমান ৬২৫-৬৪৫) পুলোকেশিনকে পরাজিত ও নিহত (?) করেন। এই নরসিংহ বর্মনই বিষ্ণু ও শিবের নামে মাবলিপুরমের (মামল্লপুরম) প্রস্তরময় মন্দির (রথ) ও তার সন্নিকটস্থ বিরাট মূর্তিসকলের (বিশেষতঃ গঙ্গাবতরণের সুন্দর পরিকল্পনা) নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। পরবর্তী রাজত্বকালে এই কার্য অনুসৃত হয়, এবং অষ্টম শতাব্দীতে সমাধা হয় (রাজা মামল্ল অনুমান ৬৪৫-৬৭৪, ও রাজা রাজসিংহ অনুমান ৬৭৪-৮০০-র কালে)। উপরন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, খ্মের ও চাম সভ্যতার উপর পল্লবগণ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। পুরাকালে কম্বোজ ও চম্পায় পল্লব লিপির ব্যবহারে এই প্রভাব প্রমাণিত হয়।

চালুক্যদের সঙ্গে নিত্য বিরোধের ফলে অবসন্ন হয়ে পল্লবগণ যখন অধোগতি প্রাপ্ত হয়, তখন এতকাল পর কর্ণাটের চোলগণ নিজ শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সমর্থ হয়। চোলরাজ প্রথম পরাণতাক (৯০৭-৯৪৭-র দিকে) আরকট পর্যন্ত পল্লবদেশ দমন করেন, এবং পাণ্ড্যদের রাজধানী মদুরা অধিকার করেন। কিন্তু এবার রাষ্ট্রকূটবংশীয় মহারাষ্ট্র রাজাদের সঙ্গে চোলদের সংঘর্ষ হল। আমরা দেখেছি যে শেষোক্তগণ ৯৪৯-এ কর্ণাট প্রদেশ জয়পূর্বক বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। রাজ্যের পুনরভ্যুত্থান হয় মহামহিম রাজরাজের কালে (অনুমান ৯৭৫-১০১২ বা

১০১৩)। এই রাজা নতুন মহারাষ্ট্র রাজগণের (কল্যাণীর চালুক্যগণ) বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ক্রমে ক্রমে মধ্য কর্ণাটের পাণ্ড্যবদের, পরে ত্রিবঙ্কুর, মহীশূর ও মালাবার উপকূলের একাংশ, কাঞ্চীর অবশিষ্ট পল্লবদের, বেঙ্গীর পূর্ব চালুক্যদের এবং তেলিঙ্গান ও কলিঙ্গদেশ জয় করেন। উপরন্তু ১০০৫-এর দিকে ইনি সিংহল দ্বীপের অভিমুখে বিজয়যাত্রা করেন। তাঁর নানা বিজয়ের কীর্তি চিরস্থায়ী করবার জন্য তিনি তাঞ্জোরে যে "মহা পাগোডা" নির্মাণ করেন, সেটি নিঃসন্দেহে দ্রাবিড় শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

চোলরাজ্য বা তথাকথিত কর্ণাটের তামিল সাম্রাজ্য, প্রথম রাজেন্দ্র চোলদেবের আমলে (অনুমান ১০১২-১০৩৫ বা ১০৪২) অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। তিনি উড়িষ্যা দমন করেন, একবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন (১০২৩-এর দিকে) এবং তাঁর নৌবাহিনী পেগু, মালাক্কার উপদ্বীপ, এমন কি সুমাত্রার শক্তিশালী শ্রীবিজয় রাজ্যের (পালেম্বান) কাছেও রাজকর আদায় করতে সমর্থ হয় (অনুমান ১০৩০)। এই সময় "তামিল সসাগরা শক্তি" বঙ্গোপসাগরের সমগ্র উপকূলেই আধিপত্য লাভ করেছিল (তাঞ্জোরে প্রথম রাজেন্দ্র চোলদেবের শিলালিপি দ্রষ্টব্য)।

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস। হালেবিড ও বিজয়নগর।

একটি মারাত্মক দুর্ঘটনায় মহান চোল সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১০৫২ বা ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে কম্পামের (মহীশূর) যুদ্ধে মহারাষ্ট্র রাজগণ চোল রাজরাজকে পরাস্ত ও নিহত করে। কিছুকাল পরে তদানীন্তন রাজবংশের স্থান বেঙ্গীর পূর্ব চালুক্য-বংশের একটি রাজা দ্বারা অধিকৃত হয় (দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোলদেব), এবং তিনি চোল-চালুক্য বংশের পত্তন করেন (১০৭০)। এই নতুন রাজবংশের অধীনে, নিম্ন গোদাবরী থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমগ্র কর্ণাট প্রদেশে চোল রাজ্যের অধিকার বজায় থাকে। পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, এ রাজ্যের অধঃপতন ঘটে। মদুরার পাণ্ড্যগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে এবং দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশের আধিপত্য হয়সল বংশীয় দ্বারসমুদ্র বা দোরসমুদ্রের (বর্তমান মহীশূর) রাজাদের হস্তগত হয়। দ্বারসমুদ্রের রাজা প্রথম বিষ্ণুবর্ধন (বিঠ্ঠল বা বিঠ্ঠদেব—১১১০-১১৪১) সম্ভবত কোন

যুদ্ধে চোলদের পরাস্ত করত তামিল আধিপত্য থেকে মহীশূরকে মুক্ত করেছিলেন। বৈদান্তিক রামানুজকে চোলগণ শৈবধর্ম গ্রহণ করাবার চেষ্টায় ছিল; তাই তাদের বিরক্তিকর উপরোধ এড়াবার জন্য তিনি বিষ্ণুবর্ধনের রাজ্যে এসে আশ্রয় নেন, ও তাঁকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই রাজা এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তাঁদের রাজধানী হালেবীডকে (প্রাচীন দ্বারসমুদ্র) অপরূপ মন্দিরে মন্দিরে ছেয়ে ফেলেন (হয়সল রীতি, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী। একে ভুল ক'রে চালুক্য বলা হয়)।

সমস্ত ত্রয়োদশ শতাব্দী ধ'রে দ্বারসমুদ্রের রাজারা মহারাষ্ট্রের যাদবরাজদের সঙ্গে লড়ালড়ি করতে থাকেন। ১৩১০-এর দিকে তাঁরা এবং যাদবরা এবং অবশিষ্ট চোলগণ সকলেই মুসলমান কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। মালিক কাফুরের সেনাপতিত্বে তাঁরা কর্ণাটের শেষ পর্যন্ত সৈন্যবল ঠেলে নিয়ে যান। বছর কুড়ি পরে পড়ল শেষ ঘা—মুসলমানরা ওয়ারঙ্গলের তেলেগু রাজ্য বিনাশ করবার পরেই (১৩২৩) হালেবীডও তাঁদের হাতে বিনষ্ট হয় (১৩২৬ বা ১৩২৭)। কিন্তু চোল, তেলিঙ্গান ও দ্বারসমুদ্রের ধ্বংসাবশেষের উপর অনতিবিলম্বে একটি নতুন দ্রাবিড় রাজ্য স্থাপিত হল, যেটি দুই শতাব্দী যাবৎ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়: সেটি বিজয়নগর।

১৩৩৫-এর দিকে, হরিহর ও বুক্করায় নামক দুই রাজ-ভ্রাতা মহীশূরের দক্ষিণ সীমান্তে, তুঙ্গভদ্রের উপত্যকায় বিজয়নগর পত্তন করেন। তাঁরা মুসলমান আক্রমণের সময় তেলিঙ্গান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন (অনুমান ১৩৩৬-১৩৭৬)। মহীশূর ও কর্ণাটের কর্ণাটী ও তামিল জাতিদের মুসলমান আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার নিমিত্ত এই সহর একটি প্রাকারস্বরূপ ছিল, এবং উক্ত জাতিগণ তার আধিপত্য স্বীকার করত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদ্যাচর্চারও এটি একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। বিজয়নগরের রাজ্যান্তর্গত শৃঙ্গেরীতেই মাধব ১৩৮০-র দিকে তাঁর মহামূল্য সর্বদর্শনসংগ্রহ লেখেন। অপিচ তাঁর ভ্রাতা সায়ণ (১৩৮৭)—যিনি বেদের ভাষ্যকর, তিনি ছিলেন বুক্করায়ের রাজমন্ত্রী। পরিশেষে বিজয়নগর দ্রাবিড় শিল্পকলার নানা শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যে পূর্ণ ছিল, যথা শিবের মহা পাগোডা (পঞ্চদশ শতাব্দী) এবং বিঠোবা (১৫২৯)।

দ্রাবিড় স্বাধীনতার, তথা হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষকরূপে বিজয়নগরের রাজারা

সেই বাহমনী বংশের মুসলমান সুলতানগণের সঙ্গে ক্রমান্বয় যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন'—যাঁরা ছিলেন বর্তমান নিজাম রাজ্যের এবং অধিকাংশ বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্তা। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী ছিল এই দুই রাজ্যের সীমারেখা; এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দোয়াব নিয়ে তাদের ঝগড়া লেগে থাকত। প্রথম প্রথম বাহমনীগণ জয়যুক্ত হয়েছিলেন; কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাশেষি যখন তাঁদের সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রতিযোগী সুলতানরাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ল—যথা বিদার, গোলকণ্ডা, বিজাপুর, আহমদনগর ও বেরার,—নরসিংহ বা নরসিংহ মালুব (১৮৪৬-১৪৯২ ?) এবং কৃষ্ণদেব (অনুমান ১৫০৯-১৫২৯) নামক বিজয়নগরের রাজারা মুসলমানদের উপর জয়লাভ করলেন। কৃষ্ণদেব রায়চূরের নিকট বিজাপুরের সুলতানকে একটি মহাযুদ্ধে পরাস্ত করেন (১৫২০)। তাঁদের উত্তরাধিকারী রামরাজ (১৫৪২-১৫৬৫) তাঁর প্রতিবেশী চারটি মুসলমান সুলতানরাজ্যের বিবাদে মধ্যস্থতা করবার সুযোগ পেয়ে (আহমদনগর, বিজাপুর, বিদার ও গোলকণ্ডা), তাদের পরস্পরকে দিয়ে পরস্পরকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষে এই চারটি মুসলমান সুলতান তাঁর কারসাজি ধ'রে ফেল্লে। তখন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালে, তালিকোটার যুদ্ধে তাঁকে হারিয়ে দিলে (জানুঃ ১৫৬৫), এবং বিজয়নগরকে ধূলিসাৎ করে দিলে (১৫৬৫)। সমগ্র প্রাচীন দ্রাবিড় সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হোলো।

বৌদ্ধ-সিংহল

স্থানীয় কিম্বদন্তি এই যে, খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষীয়গণ সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। গুজরাট হতে আগত আর্যরাজা বিজয় দ্বারা সম্ভবত সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তিনি অনুমান ৪৮৩ থেকে ৪৪৫ পর্যন্ত এই দ্বীপে রাজত্ব করেন। দুঃখের বিষয় মনে হয় বৌদ্ধধর্মের সাফাই গাইবার জন্য এই তারিখটি নির্বাচন করা হয়েছে। সেই কিম্বদন্তিই বলে যে এই দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রচারিত হয় খৃঃ পূঃ ২৪৬-এ (?)। তিনি ও তাঁর প্রজাবর্গ নাকি অশোকের পুত্র কন্যা মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা দ্বারা দীক্ষিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা বিশেষ ক'রে এই জন্যই মগধ থেকে এসেছিলেন। এই রাজাই নাকি তাঁর রাজধানী অনুরাধাপুরে মহাবিহারের পত্তন করেছিলেন, যেটি ছিল সিংহলী

ধর্মসঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র। ভট্টগামনী (৮৯-৮০ অথবা ২৯-১৭?) নামক তাঁর জনৈক উত্তরাধিকারী সিংহলী বৌদ্ধধর্মে একটি নতুন উদ্যমের সঞ্চার করেন। তাঁর রাজত্বকালে (৮৯-তে?) মহাবিহারের ভিক্ষুগণ দ্বারা আহূত একটি সভায় পালি ত্রিপিটকের বিধিবদ্ধ সংস্করণ লিপিবদ্ধ হয়। এই রাজাই অভয়গিরি নামে একটি নতুন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি অনতিবিলম্বে মহাবিহারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। অভয়গিরি ও মহাবিহার উভয় স্থানেরই ভিক্ষুগণ স্থবির সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (পালিঃথেরা)। এই "প্রাচীন" সম্প্রদায়েরই চিরদিন সিংহলে প্রাধান্য ছিল; কিন্তু শেষোক্তগণ যেমন খাঁটি হীনযানের প্রতিই সর্বদা নিষ্ঠাবান ছিলেন, প্রথমোক্তদের মধ্যে কতকাংশ পরে অল্পবিস্তর মহাযানের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এই দুই মঠের মত ও অনুষ্ঠানঘটিত বিবাদবিসম্বাদ বহুকাল যাবৎ এই রাজ্যকে আলোড়িত করেছিল।

কিন্তু এই সকল মতান্তর সত্ত্বেও সিংহলী ধর্মসঙ্ঘ অধিকাংশই ছিল হীনযান-পন্থী, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের সেই আদিম শুদ্ধস্বত্বরূপ. সেই অনীশ্বর, মানবীয়, নৈষ্ঠিক ধারার পক্ষপাতী, যেটি অশোকের যুগে এই দ্বীপে প্রবর্তিত হয়েছিল। তাঁরা পালিকে পুণ্যভাষা ব'লে রক্ষা করেছিলেন। ভারতবর্ষের উত্তরাপথে বৌদ্ধগণ শেষকালে সংস্কৃত ভাষাই গ্রহণ করেছিলেন, সে স্থলে সিংহলী বৌদ্ধধর্মে পালি ভাষার প্রচলনে একটি বিশেষ মূল্যবান সনাতন রূপ সংরক্ষিত হয়েছে— এই কথা ওল্‌ডেনবর্গ্ সাহেব বলেন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, মহানামের রাজত্ব-কালে (অনুমান ৪১২-৪৩৪) বিশুদ্ধ মাগ্‌গ রচয়িতা বুদ্ধঘোষ নামক একজন ভিক্ষু মগধ থেকে সিংহলে আসেন। সেখান থেকে তিনি ঐ দ্বীপে পূর্ব্ব প্রচলিত হীনযান মতামত পালিতে অনুবাদ করত সেগুলিকে সংগ্রহ ও পরিষ্কার করার কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। কিন্তু Finot সাহেব উক্ত সিংহল দ্বীপে অভিযানের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের ফলে সিংহলে যে শিল্পকলা বিকাশের সুযোগ, ঘটে ভারত উপদ্বীপের গুপ্তশিল্পের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সম্ভবত কাশ্যপের রাজত্বকালে (৪৭৯-৪৯৭) সিগিরীয়ার প্রাচীরচিত্র অঙ্কিত হয়, যেগুলি অজন্তা চিত্রের জাতভাই। "বুদ্ধের সমাধিভাব"-এর যে দুই গজ উচ্চ প্রস্তর মূর্তিবর্তমানে কলম্বোর যাদুঘরে রয়েছে, সেটিকেও W. Cohn সাহেব এই 'একই কালের বলে' মনে করেন (৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী),

যদিও কুমারস্বামী বলেন সেটি ২য় শতাব্দীর। ৮৪৬-এ খৃঃ অনুরাধাপুর রাজধানীর পদবীচ্যুত হয়, এবং পলন্নারুব (বর্তমান তোপাবা) তার স্থান অধিকার করে; কিন্তু সিংহল রাজগণ বারম্বার তার স্থাপত্য কার্যগুলির সংস্কার করিয়ে দেন।

কর্ণাটের তামিলগণ, পাণ্ড্যগণ, পরে শৈব চোলগণের বারম্বার আক্রমণ হেতু বৌদ্ধধর্মসঙ্ঘকে বড়ই বিপন্ন হতে হয়, এবং অনুরাধাপুর ত্যাগ করবার কারণই তাই। ২০০৫-এর দিকে বিজয়ী চোল রাজরাজ সিংহলকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন। একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রথম বিজয়বাহু আবার এই রাজ্যকে তার স্বাধীনতা প্রত্যর্পণে এবং কিছুকালের নিমিত্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হন। সেই সময় তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘকেও পুনরুজ্জীবিত করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে সিংহলী দ্বীপ আবার নতুন করে' তামিল আক্রমণ এবং গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়।

প্রথম পরাক্রম বাহু (১১৬৪-১১৯৭) নামক এক শক্তিশালী রাজার অধীনে দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহল আবার উন্নতি লাভ করে। এই রাজা তামিলদের তাড়িয়ে দেন, এবং তাদের পূর্ব পূর্ব আক্রমণের প্রতিশোধস্বরূপ কর্ণাটের পাণ্ড্যদের বিরুদ্ধে এক অভিযান করেন। স্বরাজ্যের অভ্যন্তরে তিনি অভয়গিরি এবং মহাবিহার মঠদ্বয়ের ঐক্যস্থাপন করত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গৃহবিবাদ রহিত করেন। তিনি নিজে ছিলেন সাধু ব্যক্তি, হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজেই রোগীদের পরিচর্য্যা করতেন। পলন্নারুবে তিনি অনেক বৌদ্ধ স্থাপত্য নির্মাণ করান, ঐ সহরের নিকটে পাল-বিহারের শিলাময় মূর্তি অধোৎকীর্ণ করান, এবং অনুরাধাপুরের মন্দিরের সংস্কার করান। তাঁর দেহান্তে আবার আক্রমণ আরম্ভ হয়। ১২৩০-এ হয় কলিঙ্গের বোম্বেটেদের আক্রমণ। ১২৫৫-র দিকে, তৃতীয় পরাক্রম বাহুর রাজত্বকালে (১২৪০-১২৭৫) হয়ত শ্রীবিজয় (সুমাত্রার পালেম্বান) কিম্বা খুব সম্ভব তাম্রলিঙ্গ (লিগর) থেকে একটি মালয় দেশীয় নৌ-বাহিনী সিংহল দ্বীপ আক্রমণ করতে আসে। কর্ণাটের চোল ও পাণ্ড্যগণ তাদের সাহায্য করেন, কিন্তু পরিণামে আক্রমণকারীরা পরাভূত হয়। পরবর্তীকালে অনুমান হয় যে, সিংহল রাজ্য চীনদেশের মঙ্গোলীয় সম্রাট কুবিলাইকে সহায়রূপে লাভ করবার চেষ্টায় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে ও তাঁকে বুদ্ধের একটি স্মরণচিহ্ন প্রেরণ করে (১২৮৪)। আমরা এও জানি যে, কুবিলাই কর্তৃক সিংহলে প্রেরিত দূতের

মধ্যে মার্কো পোলো ছিলেন একজন ; এই ভ্রমণকারী সিংহলেই বুদ্ধের পরিচয় লাভ করেন। তাঁকে তিনি "সাগামনি বোর্কম বা বোর্কন" নামে অভিহিত করেছেন, এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক যথাযথ তথ্য আমাদের জানিয়ে গেছেন। তৃতীয় পরাক্রম বাহুর বহু পূর্ববর্তীদের ন্যায় তিনিও ছিলেন রাজর্ষি। বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশত তিনি প্রাণদণ্ড বা হত্যা রহিত করেন।

যদিও তৃতীয় পরাক্রম বাহু ও তাঁর পুত্র এবং সহকারী চতুর্থ বিজয় বাহু নিজেদের সমগ্র সিংহলের রাজা ব'লে সগর্বে ঘোষণা করতেন, কিন্তু দ্বীপের মধ্যস্থলে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে ভিন্ন তাঁদের আধিপত্য সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয়েছিল কিনা সন্দেহ ; কারণ তামিলরা সর্বদাই উত্তর দিকে আক্রমণ বা উৎপাত করত। উপরন্তু উক্ত রাজাদের মৃত্যু হলে পর কর্ণাটাগত অন্যান্য তামিলগণ পুনর্বার সিংহল আক্রমণ করে (১৩১৪)। ভাষার দিক থেকে এবং ধর্মের দিক থেকে উভয়তঃই সিংহল দ্বীপের সমগ্র উত্তরাংশ শেষ পর্যন্ত এই ভয়াবহ প্রতিবেশীদের দ্বারা অধিকৃত হয়।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা গন্ধী*

মহাত্মাজীর সত্তর বৎসর জন্মতিথি উপলক্ষে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ বইখানি সম্পাদনা করেছেন। সবশুদ্ধ আটান্নটি প্রবন্ধের মধ্যে এগারটি ভারতবাসীর ও বাকিগুলি বিদেশীর রচনা। এই প্রকার ভৌগলিক অসমবিভাগের জন্য মহাত্মাজীর সার্ব্বজনীনতাই প্রধানত দায়ী। বিদেশীর মধ্যে অনেকেই খৃষ্টান ও ধর্ম্মযাজক। মহাত্মাজীর ধর্ম্মের সঙ্গে খৃষ্টান ধর্ম্মের মিল অনেক, এমন কি অনেক প্রথিতযশা খৃষ্টানের মতে তিনি যীশুর পরেই প্রথম ও প্রধান খৃষ্টান, তাই পুস্তকে খৃষ্টান লেখকের প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক, অর্থাৎ জনমতের অনুযায়ী। অন্য সব প্রবন্ধও ভক্তিমূলক। মহাত্মাজীর দান এতই মূল্যবান ও বহুমুখী যে তাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনাও মন্দ লাগে না, কৃতজ্ঞতায় তার শুদ্ধি হয়। অধ্যাপক টম্‌সনের চটুল প্রবন্ধও বিষয়ের গুণে গম্ভীর হয়েছে। বই-এর শেষে মহাত্মাজীর নিজের গোটাকয়েক ও অধ্যাপক মূয়ারহেড্-এর 'হিন্দুধর্ম্মের সত্য' নামে একটি প্রবন্ধ আছে।

এই ধরণের সম্পাদিত ও সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলি এদেশে আজকাল খুব চলছে। জয়ন্তী-সংক্রান্ত যতগুলি প্রবন্ধ সমাবেশের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তার মধ্যে নির্ব্বাচন হিসেবে এই বইখানি নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ও বিদেশীর লেখা থাকলে কি হয়—মহাত্মাজীর জীবনের মূলসূত্র দিয়ে বইটি মালায় গ্রথিত হয়েছে। অনেকে হয়ত বলবেন যে এ মালায় রঙের বাহার নেই, কিন্তু গন্ধেই তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ। তবু একটি কথা স্বীকার করতেই হবে যে অন্তত পণ্ডিত জহরলালের, কিংবা সুভাষ বাবুর প্রবন্ধ থাকলে লোকে বুঝত যে ভারতবর্ষে, অন্য উপমায়, এমন একটি চিন্তাধারা বইতে সুরু করেছে যার বহতা একত্র, এককালীন, এমন কি একমুখী হলেও তার উৎস অন্যত্র। বইখানির সম্পাদনা সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে খাঁটি ভারতীয় ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের দিক থেকে মহাত্মাজীর ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিচার নেই; যদিও ডাক্তার ভগবান দাস ঋষিবর্ণিত সমাজের তুলাদণ্ডে মহাত্মাজীর সামাজিক মতামত আলোচনা

* Mahatma Gandhi—Edited by—S Radhakrishnan, (George Allen & Unwin Ltd.)

করেছেন। সনাতনী হিন্দু ও মুসলমানদের ওপর মহাত্মাজীর প্রতিক্রিয়া কি ধরণের তার প্রকৃত পরিচয় আমাদের অবিদিত। তাঁদের মধ্যে মনস্বী ও ভদ্র লেখকের সন্ধান দুষ্কর নয়। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ সাধনার সঙ্গে মহাত্মাজীর সাধনার গরমিল আছে শুনেছি। তার বিচার না থাকার দরুণ বইখানির অঙ্গহানি হয়েছে। তেমনই আরেক ধরণের মননশীল ব্যক্তি আছেন যাঁরা ইতিহাসের নিয়মানুসারেই মহাত্মাজীর মাহাত্ম্য আলোচনা করতে চান। যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রতিবেশে গন্ধীজির একছত্র নায়কত্ব আজ সম্ভব তার উল্লেখের অভাব বইটির তৃতীয় দোষ। অস্পৃশ্যদের জন্য মহাত্মাজীর প্রচেষ্টা একটি সামাজিক কীর্ত্তি; কিন্তু তার পূর্ব্বেও হিন্দু সমাজে এই প্রকার প্রয়াসের সাক্ষাৎ পাই। চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম প্রথমেই মনে আসে। তাঁর প্রক্রিয়ার সঙ্গে মহাত্মাজীর তুলনা করলে বোঝা যেত হিন্দুসমাজ কতখানি বদলেছে এবং সেই পরিবর্ত্তনের পারিপার্শ্বিকে গন্ধীজীর কৃতিত্ব কতটা স্থায়ী। তা ছাড়া, হরিজন সমস্যার একটি অর্থনৈতিক দিকও আছে। খেত-মজুরদের মধ্যে নিম্নজাতির সংখ্যা অন্য কোনো শ্রেণীর চেয়ে বেশী। এই তথ্যটিকে ভিত্তি করে সমস্যার সমাধান যে হতে পারে তার সম্ভাবনার কোনো প্রকার ইঙ্গিত বইখানিতে নেই। হয়ত তার কারণ এই মহাত্মাজী হরিজনদের চরখা কাটতে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সে উপদেশ সকলের জন্য। অতএব সমস্যার বিশেষত্বটুকু অস্বীকৃত রয়েই গেল অনেকের ধারণা হতে পারে। এমন কি একাধিক ব্যক্তি ভাবেন যে হরিজনদের প্রতি মহাত্মাজীর আগ্রহ প্রধানত ধর্ম্মমূলক হবার জন্য সমস্যা সমাধানের পথে বাধা পড়েছে। আমার মোট কথা এই: বইখানির সব প্রবন্ধই মানসিক স্তরের, সেই স্তরের নীচে কোনো লেখকেই যেতে সাহস পান নি। আমার মনে হয় যে বইখানির প্রথম প্রতিজ্ঞা, মহামানব স্বপ্রজনিত। বলা বাহুল্য একাধিক অ-ধার্ম্মিকের কাছে এ-ধরণের প্রাথমিক অথচ অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞা গ্রাহ্য নয়, তাই বইখানির অনেক রচনাই চমৎকার হলেও পাঠকের মনে একটা অসন্তোষ রেখে যায়।

"মহাত্মা" শব্দের অর্থ ডাঃ কুমারস্বামী তাঁর প্রবন্ধে বুঝিয়েছেন। যার আত্মা মহান তিনি মহাত্মা নন, কারণ, আত্মার ছোট বড় আকার নেই, গুণের তারতম্য নেই, কারণ, আত্মা নির্গুণ। মহাত্মা তিনি যাঁর মধ্যে ভগবান নিজকে বেশী

প্রকাশ করেছেন। ভগবান, ব্রহ্ম নয়, কারণ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশিত। অতএব মহাত্মা শব্দটির সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার মূল অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অর্থগত সংস্পর্শ থাকলেও তার মধ্যে ভগবদ্ ধর্ম্মের আভাসই বেশী। লীলা, প্রকাশ প্রভৃতি সংজ্ঞা যখন ভারতীয় মনে বসল, যখন জনসাধারণের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান অপার্থিব মনে হল, যখন তার পরিবর্ত্তে মানবিক গুণের শুদ্ধ আধারের প্রয়োজন হল, তখনই মহাত্মা শব্দের প্রয়োগ আরম্ভ এ-কথা মনে করা অন্যায় নয়। কোন্ অবস্থায় এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছিল তাও কল্পনা করা যেতে পারে। যখন বৈদিক সমাজ কোনো আদিম সমাজের সংঘর্ষে তুর্ব্বল হয়েছে, তুটি সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতে একটি তৃতীয় সমাজ সৃষ্টি হচ্ছে, অথচ বৈদিক সমাজের কৃষ্টি তখনও ভাঙ্গেনি, তখনই বৈদিক সংজ্ঞাকে অদল-বদল করে জনমতের উপযোগী এবং সমাজ-প্রগতির অনুযায়ী নতুন সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়। য়ুরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে substance থেকে growth-এর পরিণতির ব্যাখ্যাও এই। আমাদের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতবর্ষে বিশেষত বাঙলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের লীলা ও থিওজফীর মহাত্মা-বাদ পাশাপাশি চলেছে। তার কারণও ঐ, অর্থাৎ পুরাতন ও নতুন সমাজের মধ্যে বোঝা-পড়া। এই বোঝা-পড়া করেন কে? সর্ব্বত্রই মধ্য সত্তোপভোগীর দল; তবে এ পোড়া দেশে, চাকুরীজীবি—ইদানীং অর্থাৎ ১৯১৯ সালের পর থেকে কল-কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীর দল। ভগবৎ ধর্ম্মে বিশ্বাসীর মধ্যে বৈশ্যের সংখ্যা বেশী মনে হয়। অতএব আমার মতে যাঁরা ব্রহ্মবাদী না হয়ে 'ভগবান' মানেন তাঁরাই মহাত্মা কথাটি ন্যায়ত ব্যবহার করতে পারেন। করেনও দেখেছি। ভারতবর্ষে ধনিক-বণিকরাই গন্ধীজিকে মহাত্মা বলেন এবং গ্রামের লোকে তাঁকে মহারাজ বলে। বিশ্বাসের ওজনে অবশ্য পার্থক্য আছে। প্রথম শ্রেণীর তাঁকে না হলে চলে না—এই হল তাঁদের বিশ্বাসের প্রকৃতি; অন্য শ্রেণীর বিশ্বাস অহেতুক। পার্থক্যটুকু লক্ষ্য করবার জিনিষ। তাই বলে গন্ধীজি অ-ভারতীয় নন।

ইংরেজীতে তিনটি কথা আছে, hero, prophet ও mystic, যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন মহৎ ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। তেমনই হিন্দুসমাজে জীবন্মুক্ত, যোগী, ব্রাহ্মণ। কোনটিই কারুর অনুবাদ নয়। গন্ধীজিকে ঠিক জীবন্মুক্ত, যোগী কিংবা ব্রাহ্মণ বলা চলে না, যদিও তিনি এমন শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছেন যেটা হয়ত

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার মহৎ ব্যক্তির মধ্যে কারুর ভাগ্যে জোটে নি। হিন্দুশাস্ত্র কি সাধনার কেনো অঙ্গের ভাষায় যদি তার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয় ত সেটি বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাধনার। কারণ তাঁর ভগবান প্রেমময়। তিনি অবশ্য সত্য হিসেবেও তাঁকে কল্পনা করেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য সেটা ঠিক বেদান্তের সত্য নয়, অর্থাৎ তিনিই আছেন, অতএব তিনিই সৎ ও সত্য, বাকী সব মিথ্যা—এমন মত গন্ধীজির নয়। আমার স্থিরবিশ্বাস তাঁর সাধনা রাধার। অবশ্য সে-রাধা গৌড়ীয় নয়, গুজরাটি হতে পারে। মোদ্দা কথা, গন্ধীজীর সাধনা স্ত্রীসুলভ। আমি অনেকবার এই মন্তব্য প্রকাশ করেছি। হয়ল্যাণ্ডের প্রবন্ধে সমর্থন পেয়ে বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হল। অ-সহযোগ, নিজের দুর্ব্বলতা থেকে শক্তি আহরণ, অনুভূতি সাপেক্ষতা, নিজের ইচ্ছাকে পরের আজ্ঞায় পরিণত করবার ক্ষমতা, অর্থাৎ একটু লীলাভাব, এক কথায় যে-সব প্রক্রিয়ায় গৃহকর্ম্ম নির্বিবাদে চলে তারই সাক্ষাৎ মহাত্মাজীর কৃতিত্বে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এগুলি দুর্ব্বলতার চিহ্ন নয়, কে বলে মা তুমি অবলে! আমি এদের heroic qualities বলি। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের নেতাকে hero বলতে কারুর বাধে না—কারণ, প্রতিকূল প্রতিবেশের বিপক্ষে লড়াই করা heroরই ধর্ম্ম। কিন্তু এই ধর্ম্মের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেশী ফুটে ওঠে স্বীকার করতেই হবে। বিরুদ্ধ আচরণে অনেক সহযোগী জোটে নিশ্চয়, কিন্তু সংঘর্ষের প্রকৃতি যখন একধারে নঙর্থক, অর্থাৎ বারণ, তখন অন্যধারে একজন আত্মবিশ্বাসী, পরিশ্রমী, একাগ্রচেতা নেতার সৃষ্টিই স্বাভাবিক। সেই নেতা যখন নির্য্যাতনের প্রতীক হয়ে ওঠেন তখন তিনি একাধারে hero ও leader। তাঁর কৃতিত্ব অর্জ্জনে জনসাধারণের দান ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যত সেটি অস্পষ্ট হয় ততই মনে হয় নেতার খাতির অ-পার্থিব প্রভাবের সমতুল।

এর ওপর hero-leader-এর মনোভাবে যদি ধর্ম্মের অংশ বেশী থাকে, যদি তাঁর সমগ্র কর্ম্মে কোনো বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীকগুলি এমন কি অন্যরূপেও প্রকাশ পায়, যদি সামাজিক প্রতিবেশ সেই সব প্রতীকের প্রচারে সাহায্য করে, যদি সেই সমাজ বিপদে পড়ে নিজেদের ওপর আস্থা হারায়, তবে hero-leaderকে prophet ভাবতে বিশেষ কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। তার মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যদি আবার তর্কনীতির বাইরে পড়ে তখন:-সেই

hero-prophet mystic-এ পরিণত হন। আমার বিশ্বাস আজ মহাত্মাজীর প্রভাবে এই বিবর্ত্তন সম্পূর্ণ হয়েছে।

হিন্দু-সমাজে ব্যক্তির স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই গন্ধীজি হিন্দু hero হতে পারেন না, কেবল য়ুরোপীয় ভাবের hero ও leader হতে পারেন; হিন্দু-সমাজে Prophet-এর স্থান নেই, তাই তিনি বিদেশী Prophet; হিন্দু-সমাজে mystic মাত্র আত্মজ্ঞানী, তাই তিনি practical mystic। অথচ অন্যধারে তাঁর মানসিক সংজ্ঞা হিন্দু-ধর্ম্মের, এবং সমস্যা ভারতীয়। এই দুটি বিপরীত, অন্ততঃ আংশিকভাবে বিপরীত ভাবের টানা পোড়েনে গন্ধীজী মহাত্মা। তার ওপর বৈশ্য-যুগের ধর্ম্ম-মনোভাবের যোগান রয়েছে। য়ুরোপীয় ধনিক-তন্ত্রের আদি-বিন্যাসে যে Puritanism এর সাক্ষাৎ পাই তার ছাপ মহাত্মাজীর আচরণে ও রচনায় বেশ পড়েছে। যদি কেউ প্রশ্ন করেন সেই Calvinisim এর মূলমন্ত্র system of rationalist ethics মহাত্মাজীর মধ্যে পাই না কেন, তবে তার উত্তর দেব গান্ধীজি হিন্দু, এবং ভারতীয় সমাজ এখনও পাকাপাকি য়ুরোপীয় ধনিকতন্ত্রে পরিণত হয়নি।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শঙ্খচিল ও রাজহংস

মৃত্তিকার গ্রন্থি টুটি' উঠিল সে চেতনার চিল,
জীবন্তশিখার মতো দিগন্তে দিগন্তে দিল হানা ;
করোটী-ধবল-গ্রীবা, পীত চক্ষু, চঞ্চু তাম্র-নীল,
প্রোজ্জ্বল পিঙ্গল বর্ণ বঙ্কিত নখর ; মুক্তডানা

রক্ত-দাবানল সম বিরঞ্জিত, বিথারিত, সঞ্চালিত মুগ্ধ বসুধার
দিকে দিকে। সহসা বসিল আসি বিটপীর শিখর-শাখার
সিংহাসনে
একচ্ছত্র সম্রাটের মহিমায় ; অব্যর্থ-দৃষ্টির বহ্নি জ্বালিয়া নয়নে

একটি মুহূর্ত শুধু চাহিল সে মর্তের প্রান্তরে ;
যেথায় পঙ্কিল জলে, গণ্ডীবদ্ধ কুণ্ডের কারায়
চক্ষুহীন কর্ণহীন লক্ষ লক্ষ কীটাণু সন্তরে,
যুগ-যুগান্তর ধরি আলোকের সম্বিত হারায়

অসিত-শৈবালজাল-আচ্ছন্ন পন্থার 'পরে। সে-পন্থায় পরশি' চরণ
বিদ্যুৎ-নখর মেলি' বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়া কীটাণুর পাংশুল-জীবন,
ধাবমান
উল্কা সম পলকের গতির ঝলকে তুলি' সে বিহঙ্গ বহে অভিযান

রজতচ্ছুরিত রৌদ্রে প্রজ্জ্বলিত পবনের মানস মন্থিয়া
ঊর্ধ্বের উত্তুঙ্গ দেশে ;—যে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন-মুর্ধায়
আদিত্যের রাজহংস গোলকের অন্তরে বসিয়া
তাহারে বরণ করে অনন্তের সৌর-চেতনায়।

নিশিকান্ত

বিংশোত্তরী

'বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভার তিমির—
দ্বিষাং বৃন্দৈর্ব্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।'

—আনন্দলহরী

সারেঙ্গীওয়ালার ছড়ি দ্রুত চলে। সুরের প্রপাত
অলিতে গলিতে ঢোকে—রৌদ্রালু প্রহর,
কাক, চিল, চড়ুই-এর স্বর।
অর্থবান ও অর্থবতী নিদ্রার পুঁজিরে বরে খালি।
রৌদ্রপূত বর্ণপ্রভ বাড়ী
লাল, নীল, পীতাভ প্রাকারে
উঁকি মারে এক মুঠো দিবাস্বপ্ন পানে ;
ছিন্নকন্থা পরিহিত পথিকে সুধায় :
সুপ্রভাত,—কফি কিছু, কোকো কিংবা চা ?
হায় রে দুর্ভাগা দেশ !
সারেঙ্গীওয়ালার ছড়ি এ ছবির ফ্রেমে
রূপালী সুরের আঁকাবাঁকা রেখা টানে।

ছিন্নকন্থা পরিহিত সে পথিক থামে
থামের আড়ালে।
নামের আড়ালে দেখি বর্ণচোরা চোর,
তস্করের জটিল জীবন
পথের কিনারে।
ইষ্টাপূর্ত সাধনায় কখনো কুক্কুরবেশী
কখনো লস্কর।
নিবিষ্ট বকের চিত্তে মীনগন্ধী ঝড়,
জিঘাংসার নিশ্চল সমাধি।

থামের আড়াল কিছু নিরাপদ নয়,
শৃঙ্গী হতে শত হস্ত দূরে ॥

পাখীগুলি পেলো ছাড়া প্রাণের আকাশে ;
নিরাশ্রয় পক্ষাবেগ রচে ঘন নীড়
পথাশ্রয়ী বৃক্ষদের পত্রপুঞ্জ মুছে নেয় তাদের বিস্তার
কামনার মাঝে—
প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনীর। লঘু চঞ্চু ঘোরে ফেরে
প্রতিদিন আবৃত্তির মত,
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি নিষ্কাম সঙ্গম,
রেলিংএর ধারে কিংবা ধর্মতলার
মোড়ে। পাবে শান্তি কোন্ সমন্বয় মাঝে
লাঞ্ছিত পথিক!
সারেঙ্গীর দ্রুত গতে বাঁধা এই পদ সঞ্চালন,
ধমনীর গতি।
প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখি অট্টহাসে সমের চূড়ায়
শ্বেত ও ফেনিল ;
রক্তে শুনি তুরঙ্গম্‌হ্রেষা দুনিবার।
পাদপের জনারণ্যে বর্ধজীবী বল্কলের পাংশু মুক্তি আর
ছায়ায় ছায়ায় ঠাসা শাখাদের গলি।
এর মাঝে শান্তি খোঁজা
চকিতে বিদ্যুৎপ্রভ কুঠারের ক্রোধে শুধু প্রমাদ গণনা ॥

আজও হে অর্য্যমা,
আনন্দের প্রস্রবণে শুনি তব হিরণ্য কল্লোল
প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন কালে।
প্রাণবান রৌদ্রের উষ্ণ অনুরোধ
পানাহার মত্ত রক্তকণাদের ডাকে
বাণিজ্যের যৌথ পোতে দূরে।

স্ফটিক সৌধের চূড়া লাখে লাখে সূক্ষ্ম শির নাড়ে,
নিশ্চিন্ত মত্ততা আনে সামুদ্রিক সুরা।
কাকাতুয়ার আর্তনাদ ও উন্মত্ত নর্তন, এই দিনগুলি যেন।
জনসমুদ্রের ক্রুদ্ধ ঢেউ ভাঙে নিচে,
ভিত্তিমূলে লাগে শিহরণ।
স্বেদ-গর্ভ শ্রমে,
স্বপ্নমোড়া রাত্রিগুলি অভিমানে আত্মঘাতী হল
একে একে। সঙ্গহীন প্রমায়ুর শেষে
নরযাত্রা দেখা যায় ধূলিবিলুণ্ঠিত ;
আন্দোলন, প্রমিতি ও সমিতির ভীড়ে
মুখের রেখায় কাঁপে লেনিন্-সুষমা, কড়া চুরুটের ধোঁয়া।
সারেঙ্গীওয়ালার ছড়ি কষা হানে দীপকী গমকে ॥

তারপর শান্তি আসে বর্ষাধৌত পল্লীসম নামি
প্রখর শ্যামল—কত সমতল ও পিচ্ছিল মনে।
রজস্বলা ধরিত্রীরে বহুপ্রজা করেছো অর্য্যমা
বীর্য্যবান করে। প্রাণ, আবর্ত্তের প্রচণ্ড ঘূর্ণনে,
চারু ভ্রূণ বিভঙ্গের কায়াকৃত তাপে, ছায়াকামী।
অভ্রংলিহ দুরাশার মনোলৌল্যে নেই বুঝি ক্ষমা
সৌর আদালতে। তাই উৎকোচের লুপ্ত ইন্দ্রজাল।
স্বস্থ মনে, লিবিডোর রোধহীন সুস্থ ঋজু পথে,
প্রাণোর্ম্মির হর্ষনাদ, মৃত্যুহীন সৌর শিশুদেরই।
যুগান্তের অপঘাতে, ভৈরবের তাণ্ডবে করাল,
স্ফূর্তিই দেখি। এই বসুধার আয়তি-সরণী
রক্ত-সূর্যে সমুজ্জ্বল—অবিনাশী পূর্ণ মনোরথে।

কামমুকুলিত মনে বর্ণছত্রে ঘেরা ঘটাকাশে,
নব নব যাত্রারম্ভে অজর এ পটাকাশ হাসে ॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

"অবসর"

আমরা ছিঁড়েছি দুর্গম দিন। মন্থরতা
দিয়াছে অনেক প্রলাপ কাহিনী। স্মৃতির ছায়ে
এসেছে দানব ঈশাণ কোণের ধূম্র রথে ঃ
রাখীবন্ধনী ছিঁড়ে গেছে। আজ, সময় হল ?

এখানে যুদ্ধ। বন্ধ্যা মাটির প্রাসাদ গড়ি
বুদ্ধির ধারে শীর্ণ শরীর শানানো শুধু
মৃত্যু দূতেরা নিশ্চুপ মনে মন্ত্র পড়ে—
দিবা অবসান সেতুবন্ধনে, সন্ধ্যা এলো

ধারকরা তাপে দেহ সেঁকে নাও শয্যাশায়ী
শরসন্ধানী মন মেলে মিছে মিলাতে চাও
দূরে ঝাউবনে ঝোড়ো রাত কাঁদে ক্লান্ত মনে
বহু বছরের অভিশাপে ভরা স্বপ্ন শুধু

কৃষ্ণ-চূড়ার উদ্ধত ডালে আকাশ আলো
তোমার আমার মধ্যে বিরাট স্মৃতির সেতু
মাঘের সূর্য্য তীর্থযাত্রী। বিশাল ছায়া।
প্রলাপী মনের পাঁচিলে রুদ্ধ। মিথ্যে খোঁজা।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

একটি রূপক কাহিনী

দূর থেকে সহরটাকে দেখতে পেয়ে টমাস আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠল। অনেক সহর সে দেখেছে কিন্তু এটার সাথে বুঝি কারো তুলনা চলে না। চমৎকার আবহাওয়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে উঁচু উঁচু দালানগুলো একেবারে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে যেন। পাহাড়ের উপর থেকে টমাস এই সহরের কর্মব্যস্ততার চাপা কোলাহল শুনতে পেল, বোলতাকে একটা হাঁড়ীর মধ্যে বন্ধ করে রাখলে যে রকম শব্দ শোনা যায় তেমনি। টমাসের দীর্ঘাবয়ব এবং তামাটে মুখের আকৃতি অপরিণত দেহকে বিকৃত করে দিয়েছে। ওর একমাত্র সখ মানুষকে ভোজবাজী দেখান আর বেহালা বাজিয়ে ভবঘুরের মত উদ্দেশ্যহীন পথে হাঁটা।

কিন্তু এখন টমাস কোথাও কিছুদিনের জন্যে কায়েমীভাবে থাকতে চায়, উদ্দেশ্যহীনতা আর ভাল লাগে না। অবিশ্যি এর আগেও ও অনেকের কাছে থাকবার চেষ্টা করেছে, অনেকেই ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে আর টমাসও ভেবেছে হয়ত এতদিনে থাকবার মত একটা স্থান জুটল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা গণ্ডগোলের সূচনায় ওকে পথে বেরুতে হয়। তাই টমাস ভাবল, এই সহরের অগণিত বাড়ীর যে কৌতূহলী দৃষ্টি ওকে ঘিরে ধরেছে তার মধ্যে নিজের থাকবার মত সংস্থান বোধহয় মিলবে। টমাস কাঁধের বেহালা থলের মধ্যে ঢুকিয়ে পিছন ফিরে শেষবারের মত দেখে নিল চিরপরিচিত ক্ষেত, অরণ্য, নদী তারপর দ্রুতবেগে পাহাড় থেকে নেমে নতুন সহরের সীমানায় এসে দাঁড়াল।

প্রথমেই টমাসের নজরে পড়ল একটা বিপুলকায় মানুষ রাস্তার মাঝখানে একটা বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুলভাবে কি যেন নিয়ন্ত্রিত করছে। টমাস ওর কাছে গিয়ে নিজের অভিপ্রায় জানাল। কয়েক মিনিট লোকটা তেমনি হাত নাড়তে লাগল তারপর হঠাৎ টমাসের দিকে ফিরে ভ্রুকুটি করে উঠল, কী নাম তোমার ?

—টমাস।

* (ডে লুইস-এর Thomas—A Fairy Tale গল্পের অনুবাদ)

—পদবী কী ?

টমাস নির্বিবাদে উত্তর দিল। ওর বেহালার দিকে লোকটার নজর পড়াতে আবার চীৎকার করে হাত এগিয়ে দিল, বেহালার লাইসেন্স আছে ত ?

—না, এর জন্যে যে লাইসেন্স রাখতে হয় তা আমি আগে জানতাম না, কিন্তু আপাতত আমি কোথায় যেতে পারি সেটা যদি বলে দাও তাহলে কাল একটা লাইসেন্স করিয়ে নেব।

—তোমার পদবী কি বললে যেন···ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, ছাখ মার্কেট স্কোয়ারের কাছে এক ভদ্রলোকের মস্ত এক বাড়ী আছে, তাঁরও কিন্তু এই পদবী, বোধ হয় তিনি তোমার আত্মীয় হন, তাই না ?

ব্যাপারটা আর একটু অনুধাবন করবার ইচ্ছা ছিল টমাসের কিন্তু ইতিমধ্যে লোকটা আবার হাত নেড়ে বিড়বিড় করতে আরম্ভ করেছে, ওসব আমার কাজ নয়, যাও এখান থেকে, ট্রাফিক্ চলাচলের অসুবিধে হচ্ছে।

সত্যি তাই। কিছুক্ষণ আগেও সমস্ত গাড়ীগুলো ঠিকমত যাতায়াত করছিল কিন্তু এখন আশেপাশের বাস, মোটর প্রভৃতির মধ্যে কি রকম একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। বিপুলকায় মানুষটা পূর্ব-বর্ণিত বাড়ীতে যাবার পথ দেখিয়ে দিল তারপর কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলল, খবরদার কোন সময়ে যেন মিষ্টার জেক্স্-এর সাথে দেখা কোরো না।

লোকটার নির্দেশমত টমাস সহরের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রস্তর-নির্মিত একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে এলো। বাড়ীটার গগনভেদী উচ্চতা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী থেকে নিজের স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অপরিচিত সহরের এই নতুন বাড়ীতে ঢোকবার সময় টমাস আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে গেল ; একটু আনন্দও হল বৈকি, যদি সত্যিই ওর কোন আত্মীয়ের সাথে দেখা হয়। বাড়ীর ভিতরটা আরো সুন্দর, টমাস মনে মনে ধারণা করে নিল আত্মীয়টি নিশ্চয় যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন। একটা সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে কতকগুলো লোক টেবিলের খাবারে মনোযোগী হয়েছে, কয়েকটা চেয়ার খালি পড়ে আছে, বোধহয় সব নিমন্ত্রিত অতিথি এখনও পৌঁছায় নি। এতখানি পথ চলার ক্লান্তি ওকে অবসন্ন করে ফেলেছিল কিন্তু তবু কিছুক্ষণের জন্যে টমাস ধৈর্য ধরে নিমন্ত্রণ পাবার আসায় অপেক্ষা করল। যেহেতু

টমাস নিজে একজন যাদুকর সেইজন্যেই হঠাৎ ওর মনে হোলো হয়ত এই লোকগুলোও এখানে কোন ভোজবাজী দেখাবার মৎলবে এসেছে।

ওরা টমাসের দিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেনি। অগত্যা টমাস ওদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বল্ল, আমার মনে হচ্ছে এ বাড়ীর মালিক আমার আত্মীয় হন, তাঁর সাথে...

নিশ্চয়ই—একজন টমাসের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল, তিনি আমাদেরও আত্মীয় হন।

—এত বড় চমৎকার বাড়ীটা কী তাহলে তাঁর নিজের ?

—শুধু এ বাড়ী কেন, এ সমস্ত সহরটাই ত তাঁর, তা ছাড়া আরো অনেক কিছু...

—আমি তাঁর সাথে দেখা করতে চাই, বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে টমাস জানাল।

—উঁহু, তা হবে না।

—কেন, আজ কী তিনি এখানে নেই ?

—নিশ্চয়ই আছেন, তিনি ত ঘরে বাইরে সর্বত্রই সব সময়ে থাকেন।

টমাস কিন্তু ভেবে নিল নিশ্চয়ই ওর আত্মীয়টির খুব প্রতিপত্তি আছে এবং সেইজন্যেই হয়ত অত্যধিক কাজের চাপে তিনি ওকে অভ্যর্থনা জানাবার সময় সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। সুতরাং টমাস নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত থাকবার মত একটা ঘরের সন্ধান চাইল যেখানে আত্মীয়টির কাজ শেষ না হওয়া অবধি অপেক্ষা ও বিশ্রাম করা যায়।

—আমার মনে হয় আপনারা কোন ভোজবাজী দেখবার চেষ্টা করছিলেন, হঠাৎ টমাস নিজেকে প্রকাশ করে ফেল্ল, যাক্ আমি আর আপনাদের বাধা দেব না কারণ ওসব অনেক কিছু আমার জানা আছে, এ ব্যবসাটা আমার খুব ভালো লাগে আর গ্রামের লোকগুলো একমাত্র এতেই...

টমাসকে আর বলতে হোল না। ঘৃণিত অবজ্ঞায় ওদের মধ্যে একজন গর্জিয়ে উঠল, কী বল্লেন আপনি ? আজকালকার এই কুসংস্কার-বর্জিত দিনেও এইসব অবৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনা ? এই মুহূর্তে এখান থেকে দূর হয়ে যান। আমি আগে বুঝিনি এখন মনে হচ্ছে আপনি একেবারে অশিক্ষিত একটা বর্বর। আমি বরাবরই শাসনকর্তাকে জানিয়েছি যে এই সব অশিক্ষিত

বেদেদের সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া কতটা কলঙ্কের ব্যাপার। যাও আবার পড়াশুনো শেখগে আর মনে থাকে যেন ভদ্রতা না শিখে কোনদিন এখানে এসো না। হ্যাঁ আর একটা কথা, যাই করো বাপু মিষ্টার জেক্স্-এর কাছে যেন কোনদিন যেও না।

টমাস রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ভাবল নিশ্চয়ই ওরা আত্মীয়টিকে খুন করে টেবিলের নিচে লুকিয়ে রেখেছে, তা না হলে এরকম আকস্মিক রূঢ় ব্যবহার করবার কী কারণ থাকতে পারে ?

এরপর মিষ্টার ফিলিপ টমাসকে উদারতার সাথে গ্রহণ করলেন। অভ্যর্থনায় বিগলিত হয়ে মিষ্টার ফিলিপের প্রশ্নের উত্তরে টমাস এই সহরে আসার সমস্ত অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণনা আরম্ভ করল। মুদ্রাদোষের বশবর্তী হয়ে মাঝে মাঝে ফিলিপ ঘাড় দোলান সামান্য, তা ছাড়া আর কোন ক্রুটী টমাস বাইরে থেকে খুঁজে পেল না। যা হোক্ কিছুক্ষণ আগে টমাস যাদের খপ্পরে পড়েছিল তাদের চেয়ে ফিলিপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের।

লাঞ্চ খাবার সময় টমাস বেহালা নিয়ে বসল বাজাবার জন্যে, আগের অভিজ্ঞতা থেকে ভোজবাজী দেখাবার সাহস পেল না। তা ছাড়া এ পর্যন্ত যারা ওর বেহালা বাজান শুনেছে তারা সকলেই যথেষ্ট সাধুবাদ জানিয়েছে। টমাস যেই বাজান সুরু করল তৎক্ষণাৎ ফিলিপ সামনের শেলফ্ থেকে একটা বই খুলে নিয়ে একবার বইটার দিকে একবার বেহালার ছড়িটার দিকে কী যেন পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। থেকে থেকে তাঁর ঘাড় ঈষৎ দুলছিল তবে সেটা ঠিক সঙ্গীতের তালে নয়। টমাস থামতেই ফিলিপ দ্রুত বইটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্লেন, বাঃ মন্দ নয়, সুন্দর। কিন্তু আপনি ছড়ি ঠিক মত ধরতে শেখেননি যে, আপনার কব্জী আরো ই-য়ে হওয়া চাই, আর দেখুন 'নি' পর্দাটা কী আপনি ঠিক মত··· ?

—কিন্তু আমার এই সুর কী আপনার ভাল লাগল না ?

—ও, আরে সে ত লেগেছেই, সত্যি সুন্দর, কিন্তু যন্ত্রটাকে ত আপনার আয়ত্বে আনা চাই—ওই ত দেখছি আপনাকে আয়ত্বে এনেছে।

উত্তরে টমাস বিবর্ণ হাসল।

কিছুদিনের মধ্যেই ফিলিপ তাঁর এই নতুন ছাত্রটির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠলেন, টমাসও নিঃশব্দে সমস্ত শুনে যায়। নিঃশব্দে না শুনে উপায় কী? ফিলিপ যা বলেন তার অধিকাংশ কথাই ও বোঝে না। সেজন্যে ফিলিপকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়, যে ছেলে কিছুই লিখতে পড়তে জানে না, কখনো তর্কশাস্ত্র, য়্যারিস্‌টট্‌ল্‌, লিগ্‌ অব নেসান্স্‌ কিম্বা ফুটবল খেলার নিয়ম প্রকৃতির নাম পর্যন্ত শোনে নি তার দ্বারা কী এমন সম্ভব হতে পারে? কিন্তু তবু টমাস তাঁর সাথে জ্যোতিঃশাস্ত্র, ভূগোল কিম্বা মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে যে কোন ভাষায় চমৎকার আলোচনা করতে পারে। একদিন তিনি ওকে বল্লেন, ছাখো টমাস, ইস্কুলে তোমাকে পড়তেই হবে কিন্তু তার আগে তোমাকে কয়েকটা জিনিষ দেখাতে চাই।

পকেট থেকে চাবি নিয়ে ফিলিপ ডেক্স্‌-এর ড্রয়ার খুললেন। ড্রয়ার থেকে আর একটা চাবি বার করে আলমারি খোলবার জন্যে এগিয়ে এলেন। কৌতূহল এবং উত্তেজনায় টমাসের মানসিক অবস্থা যে স্তরে এসে পৌঁছল তার বর্ণনা এখানে অবান্তর সুতরাং আলমারি থেকে ফিলিপ যে জিনিষ বার করে-ছিলেন তার জন্যে টমাস মোটেই প্রস্তুত ছিল না, একেবারে নিষ্ঠুর য়্যান্টি-ক্লাইমাক্স্‌। শুধু কতগুলো কাঠের খেল্‌না, অন্তত ওগুলোকে দেখে মোমের খেল্‌না বলেই মনে হল। প্রত্যেকটার আকৃতি বিশ্রী, গায়ে কিসের যেন ছাপ—এদের দেখেই ওর মনে কী যেন পরিচিত অস্পষ্ট ছায়া ভেসে উঠল। ওগুলোর মধ্যে কয়েকটা বেছে নিয়ে ফিলিপ নিঃশব্দে ওর হাতে দিলেন। খেলনা নিয়ে খেলাতে টমাসের কোনই আপত্তি নেই তবে ওর ভবিষ্যৎ জ্ঞানার্জনের পথে এই অসম্পূর্ণ, বিকলাঙ্গ পুতুলগুলো কী সাহায্য করতে পারে? নিরুৎসাহের সাথে টমাস ওগুলো ফিলিপের কাছ থেকে নিল। তখন থেকে মাঝে মাঝে ও আশ্চর্য হয়ে যেত, এই পুতুলগুলো কেমন যেন তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। কোন সময়ে হয়ত ওগুলোকে পকেট থেকে বার করে টমাস নির্বোধ দৃষ্টিতে বহুক্ষণ চেয়ে থাকত। কোন দিন হয়ত ও স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেল, কয়েকটা পুতুল বিপুলকায় দেহ নিয়ে ওর সামনে এগিয়ে আসছে, তারপর হয়ত অতিক্ষুদ্র এক বীভৎস রূপ নিয়ে পিছনের দিকে ছুটে গেল। পরদিন সকালে টমাস ড্রয়িংরুমে বসে কী যেন ভাবছিল, আবার হঠাৎ দেখা

গেল ওদের মধ্যে একটা জীবন্ত কুৎসিত দেহের আকার নিয়ে দরজার চৌকাঠে পা দিয়েছে। সাংঘাতিক ভয়ের সূচনায় সেদিন বিকালে টমাস সমস্ত পুতুলগুলো পুড়িয়ে ফেল্ল। ঐ বিকলাঙ্গ অদ্ভুত জড় পদার্থগুলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আর কী সুযোগ্য উপায় থাকতে পারে ?

এই অবাস্তব অভিজ্ঞতাকে বাদ দিলে, মোটের ওপর টমাস বেশ সুখেই ছিল। ইস্কুলের সহপাঠীরা ওকে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মেনে নিত আর মাঝে মাঝে ভোজবাজী দেখাবার জন্যে অসম্ভব বায়না ধরত। ইস্কুলের নিয়মের পরিধিতে যাবতীয় পড়াশুনোর ব্যাপারে সহপাঠীরা ওকে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং তার প্রতিদানে টমাস ওদের কাছে এই গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর পৃথিবীর ইতিহাস অনর্গল বলে যেত। তখন টমাসের খেয়াল হল মিষ্টার ফিলিপ ওকে যেসব বিকৃত পুতুল দিয়েছিলেন সেগুলোর আকৃতি অনেকটা ওর সহপাঠীদের মত। তবে এরা টমাসকে ভয় দেখায় না বরং অভ্রান্ত দেবতা ভেবে শ্রদ্ধা করে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া টমাসের অনুকূলে, শুধু ফিলিপের পরিবর্তিত আচরণই যা একটু ওকে বিচলিত করে তুলল। এটা স্পষ্টই বোঝা গেল ফিলিপ ওকে আজকাল যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখেন, বিশেষ করে ও যখন সহপাঠীদের সাথে খেলা করে। সময়ে অসময়ে ওদের কাছ থেকে তিনি টমাসকে সরিয়ে নেন।

এই অপ্রীতিকর ব্যবহারে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ এলো অকস্মাৎ। পর পর দুজনে টমাসকে যার সাথে মিশতে নিষেধ করেছিল হঠাৎ একদিন সকালে ফিলিপকে ও তারই কথা জিজ্ঞাসা করে বসল, স্যার, মিষ্টার জেক্স্ লোকটি কে বলুন ত ?

এই প্রশ্নে সকলেই অদ্ভুতভাবে চমকে উঠল। ফিলিপ মনে মনে অস্বাভাবিক চঞ্চল হয়ে উঠলেও খুব শান্তভাবে বল্লেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ টমাস ?

টমাস বার বার অস্বীকার করা সত্ত্বেও ওকে পোটলাপুঁটলি বেঁধে ফিলিপের সাথে তাঁরই এক বন্ধুর কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হল। ফিলিপ দৃঢ়তার সাথে জানালেন সেই বন্ধুটি শীগ্‌গীর ওকে সুস্থ করে দিতে পারবে।

এই বন্ধুটির নাম মিষ্টার মার্ণ্ট্। তাঁকে দেখলে ভয়ের চেয়ে হতাশাই

বেশী আসে। চেহারায় অপরিমেয় কাঠিন্য, সমস্ত মাথায় একটী চুলের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ফিলিপ এই বন্ধুটির সাথে যখন ঘরের এক কোণে চুপি চুপি কথা বলছিলেন তখন টমাস বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল এ ঘরের শুধু জানালা ছাড়া মেজে, ছাদ, চেয়ার, টেবিল সবই কাঁচের তৈরি। এমন কি মিষ্টার মাণ্টের টাক মাথাও পরিষ্কার কাঁচের মত চকচক্ করছিল। ভদ্রলোক একসাথে অনেকগুলো চশমা পড়েছিলেন, চশমা খুলে ফেললে হয়ত কাঁচেরই ছুটো স্বচ্ছ চোখ বেরিয়ে পড়বে। এই সব আশ্চর্য ব্যাপারেই যে টমাস সম্পূর্ণ অভিভূত ছিল তা নয়, ফিলিপের দু একটা কথাও তার কানে আসছিল···বুঝলেন মিষ্টার মাণ্ট্ একটা বিশ্রী কেস্···আমার চেয়ে আপনি ভাল বুঝবেন।

সেই মুহূর্তেই মাণ্ট্ ফিলিপের মাথার উপর দিয়ে টমাসের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করলেন, ওহে তোমার পেটের নাড়িভুড়ি বার করতে হবে, এদিকে এসো।

টমাস বল্ল, আমার পেটের ভিতর ত কোন গোলমাল নেই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।

মাণ্ট্ গর্জিয়ে উঠলেন, অসম্ভব ; তা হতেই পারে না···।

তারপর টমাসকে পাশের একটা ঘরে আনা হোল : মিষ্টার মাণ্ট্ যথেষ্ট তৎপরতার সাথে ওকে বিভিন্ন যন্ত্রের পর বসিয়ে ওজন করলেন আর কাঁচের নোট বুকে ফলাফল লিখে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর তিনি টমাসকে ওর মা-বাপ সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন কিন্তু টমাস তাদের কথা একেবারে ভুলে গেছে, সঠিক কিছু বলতে পারল না। তখন টেলিস্কোপ্ দিয়ে টমাসের যকৃৎ পরীক্ষা করবার পর মিষ্টার মাণ্ট্ তাঁর নোট বুকে অনেক অঙ্ক কষে নিয়ে বললেন, যাক্ তোমার কী হয়েছে এতক্ষণে ধরতে পারলাম—তুমি আর বেঁচে নেই।

—তা কী করে হয়, টমাস অবাক হয়ে গেল।

মিষ্টার মাণ্ট্ ডেস্কের পিছনে উঠে দাঁড়ালেন। চশমা খোলাতেই বেরিয়ে পড়ল কাঁচের ছুটো জ্বলন্ত চোখ। নোট বুক নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, ওহে ছোক্‌রা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি তুমি বেঁচে নেই, এই অঙ্কগুলো একবার দেখলেই বুঝবে।

টমাস এই অদ্ভুত ঘর থেকে তখনই ছুটে আসছিল, বেহালা আর থলেটা

নেবার জন্যে একটু থামতে হোল। বেপরোয়া ছুট্‌তে গিয়ে বাইরে দরজার সামনে হঠাৎ এক যুবকের সাথে ধাক্কা লাগল। নিজেকে সংযত করে নিয়ে টমাস প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, কে তুমি ?

দেখা গেল যুবকটি এরূপ হঠকারিতায় মোটেই বিরক্ত হয়নি। ভাল ভাবেই উত্তর দিল, আমি একজন কবি, নাম থ্রংমরটন্। এসো না বন্ধু এক গ্লাস্ শেরি খাওয়া যাক্।

বস্তুত টমাস তার জীবনে বহু কবির সাথে পরিচিত হয়েছে এবং সেই কারণে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখ্‌তে পেলে এই নতুন কবিও তার নাম জানবার জন্যে মোটেই কৌতূহল প্রকাশ করল না। তবে কি কবিরা এই সব সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেই জানতে পারে ?

রাস্তাগুলো থ্রংমরটনের খুব পরিচিত বলে মনে হলো কারণ ও এদিক ওদিক না তাকিয়ে মুখ নিচু করে অসম্ভব জোরে হাঁটছিল। টমাস কোন মতেই ওর সাথে পা ফেলে চলতে পারে না, অনেক হাঁটবার পর ওরা সহরতলীর মধ্যে একটা পুরান বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো। বাড়ীটাকে কোন মতেই আকর্ষণীয় বলা চলে না, মানুষের উপেক্ষায় বহুদিনের ইটের স্তূপ আস্তে আস্তে ধ্বসে গিয়েছে যেন।

কবি যেন ওর মনের ভাব বুঝতে পেরেছে এমন ভাবে বল্ল, না তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, ভেতরে চল দেখবে'খন।

দুজনে উপরের একটা ঘরে এসে খানিকটা শেরি খাবার পর টমাস চারিদিকে চেয়ে দেখল। ঘরের দেয়াল একেবারে সাদা, তার উপর পেন্সিলে কী সব যেন লেখা হয়েছে। কি লেখা আছে দেখবার জন্যে টমাস এগিয়ে যেতেই কবি ওকে টেনে এনে জানালার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। জানালার বাইরে দেখবার মত কিছু নেই—কতকগুলো বাড়ীর ছাদ, দূরে কারখানার কয়েকটা উত্তুঙ্গ চিমনি আর তার চেয়ে কিছু দূরে রেল লাইনের আঁকা-বাঁকা পথ।

—আমাদের বরাত ভাল, কি বলহে, কবি জিজ্ঞাসা করল, এ-রকম একটা ঘর পেলাম যেখান থেকে রেল লাইনের সব কিছু ছাখা যায় ; সত্যি আমি ত ভেবে অবাক হয়ে যাই ট্রেণের ব্যবস্থা না থাকলে আমাদের অবস্থা কী শোচনীয় হত।

টমাস এতক্ষণে আলাপ করবার একটা উপায় পাওয়ায় কিছু পরিমাণে খুসী হোল, ও তুমি বুঝি খুব দেশ বিদেশ ঘুরেছ।

—না মোটেই না, যাব কোথায়? কেনই বা যাব? ছেলেবেলা থেকে আমি এ সহরের বাইরে যাইনি।

—আচ্ছা থ্রংমরটন্ তুমি যখন এ সহরে বহুৎদিন আছ তাহলে নিশ্চয়ই মিষ্টার জেক্স্-এর সাথে তোমার পরিচয় হয়েছে?

কবি ওর দিকে সন্দিহান ভাবে তাকালো, তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বাইরে চারিদিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করে টমাসের খুব কাছে সরে এলো। টমাস এদিকে ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করেছে কারণ এই মুহূর্তেই ওকে সেই অবাঞ্ছিত এবং রহস্যময় মিষ্টার জেক্স্-এর ইতিহাস শুনতে হবে।

কবি ফিসফিস করে বল্ল, থ্রংমরটন হল আমার পদবী, আমার প্রকৃত নাম লিয়নেস্। প্রতিজ্ঞা কর তুমি কাউকে বলবে না।

—প্রতিজ্ঞা করলাম কিন্তু জেক্স্ কে?

—ও জেক্স্, সে খুব ভদ্রলোক, কয়েকবার তাকে দিয়ে আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে।

—তাঁকে দেখতে কেমন?

—কি জানি, কোন দিন দেখিনি।

—সে কী, এইত তুমি বললে তাঁর দ্বারা তোমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে।

—নিশ্চয়, সত্যি কথা বলতে কি তাকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটা কবিতা লিখেছি আমি, ওই দ্যাখ দেয়ালের গায়ে খোদাই করা।

টমাস ওদিকে তাকাতেই কবি বাধা দিল, না, না ও সব পড়বার মত নয়, অপরিণত হাতের কিনা, এখুনি আমি ওসব তুলে ফেলছি। এখন তোমাকে উদ্দেশ্য করে একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে, সেটা অবিশ্যি আমি সবাইকে দ্যাখাতে পারি।

তৎক্ষণাৎ কবি এত গভীর ভাবপ্রণতায় ডুবে গেল যে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে টমাস অনেক রাত্রে কিছু খাবার এনে খেয়ে শুয়ে পড়ল। কবির পেন্সিলের খস্খস্ শব্দ তখন থামেনি, দূরে এন্জিনের শব্দ আর অন্ধকার বাতাসে দু একটা পাখীর কান্না শোনা গেল।

পরদিন কবি টমাসকে উদ্দেশ্য করে যে কবিতা লিখেছিল সেটা পড়ে শোনাল আর টমাসের মুখে যথেষ্ট প্রশংসা শুনে তখুনি ওকে মিষ্টার জেক্স্-এর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে রাজী হয়ে গেল। টমাসও ভেবে পেল না যাকে কবি কোনদিন দেখেনি তার কাছে নিয়ে যাবে কেমন করে! অবিশ্বাস আর উত্তেজনায় ও কবিকে অনুসরণ করল। একটা সরু রাস্তার সামনে আসতেই ওরা দেখতে পেল পথের শেষ সীমানায় একটা লোক বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছে কিন্তু কেউ ওর অনুরোধ গ্রাহ্য করছে না। এই সহরে প্রথম ঢুকতেই এই জাতীয় একটি লোকের সাথে টমাসের দেখা হয়েছিল। কিন্তু এই লোকটার চেহারা আরো অদ্ভুত বলে মনে হল। টমাস ওর কুৎসিত পিঠ আর অবজ্ঞেয় দেহভঙ্গীর ভিতর ঘৃণা আর আকর্ষণের উদ্ভট সংমিশ্রণ দেখতে পেল।

—ইনিই কী মিষ্টার জেক্স্?

—হুঁ।

টমাস খানিকটা এগিয়ে আসতেই জেক্স্ ওর দিকে একবার আড়চোখে তাকাল, তারপর বাক্স বগলে করে মুহূর্ত মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। টমাস অনুসরণ করতে যাচ্ছিল, বাধা দিল কবি, তোমার ত ছাখা হয়েছে, আর কী চাও তুমি?

—আমি ওঁর সাথে কথা বলতে চাই।

টমাস বুঝল এবার হয়ত কবি ওকে হিংসা করতে আরম্ভ করেছে। এখুনি দুজনের মধ্যে অশোভন মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে! এত সামান্য কারণে লিয়নেসের সঙ্গ ছাড়া উচিত নয়, আর যাই হোক, সঙ্গী হিসেবে ও খুব উদার। সুতরাং জেক্স্কে ধরবার আশা ছেড়ে দিয়ে ওকে বাধ্য হয়ে ফিরতে হল।

তখন থেকে টমাস ওর বাড়ীতে যথেষ্ট সহৃদয়তা পেত, অবিশ্যি মাঝে মাঝে ওর অসংখ্য কবিতা কপি করে দিতে হত কিম্বা অন্য কোন সময়ে ছুটতে হত সহরের আর এক প্রান্তে প্রিমরোস্ আর ড্যাফোডিল্ আনবার জন্যে। আবার কোন সময়ে কবি হয়ত ওকে কাছে বসিয়ে বেহালা বাজাতে বলত। কিন্তু এখানেও টমাস বেশী দিন ভালভাবে থাকতে পারল না, আবার পথে বেরুতে হল। ব্যাপারটা খুবই সামান্য, একদিন বাড়ী ফিরে ও দেখল কবি দরজা বন্ধ

করে ওর বেহালা বাজাচ্ছে, ব্যস সেইখানেই ইতি। ওর অনুমতি ছাড়া বেহালায় কারো হাত দেওয়া টমাস কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারে না।

এবার বাঁচবার সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠল, তাই টমাস ঠিক করল যতদিন না অন্য কোন উপায় ঠিক হয় ততদিন ভোজবাজী দেখিয়ে আর বেহালা বাজিয়ে জীবিকার্জন করা যাক্। বেহালার লাইসেন্স্-এর কথা মনে পড়াতে পথের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে ও টাউন হলে উপস্থিত হল; যদি টমাস নেহাৎ ছেলেমানুষ হত, তাহলে ভেবে নিত এখানকার মানুষগুলো বুঝি ওর উপস্থিতির আশায় অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করছিল কারণ ও যাওয়া মাত্র একজন কর্মচারী ওকে সোজাসুজি শাসনকর্তার সামনে নিয়ে গেল আর শাসনকর্তাও ওকে দেখে ভারি খুসী, বল্লেন, তোমাকে পেয়ে আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে, আমাদের নতুন টাউন হল, পুলিশের ব্যবস্থা সব কেমন দেখছ? এখান্‌কার মত বুদ্ধিমান নাগরিক কী আর কোথাও দেখেছ? ঠিক, ঠিক, তুমি কি বলতে চাইছ তা আমি বুঝেছি। তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে এই একমাত্র যুবক যে ঠিক মত বিচার করতে পারেঃ যাক্, তোমাকে কিন্তু একটা চাকরিও দিতে পারি। সত্যি তোমার চেহারা কী চমৎকার!

শাসনকর্তা তারপর পকেট থেকে সেই সহরের একটা ম্যাপ্ বার করলেন। টমাস দেখল কয়েকটা জিলার ধার দিয়ে গোল করে বৃত্ত টানা হয়েছে। শাসনকর্তা ওর মধ্যে একটা দেখিয়ে বল্লেন, এই জিলার মানুষেরা খাবারের জন্যে অভিযোগ জানাচ্ছে, আমরা ঠিক করেছি তোমাকে এখানকার কমিশনার হিসেবে রাখব, যাতে করে তুমি এদের অভাব অভিযোগ তদন্ত করতে পারে। অবিশ্যি তোমাকে কমিশনারের মত মাইনে আর ইউনিফর্ম দেওয়া হবে; আর একথাও আমি সাহস করে বলতে পারি যে ভবিষ্যতে কাজ শেষ হলে তোমার পেন্‌সানের ব্যবস্থাও হবে।

—কিন্তু আমার যে যোগ্যতা নেই, মানে আমি···

—ধুত্তোর, তুমি বড্ড বিনয়ী হে ছোকরা, আমরা এটা নিশ্চয় করে জানি তুমি যতখানি সন্দেহ করছ তাঁর চেয়ে ঢের বেশী যোগ্যতা তোমার আছে। আমরা ইচ্ছা করি না এই সহরে কোন ব্যক্তি তার উপযুক্ত দাবী থেকে বঞ্চিত

হোক। আর ছ্যাখো তোমার ঐ অদ্ভুত ভোজবাজী আর বেহালাটা যদি কোন কাজে লাগে ত নির্ভয়ে ব্যবহার করবে। সঙ্গীতের এ-ই আলাদা, তাই না ?

শাসনকর্তা প্রচুর হাসতে হাসতে হাতের গামছা মুখে চেপে ধরলেন। বিস্ময়ে টমাসের মুখের রঙ্ বদলে গেল, এর মধ্যেই ওর ক্ষমতা সম্বন্ধে এ দেশের জনমত উৎসাহী হয়ে উঠেছে ? শাসনকর্তা আবার হাসলেন, আমাদের সব নতুন নিয়ম, নতুন পদ্ধতি, তাই না ?

টমাস আর একবার ম্যাপটা দেখে নিল। ওর ভৌগলিক জ্ঞান একটু বেশী সে কথা আপনাদের বলেছি। টমাস বুঝল ওর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সেইখানে যেখানে একবার মুহূর্তের জন্যে মিষ্টার জেক্স্-এর সাথে দেখা হয়েছিল। শাসনকর্তা একথা শুনে গম্ভীর মাথা নাড়লেন, আহা সে এক দুঃখের ব্যাপার ; বেচারি সারা জীবন ভুল করেই কাটাল। ওর ধারণা আমরা সবাই ওকে খুন করতে চাই ও সেইজন্যে প্রতিহিংসা নিতে চায়। একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে ওর, তবু আমরা নজরবন্দী রেখেছি, যাই হোক্ তোমার সাথে ওর কিছু মিলবে না, ও একেবারে অন্য ধরণের।

কিছুদিনের মধ্যেই টমাস নতুন কাজে মন দিল। যাদের নিয়ে ওর কাজ তারা সবাই গরীব, তাই ওরা প্রথমে টমাসের অদ্ভুত ভোজবাজী আর বেহালা বাজান দেখে একটু সন্দেহ করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলের বাড়ীর দরজা অবারিত হয়ে এলো। টমাসেরও বুঝতে দেরি হল না যে এদের অভিযোগ সত্যই ন্যায়সঙ্গত। যদিও সেখানকার কেউ কেউ মিষ্টার জেক্স্-এর নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিল, সেই কারণে ওরা মাঝে মাঝে টমাসের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালাত কিন্তু সংখ্যায় ওরা এত কম যে টমাস ওদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার কোন চেষ্টা করেনি। প্রায় পনের দিন পর টমাস সমস্ত লোকের অভাব অভি-যোগের এক তালিকা লিখল এবং কী উপায়ে এই সব অভিযোগ দূর করা যেতে পারে তারও একটা সুচিন্তিত সমাধান আবিষ্কার করল।

টমাসের পরিশ্রমে শাসনকর্তা খুসী হলেন, শীগ্‌গীর যাতে এসব অভিযোগ মিটতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আরো জানালেন

যাবতীয় নতুন ব্যবস্থার স্থায়ী ভিত্তি রাখবার জন্য একটা অধিবেশন হবে। কিন্তু এর আগে দরকার হলে অস্থায়ী জরুরী ব্যবস্থাও হতে পারে।

তখন থেকে সরকারী আদেশে গাড়ী গাড়ী বোঝাই খাবার জিলার সমস্ত রাস্তায় পাঠান হল। চারিদিকে টমাসের জয়জয়কার পড়ে গেল, প্রতি সোমবার টমাস বাড়ী বাড়ী ঘুরে দেখল সকলের মুখে গভীর আনন্দ।

এরপর একদিন কী কারণে বুঝি টমাসকেও গাড়ীতে যেতে হল। ওরা একটা বাড়ীতে খাবারের ঝুড়ি নামিয়ে দিয়ে যেই গাড়ীর কাছে এসেচে অমনি মিষ্টার জেক্স্-এর সাথে একেবারে মুখোমুখি দেখা। দুজনের পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময় হল, যেন দানবিক সংঘর্ষ। টমাস এতখানি বিস্মিত হয়ে গেল যে জেক্স্-এর মধ্যে কতকগুলো অদ্ভুত নতুনত্ব ওর চোখে পড়ল না, এমন কি জেক্স্ কিছু বলতে চাইছে কিনা সেদিকেও কোন হুঁস ছিল না। জেক্স্-এর মুখ ঘৃণিত কয়েকটা রেখায় বিবর্ণ, অন্ধকার চোখ দুটো যেন গর্তে ঢুকে গেছে আর টমাসের চোখে মুখে সবুজ উজ্জ্বলতা। কিন্তু তবু টমাস নিজেদের মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য খুঁজে পেল।

জেক্স্ কুৎসিতভাবে ওকে ধমকে উঠল, তুমি বিশ্বাসঘাতক, ঠগ্, এই ভীড়ের মধ্যে আমাদের সকলের সামনে খোল ত দেখি তোমাদের ঐ খাবারের ঝুড়ি, আমরা দেখতে চাই ওর মধ্যে কী আছে।

টমাস এই প্রস্তাবে মোটেই গররাজী ছিল না। তখনি ঝুড়ি খুলে ফেলা হল, তারপর অনেক ছেঁড়া খবরের কাগজের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা কাঠের বাক্স। চারিদিকের ভীড় আরো ঘন হয়ে আসছে। টমাস হাতুড়ি দিয়ে কয়েকটা ঘা দিতেই বাক্স খুলে গেল। ভিতরে পাওয়া গেল তিনটে স্ক্রু, তিনটে টিন কাটা ছুরি, গ্রামোফোনের এক প্যাকেট পিন আর ফিলিপ টমাসকে খেলতে যে রকম খেলনা দিয়েছিলেন সেইরকম কতগুলো কাঠের পুতুল। বিস্ময়ে, লজ্জায়, অপমানে টমাস একটা কথাও বলতে পারল না। সহরের সমস্ত লোক ওকে বিশ্বাস করে থাকে, ওরা চায় খাবার, আর শাসনকর্তা ওকে দিয়ে এইসব অবান্তর সামগ্রী সরবরাহ করাচ্ছেন? জেক্স্ অবজ্ঞায় বিকৃত হাসল। এদিকে ভীড়ের মধ্যে অস্বাভাবিক হৈ চৈ আরম্ভ হোল, ওরা সকলে ঠেলাঠেলি করে মুহূর্তমধ্যে সমস্ত জিনিষ গভীর সম্বর্দ্ধনায় কুড়িয়ে নিয়ে গেল। জেক্স্ আপ্রাণ

চেষ্টা করে ওদের বোঝাতে লাগল, কী ভাবে সবাই প্রতারিত হচ্ছে—তবু জনতা ওর কথায় ভ্রুক্ষেপ করল না। প্রায় এক মিনিটের মধ্যেই জনতা কমে এলো, শুধু চার জন তখনও মিষ্টার জেক্স্-এর সাথে ছিল। এদের কাছে টমাস ক্ষমা চাইল, মাফ্ করবেন, ভিতরে কী ছিল তা আমি জানতাম না।

জেক্স্ বাধা দিল, ভিতরে কি আছে তা কি তোমার জানা উচিত ছিল না? তুমি কি কমিশনার নও?

নিরুপায় হয়ে টমাস শাসনকর্তার কাছে ফিরে এসে সমস্ত জানাল। শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু আমরা যা পাঠিয়েছি জনসাধারণ কি তা পছন্দ করেনি?

—হ্যাঁ তা করেছে, কিন্তু আমি সে কথা বলছি না, ওরা খাবারের জন্যে অভিযোগ জানিয়েছে সুতরাং আমাদের দেখতে হবে যাতে করে ওরা ভাল খাবার পায়।

—ওহে তোমার ভাবপ্রবণতাকে আমি প্রশংসা করছি, কিন্তু ওদের কী পাওয়া উচিত তা বলবার আমরা কে? মানুষ যা পেলে খুসী হয় অথচ সব সময় সুখী হতে পারে না তাই দেওয়ার নামই সত্যিকারের মানবপ্রীতি।

—আমি বড্ড ভুল করেছি দেখছি, টমাস আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল, আপনারা আমাকে ঠকিয়েছেন। এ সহরে একমাত্র মিষ্টার জেক্স্ই খাঁটি লোক, আমি এখন তার কাছে যাব, এখন থেকে তাঁর আর আমার উদ্দেশ্য অভিন্ন।

শাসনকর্তা কঠিন শান্ত গলায় বল্লেন, একটু দাঁড়াও, তোমার উদ্দেশ্য যদি ওই হয় তাহলে আর আমরা কী করতে পারি। তোমার বন্ধু এখন কারাগারে বন্দী, সেখানে দেখা করতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই। আমি এই মাত্তোর ওকে বন্দী করবার হুকুম দিলাম, ডাক্তারের পরামর্শে ঠিক হয়েছে ওকে আর কোনদিন মুক্তি দেওয়া হবে না। যেতে পার ওর কাছে, তবে একথা মনে রেখ, তুমি যা ভেবেছ তা হবেনা, জেক্স্ তোমাকে দেখে মোটেই খুসী হবে না।

শাসনকর্তার কথাই ঠিক হল। জেক্স্ ওর দুরবস্থার জন্যে টমাসকে সম্পূর্ণ দায়ী ভাবল। এটা মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্যে টমাস নিজে জেক্স্-এর কুঠরীতে কয়েদীর মত আটক থাকতে চাইল (এবং শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষও তাতে রাজী হল) তবু জেক্স্ ওর সাথে একটা কথাও বলল না।

আপনারা এবার বোধ হয় একটি সুন্দর সমাপ্তি আশা করেছেন ? রহস্যজনক পলায়ন আর শেষ মুহূর্তের ক্ষমা, তারপর ওদের নির্বিবাদে দিন কাটানোর ইঙ্গিত ? তাহলে আপনাদের হতাশ হতে হবে। গল্প যেদিন শেষ হবে সেদিন জেক্স্‌কে বাইরে আনা হল প্রাত্যহিক ভ্রমণের জন্য। টমাস ওকে অনুসরণ করল। কিন্তু আজ দেখা গেল মাঠের এক প্রান্তে রাইফেল্‌ হাতে একদল সৈনিক দাঁড়িয়ে এবং কোন বিশেষ কারণে জেক্স্‌কে আনা হল মাঠের অপর প্রান্তে। টমাস এগিয়ে এসে ওর কাছে দাঁড়াল। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে এতক্ষণ পরে জেক্স্‌ টমাসের সাথে কথা বল্ল, আমার এখানে দাঁড়ানো বোধ হয় ঠিক হবে না, দৈবাৎ তুমিও আঘাত পেতে পার, ওরা নির্ভুল গুলি ছুঁড়তে জানে না।

টমাস বল্ল, তাই হোক্‌, আমি আপনার দলে একথা প্রমাণ করবার আর কোন উপায় দেখছি না যে।

জেক্স্‌ অপূর্ব্ব বিস্ময়ে টমাসের দিকে তাকালো, যেন এই প্রথম ওর সাথে দেখা। টমাসের মত নতুন উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে জেক্স্‌ কোন মতে বলল, আচ্ছা আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম। সেই কারণেই আমি ইচ্ছা করি না যে আমরা দুজনে একসঙ্গে মরি। সেটা আমাদের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি। তুমি বরং সহরে আমার বন্ধুদের কাছে ফিরে যাও। তোমার কর্তব্য তুমি জান, ওদের কী বলতে হবে তাও ত জান।

টমাস একটু এগিয়ে যেতেই জেক্স্‌ আপ্রাণ চীৎকার করে উঠল, তোমার নামটা কী, আর পদবীটা ? টমাস আস্তে আস্তে বল্ল। সঙ্গে সঙ্গে কমাণ্ডারের দীর্ঘনাদে কতকগুলো আগুনের স্ফুলিঙ্গ তীব্রভাবে ছুটে এলো। তার আশ্চর্য প্রতিধ্বনিতে টমাসের মৃদু উত্তর কিছুই বোঝা গেল না।

একবার মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে টমাস সহরে জেক্স্‌-এর বন্ধুদের খুঁজে নেবার জন্যে কারাগারের সীমানা থেকে বেরিয়ে এলো।

বীরেশ্বর বিশ্বাস

সম্রাট অশোকের শিলালিপি

ভূমিকা

মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট অশোক সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা যাহা জানেন তাহার মূল ও প্রধান উপাদান হইতেছে অশোকের বিভিন্ন শিলালিপিগুলি। এই লিপিগুলি গিরিগাত্রের শিলার উপর, বা শিলাস্তম্ভের উপর, বা গিরিগুহার শিলাগাত্রের উপর খোদিত। বাংলাদেশ ও অতিপূর্ব্ব-ভারত এবং অতিদক্ষিণ-ভারত ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্য সর্ব্বত্রই এই লিপিগুলি পাওয়া গিয়াছে। ইহাও সম্ভব যে হয়ত এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই এমন অশোকলিপি দেশের একাধিক স্থানে লুক্কায়িত আছে।

গিরি, স্তম্ভ বা গুহা কিসের উপর খোদিত, উহাদের বক্তব্য বিষয় ও দৈর্ঘ্যই বা কি, এই সব ভেদে অশোকলিপিগুলিকে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা হয়, যথা—

(১) শিলানুশাসন, Rock Edicts, সংখ্যায় চৌদ্দটি (ইহা ছাড়া আরও স্বতন্ত্র দুইটি আছে)।

(২) স্তম্ভানুশাসন, Pillar Edicts, সংখ্যায় সাতটি, তাছাড়া দুটি স্বতন্ত্র।

(৩) ছোট স্তম্ভ-লিপি, Minor Pillar Inscriptions, সংখ্যায় চারটি।

(৪) ছোট শিলালিপি, Minor Rock Inscriptions, সংখ্যায় একটি।

(৫) গুহালিপি, Cave Inscriptions, সংখ্যায় তিনটি।

এই বিভিন্ন শ্রেণীর শিলালিপিগুলির অধিকাংশই আবার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে, যথা—

(১) ১৪টি শিলানুশাসনের প্রায় প্রত্যেকটিই সাতটি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে;

(২) ৭টি স্তম্ভানুশাসনের মধ্যে ছয়টি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে ;

(৩) ৪টি ছোট স্তম্ভ-লিপির এক একটি এক এক স্থানে পাওয়া গিয়াছে ;

(৪) ছোট শিলালিপিটি অল্পাধিক পরিবর্ত্তিতভাবে এগারটি স্থানে পাওয়া গিয়াছে ;

(৫) ৩টি গুহা-লিপির এক একটি গয়ার নিকটবর্ত্তী বরাবর* পাহাড়ের গুহায় পাওয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে মাত্র প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ "১৪টি শিলানুশাসন"-এরই বিশদ আলোচনা আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলিতে করিব।

শিলাগাত্রের উপর খোদিত হইলেও অশোক-লিপিগুলি কালবশে বহুস্থানে অস্পষ্ট বা বিনষ্ট হইয়াছে। কোথাও অক্ষর, কোথাও আকার উকারাদি চিহ্ন লোপ পাইয়াছে ; কোথাও অক্ষর আছে তো চিহ্ন নাই, কোথাও বা চিহ্ন আছে কিন্তু অক্ষর নাই ; কোথাও এক বা ততোধিক শব্দ, কোথাও এক বা ততোধিক লাইন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন লিপি মিলাইয়া, তুলনা করিয়া, যোগ করিয়া কি বিপুল পরিশ্রমে যে পণ্ডিতদের এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিতে হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা এই প্রবন্ধগুলিতে অশোক-লিপিগুলির যে সব পাঠ প্রয়োগ করিব তাহাতে এই সব অক্ষর-চিহ্ন-শব্দ-লাইন প্রভৃতির বিকৃতি-লোপাদির বা পুনঃসংস্কৃতির উল্লেখ করিব না, কারণ প্রাচীন-লিপিতত্ত্বের (epigraphy) আলোচনা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিরক্তিকর হইবে। উপরন্তু প্রাচীন লিপির পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গে ব্যকরণ ও ভাষাতত্ত্বেরও এত কথা আসিয়া পড়িবে যে তাহাতে প্রবন্ধ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। আমরা মাত্র পণ্ডিত-সমাজ দ্বারা পুনঃসংস্কৃত ও পুনরুদ্ধৃত পাঠেরই উল্লেখ করিব।

যেখানে এক লিপিশ্রেণী একাধিক স্থানে পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায় কোথাও বা একটি অনুশাসন বা একটি লিপি বাদ পড়িয়াছে, কোথাও বা নূতন কিছু যোগ করা হইয়াছে যাহা অন্যত্র নাই। আরও দেখা যায় যে একই

* "বরাবর" শব্দটি সংস্কৃত "প্রবর" শব্দ হইতে জাত, বরাবর=বরবর=পরবর=প্রবর। বরাবর-পাহাড়ের আর একটি গুহায় প্রাপ্ত একটি ব্রাহ্মণ্য দেবী-মূর্ত্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপিতে এই পদটি পাওয়া যায়—"প্রবর-গিরিগুহা-সংশ্রিতং বিষমেতৎ—"।

লিপি যেখানে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় সেখানে উহাতে অল্পস্বল্প পাঠভেদও থাকে। কয়েকটি শব্দ বিভিন্ন স্থানে বেশী বা কম দেখা যায়। প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্বন্ধীয় না হইলে এইরূপ পাঠান্তরেরও আমরা উল্লেখ করিব না।

একই অনুশাসন বা লিপি যেখানে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় সেখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ ভাষা এক হইলেও শব্দাদির রূপ ও আকৃতি বিভিন্ন হইয়া পড়ে। একই শব্দ বিভিন্ন স্থানে কিরূপ পরিবর্তিত হয় তাহা ভাষাতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইলেও এখানে তাহার একটু নিদর্শন দেখাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ১ম শিলানুশাসনের আরম্ভে অশোক বলিয়াছেন, "এই ধর্ম্মলিপি দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর দ্বারা লেখান হইয়াছে।" একথা বিভিন্ন স্থানে এইভাবে দেখা যায়,—

গিরনার— ইয়ং ধংম-লিপী দেবানংপ্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞা লেখাপিতা।

কাল্‌সী— ইয়ং ধংম-লিপি দেবানংপিয়েনা পিয়দসিনা লেখিতা।

শাহ্‌বাজগঢ়ী—অয় ধ্রম-দিপি দেবনপ্রিঅস রঞো লিখপিতু।*

মান্‌সেহ্‌রা— অয়ি ধ্রম-দিপি দেবনংপ্রিয়েন প্রিয়দশিন রজিন লিখপিত।

জউগড়— ইয়ং ধংম-লিপী খেপিংগলসি পবতসিং† দেবানং পিয়েন পিয়দসিনা লাজিনা লিখাপিতা।

ধউলি— এখানকার এই লিপিটি ভাঙ্গিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন স্থানের ভাষাতে যে পার্থক্য হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই বিভিন্ন স্থানগুলি পরস্পর হইতে বহু দূরবর্ত্তী। অশোক-লিপির ভাষা প্রাকৃত। পরস্পর হইতে এত দূরবর্ত্তী সে যুগের ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাধারণ লোকের ভাষা যে এক হইবে তাহা আশা করা বাতুলতা, অথচ অশোক তাঁহার লিপিগুলি লেখাইয়াছিলেন পণ্ডিতদের জন্য নয়, সাধারণ লোকের জন্য। সেজন্য সংস্কৃতে না লেখাইয়া প্রাকৃত ভাষায় লেখাইয়াছিলেন, তাহাও এমন স্থানে যেখানে বহুলোকের গতায়াতের পথে তাহা সহজেই লোকের চোখে পড়ে। ইহাতে মনে হয় সে যুগে জনসাধারণের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না, এবং শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে একটি সাহিত্যিক বা

* 'তু' খোদাইকারের প্রমাদ, মান্‌সেহ্‌রার মত এখানে 'ত' হইবে।

† অর্থাৎ "খেপিঙ্গল (যাহাকে আকাশে পিঙ্গলবর্ণ দেখায়) পর্ব্বতে"।

সরকারি প্রাকৃত ভাষা সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল, যদিও প্রদেশ ভেদে এই বানান-উচ্চারণ-ব্যাকরণে কিছু কিছু বিভিন্নতা হইত। লিপিগুলিতে এমন অনেক ব্যক্তিগত মনোভাবের ও চিন্তার কথার উল্লেখ আছে যাহাতে মনে হয় অশোক কোন মন্ত্রী, পরিষদ, কর্ম্মচারী বা বন্ধুর হাতে লেখার ভার না দিয়া স্বয়ং এই লিপিগুলি রচনা করিতেন। তিনি অবশ্য মগধে তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃতেই বোধ হয় লিপি রচনা করিতেন, ইহা পরে বিভিন্নস্থানে প্রেরিত হইয়া সেখানকার কর্ম্মচারী দ্বারা তৎ তৎ স্থানে প্রচলিত সরকারি বা সাহিত্যিক প্রাকৃতে অনূদিত হইয়া খোদকের দ্বারা শিলা বা স্তম্ভগাত্রে খোদিত হইত।

অশোক-লিপি লইয়া বহু পণ্ডিতে বহু গবেষণা করিয়াছেন, এখনও সে গবেষণা শেষ হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলিতে অশোক-লিপি সম্বন্ধে যে সব কথা বহু-বিদ্বজ্জন-সম্মত তাহাই বলিব। এ যাবৎ যত গবেষণা হইয়াছে তাহার ফল পাঠকের গোচর করিব। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আলোচনার মধ্যে পণ্ডিতদিগের নাম, পুস্তক-পত্রিকাদির নাম ও পৃষ্ঠা-পত্রাঙ্কাদির উল্লেখ করিয়া পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ও প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করা হইতে বিরত থাকিব।

অশোক-লিপিগুলির অধিকাংশই ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত। ব্রাহ্মীলিপি বাম হইতে দক্ষিণে পড়িতে হয়। ১৮৩৮ সালে জেমস্ প্রিন্সেপ ব্রাহ্মীলিপির রহস্যভেদ করেন। শাহাবাজগঢ়ি ও মনাসহরা এই দুই স্থানে প্রাপ্ত অশোক-লিপিগুলিই মাত্র খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত। খরোষ্ঠী লিপি দক্ষিণ হইতে বামে পড়িতে হয়। শাহাবাজগঢ়ি-শিলানুশাসন আবিষ্কারের পূর্ব্বেই ইন্দো-গ্রীসীয় ও ইন্দো-সীথীয় রাজাদের কয়েকটি দ্বি-ভাষা-সংযুক্ত মুদ্রা হইতে খরোষ্ঠী লিপির কতকগুলি অক্ষর পণ্ডিতদের কাছে পরিচিত ছিল। পরে প্রিন্সেপ, লাসেন্, নরিস্ ও কানিংহাম এই লিপির পূর্ণ রহস্যভেদ করেন। "খরোষ্ঠী" কথাটির ব্যুৎপত্তি ভারতীয় টীকাকাররা খর+ওষ্ঠ বা "গাধার ঠোঁট" হইতে করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। "হরূট্ঠ" নামক একটি সেমিটিক শব্দ আছে, ইহার অর্থ "খোদাই করা"। এই শব্দটি বোধ হয় সংস্কৃতীকৃত (Sanskritised) হইয়া "খরোষ্ঠী"তে পরিণত হইয়াছে।* অসংস্কৃত শব্দকে সংস্কৃতীকরণের নিদর্শন মোটেই বিরল নহে।

* Ludwig, Festgabe fur Weber, Leipzig 1896, p. 68.

পূর্ব্বোক্ত "ছোট শিলালিপি"টির একটি সংস্করণ মাদ্রাজের কুর্ণুল জেলার ইয়েরাগুডি নামক স্থানে আছে। এই লিপিটির প্রায় অর্দ্ধাংশ প্রথমে বাম হইতে দক্ষিণে, ওপরের লাইনে দক্ষিণ হইতে বামে, এইভাবে পড়িতে হয়। হালের গরু ক্ষেত্রে লাঙ্গল টানিবার সময় এইভাবে চলে বলিয়া এরূপ লিপিকে গ্রীকভাষায় boustrophedon বলা হয়।

অশোকলিপিগুলি হইতে এই কয়েক প্রকারের তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, যথা—

(১) ঐতিহাসিক—অশোকের জীবন ও চরিত্র, তদানীন্তন কালের ভারতের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক প্রভৃতি অবস্থা। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলিতে প্রধানত এই বিষয়টির উপরই লক্ষ্য রাখিব।

(২) ভাষাতাত্ত্বিক—সঠিক অর্থ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ বিষয়টিরও উপর আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৩) লিপিতাত্ত্বিক—এ দিকটি আমরা নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে উপেক্ষা করিব।

(৪) বৈয়াকরণিক—এ দিকটিও আমরা প্রায় উপেক্ষা করিব।

শিলানুশাসনগুলির আলোচনার সময় আমরা ১৪টি শিলানুশাসন পর পর পৃথকভাবে আলোচনা করিব। প্রত্যেক শিলানুশাসনের আলোচনায় প্রথমে তাহার মূল পাঠ দিব। মূলে কোনও প্রকার যতি-ছেদ-বিরাম প্রভৃতি জ্ঞাপক চিহ্নাদি নাই, বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য (sentence) গুলিও পৃথক করা নাই। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা মূল পাঠটিকে ক, খ, গ প্রভৃতি নামে বিভিন্ন বাক্যে বিভক্ত করিব এবং প্রয়োজনানুসারে উহাতে কমা-সেমিকোলনাদি চিহ্ন সংযোগ করিব।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মূলের পর আমরা তাহার একটি সরল বাংলা অনুবাদ দিব। তৃতীয়ত, এই অনুবাদের পর একটি টিপ্পনী থাকিবে, ইহাতে মূল ও অনুবাদের ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক প্রভৃতি তথ্যের আলোচনা থাকিবে। কয়েকটি সংকেত চিহ্নও ব্যবহৃত হইবে, যথা—সং = সংস্কৃত; পা. = পালি; প্রা. = প্রাকৃত; তু. = তুলনা কর। দুই শব্দের মধ্যে > চিহ্নটি থাকিলে বুঝিতে হইবে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দ হইতে উদ্ভূত, যথা প্রবর > পরবর; দুইটি শব্দের

মধ্যে < চিহ্নটি থাকিলে প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্দ হইতে উদ্ভূত বুঝিতে হইবে, বরাবর < প্রবর। √ = ধাতু।

চৌদ্দটি শিলানুশাসন

এই শিলানুশাসনগুলি নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে পাওয়া গিয়াছে, যথা—

গিরনার (< সং গিরিনগর)—কাঠিয়াওয়ার প্রদেশের জুনাগঢ় অঞ্চলে। এখানে ১-১৪ সংখ্যক শিলানুশাসনগুলি আছে।

কাল্‌সী—দেরাদুন জেলায়; ১-১৪।

শাহ্‌বাজগঢ়ী—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে; ১-১৪।

মান্‌সেহরা—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে; ১-১৪।

ধউলি (<সং ধবলী)—উড়িষ্যা প্রদেশের ভুবনেশ্বরের নিকটে। এখানে ১-১০ ও ১৪ সংখ্যক শিলানুশাসনগুলি আছে। তা ছাড়া দুইটি "স্বতন্ত্র শিলানুশাসন"ও এখানে আছে।

জউগড় (<সং জতুগৃহ)—উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায়; এখানেও ধউলির মত ১-১০, ১৪ এবং "স্বতন্ত্র শিলানুশাসন"দ্বয়ের একটি সংস্করণ আছে।

সোপারা (<সং সুপারক)—বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলায়; এখানে মাত্র ৭ম শিলানুশাসনটি আছে।

ইয়েরৃরাগুডি—মাদ্রাজ প্রদেশের কুর্ণ্‌ল জেলায়; ইহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে; ১-১৪।

এই সব স্থানের মধ্যে গিরনারের শিলানুশাসনগুলিই সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার পড়া যায় এবং অন্যগুলি অপেক্ষা স্পষ্ট ও অটুট আছে। এইজন্য আমরা এই প্রবন্ধগুলিতে গিরনারের পাঠই উল্লেখ ও আলোচনা করিব। ১৩ সংখ্যক শিলানুশাসনটি কিন্তু গিরনারে অস্পষ্ট ও ভাঙ্গা, সে জন্য ঐটির আলোচনার সময় আমাদের অন্য স্থানের পাঠ উদ্ধার করিতে হইবে।

প্রথম শিলানুশাসন

গিরনার

(ক) ইয়ং ধংমলিপি দেবানংপ্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞা লেখাপিতা।

(খ) ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজুহিতব্যং।

(গ) ন চ সমাজো কতব্যো।

(ঘ) বহুকং হি দোসং সমাজম্হি পসতি দেবানংপ্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা।

(ঙ) অস্তি পি তু একচা সমাজা সাধুমতা দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো।

(চ) পুরা মহানসম্হি দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো অনুদিবসং বহুনি প্রাণসত সহস্রানি আরভিসু সূপাথায়।

(ছ) সে অজ যদা অয়ং ধংমলিপি লিখিতা, ত্রী এব প্রাণা আরভায় সূপাথায়—দ্বো মোরা, একো মগো, সো পি মগো ন ধ্রুবো।

(জ) এতে পি ত্রী প্রাণা পচ্ছা ন আরভিসরে।

অনুবাদ

(ক) এই ধর্ম্মলিপি দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী দ্বারা লেখান হইয়াছে। (খ) এখানে (আমার রাজ্যে) কোনও জীবকে বধ করিয়া বলি দেওয়া যাইবে না। (গ) এবং সমাজ (বহুলোক একত্র হইয়া পানভোজন ও আমোদপ্রমোদ-যুক্ত উৎসবের অনুষ্ঠান) করা যাইবে না। (ঘ) কারণ দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী সমাজে (ঐরূপ অনুষ্ঠান) বহু দোষ দেখেন। (ঘ) কিন্তু কতকগুলি (এক রকমের) সমাজ আছে যাহা দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী সাধু মনে করেন। (চ) পূর্ব্বে দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর মহানসে (রন্ধনশালায়) সূপের (তরকারির) জন্য প্রতিদিন বহুশত সহস্র প্রাণীকে বধ করা হইত। (ছ) কিন্তু আজ যখন এই ধর্ম্মলিপি লেখা হইল, (তখন প্রতিদিন) সূপের জন্য মাত্র তিনটি প্রাণী বধ করা হইতেছে—দুইটি ময়ূর (ও) একটি মৃগ, (এবং) সে মৃগটিও নিয়মিতরূপে নয়। (জ) পরে এমন কি এই তিনটি প্রাণীকেও বধ করা হইবে না।

টিপ্পনী

(ক) ধর্ম্মলিপির "লিপি" শব্দটি উণাদিসূত্রের টীকায় সং √ লিপ্, লেপন করা, হইতে নিষ্পাদন করা হইয়াছে; ইহা ঠিক নয়, কারণ খরোষ্ঠী সংস্করণদ্বয়ে (শাহবাজগঢ়ী ও মানসেহ্‌রাতে প্রাপ্ত) "লিপির" স্থানে "দিপি" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, এবং এই "দিপি" শব্দটি Achaemenidan শিলালেখে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অশোকলিপিগুলিতে যেখানে "লিখিত",

"লেখিত", "লেখাপিত" শব্দ আছে, তাহার স্থানে খরোষ্ঠী-লিপিগুলিতে "নিপিস্ত", নিপেসিত, "নিপেসপিত" প্রয়োগ করা হইয়াছে, এবং এই শেষোক্ত শব্দগুলি পারসিক "নি-পিশ্‌", লেখা, হইতে নিষ্পন্ন। "দিপি" এবং "নি-পিশ্‌" এই দুইটি শব্দই আবার বেহিস্তানের Darius-এর Inscription-এ এবং ভানের Xerxes-এর Inscription-এও পাওয়া যায়। অনেক অশোকলিপির মুখবন্ধের "দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ বলিয়াছেন" এই উক্তি বোধহয় Achaemenidan Inscription-এর "Darius (Xerxes, Artaxerxes) রাজা বলিতেছেন" এই উক্তির কিছু পরিবর্দ্ধিত অনুকরণ। অশোক গিরনারের শাসনকর্ত্তারূপে যে যবনরাজাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল তুশস্‌ফ ; এই নামটি বোধহয় বিশ্‌তস্‌ফ কেরেসস্‌প প্রভৃতির মত একটি পারসিক নাম, এবং ইহাতে বুঝা যায় অশোক ইরাণীয়দিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। ভারতীয় ভাষা ও অশোকের উপর পারস্তের প্রভাব এই সব প্রমাণে স্পষ্ট হইবে। তাঁহার লিপিপ্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার ছিল বলিয়া অশোক তাঁহার লিপিগুলিকে "ধর্ম্মলিপি" আখ্যা দিয়াছিলেন।

"দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী"—তাঁহার লিপিগুলির অধিকাংশেই অশোক নিজেকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। দুই একটি লিপিতে শুধু "দেবতাদের প্রিয়" বা "রাজা প্রিয়দর্শী" এই অভিধাই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। কেবলমাত্র একটি লিপিতে (নিজামরাজ্যের রাইচুর জেলার মাস্‌কি-গ্রামে প্রাপ্ত "ছোট শিলালিপি"র সংস্করণে) "অশোক" নামের উল্লেখ আছে। সেকালে এবং একালেও রাজা-রাজড়া ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা একাধিক নামে লোকের কাছে পরিচিত। "রাজতরঙ্গিনী"তে অশোকের আর একটি নামের উল্লেখ আছে—"শান্তাবসাদ"। ইহা বোধহয় গৌণ (অর্থাৎ গুণ-নিষ্পন্ন) নাম, অশোক প্রজার মঙ্গল কামনায় অশেষ প্রয়াসী ও সদাব্যস্ত থাকায় তাঁহার ঐ নাম হইয়া থাকিবে। "প্রিয়দর্শী" বোধহয় অশোকের উপনাম ছিল এবং "দেবতাদের প্রিয়" বোধহয় তিনি তাঁহার উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমন ইতিহাসের অন্য রাজারা সাহেন্‌ শা, king of kings, defender of the faith প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। "দেবতাদের প্রিয়" উপাধিটি প্রায় His

Majesty-র মত সম-অর্থে ব্যবহৃত হইত। যাহা এককালে বিলাসীর বসন থাকে তাহা পরবর্ত্তী যুগে সাধারণ পরিচ্ছদ হইয়া দাঁড়ায়; যাহা এককালে অতি-উচ্চপদস্থ ব্যক্তির উপাধি থাকে তাহা পরে সাধারণ ভদ্রতার প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়, যেমন আমাদের "শ্রীলশ্রীযুক্ত মহামহিমবরেষু"; সেইরূপ অশোকের "দেবতাদের প্রিয়" কালক্রমে জৈন সাহিত্যে ব্যবহৃত জনসাধারণের পরস্পর-সম্বোধনের "হে দেবতাদের প্রিয়" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যেমন উত্তর-ভারতে ব্রাহ্মণ মাত্রেই "মহারাজ" এবং উর্দ্দুতে ভদ্রব্যক্তি মাত্রেই "হুজুর, সাহেব"। সংস্কৃত ভাষায় "দেবতাদের প্রিয়" কথাটির "মূর্খ" অর্থেও প্রচলন আছে; কানা ছেলেকে "পদ্মলোচন" বলা, হীনকে ব্যঙ্গ বা অনুকম্পা করিয়া মহৎ নাম দেওয়া সব ভাষাতেই দেখা যায়, জার্ম্মান ভাষাতেও Gotteslieb (ভগবানের প্রিয়) কথাটি মূর্খের প্রতি প্রযুক্ত হয়। কিন্তু আর একটি দিক দিয়াও "দেব প্রিয়" কথাটির "মূর্খ" অর্থে ব্যবহার অনুমান করা যাইতে পারে। অশোক প্রজার মঙ্গল, ধর্ম্মের প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে এত অধিক উৎসাহী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি সকলকেই তাঁহার মত উৎসাহী মনে করিতেন; উৎসাহের আতিশয্যে তিনি নিজে আহার নিদ্রা একরকম বাদ দিয়াছিলেন, তাঁহার মন্ত্রী, পারিষৎ-কর্ম্মচারিদেরও বিশ্রাম দেন নাই, এমন কি প্রজা সাধারণকেও উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। "সর্ব্বং অত্যন্তগর্হিতং", আতিশয্য নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এইজন্য লোকে বোধহয় ব্যঙ্গ করিয়া অশোকের উপাধিকে মূর্খের নামান্তর রূপে ব্যবহার করিত। এই ব্যাখ্যাটি হয়ত দেশভক্ত পাঠকের মনঃপুত হইবে না, কিন্তু অশোকের কার্য্যকলাপ শেষ পর্য্যন্ত অনুধাবন করিলে ইহারা যৌক্তিকতা উপলব্ধি হইবে।

"লেখাপিতা"—শুদ্ধ ব্যাকরণানুসারে "লেখিতা" হওয়া উচিত ছিল কিন্তু দুইবার নিজন্ত-প্রত্যয়ে "লেখাপিতা" হইয়াছে। এই রীতি গিরনার প্রাকৃতে প্রভূত দৃষ্ট হয়, যেমন "রোপিতা" স্থলে রোপাপিতা, "হারিতা" স্থলে হারাপিতা, "খানিতা" স্থলে খানাপিতা (২য় শিলানু., গিরনার খ, গ, ঘ)।

(খ) আরভিৎপা—সং আলভ্যং °ৎপা=সং °ত্বা, এখানে ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ থাকিলেও অপ্ প্রত্যয় না হইয়া ত্বাচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। কিন্তু √ লভ্

হইতে নিষ্পাদন না করিয়া √ রভ্ হইতে করিলে এ শব্দটির অর্থ ভাল বুঝা যাইবে। জৈনসাহিত্যে "আরম্ভ" = যন্ত্রণা দেওয়া, বধ করা।

(গ) "সমাজ" কথাটির এই অর্থ ব্যুহ্লার, ভাণ্ডারকর, টমাস প্রভৃতি পণ্ডিতরা বহু উদাহরণ দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

(ঘ) সমাজম্হি—এখানে ও (চ) "মহানসম্হি"তে °ম্হি = সং °স্মিন্; বিশেষ্যে সর্ব্বনামের ও সর্ব্বনামে বিশেষ্যের বিভক্তি-চিহ্ন যোগ করা এই প্রাকৃতে প্রায়ই দেখা যায়।

(ঙ) পরে "চতুর্থ শিলানুশাসন"-এর "খ" বাক্যে আমরা দেখিব অশোক তাঁহার অনুমোদিত ও প্রবর্ত্তিত এইরূপ "সমাজে"র কথা বলিয়াছেন। ইহাতে লোকের ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস যাহাতে বাড়ে সেইরূপ অনুষ্ঠানাদি দেখান হইত।

(চ) বহুশতসহস্র—ইহা অবশ্য আক্ষরিক সত্য হিসাবে না লইয়া রূপক হিসাবে লইতে হইবে।

(ছ) ইহাতে বুঝা যায় অশোক ময়ূর ও মৃগ মাংস এত ভালবাসিতেন যে ইহা ছাড়িতে তাঁহার অনেক সময় লাগিয়াছিল। অথবা এরূপও হইতে পারে যে তিনি নিজে নিরামিষাশী হইলেও রাজপরিবারের অন্য মাংসাশী লোকদের জন্য এই ব্যবস্থাটুকু রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এসব কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করায় তাঁহার অকপট সরলতা প্রকাশ পায়।

অয়ং— = (ক) ইয়ং, স্ত্রীলিঙ্গ স্থানে পুলিঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তী— = (জ) ত্রী, দুইএরই ব্যবহার ছিল।

(জ) ইহাতে রাজপরিবারের মাংসভোজী অনেকে নিশ্চয় তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন।

এই শিলানুশাসনে দেখা গেল অশোক জীবহত্যা এবং প্রজাদের চিরাচরিত উৎসব-মিলন নিষেধ করিতেছেন এবং তাহাদিগকে তাঁহার নিজের প্রবর্ত্তিত উৎসবে যোগ দিতে বলিতেছেন। ইহাতে অসন্তোষ বৃদ্ধি, বিদ্রূপ প্রভৃতির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এ বিষয়ে বিভূতি সত্যই বড় ছেলেমানুষ—বিবাহ করার বিষয়ে। এতটুকু অভিজ্ঞতা নাই। মেয়েদের সম্বন্ধে কোনদিন সে যে মাথা ঘামায় নাই তা নয়, তবে সেটা খুবই কম। অস্পষ্ট একটা ধারণা তার মনে আছে যে, দেখিলেই ভাল লাগে এমন চেহারার আর মিশিলেই মিষ্টি লাগে এমন স্বভাবের একটি চালাকচতুর চটপটে মেয়ের সঙ্গে একদিন না একদিন প্রেম তার হবেই, বাস্, তারপরেই মালাবদল। কিন্তু মাধবীলতা কি তার কল্পনার সেই মেয়ে? দু'দিন ভাবিয়া বাপকে একটা জবাব দিবে বলিয়াছিল, সাতদিন ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিল না। তারপর মনে হইল, মাধবীলতার সঙ্গে পরামর্শ করিলে দোষ কি?

মাধবীলতা সোজাসুজি জবাব দিল, 'আমি কি জানি!'

অর্থাৎ মাধবীলতার আপত্তি নাই। মনে মনে বড় অভিমান হয় মাধবীলতার, তাকে জিজ্ঞাসা করা কেন, কি করা উচিত? ইচ্ছা না থাকে, বাতিল করিয়া দিলেই হয়। সে তো আর পায়ে ধরিয়া সাধে নাই!

সদানন্দ অনেকবার মাধবীলতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, সে যায় নাই। কি করিবে গিয়া? সদানন্দ কি বলিবে সে ভাল করিয়াই জানে। আর ওসব কথা শুনিবার সাধ মাধবীলতার নাই। নিজে সে অনেক ভাবিয়াছে—এখনো ভাবিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে মাথার মধ্যে যখন একটা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, মনে হয় মাথার ঘিলুগুলি গলিয়া গলিয়া তালুর কাছ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে (মোমের মত), তখন হঠাৎ একসময় দু'কাণে তার তালা লাগিয়া গিয়া সমস্ত জগৎ বদলাইয়া যায়। স্তব্ধ ও শান্ত চারিদিক। ভাবনার তো কিছু নাই? আত্মগ্লানির কোন কারণ তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? সব ভাল, সব মিষ্টি, সব সুন্দর। জীবনে সুখী হওয়ার পথে একটা বাধাও আর নাই। কত আনন্দ জীবনে। আপশোষ শুধু এই যে সে

জানে, আবার গোড়া হইতে সব সুরু হইবে, দুর্ভাবনা, অস্বস্তিবোধ, আত্মগ্লানি আর মাথার অনির্দ্দিষ্ট দুর্ব্বোধ্য যাতনা। প্রথমে সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়া বাড়িতে বাড়িতে কয়েকদিনে উঠিয়া যাইবে চরমে, তখন আবার দু'কাণে তালা লাগিয়া পাওয়া যাইবে শান্তি ও স্তব্ধতা। ব্যাপারটা মাধবীলতা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এ কি কোন অসুখ? মাথার অসুখ? পাগল টাগল হইয়া যাইবে না তো?

সদানন্দ একদিন বিভূতিকে দিয়াই তাকে ডাকিয়া পাঠাইল। মাধবীলতা নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, 'যাব?'

'যাবে বৈকি, বাঃ রে!'

'একা একা যেতে আমার কেমন ভয় করে।'

'ভয় আবার কিসের?'

সদানন্দের সামনে নিজেকে মাধবীলতার সত্যই কেমন যেন পুতুলের মত অসহায় মনে হয়। তাকে নিয়া যা খুসী করার ক্ষমতা যেন এই লোকটির কেমন করিয়া জন্মিয়া গিয়াছে।

'আমাকে একেবারে ত্যাগ করে দিলে মাধু?'

মাধবীলতা পুতুলের মতই চাহিয়া থাকে। এই তো সবে আরম্ভ, আরও কত কথা সদানন্দ বলিবে! কিন্তু সদানন্দও কথা না বলিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া খানিক পরে সে সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া যায়। তখন মাধবীলতা মাথা নীচু করে, অনেক ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলে, 'আপনি যদি বারণ করেন—'

সদানন্দ ভাবিতেছিল সেদিনকার কথা, আঙ্গুলগুলিকে সেদিন পাখীর পালকের চেয়ে কোমল করিয়া মাধবীলতার গায়ে বুলাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। আজ মারিতে ইচ্ছা হইতেছে। এমন কোমল, এমন মোলায়েম গা মাধবীলতার, দেখিলেই মনে হয় চামড়ার উপর বুঝি আর একটা অপার্থিব আবরণ আছে (এটা সদানন্দ অনেকবার কল্পনা করিয়াছে), আগে স্পর্শ করিবার কল্পনাতেই রোমাঞ্চ হইত, আজ কাটিয়া ছিঁড়িয়া রক্তপাত করিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইচ্ছা হইতে হইতে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া সদানন্দ দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া দেয়। সত্য কি মাধবীলতার শরীরটা সে ছিঁড়িয়া ফেলিবে না কি? চোখ দেখিয়া মাধবীলতার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসে। পাগল না হইয়া গেলে কি

মানুষের এমন চোখ হয়? কি করিবে সদানন্দ? খুন-টুন করিয়া ফেলিবে না তো?

কাছেই বসে সদানন্দ, ডান হাত শক্ত করিয়া তার বাঁ হাতের কব্জির কাছে চাপিয়া ধরে। মায়া-মমতা যে আজ সদানন্দের মনে এক ফোঁটা নাই, রাগে দুঃখে অপমানে মানুষটা গরগর করিতেছে, মাধবীলতা অনেক আগেই সেটা টের পাইয়াছিল। এতক্ষণে সে বুঝিতে পারে, ভয়ঙ্কর একটা আঘাতে দেহে মনে তাকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করিয়া দিবার সাধটাই সদানন্দের মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এতদিন মনে মনে সদানন্দ কি ভাবিয়াছে কে জানে, হয়তো এই রকম একটা কল্পনাই মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়াছে। আজ আর কোন রকমেই ঠেকানো যাইবে না। গলা টিপিয়া তাকে মারিয়া ফেলাও সদানন্দের পক্ষে আজ আশ্চর্য্য নয়। মাধবীলতা জানে বাঁ হাতের কব্জিটা তার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাথার মধ্যে এমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে যে ব্যথাটা ভাল রকম অনুভব করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বিস্ফারিত চোখ দুটি সদানন্দের চোখের সঙ্গে মিলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে মাধবীলতা জ্ঞান হারাইয়া সদানন্দের গায়েই ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

ঘরেই কুজায় জল ছিল, মাথায় খানিকটা জল চাপড়াইয়া দিয়া সদানন্দ দরজা জানালা খুলিয়া দিল। খানিক তফাতে হাত গুটাইয়া বসিয়া বিড়বিড় বকিতে লাগিল, বোধ হয়, আত্মরক্ষার এতবড় অস্ত্র আয়ত্ত করিয়া রাখার জন্য মাধবীলতাকে গালাগালি।

মাধবীলতার জ্ঞান হওয়ার পর সদানন্দ উদাস ভাবে বলিল, 'আচ্ছা তুমি যাও মাধু?'

'আপনি কি করলেন আমার?'

'কিছুই করিনি।'

মাধবীলতা সে কথা বিশ্বাস করিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। গেল একেবারে বিভূতির কাছে। নালিশ যদি করিতে হয়, হবু স্বামীর কাছে করাই ভাল।

বিভূতি শুনিয়া অবাক। 'অপমান করেছেন? কি অপমান করেছেন স্বামীজি তোমাকে?'

মাথার মধ্যে কতকগুলো বড় অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলিতেছিল মাধবীলতার, স্থান ও কালের কতকগুলি নিয়ম যেন ঢিল হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে, অথচ ঠিক যেন মাথার মধ্যেও নয়, মাথার পিছন দিকে একটা বাড়তি অঙ্গ আছে, সেইখানে কত কি জিনিষ একসঙ্গে সরু আর মোটা হইয়া যাইতেছে, কয়েকদিন পরে পরে কাণে যে তার তালা লাগে সেই বীভৎস স্তব্ধতা সর্ব্বব্যাপী আলোড়নের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া এমন একটা এলোমেলো গতি লাভ করিয়াছে যা চোখে দেখা যায়, আর এমন একটা অকথ্য ভয় (অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের যে এমন একটা অবর্ণনীয় রূপ থাকে মাধবীলতার জানা ছিল না)—ব্যাপারটা বুঝিবারও নয়, বুঝাইবারও নয়। অথচ মস্তিস্কের সাধারণ অংশটা এদিকে বেশ কাজ করিতেছে। সমস্ত ঘটনাটা অনায়াসে গড়গড় করিয়া সে বিভূতিকে বলিয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া হাত ধরিয়া টানিবার সময় ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায় আজ কি ভাবে রাক্ষসটার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

'তুমি যদি এর প্রতিকার না কর—'

বিভূতির বুকে মুখ গুঁজিয়া দিয়া মাধবীলতা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিভূতি কথা বলে না দেখিয়া খানিক পরে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই সে চমকাইয়া গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিবার সময় সদানন্দের মুখ যেমন হইয়াছিল, বিভূতির মুখও তেমনি দেখাইতেছে।

'একটু বোসো, আমি আসছি।'

মাধবীলতা সভয়ে তার হাত চাপিয়া ধরিল, 'কি করবে ? থাকগে, কিছু করে কাজ নেই। যা হবার তাতো হলই—'

কিন্তু আর কি বিভূতিকে আটকানো যায় ? হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া গেল। সদানন্দের ঘরে গিয়া সদানন্দের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, 'মাধুর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার মানে ?'

'ছ্যাখো বিভূতি, তুমি ছেলেমানুষ—'

বাকী কথাগুলি সে বলিয়া উঠিতে পারিল না, বিভূতির ঘুঁষিতে নাকটা ছেঁচিয়া গেল। বিভূতি আরও মারিত, কিন্তু পিছন হইতে মহেশ তাকে জড়াইয়া ধরায় আর কিছু করিতে পারিল না।

'ছেড়ে দাও বাবা, বজ্জাতটাকে আমি খুন করব।'

'ছি বিভূতি, ছি!'

'আমাকে ছি করছ? জানো ও কি করেছে?'

'জানি বৈকি।'

'জানো?'—বিভূতি এতক্ষণ ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করিতেছিল, এবার স্তব্ধ হইয়া গেল।

নাক দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে, সেবা বেশীর ভাগ করিল শশধরের বৌ। কখন কোন ফাঁকে সে যে আসিয়া জুটিয়াছিল কেউ টেরও পায় নাই। বিভূতি একদিকে ছোট একটা টুলে বসিয়া ব্যাপার দেখিতেছিল আর থাকিয়া থাকিয়া মুখ বাঁকাইতেছিল। এখনও তার রাগ কমে নাই, বেশ বুঝা যায় একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্যই সে বসিয়া আছে। মাঝখানে একবার সে কি একটা মন্তব্য করিতে গিয়াছিল, মহেশ হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, 'দোহাই তোর, একটু থাম।' তারপর হইতে সে চুপ করিয়া আছে।

বুঝা যায়, মহেশ ভাবিতেছে।

ভাবিবার কি আছে বিভূতি বুঝিতে পারে না। তার বিরক্তির সীমা থাকে না। মহেশ যদি সব জানেই, তবে আর এই পাষণ্ড সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিতে তো একমুহূর্ত্ত দেরী হওয়া উচিত নয়। এত সেবা যত্নই বা কি জন্য? ঘাড় ধরিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেই হয়!

সদানন্দ একটু সুস্থ হইলে মহেশ বলিল, 'বিভূতি, বড় ঘরের রোয়াকে যে ভাঙ্গা কাঠের বাক্সটা আছে না, তার থেকে বড় হাতুড়িটা নিয়ে আসবে?'

'হাতুড়ি দিয়ে কি করবে?'

'একটু কাজ আছে।'

বিভূতি হাতুড়ি আনিয়া দিল। লোহায় মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। হাতুড়ি হাতে করিয়া মহেশ চৌধুরী বলিল, 'প্রভু, আমার ছেলের হয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি। ছেলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করবে না, ওকে বলা বৃথা। ছেলের হয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি, আপনি তাই মঞ্জুর করুন।'

বলিতে বলিতে মহেশ চৌধুরী করিল কি, হাতুড়িটা দিয়া নিজের নাকের

১০

উপর সজোরে মারিয়া বসিল। সকলে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কেবল শশধরের বৌ আবার সেবা আরম্ভ করিয়া দিল মহেশের। সে যেন এইরকম একটা কাণ্ড ঘটিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সদানন্দের চেয়ে মহেশের যে জোরে লাগিয়াছিল তাতে সন্দেহ নাই, রক্ত আর বন্ধ হইতে চায় না। মহেশের বারণ না মানিয়া বিভূতি পাড়ার সুবিমল ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। ডাক্তার আসিয়া কিন্তু করিতে পারিল না কিছুই, থেঁতলা নাকটা পরীক্ষা পর্য্যন্ত নয়। মহেশ তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অতিকষ্টে খোনাসুরে বলিল, 'না না, আমার কর্ম্মভোগ আমায় ভোগ করতে দিন।'

সুবিমল ডাক্তারের কাছে পাড়ার লোক জানিতে পারিল, সাধু সদানন্দ আর মহেশ চৌধুরীর মধ্যে ভয়ানক রকমের একটা হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। দুজনেই দারুণ আহত। মহেশ চৌধুরীর এখন ভয়ানক অনুতাপ হইয়াছে, বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যাইতে চায়।

হাতাহাতি হইল কেন? প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি! ও রকম তো ওদের মধ্যে লাগিয়াই আছে। অন্যদিন কথা কাটাকাটির মধ্যেই সমাপ্তি হয়, আজ হাতাহাতি পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে।

কথাটা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রূপ নিল অন্যরকম। ঘটনাটা অপরাহ্নের, সন্ধ্যার পর অনেকে খবর জানিতে আসিল। সদানন্দ তখন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, তার দেখা কেউ পাইল না। মহেশ চৌধুরীর সমস্ত মুখটাই ফুলিয়া গিয়াছে, কথা বলিতেও কষ্ট হয়। তবু সে-ই সংক্ষেপে ব্যাপারটা সকলকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল। গোঁয়ার-গোবিন্দ একটা ছেলে আছে তার সকলে জানে তো? একটা ভুল বোঝার দরুণ হঠাৎ রাগের মাথায় সে সদানন্দকে অপমান করিয়া বসে। ছেলের হইয়া মহেশ চৌধুরী তাই এই শাস্তি গ্রহণ করিয়াছে।

রসিক ভটচায মহেশ চৌধুরীর বন্ধু। সে বলিল, 'তুমি কি উন্মাদ মহেশ?'

'কাল পরশু তোমার সঙ্গে ও বিষয়ে তর্ক করা যাবে, কেমন?' বলিয়া মহেশ চৌধুরী শয়ন করিতে ভিতরে গেল।

যে দশ বারজন উৎসাহী ও কৌতূহলী পরিচিত লোকের কাছে মহেশ চৌধুরী কথাগুলি বলিল, তারা তখন ডাকাইয়া আনিল বিভূতিকে। কি হইয়াছিল ? সদানন্দকে সে কি অপমান করিয়াছিল ? কেন অপমান করিয়াছিল ? কি দিয়া সদানন্দ মহেশ চৌধুরীকে আঘাত করিয়াছে ?

কিন্তু বিভূতি তেমন ছেলেই নয়, সে সংক্ষেপে শুধু বলিল, 'আমি কিছু জানি না। আপনারা এবার যান তো।'

সকলে দয়া করিয়া তার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়াছে, সকলকে বসাইয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইতে মহেশ চৌধুরীর কত সঙ্কোচ, কত আপশোষ! আর তার ছেলে কিনা সোজাসুজি সকলকে বিদায় করিয়া দিল! ছেলেটা সত্যই গোঁয়ার।

পরদিন অনেক দূরের গ্রামে পর্য্যন্ত রটিয়া গেল, ছেলেটাকে বাঁচাইতে গিয়া মহেশ চৌধুরী সদানন্দের হাতে ভয়ানক মার খাইয়াছে। একটি টুঁ শব্দও করে নাই মহেশ চৌধুরী সদানন্দ মার বন্ধ করিলে রক্তাক্ত শরীরে সদানন্দের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া ছেলের হাত ধরিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু মহেশ চৌধুরী বলিয়াছে, 'প্রভুর প্রহারের চিকিৎসা ? ছি!'

শেষ কথাটাতে সকলে যে কি মুগ্ধ হইয়া গেল বলিবার নয়। এমন ভক্তি মহেশ চৌধুরীর যে মার খাইয়া মরিতে বসিয়াছে তবু চিকিৎসা করিবে না—গুরু মারিয়াছে বলিয়া! সকলের কাণে যেন বাজিতে লাগিল 'মারলি মারলি কলসী-কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।'

না জানি কতবড় মহাপুরুষ সদানন্দ যার জন্য মহেশ চৌধুরীর এমন অলৌকিক ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছে, এমন মহৎ প্রেরণা আসিয়াছে। সদানন্দের উপর মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন সভয় বিস্ময়ে হু হু করিয়া বাড়িয়া গেল। অনেকের মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ হয় তো মানুষ নয়, মানুষের রূপধারী—

ফিস ফিস করিয়া অন্তরঙ্গ মানুষের কাণে কাণেই শুধু কথাটা বলা যায়। কয়েকটি ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতরে, গেঁয়ো পথের ধারে কয়েকটি জমকাল গাছের ছায়ায় দেবতার আবির্ভাবের কথাটা কাণাকাণি হয়। অকালবার্দ্ধক্যের ছাপমারা কয়েকটি ক্লিষ্ট মুখে উত্তেজিত আনন্দের বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটে।

কয়েকটা দিন একরকম একা একা ঘরের কোণে কাটাইয়া দিবার পর সদানন্দই প্রথম কথাটা পাড়ে। বলে, 'আমি বরং কোথাও চলে যাই মহেশ।'

মহেশ চৌধুরী বলে, 'আর ও কথা কেন প্রভু? সেদিন তো ক্ষমা করেছেন, ও ব্যাপার তো চুকে গেছে?'

'চুকে গেছে বললেই কি সব ব্যাপার চুকে যায় মহেশ?'

'আজ্ঞে তা যায় বৈকি। আমরা এখন ভাবব ও ঘটনাটা যেন ঘটেই নি, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলব। মনের বাইরে তো কোন কিছুর জের চলতে পারে না প্রভু।'

মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরী এমনভাবে কথা বলে, মনে হয় ঠিক যেন সদানন্দকে উপদেশ দিতেছে। প্রথম প্রথম সদানন্দ অতটা খেয়াল করিত না, আজকাল মন দিয়া শোনে। উপদেশের মতই কথাগুলি সে গ্রহণ করে এবং পালন করিবার চেষ্টাও করে। মহেশ চৌধুরীর এখানকার উপদেশ, সেদিনকার ব্যাপারটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কথায় ব্যবহারে এমন ভাব দেখাইতে হইবে যেন কিছুই ঘটে নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ সেই চেষ্টাই করে। কয়েকদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণভাবে ঘরের কোণায় কাটাইবার পর হঠাৎ সেদিন হাসিমুখে গিয়া হাজির হয় সান্ধ্য মজলিসে।

সকলেই উপস্থিত আছে। বিভূতি এবং মাধবীলতাও। প্রথমটা সদানন্দের ভয় হয়, বিভূতি হয়তো রাগ করিয়া উঠিয়া যাইবে, হয়তো একটা কেলেঙ্কারী করিয়া বসিবে। মাধবীলতা হয়তো তেমন কিছু করিবে না, সে সাহস তার নাই, কিন্তু কথায় ব্যবহারে সহজ ভাব কি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে মেয়েটা? মহেশ চৌধুরী তো বলিয়া খালাস সব চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে, কিন্তু ওদের দুজনের পক্ষে কি চুকিয়া বুকিয়া যাওয়া সম্ভব?

কিছুক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সদানন্দ বুঝিতে পারে, ব্যাপারটা সত্য-সত্যই সকলে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে—যতটা মুছিয়া ফেলা সম্ভব। বিভূতি আর মাধবীলতা যে একটু সঙ্কোচ আর অস্বস্তি বোধ করিতেছে প্রথমদিকে এটা পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে দুজনেই অন্যদিনের মত সহজভাবে সকলের হাসি গল্পে যোগ দিয়াছে।

সদানন্দের খুসী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মনটা তার হঠাৎ বড় খারাপ

হইয়া গেল। আর একবার সে যেন মহেশ চৌধুরীর কাছে হারিয়া গিয়াছে। অতি শোচনীয় কুৎসিৎ পরাজয়। সেদিনকার ব্যাপারে মহেশ চৌধুরীর কাছে সে যে ছোট হইয়া গিয়াছে আজ এই সান্ধ্য-মজলিসে আসিয়া প্রথম সেটা সদানন্দের খেয়াল হইল।

তার মনে হইতে লাগিল, এই উদ্দেশ্যই ছিল মহেশ চৌধুরীর, তাকে হীন করার জন্যই সে হাতুড়ি দিয়া সেদিন নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল। এখনো মহেশ চৌধুরীর মুখ অল্প অল্প ফুলিয়া আছে—কি সাংঘাতিক মানুষ মহেশ চৌধুরী!

(ক্রমশঃ)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

An Essay on India's National Income, 1925-29—by U. K. R. V. Rao, (George Allen & Unwin Ltd) 6sh.

১৮৭৬ সালে দাদাভাই নৌরজী বৃটিশ-শাসিত ভারতের ১৮৬৮ সালের মাথা-পিছু আয়ের সর্ব্বপ্রথম অনুমান করেন। তারপর থেকে এপর্য্যন্ত যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা হয়েছে শ্রীযুত রাও-এর অনুমান তার সর্ব্বশেষ। ১৯২৫-২৯ সালের গড়পড়তা মাথাপিছু বাৎসরিক আয়ের অনুমান করে এই রচনা লিখে ১৯৩৬ সালে তিনি দাদাভাই নৌরজী প্রাইজ পান। ১৯৩৯ সালে এই লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

দেশের সব রকম কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বাৎসরিক উৎপাদনের সমষ্টি হচ্ছে দেশের সম্মিলিত আয়। মাথাপিছু আয় পাওয়া গেছে একে অনুমিত লোক-সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়ে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন বিভাগের আয় যোগ করতে গিয়ে অসতর্কতায় অনেক ভুল এসে পড়তে পারে। কোনোটাকে একবারের বেশী ধরা হয়, কোনোটা বা একেবারেই বাদ পড়ে। আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণের খবর এত কম ও অসম্পূর্ণ যে এ ধরণের হিসেব সংখ্যা ছেড়ে প্রধানত যুক্তি ও ব্যক্তিগত অনুমানের উপর নির্ভর করে করতে হয়। ভুলের সম্ভাবনা তাই বেড়ে উঠে। শ্রীযুত রাও তাঁর বইএর প্রথম অধ্যায়ে নৌরজী থেকে আরম্ভ করে কয়েকটা প্রধান প্রচেষ্টার বর্ণনা ও আলোচনা করেছেন। তাই আগেকার ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়নি এবং একথা স্বচ্ছন্দে বলা চল্‌তে পারে যে এত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি যা করেছেন তা অতি প্রশংসনীয়।

এঁর হিসেবে গড়পড়তা আয় হচ্ছে বছরে মাথা প্রতি ৭৭'৯ টাকা। এই সংখ্যার সঙ্গে আগের কয়েকটা অনুমানের তুলনা তিনি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন।

	অনুমান	বছর	১৯২৫-২৯এর মুল্যের হার	বেড়েছে	সময়
ডাঃ নৌরজী	২০'৫৲	১৮৬৭-৮	৫৪'২৲	+ ৭৫ (শতকরা)	৬০ বছর
এ্যাটকিন্‌সন্	৩১'৫৲	১৮৯৫	৫৫'০৲	+ ৪০ („)	৩০
স৷ং এবং খাম্বাটা	৮৮	১৯২১-২	৭৮'০		

উপসংহারে শ্রীযুত রাও বলেছেন যে আয়ের দিক থেকে, গত ৬০ বছরে যে আমাদের আয় কমে না গিয়ে কিছু বেড়ে গেছে তা নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অন্য সমস্ত দেশে মাথাপিছু আয় যখন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে অন্যদের তুলনায় তখন আমরা গরীব হয়ে যাচ্ছি।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে তর্ক উঠলে গড়পড়তা আয়ের সংখ্যা উদ্ধৃত করে আমরা যখন কিছু প্রমাণ করতে যাই তখন আমাদের সাবধান হওয়া উচিত যা'তে সংখ্যার অপপ্রয়োগ না হয়। বছরে ৭৭.৯ টাকা একটি গড়পড়তা সংখ্যা মাত্র। এর ওপরে ও নীচে কত লোকের আয় কি রকম ভাবে ছড়িয়ে আছে তা' আমরা জানি না। উপরের দিকে যদি অল্প লোকের অনেক বেশী আয় থাকে, নীচের শ্রেণীর লোকের আয় তবে যাবে আরও কমে। সমস্ত দেশের আয় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কি রকম তা' না জানা পর্য্যন্ত গড়পড়তা আয় আমাদের অসম্পূর্ণ ধারণা দেয়। শ্রীযুত রাও এটা লক্ষ্য করেছেন এবং শেষ অধ্যায়ে স্বীকার করেছেন যে এসম্বন্ধে আমাদের খুব কম খবরই জানা আছে। বছরে মোটামুটি ২,০০০৲ টাকা যাদের আয় তাদের আলাদা করে তিনি দেখিয়েছেন যে বাকী লোকের মাথাপিছু আয় মাত্র ৬৪·৬ টাকায় নেবে আসে। আমাদের হাতে যদি আরও কিছু খবর থাকত, ধরুন বছরে যাদের ৬০০৲ টাকা আয় (মাসে ৫০৲) তাদেরও যদি আলাদা করতে পারতাম তবে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় আরও অনেক কমে যেত। এমন সংখ্যা নেই যা দিয়ে গত ৬০ বছরে বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ের কোন তুলনামূলক বিচার আমরা করতে পারি। জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর স্থান ৬০ বছর আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে এই যদি ধরে নিই তবে অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে যত আস্তেই হো'ক সব শ্রেণীর আয় বেড়ে চলেছে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্থান আজ কি ঠিক তেমন আছে? এক শ্রেণীর অবস্থা যখন ভাল হচ্ছে অন্য-শ্রেণীর অবস্থার তখন উন্নতি হচ্ছে না বা আরও খারাপ হচ্ছে—এমন কি হতে পারে না? দ্রুত লোকসংখ্যা বাড়ার নিষ্ঠুর বোঝা শুনেছি দরিদ্ররাই বিশেষ করে বহন করে। সমস্ত দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু কৃষক ও দরিদ্র জন-সাধারণের কথা ধরলে, তাদের অবস্থা উন্নতির দিকে যাচ্ছে তার প্রমাণ কি?—এ প্রশ্ন বোধহয় সঙ্গত ভাবেই করা চলে। আলোচ্য বইয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র

এত বিস্তৃত নয় তাই এসব আলোচনা সেখানে ওঠেনি। কিন্তু এসব প্রশ্ন অর্থনীতিবিদ্‌দের মনে উঠুক এবং তাঁরা আমাদের সন্তোষজনক উত্তর দিন্‌ এই আমরা চাই।

শ্রীসত্যব্রত সেন

Step By Step—Winston Churchill, (Thornton Butterworth)

চার্চিলের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে অনেকের অনৈক্য ঘটলেও তাঁর রচনাচাতুর্য্যের নিন্দা করবার মত বিদূষক কেউ আছেন কিনা জানিনে। তাঁর World Crisis সিরিজ অনেক এমেচার রাজনীতিজ্ঞের অজ্ঞতা দূর ক'রেছে। আলোচ্য বইটিও সেইরূপ প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠবে ব'লে আশা করা যায়। বই ব'লতে আমরা যা বুঝি এটা ঠিক সেই ধরণের নয়—এ যেন একটা ডায়েরী, বিভিন্ন সময়ে রচিত সাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার ওপর মন্তব্যগুলি একত্রে গ্রথিত হ'য়েছে—তাই সাবলীল ঘটনাস্রোত কিঞ্চিৎ ব্যাহত হওয়া অনিবার্য্য, তা হ'লেও কী ক'রে য়ুরোপে এমন মেঘাড়ম্বরের সৃষ্টি হ'ল তার একটা আঁচ এ বই থেকে পাওয়া যায়।

এই বই-এর আলোচনা কাল ১৯৩৬-এর মার্চ্চ থেকে ১৯৩৯-এর মে পর্য্যন্ত। প্রত্যেক পরিচ্ছদের সঙ্গে তারিখ যুক্ত থাকায় পটভূমিকার আভাস সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রবন্ধগুলির রচনার সময়ের ব্যবধান এত বেশী যে স্থানে স্থানে পারম্পর্য্য রক্ষা পায়নি। প্রধানতঃ জার্মাণী ও ইতালীর সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কের গতি নিয়েই এ-বইতে আলোচনা করা হয়েছে। জার্মাণীকে এতটা শক্তিশালী ক'রে তোলবার জন্য ব্রিটেন কতটা দায়ী, আবিসিনিয়া-সমস্যা বর্ত্তমান গোলযোগে কতটা ইন্ধন যুগিয়েছে, স্পেনের বিড়ম্বনায় দূরে স'রে দাঁড়ানোয় কী পরিণতি ঘটলো তার বিশেষ পরিচয় লাভ করা যায়। জাপান, রুশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে আলোচনা আরো একটু বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। আর দুর্ভাগা ভারতবর্ষের সমস্যার জন্য কি এতটুকু স্বল্পায়তন পরিসরই যথেষ্ট ?

বিগত শাসনতন্ত্র রচনায় চার্চিলের তীব্র আর্ত্তনাদ এদেশেও প্রতিধ্বনিত হ'য়েছিল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব একটুও অপরিচিত নয়। অতএব তাঁর

কাছ থেকে এ ধরণের প্রবন্ধ আশা করা যেতে পারে। তাঁর রচনায় স্বকীয় মনোভাব গোপন ক'রে আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়াস নেই দেখে তাঁকে সাধুবাদ দিতে ইচ্ছে হয়। নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য দেখে লেখক যেরূপ শঙ্কিত হ'য়েছেন তা সত্যিই উপভোগ্য। মাদ্রাজের মত প্রদেশে যেখানে সবাই ভেবেছিল 'Moderate Liberal Legislature' হবে, সেখানেও কংগ্রেস মাথা উঁচিয়ে উঠেছে। অতএব স্বদেশবাসীকে আর একবার শঙ্কিত ক'রে তোলবার জন্য লিখতেই হয়—"They can govern, at any time they choose, the greater part of India. The administration of justice and the control of police will, at their request, be placed immediately in their hands. They can dispose of the revenues of a half a dozen countries almost as large as leading European States" এবং এমন কি "they can vindicate or break the constitution created for them."

পণ্ডিত জওহরলালকে তিনি বলছেন, Communist, Revolutionary, most capable and most implacable product of the British connection with India. ভালো কথা, কিন্তু সেই রকম ব্যক্তিকে একথা শুনিয়ে কী লাভ যে "The frontier is astir ; and British officers and soldiers are giving their lives to hold back, from the cities and peace time wealth of India, the storm of Pathan inroad and foray."

একটা কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে এ শ্রেণীর পুস্তকে সাধারণত বস্তু অপেক্ষা বাক্যবিন্যাসের বজ্রধ্বনিই বেশী শুনতে পাই। Step By Step তার ব্যতিক্রম। এ বইতে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নেই। দহন অতি তীব্র কিন্তু আগুন রয়েছে লুকানো।

এই বই পড়বার পূর্ব্বে ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালের প্রথমাংশের রাজনীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ১৯৩৫-এর জুন মাসে ইংরেজ-জার্মান সামুদ্রিক চুক্তি, আবিসিনিয়া গোলযোগ, ১৯৩৬ সালে জার্মাণীর রাইনল্যাণ্ড অধিকার প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে অধিকাংশ মন্তব্যই অস্পষ্ট থেকে যাবে। ভার্সাই ও লোকার্নোর কথা উল্লেখ করা বাহুল্য—কারণ এগুলি যাঁরা

জানেন না তাঁদের এ-বই পড়বার আগ্রহ এবং প্রয়োজন যে হবে না তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সর্ব্বোপরি একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বিশ্লেষণ ও মন্তব্য ঠিক এক নয়। তাই একদর্শিতার ক্রটি এ ধরণের পুস্তকে অবশ্যম্ভাবী। এ বইকে রাজনৈতিক মনুসংহিতা ব'লে মেনে নেবারও প্রয়োজন নেই তথা মতানৈক্যে ক্ষুণ্ণ হবারও কারণ নেই। সর্ব্বশেষে রচনাকৌশলের স্তুতি জানাবার সুযোগ পুনরায় গ্রহণ ক'রছি।

ক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

Journey Through Life—By Amedee Ozenfant. Translated by Helen Beauclerk and Violet Macdonald (Gollancz Ltd). 16 Shillings.

সোশ্যালিষ্ট শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে পৃথিবীব্যাপী আজ যে কলরব উঠেছে তার সঙ্গে সুর মেলানো থেকে আমরাও নিষ্কৃতি পাই নি। বুর্জ্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম তার বিরুদ্ধে তো রয়েছেই, তা' ছাড়া তার সঙ্গে রয়েছে 'infantile' সোশ্যালিষ্টদের বিকৃত বুক্‌নি। এ-দু'য়ের ভিতর থেকে খাঁটি জিনিষটিকে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা সহজ ব্যাপার নয়। আলোচ্য পুস্তকখানি বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী আমেদে ওজাঁফাঁর জীবনকাহিনী হ'লেও, যেহেতু তিনি তার মধ্যে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির হিসেব-নিকেশ দেন নি বা আর্টের কয়েকটা বাঁধা ধরা নিয়ম নিয়ে বুদ্ধির কসরৎ দেখান নি, পরন্তু সামাজিক জীব হিসেবে পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের ও শিল্পী-মনোভাবের আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের পরিচয় দিয়েছেন, সেইজন্য তাঁর মনের সোশ্যালিষ্ট পরিণতি, সোশ্যালিষ্ট শিল্পের আদর্শ, স্বরূপ, বর্ত্তমান সমাজে শিল্পীর কর্ত্তব্য প্রভৃতি সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, চিন্তাশীল সোশ্যালিষ্টদের কাছ থেকে বিশেষ অনুধাবনের দাবী করে।

বইখানি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে "The Constants" অর্থাৎ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মাঙ্গলিক জয়যাত্রার অনুপ্রেরণার জন্য যে-সব উপকরণ

প্রাচীন শিল্পের মধ্যে আজও সঞ্চিত রয়েছে তাদের পুনরুদ্ধার ক'রে সকলের সামনে প্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছে। দ্বিতীয় ভাগে "Raw Material" সংগৃহীত হ'য়েছে, অর্থাৎ ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত শুধু ওজ্ঁফাঁর দেশ ফ্রান্সে নয়, সমগ্র য়্যুরোপ ও বিশ্বের উপর দিয়ে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হ'য়েছিল, সচেতন সামাজিক মানুষ হিসেবে তিনি তখন জীবনের যে-সব 'কাঁচা মাল' সংগ্রহ করেছিলেন, তারই কাহিনী। তৃতীয় ভাগে "Optimism and Unity"-র মধ্যে আত্মবিশ্লেষণের পর তাঁর মানসিক বিকাশকে তিনি ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ ১৯৩১ সালের কর্ম্মোৎসাহী ওজ্ঁফাঁর জীবনকে 'thesis' এবং ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সালের জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেষ্টনে প্রক্ষিপ্ত ওজ্ঁফাঁর জীবনকে 'anti-thesis' বল্‌লে, ১৯৩৪ সালের আশাবাদী, ঐক্যবাদী ও শুভবাদী শিল্পী ওজ্ঁফাঁর জীবনকে 'synthesis' বলা যেতে পারে। এক কথায় পুস্তকখানি শিল্পী ওজ্ঁফাঁর dialectical জীবনের পরিচিতি। 'Life, the first idea', 'Life, the swarming', 'Life, the final drawing', এবং 'Life, the finished picture'—এই চারখানি চিত্রও ওজ্ঁফাঁর জীবনের বিরোধবন্ধুর গতির সঙ্গে এক ছন্দে গাঁথা।

আর্থিক অভাব, পুরাতন বৎসরের ক্লান্তি এবং ফ্রান্সের চিরসঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে জীবন যখন দুর্ব্বিষহ হ'য়ে উঠলো, আমেদে ওজ্ঁফাঁ তখন গ্রীস যাত্রা করলেন মানসিক স্বাস্থ্য সন্ধানে। কেয়ারো, জেরুজ্যালেম্, ইফেসাস্, এথেন্স্ সহর ঘুরে তিনি প্রাচীন গ্রীক্ শিল্প ও সভ্যতার মধ্যে তাঁর জীবনকে কর্ম্মমুখর করবার রসদ সংগ্রহ করলেন। এলিয়ট্-প্রমুখ কবিদের মত ওজ্ঁফাঁ শিল্প ও সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ ব'লে বিলাপ করেন নি, তিনি প্রাচীন মানুষের শক্তিমান্ মনের প্রকাশকে যোগ্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। পার্থিনন্-এর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তার সৌন্দর্য্যকে নূতন ক'রে উপলব্ধি করলেন। পার্থিননকে শুধু তিনি "a symphony in perspectives" ব'লে ক্ষান্ত রইলেন না, বললেন : "The ineluctable tracks of the grooved columns carry our gaze, our hearts, our spirits, all our indivisible being upward. Whether we like it or not—hup! But abruptly the powerful horizontal entablature checks the ascent. Stop!

Our busniess is to be raised up, but not to vanish altogether into a land of dreams, not to desert our human duties. 'Grow fine, grow pure', said the Parthenon to the Athenians, 'this is my wish, but stay where you are'. The Pediment takes you in its mighty, angular grasp and thrusts you down. 'Athens wants you' Thus were the shapes of the Parthenon contrived, to the end that its citizens should be exalted, yet never allowed to escape from the real, from the city of Athens" (P. 42) এই দৃষ্টি দিয়ে গ্রীক্ সভ্যতা ও শিল্পকে উপলব্ধি ক'রে নিজের ও বর্ত্তমান সমাজের জন্য যে ক'টি অমূল্য অবদান ওজ্ াফাঁ সংগ্রহ করলেন তা হ'ল এই ঃ—

"Be men. Forget that soon, a little less soon, yon will perish. Forget that life for the most part cares nothing for you. Beyond you humanity goes on. Serve it. In this way you will find usefulness and immortality." (P. 41).

"There can be no falser measure of life than death. To do great things one must live as though one would never die." (P. 44)

বর্ত্তমানে খৃষ্টান্ ধর্ম্মযাজকদের হীন প্রবৃত্তি এবং খৃষ্টধর্ম্মের অনাচারকে নিন্দা ক'রে ওজ্ াফাঁ বললেন ঃ "'Be men, serve others', say Athens, Jesus and Lenin." গ্রীস্ ও গ্রীক্ শিল্পী ইক্টিনস্ হ'লেন ওজ্ াফাঁর নূতন জীবনের দীক্ষাগুরু।

১৯৩১ সালে গ্রীস্ পর্য্যটন শেষ ক'রে ওজ্ াফাঁ পূর্ণ উদ্যম নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। জীবন সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতিকে তিনি রূপায়িত করলেন পটের উপর। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ও মানবতার অনুভূতিকে তিনি তার প্রথম ছবিতে 'symbolise' করলেন। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু (out-stretched figures), স্নেহ, প্রেম, নিন্দা (Figures of Mother and Child, Mother and Son, Mother and Daughter, Sleep, The Lovers, Infant at the

Breast) প্রভৃতি তাঁর প্রথম চিত্রের 'elements'। এই 'figure'-গুলির ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "I use them as you would use nouns in a sentence. Or, rather, aphorisms in a lecture." (P. 132)

তারপর সমস্ত য়্যারোপে আর্থিক সঙ্কট বিকট মূর্ত্তিতে দেখা দিল। "Depression. The real 'everything is useless' feeling"। আর্থিক সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র য়্যারোপের, য়্যারোপ ছাড়িয়ে সমগ্র পৃথিবীর উপর নৈরাশ্যের অন্ধকার নামল। সুন্দর, সরল, সাবলীল জীবন যাপনের শেষ আশার রশ্মিটুকু পর্য্যন্ত নিভে গেল। সুদূর প্রাচ্যে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করল এবং য়্যারোপের বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি জাপানী মিলিটারিষ্টদের এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানাল না। ইংল্যাণ্ড 'Gold Standard' পরিত্যাগ করল। ভারতবর্ষে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ ক'রে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করলেন। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ চীনকে গ্রাস করল। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানগুলি আয়তনে ফ্রান্সের প্রায় তিনগুণ হবে। হিয়েন-নিঙ্‌-এ বাঁশের চালাঘরে পনেরো হাজার গৃহহীন ক্ষুধার্ত্ত নরনারী-শিশু আশ্রয় নিল, কিন্তু খাদ্যের সংস্থান নেই। অবশেষে কামানবিস্ফোরণে সকলকে বিলুপ্ত করা হ'ল। য়্যারোপে ধনতন্ত্রের প্রতিনিধিদের সফরের হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল। ব্রুনিং ও কার্টিয়াস্‌ প্যারীতে এলেন, লেভাল্‌ ও ব্রায়াণ্ড বার্লিনে গেলেন, তারপর নিউইয়র্ক ও জেনেভায়। প্রেসিডেণ্ট্‌ হুভার আৎলান্তিকের ওপার থেকে শিথিলভিত্তি ধনতন্ত্রকে ঠেকো দিয়ে রাখবার জন্য সকল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে আবেদন জানালেন। এর মধ্যে জার্ম্মানিতে নাৎসী আন্দোলন ক্রমে বৃদ্ধি পেল। এই ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ওজ্‌াঁফাঁর জীবনের দিনগুলি কাটতে লাগল এবং সেই সময় তিনি আঁকলেন তাঁর "Life, the Swarming" ছবি। আকাশের পটভূমিকায় পরস্পর-সংলগ্ন মানুষের মূর্ত্তিগুলিকে একটি সুন্দর প্যারাবোলার মত দেখায়, মনে হয় যেন ভিতর থেকে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যাচ্ছে। তারপর "by a shifting in the centres of gravity, it twists as though it had been jerked in the back, and begins to mount like a tumbler, arse over tip. It turns over and over, over and over. But at last its flight stops. The earth has

decided that this fantastic climbing has lasted long enough, and calls it back again, gently at first, then with increasing insistence." (P. 150).

হিটলারিজম্ ক্রমেই শক্তিশালী হ'তে থাকল। ১৯৩২ সালে হিট্লার ক্রনিংবুইকের গবর্ণমেন্ট্ কাউন্সিলার হ'লেন। মার্শাল হিণ্ডেন্‌বুর্গের সঙ্গে তিনি রাইখের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'লেন। স্পেনে প্রতিক্রিয়াশীল মনার্কিষ্ট্‌দের ষড়যন্ত্র ক্রমে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো, মনার্কিষ্ট্ সান্‌জুর্গো এই অভিযোগে ধরা পড়লেন। চিলি, ব্রেজিল্, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলিতে ফ্যাশিষ্ট আন্দোলন বৃদ্ধি পেল। ব্রায়াণ্ড মারা গেলেন, মঁসিয়ে ডোমার নিহত হ'লেন এবং লেব্রঁা হ'লেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট্। জাপান মাঞ্চুরিয়া আত্মসাৎ করল, চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য হ'লেও মাঞ্চুরিয়ার দূরত্বের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষে তখন কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। এই সময় ওজ্যাঁফাঁ তাঁর ডায়েরীর পৃষ্ঠায় লিখলেন: "Woe on an elite that becomes a caste. Look at Egypt and the decadence that followed the rule of the priestly caste, at China and its mandarins, at Spain and its royalty. France is going towards the same sterility. Or possibly a worse sterility, since our ruling caste, being only a money caste, is worth less than the priests, the mandarins or the kings. We are rebels, we rebel against a form of government that keeps men in poverty, against the stupidity of the State and the weakness of those who are in power.··· And we rebel against ourselves, our weariness and our despair comes from our feeling of uselessness." (P. 197)। এই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পর ওজ্যাঁফাঁ তাঁর প্রথম চিত্রাঙ্কনের ব্যর্থতাকে স্বীকার করলেন। "My big picture, LIFE, is a failure. What a relief !···The personifications of the Sun and the Night were childish, mythological, out of time, artificial. Our direct, physical notion of the world is infinitely more moving than those

theatrical divinities. The Sun is not a more or less athletic champion ; the Night, to us 1932 men, is not a lazy odalisque." (P. 203)। আবার নূতন ক'রে তিনি ছবি আঁকতে সুরু করলেন।

হিটলার মার্ক্সিজম্ ধ্বংস করবেন ঘোষণা করলেন। ভন্ পাপেন রাইখের চ্যান্সেলার পদ ত্যাগ করলেন। হিণ্ডেনবুর্গ হিট্লারকে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু হিট্লার চাইলেন পূর্ণ ক্ষমতা। ফ্রান্সে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হ'ল অ্যামেরিকাকে সমর ঋণ পরিশোধের সমস্যা নিয়ে। হেরিয়ট্ মন্ত্রীপরিষদের পতন হ'ল। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে হিট্লার রাইখের চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হ'য়ে ঘোষণা করলেন : "In four years I will repair the damage done by fourteen years of Marxism"। ওজ্ঁাফাঁ জার্ম্মানিতে নাৎসীজম্-এর এই অভ্যুত্থানে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে লিখলেন : "Look at the crushing defeats that Social-Demecracy, the Second International, has sustained lately. Twelve years ago Mussolini's national fascio made a single mouthful of Italian Socialism. And now the powerful German organisation is in the bag." (P. 215)। সোশ্যাল ডেমক্রাট্ এবং Second Internationalist-দের এই হীন বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নপুংসক মনোবৃত্তি ওজ্ঁাফাঁ ভুলতে পারেন নি। সেইজন্য যখন মিঃ বাট্ একদিন তাঁর কাছে 'Peaceful Socialism'-এর ব্যাখ্যা করছিলেন এবং বলছিলেন যে বিপ্লবকে এড়িয়েও সমাজতন্ত্রের জয় ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তখন ওজ্ঁাফাঁ তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন : "That is...exactly what the German Social Democrats said...You seem to think, as those vanquished people did, that one can parley with the feudal wolves and set them to despoil themselves in favour of the people." (p. 274)। সোশ্যাল ডেমক্রাট্দের বিদ্রূপ ক'রে ওজ্ঁাফাঁ 'Pink Socialists' বলেছেন, 'Red Socialists' নয়। কিন্তু তা হ'লেও ওজ্ঁাফাঁ নিজে নিরাশ হন নি। রাইখষ্টাগ্ অগ্নিকাণ্ডের পর লাইপজিগ্ ফোর্টে বুলগেরীয় কম্যুনিষ্ট ডিমিট্রফের তেজস্বিনী ভাষায় কম্যুনিজম্-এর মর্য্যাদা রক্ষার কাহিনী, ডিমিট্রভের বুদ্ধি, সাহস, বিশ্বাস ও তীক্ষ্ণ যুক্তির সামনে গোয়েরিং ও গোয়েবেল্স্-

সের নির্ব্বুদ্ধিতার প্রকাশ, মেফিষ্টোফিলিয়ান্ নাটকের ট্র্যাজিক্ ফাউষ্ট্ ভ্যান্ ছয় লুবের হাস্যকর ঘটনা, এবং পরিশেষে ডিমিট্রফের ও কম্যুনিজমের জয়ে ওর্জাঁফাঁ যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেলেন। প্যারীর শিল্পীরা সমবেত হয়ে ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ জানালেন। ওর্জাঁফাঁ তখন লিখেছিলেন: "Artist, Writers, Scientists, see what is happening in Germany, think of it. Can you remain neutral ? Close your ranks. Act. Every thought that leads to war is a cancer-thought. A single, united front against the old cancer-thoughts." (p. 210).

এইভাবে ফ্রান্সে, জার্ম্মানিতে, ইংল্যাণ্ডে ও অন্যান্য স্থানে ফ্যাশিজম্-এর বিভীষিকার ভিতর দিয়ে জীবন কাটিয়ে, এবং পাশাপাশি পৃথিবীব্যাপী এই মধ্যযুগীয় স্বৈরাচার ও বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট ও নাশ্যনালিষ্টদের সম্মিলিত সংগ্রামে আশান্বিত হ'য়ে শিল্পী ওর্জাঁফাঁ মানুষের ও সভ্যতার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেন, পুঞ্জীভূত মেঘস্তূপের অন্তরালে তিনি এক নূতন প্রভাতের আলোক দেখলেন, বিরাট মানবতার জয়যাত্রার পদধ্বনি শুনলেন। শিল্প ও শিল্পীর আত্মসমাহিতি, অলস কাল্পনিক জগতে তস্করসুলভ পলায়ন, এ-সব তাঁর কাছে কোন আবেদন আর জানায় না। কোন জলুষ তাদের নেই। সভ্যতার সর্পিল পথের বাঁকে বাঁকে কখন মানুষ থামে, কখন বা দু'-এক পা পিছু হটে, কিন্তু সে-সব নূতন উদ্যমে, নূতন পথে পা বাড়াবার জন্য। ওর্জাঁফাঁও মানুষের সঙ্গে সেইজন্য তাঁর পা মেলালেন। তিনি বললেন: "Prometheus, thy name signifies the foreseeing. Today men are slaves to the narrowest outlook. And most of them have lost the hope that Fire, the Father of machines, Fire, thy Son, O Promethens Inventor and Liberator, had given them. For a few among them have taken sole and selfish possession of Fire, the machine to which it gives life, and the huge forces it sets free". (p. 397)। তিনি মুক্ত প্রমীথিউসের আনন্দ উপলব্ধি ক'রে মানবসভ্যতার জয়ে বিশ্বাসী হলেন—"A hope no longer blind, Prome-

theus, but clear sighted". তাঁর শেষ চিত্রে তিনি কর্ম্ম ও জীবনকে 'protoplasmic shapes' ও 'whites'-এর ভিতর দিয়ে মূর্ত্ত করেছেন। ছবির নিম্নের মূর্ত্তিগুলি স্পষ্ট করা হয়েছে দৃষ্টিরেখার কাছাকাছি ব'লে এবং নীচ থেকে উঁচু দিকে মূর্ত্তিগুলি ক্রমে বৃহত্তর হয়েছে "So as to produce an impression of growth, of 'rising'." ছবিখানার দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখলে যে ঊর্দ্ধগতি বৃত্তাকার অনুভূতি জাগে তা কর্ম্মের ভিতর দিয়ে মানুষের ও সভ্যতার ক্রমবিবর্দ্ধমানতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত জানায়। ছবিখানিকে পরিপূর্ণ জীবনের গতিশীল অনুভূতির সুন্দর অভিব্যক্তি বলা চলে এবং ছবিখানির 'plastic effect'-এর সঙ্গে এই অনুভূতির সামঞ্জস্য আছে।

ওজাঁফাঁর এই জীবন-কাহিনী সমাজ ও শিল্পের ক্রমোন্নতিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, এবং সাময়িক বিষাক্ত পরিবেষ্টনের মধ্যে যাঁরা হয় নৈরাশ্যবাদী হয়েছেন, না হয় দিক্‌ভ্রষ্ট হ'য়ে মনের কোন বন্দরের সন্ধান পাচ্ছেন না, তাদের সকলেরই অনেকখানি মনের খোরাক্ জোগাবে আশা রাখি।

শ্রীবিনয় ঘোষ

Observations on "The Man Behind the Plough"—By Probhanath Singh Ray and Sachin Sen (British Indian Association). One Rupee.

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হচ্ছে জমিদারদের জমায়েৎ। তার পক্ষ থেকে শ্রীযুত প্রভানাথ সিংহ রায় ও শ্রীযুত শচীন সেন খান্ বাহাদুর আজিজুল হকের বই যে নিরপেক্ষ নয় আর সে বইয়ে যে কতগুলো ভুলভ্রান্তি আছে তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য এই যে প্রজাদের অবস্থাকে বিশেষ খারাপ বলা চলে না। আর জমিদারদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটা হচ্ছে অবিচার।

আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের মিষ্টার জষ্টিস্ হোম্‌স্ একবার বলেছিলেন যে

মামলার বিচার করতে হলে সব সময় মনে রাখতে হয় একটা "inarticulate major premiss"— ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোন ক্ষতি ঘটতে না দেওয়া। আজিজুল হক বা তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বই সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে হোম্‌সের ঐ কথাটা মনে পড়ে।

হক সাহেবের বইয়ে যে গলদ নেই তা একেবারেই নয়। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি একটু যত্ন নিয়ে তাঁর মালমশলা গোছাবেন আশা করা যায়—একটা ইন্‌ডেক্স আর পুরোদস্তুর bibliography বিশেষ দরকার।

কিন্তু হক সাহেবের "inarticulate major premiss" হচ্ছে প্রজার মঙ্গল। সিংহ রায় আর সেন মহাশয়ের "inarticulate major premiss" হচ্ছে জমিদারের স্বার্থরক্ষা।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

Dialectical and Historical Materialism—by J. Stalin. National Book Agency. Annas Eight.

মার্কসীয় দর্শনের দিকে আজকাল আমাদের পণ্ডিতদের চোখ পড়তে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ও বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় ভাল বই এখনও তেমন মেলে না। যে কয়েকখানা আছে, তাও দুষ্প্রাপ্য।

জ্ঞানকাণ্ড আর কর্ম্মকাণ্ডকে এক করে ফেলা হচ্ছে মার্কস্‌বাদের বিধান। মার্কস্‌বাদী নেতাকে তাই শুধু কর্ম্মিষ্ঠ হলে চলে না জ্ঞানীও হতে হয়।

সোভিয়েট জনসাধারণের অবিসম্বাদী নেতা জোসেফ ষ্টালিন এই পুস্তিকাতে দুরূহ বিষয়ের যে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে যাদের মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে, তাদের পক্ষে একেবারে অপরিহার্য্য। যাঁরা পণ্ডিত (বা পণ্ডিতম্মণ্য) তাঁরা এ বই পড়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট অবশ্য হবেন না ; এটা প্রধানত জনসাধারণের জন্যই লেখা। কিন্তু এটা পড়লে তাঁদের মনে অনুসন্ধিৎসা

যদি না বাড়ে, তার জন্য দোষী হবে তাঁদের মন আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

সকলের কাছে এই সুখপাঠ্য পুস্তিকাটা সুপারিশ করতে একটুও সঙ্কোচ হয় না।

মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত

The Patriot—By Pearl Buck (Methuen & Co. Ltd.).

গ্রন্থকর্ত্রী নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন চীন দেশীয় জনসাধারণের অন্তরঙ্গ জীবন কাহিনী রচনা করে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী গভীর ও দরদী ; ভাষা সহজ ও সুন্দর। আলোচ্য গ্রন্থে সে সকল গুণই পরিস্ফুট কিন্তু সরল মানুষের মোটা কথার পরিবর্ত্তে এতে চিত্রিত হয়েছে জাতীয়তাবাদের দুর্জ্জেয় সমস্যা।

চীন ও জাপানের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ ও বিসংবাদ হচ্ছে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। সহজবোধ্য ব্যাপার, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে গ্রন্থকর্ত্রী বিসংবাদটিকে দাঁড় করিয়েছেন নিবিড় দাম্পত্য প্রেমের প্রতিপক্ষে। এ দুয়ের সংঘর্ষে যেমন দাঁড়িয়েছে গল্পের সংশয় ও সম্পদ তেমনি দেখা দিয়েছে বিজ্ঞতার প্রয়াস। অনেক উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত ক্ষেত্র হতে। ফলে জাপানী গার্হস্থ্য জীবন ও ভৌগলিক বিবরণে রয়েছে অসংখ্য ভ্রান্তি।

পটভূমিকাটি হচ্ছে গত দ্বাদশ বৎসরের ইতিবৃত্ত। সর্ব্বজনবিদিত হলেও চিত্তাকর্ষক। পটোন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় সাঙ্ঘাই সহরের ছাত্র মহলে উদ্দাম চঞ্চলতা। তখন চিয়াংকাই শেক-এর বিজয়বাহিনী ইয়াংট্সে নদী ঝাঁটিয়ে অগ্রসর হচ্ছে অপ্রতিহত বেগে। শুধু সাঙ্ঘাই কেন, সারা দেশে সহরে সহরে নবীনের দল স্বাধীনতার আশায় ভয় ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে কারাবরণ করে নিচ্ছে ; বধ্যভূমিতে আত্মোৎসর্গ করছে সগৌরব আনন্দে। সে উন্মাদনা ধনাঢ্য য়ু পরিবারের সযত্ন প্রতিপালিত যুবক ই-ওয়ানকে করলো স্পর্শ।

তারা গুপ্ত সভা সমিতির মধ্যে থেকে নিভৃতে যখন সঙ্ঘবদ্ধ ও সচেতন

করে তুলছে শ্রমিকদের, সবে বুঝতে শিখছে সাধনার কাঠিন্য, কাটিয়ে উঠছে দৌর্ব্বল্য, তখন তাদের আশা ভরসা পদদলিত করে তাদেরই অভীষ্ট নেতা চিয়াংকাই শেক পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজব্যবস্থা সংরক্ষণে যত্নবান হলেন। তাঁর রুক্ষ নির্ম্মম শাসনে সাম্যবাদী যুবকবৃন্দ গিয়ে পড়লো দেশের অন্তর্ভাগে দুরাক্রম্য পার্ব্বত্য অঞ্চলে। অনেকে প্রাণত্যাগ করলো মশানে। ধনী-পুত্র ই-ওয়ান পিতার অর্থবলে অব্যাহতি পেয়ে প্রেরিত হলো জাপানে। সঙ্গীরা যখন প্রাণান্ত কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে ছোট ছোট অদম্য গরিলা বাহিনী গড়ে তুলছে, গ্রামে গ্রামে চাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে সাম্যতন্ত্রের বাণী, তখন ই-ওয়ান তার পিতার জাপানি বন্ধু মুরাকীর সুষমাময় আলয়ে থেকে ধীরে ধীরে বিস্মৃত হলো দেশের কথা।

নাগাসাকী সহরটি সুদৃশ্য। পথঘাট বিসর্পিত ও পরিষ্কার। নাগরিকেরা ভদ্র ও স্বল্পভাষী। কুটীরগুলি পরিচ্ছন্ন ও উদ্যান সংলগ্ন। সংবাদ পত্রগুলি অপ্রীতিকর সংবাদশূন্য। রাজপথ ভিক্ষুকবিবর্জ্জিত, রাজনৈতিক বা সামাজিক অসন্তোষ অনুপস্থিত। এ হেন আবহের মধ্যে থেকে ই-ওয়ান-এর অন্তর্ব্বেদনা শান্ত হয়ে এল এবং সে আশ্রয়দাতার কন্যার প্রেমে পড়ে গেল।

বৃদ্ধ মুরাকী বহু বৎসরের কারবারটিকে সচ্ছল রেখে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন। অত্যন্ত রাশভারী লোক, স্বল্পভাষী, উদ্যান, অন্দর ও বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁর সুরুচিপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। তাঁর সান্নিধ্যে ই-ওয়ান স্বতঃই বিনীত হয়ে পড়ে। অতিথি সৎকারে ঔদার্য্য থাকলেও সে সংসারে সঙ্গোপনে আলাপ করা সম্ভব ছিল না। প্রণয় প্রকাশ করা তার অভিপ্রায়ও ছিল না, কিন্তু যখন সে মুরাকীর কনিষ্ঠ পুত্র সহকর্ম্মী কুন্‌জীর কাছে শুনলো যে তার ভগ্নী জনৈক কুৎসিত-মূর্ত্তি প্রৌঢ় সামরিক কর্ম্মচারীর বাগদত্তা তখন তার ধৈর্য্যের বাঁধ গেল ভেঙে।

যুবক যুবতী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলো বহু বাধা বিপত্তির পর। সে বাধার মধ্যে অবশ্য জাতীয় বিদ্বেষ লেশমাত্র ছিল না—ছিল সামাজিক প্রথা। কিন্তু বিবাহের পর, তাদের দাম্পত্য জীবন যখন নিগূঢ় ও দুশ্ছেদ্য প্রেমে আবদ্ধ, পর পর দুইটি শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, পর্ব্বত গাত্রে এলায়িত কুটীরটিকে যখন তারা মনের আনন্দে শান্তিকুঞ্জ বানিয়ে তুলেছে, তখন অত্যন্ত

অপ্রত্যাশিত ও রূঢ় ভাবে প্রতিভাত হলো ই-ওয়ান-এর চিত্তে যে সে বিদেশী শত্রুপক্ষ।

নাগাসাকি নগরটি চীন দেশের নিকটতম বন্দর সংলগ্ন হলেও কোন সংবাদই পৌঁছতো না সেখানে। মধ্যে বুনজী যখন সেনা বাহিনীর সঙ্গে মাঞ্চুরিয়া প্রেরিত হয়েছিল, ই-ওয়ান তখন তার পদে উন্নীত হয়; কিন্তু এবার মুষ্টিমেয় চৈনিক বিপ্লবীকে দমন করবার অভিপ্রায়ে যখন সে সেনাদলকে সাঙ্ঘাই সহরে পাঠানো হলো, বুন্‌জীর পরিত্যক্ত পদ গ্রহণ করলো আর একটি জাপানি কর্ম্মচারী। অধিকন্তু বৃদ্ধ মুরাকীর ব্যবহারে কেমন যেন একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। পিতার পত্র নিয়মিত রূপে আর আসে না। তারপর বুনজী ফিরলো তার খোলা হাসি আর সারল্য পিছনে ফেলে। একদিন মত্ত অবস্থায় সে ই-ওয়ান-এর কাছে বলে ফেল্লে বালিকা ধর্ষণ ও হত্যার কথা। ই-ওয়ান বুঝালো অনেক কিছু কাণ্ড ঘটছে দেশে যার কোন সংবাদই সে পাচ্ছে না। একদিন একটি অনুষ্ঠানের আমোদ প্রমোদ স্তব্ধ হয়ে গেল এমন একটি দুসংবাদে যে ই-ওয়ান এর পক্ষে সামাজিক মর্য্যাদা বজায় রাখা হয়ে উঠলো দুরূহ। কোন গ্রামের আবালবৃদ্ধ নরনারী সমুদায় জাপানি অধিবাসীকে হত্যা করেছে নাকি চীনেরা। কিসের প্রতিহিংসায় এ নৃশংস কাণ্ড ঘটেছে সে সংবাদ অবশ্য আসেনি। এর পর জাপানি বন্ধু ও প্রতিবেশীর বাহ্যিক ভদ্রতার অন্তরালে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ প্রকট হয়ে উঠলো।

বাহিরের আবহ প্রতিকূল হলেও সহধর্ম্মিনীর অক্লান্ত সেবা ও শিশু পুত্রদ্বয়ের নিত্য নূতন চিত্তবিনোদক খেলা তার অন্তরঙ্গ জীবনকে মধুর করে তুলেছিল। তথাপি দেশে ফিরবার জন্য ব্যাকুল হলো ই-ওয়ান, কিন্তু পারলো না। স্ত্রী ধরে বসলো সেও যাবে। তার সরল অন্তঃকরণের উৎকণ্ঠা ও প্রেম উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। কিন্তু ক্রোধান্ধ দেশে জাপানি রমণীকে নিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়।

অগ্রজ ই-কো জার্ম্মানী হতে প্রত্যাগমনের পথে গোপনে সংবাদ দিয়ে গেল যে জাপানিরা তাদের স্বাধীনতা অপহরণ করবার সঙ্কল্প করেছে এবং চিয়াং কাইশেক বাধা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এর পর ই-ওয়ান-এর কর্ত্তব্য নির্ণয় করতে বিলম্ব হলো না এবং একদিন জাহাজের মাল খালাস করবার সময়

একটি দৃশ্য তাকে সকল বাধা হতে মুক্ত করে দিল। জনৈক জাপানি বৃদ্ধ তার একমাত্র পুত্রের ভস্মাবশেষ আলিঙ্গন করে নিঃশব্দে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছিল। তার কাছে সে পেলো দেশপ্রেমের দীক্ষা। এবার তার স্ত্রী কোন বাধারই সৃষ্টি করলো না।

গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ের পটভূমিকা হচ্ছে চীন। ই-ওয়ান-এর পিতা মিষ্টার যু তাঁর ব্যাঙ্কের শাখা প্রশাখা বিস্তার করে-ছিলেন সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ চীন জড়িয়ে। আপন প্রতিভায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ। স্বয়ং চিয়াং ছিলেন তাঁর বন্ধু। তাঁর পিতা জেনেরাল যুর উৎকেন্দ্রিকতা ছিল উপভোগ্য। বহুবিধ সামরিক সাজ পোষাক ও ক্রয়-লব্ধ তক্মা অবলম্বন করে জীবনের শেষ সময়টুকুকে কৃত্রিম জাঁকজমকে এমনই সরগরম করে রাখতেন যে সকলের করুণার উদ্রেক হতো। ই-ওয়ান-এর অগ্রজ ছিল নষ্টচরিত্র। অবশিষ্ট আত্মীয়ের মধ্যে ছিল অহিফেন-সেবী মাতামহী, মাতা ও ক্রীতদাসী পিওনি।

দশ বছর প্রবাস যাপনের পর ই-ওয়ান সকলকে জীবিত দেখলো বটে কিন্তু পূর্ব্বতন ব্যবস্থা সব ওলট পালট হয়ে গেছে তখন। পিওনি পলায়িত। মাতামহী অন্ধ ও বধির। সহরের অনেক সৌধ বিমান আক্রমণে চূর্ণ-বিচূর্ণ। হাট বাজারে উচ্ছৃঙ্খলা।

ই-ওয়ান-এর প্রথম কর্ম্ম হলো দৌত্যকার্য্য। চিয়াং কাইশেক-এর সন্ধিপত্র নিয়ে তাকে বিমান-পথে যেতে হলো সাম্যতন্ত্রী বিদ্রোহী শিবিরে। সেখানে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল শৈশব বন্ধু এন্-লান ও ক্রীতদাসী পিওনির সঙ্গে। অবলা অশিক্ষিতা মেয়েটি নবীন বিপ্লবীদের উৎসাহে আকৃষ্ট হয়ে আশ্রয়দাতার গৃহত্যাগ করেছিল, তারপর আট বছরের অমানুষিক কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে শক্তি অর্জ্জন করেছে অদ্ভুত ভাবে। বিস্মিত হয়ে গেল ই-ওয়ান। আজীবন অর্জ্জিত শিক্ষা-দীক্ষার মাপকাঠি এখানে অচল। ই-ওয়ান-এর কাছে এন্-লান-এর গরিলা বাহিনীর যুদ্ধ-পদ্ধতি, চাতুরী, নিষ্ঠুরতা, সংযম ও সাধনা অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার বলে প্রতিভাত হলো।

পরের ঘটনাগুলি অসংলগ্ন। সংক্ষিপ্তসার দেওয়া সম্ভব নয়। গ্রন্থকর্ত্রী বোধ করি চলচ্চিত্রের চাহিদার কথা স্মরণ করে রচনাটিকে এতখানি দীর্ঘ

করেছেন। প্রকৃত পক্ষে গল্পের সার বস্তুটি মধ্যম খণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ। বাকি বিবৃতি মনোরঞ্জক হলেও অবান্তর।

অকিঞ্চিৎকর দৈনন্দিন ঘটনার দ্বারা নাটকীয় শক্তি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা গ্রন্থকর্ত্রীর আছে তাই ই-ওয়ান-এর দাম্পত্য জীবন সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রেম কাহিনীর মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য হয়েছে। যতবার সে ধাক্কা খেয়েছে জাতীয় বিদ্বেষের, ততবার তার বিদেশী স্ত্রী দেশকালনিরপেক্ষ নারীত্বের মমতা দিয়ে তাকে সেবা করে ভুলিয়ে দিয়েছে সাময়িক ব্যথা। এবং সঙ্গীতের ঊর্দ্ধগামী তানের মত প্রত্যেকটি আঘাত ও প্রশমন উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে উঠেছে।

অনেকগুলি ক্ষণিকের ছবি পাঠকের চিত্তে অবিস্মরণীয় সৌন্দর্য্যের মত লেগে থাকে। স্থান সঙ্কোচের জন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব হলো না।

প্রতি পৃষ্ঠায় শিল্প প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলেও গ্রন্থখানিকে স্বতঃস্ফুট শিল্পসৃষ্টি বলা চলে না। ফরমাশি লেখার যাবতীয় দোষ এতে বিদ্যমান রয়েছে। সেইজন্য ভ্রান্তির এত সমাবেশ। গ্রন্থকর্ত্রী জাপান সম্বন্ধে যতগুলি উড়োকথা শুনেছেন সব কিছুই গ্রন্থবদ্ধ করে নিয়েছেন, ফলে কতকগুলি ভারতীয় সামাজিক অনুষ্ঠান, সাবেকি জাপানি সংস্কার ও অতিআধুনিক বিশ্বমানবীয় চিত্তবিকার পর্য্যন্ত সেখানকার সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের আঙ্গিক সৌষ্ঠব বলে বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ভৌগলিক ও রাজনৈতিক বিবরণেও ভ্রমের অভাব নাই।

অবশ্য জাপানি চরিত্রের মূল সূত্র কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি সেজন্য। ছোট বড় প্রত্যেকটি চরিত্র উপভোগ্য ও নিখুঁত হয়েছে, এবং সকলকেই, মায় ই-ওয়ান-এর সহধর্ম্মিণী তামা পর্য্যন্ত, আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিলীন হয়েছে।

গ্রন্থকর্ত্রী চৈনিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বৃদ্ধ পিতামহ ব্যতীত কোন চীনা চরিত্রই ভাল করে ফোটেনি। অধিকাংশই হয়েছে কথার সমষ্টি। এ ত্রুটির কারণ সহজেই অনুমেয়। অর্থাগমের তৎপরতার জন্য শিল্পসৃষ্টির ব্যাঘাত হচ্ছে আধুনিক ব্যাধি। সর্ব্বব্যাপী বাণিজ্যের প্রভাবে সাংবাদিক সাহিত্যের উৎকর্ষ ও শিল্পকলার অপকর্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে আপেক্ষিক ব্যাপার এবং তারই প্রতিচ্ছায়া এই গ্রন্থে পড়েছে।

আর একটি দোষ হচ্ছে 'মোগা' ও 'মোবো' নামক দুইটি অপ্রচলিত জাপানি কথার বহু প্রচলন। বাক্যদ্বয়ের অর্থ হচ্ছে 'নব্য'। কথায় কথায় নিজেদের 'আধুনিক' বা 'তরুণ' বলে জাহির করবার প্রগলভতা জাপানির মত রক্ষণশীল জাতির প্রতি প্রযোজ্য নয়।

যাই হোক সাধারণ পাঠক গ্রন্থখানি প্রণিধান করে আনন্দ পাবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে মার্কিন পাইলটটি সর্ব্বাপেক্ষা আমোদপ্রদ হয়েছে। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁর স্ত্রীসুলভ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছেন জনৈক ইংরাজ শিক্ষয়িত্রীর গুণ কীর্ত্তনে নতুবা দৃষ্টিভঙ্গীর নির্লিপ্ততা বিস্ময়কর।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জাস্ত্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুলভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৪৭

পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য *

যাঁরা সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ স্বীকারের পর তার রীতি-নীতি আবিষ্কারে তৎপর হন তাঁদের পক্ষে বাঙলা সাহিত্যের নব্যরূপ বিশেষ আলোচনার বস্তু। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যকে যদিও প্রতিভাশালী ব্যক্তির কৃতিত্ব ও দান হিসেবে দেখা চলে, আধুনিক সাহিত্যবিচারে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন হতে বাধ্য। প্রথমত, আমরা সকলেই জানি যে আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনন ও সৃজনীশক্তিকে অনন্যসাধারণ বলা যায়; এবং সমাজ-জীবনের পরিবর্ত্তন ইদানীং এমন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে তার সংঘাত সাহিত্য বহন না করে থাকতেই পারে না। যখন ইংরেজের দৌলতে 'ভদ্র-শ্রেণী' তৈরী হচ্ছিল তখন তার প্রকৃতি লুকান রইল সৃষ্টির অবসরে। এখন সে-সুযোগ অপসৃত, এখন সে-শ্রেণীর অসত্য ও শূন্য-ভবিষ্যতা সচেতন মনে ছাপ পড়েছে, তারই প্রকাশ বাঙলা সাহিত্যের নব্য-পর্য্যায়ে।

কেবল এইটুকুই অবশ্য আধুনিক সাহিত্যের যথেষ্ট ব্যাখ্যা নয়। বাঙলা-সাহিত্যের নিজেরও একটা বেগ ছিল যার পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। সাহিত্যকে বাঙালী মোটামুটি ব্যবহারিক জগতের বাইরেই রেখেছে। লোক-সাহিত্যে নিশ্চয় দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন ঘটেছিল, কিন্তু গত শতাব্দীর প্রারম্ভ

---

* অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রণীত—একমুঠো (ভারতী-ভবন)

সমর সেন প্রণীত—গ্রহণ (কবিতা-ভবন)

নিশিকান্ত প্রণীত—অলকানন্দা (কালচার পাবলিশার্স)

থেকেই তার প্রতিপাত্ত এতই কমে যায় যে আজ তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গবেষণার প্রয়োজন। এই অ-ব্যবহারিকতা রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনায় অ-পার্থিব অ-স্বাভাবিকতায় যে পর্য্যবসিত হয়নি সেজন্য সত্য, আনন্দ, মঙ্গল, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সার্ব্বজনীন সাধারণ মূল্যের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে তাঁর গভীর বিশ্বাসই দায়ী। কিন্তু তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত লেখকের রচনায় এই প্রকার আন্তরিক বিশ্বাস ধরা দেয় না, এবং সেগুলির পরিবর্ত্তে কোনো স্থির প্রতিজ্ঞারও সাক্ষাৎ মেলে না। তাই এই সব রচনায় নানা প্রকার দোষ বর্ত্তাল। তাদের মধ্যে অর্থহীন ছন্দ-সুষমা, সংযমের ও বক্তব্যের অভাব, ও প্রগলভতাই প্রধান।

অতএব বাঙলা সাহিত্যের নতুন রূপের সন্ধান পেতে গেলে সমাজ-বিবর্ত্তনের প্রকাশ, শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা, রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত সাহিত্যের একটি পরিণতির বিপক্ষে প্রতিবাদ, এবং সাধারণ প্রতিজ্ঞায় আস্থার পরিবর্ত্তে অনুকল্প প্রতিজ্ঞা ও তাতে আস্থার ও অনাস্থার প্রকৃতি বুঝতে হবে। সমাজের যে পংক্তির ব্যবহার বঙ্কিমী ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল আজ সেটি ভেঙ্গে বড় হয়েছে, সে-শ্রেণী আজ হতশ্রী হয়ে নিম্নস্তরে অবরোহণ করেছে, অথচ জনগণের সঙ্গে মিশতে পারেনি। যা ঘটেছে গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরে সে কেবল সামাজিক চলিষ্ণুতার হ্রাসবৃদ্ধি, মূলশ্রেণীর অস্তিত্ব বজায় রেখে। (বাঙলাদেশের কলকারখানায় শ্রমিকদলে বাঙালীর সংখ্যা প্রায় শূন্য এবং চাকুরীর অনুপাতে প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী—এই দুটি তথ্য সর্ব্বজনবিদিত।) তবু এই গতিশীলতার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সচেতন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা লেখক তাঁদেরই রচনা নতুন ধরণের। এঁদের ভেতর যাঁরা উর্দ্ধস্তরের মনোভাব লজ্জায় বর্জ্জন করেছেন তাঁদের লেখায় বর্জ্জনের প্রয়াস উগ্র রকমের হলেও কখনও কখনও সংযমের চিহ্ন ও বক্তব্যের গাম্ভীর্য্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা হয়ত 'কবি' নাও হতে পারেন, কিন্তু কবিতা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা যথার্থ এবং সময়োপযোগী। অর্থাৎ ছন্দের চাতুরী ও সুষমাকে তাঁরা কবিতা বলেন না, কবি যে বিকৃত ও বিশেষ পুরুষ একথা তাঁরা মানেন না, কবিত্ব যে জীবনাতিরিক্ত কল্পলোকে পলায়নের প্রক্রিয়া কিংবা তার বর্ণনা তা স্বীকার করেন না, পরন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে কবিতার উৎস কোনো ঐশী আনন্দ কি ঐ প্রকারের কোনো শক্তি নয়, এই সমাজ-জীবনের স্তরের

কোনো ফাটল থেকে উৎপন্ন হয়ে সেটি বেরিয়ে এসেছে সমাজ-বৃক্ষ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে জীবনের সম্পদ-বৃদ্ধি সাধন-কল্পে। তাঁদের কাছে কবিত্ব ব্যবহারিক জীবনেরই সর্ব্বাপেক্ষা সচেতন অঙ্গ। কতটা তাঁরা সার্থক হতে পেরেছেন সেটা পরে বিবেচ্য, অথাতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, কিন্তু পূর্ব্বতন কর্ম্ম-কাণ্ড না আলোচনা করে তাঁদের কবিতা-বিচার কেবল অসম্ভব নয়, অন্যায়। অমিয় চক্রবর্ত্তীর 'এক মুঠো' ও সমর সেনের 'গ্রহণ' এই প্রাথমিক কারণে নব্য সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে। তাঁরা পুরানো কথা বিস্তর কথায় বলেননি, নিরলঙ্কারে, স্বল্প ও কাটাকাটা ভাষায় যা নতুন মনে করেন তাই বলতে চেষ্টা করেছেন, এবং সেজন্য আঙ্গিকের যতটা পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ভেবেছেন তাই আনতে সচেষ্ট হয়েছেন।

আমি কিন্তু অমিয় ও সমরের বক্তব্যের নতুনত্বটুকু ধরিয়ে দিতে অক্ষম। তবে তাঁদের ভাববৃত্তিগুলিকে (moods) যেন চিনি। বিষ্ণু দে তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য পার্থক্য না মেনে উপায় নেই। এক কথায় বলতে গেলে বিষ্ণুর রচনায় 'মেজাজ' আছে, অমিয়র নেই ; সমরের আছে ভাববৃত্তির ঐক্য, যেটা চিত্তবৃত্তির ঐক্য থেকে বিভিন্ন। বিষ্ণুর রচনায় তার নিজস্বতা এতই উগ্রভাবে প্রকট যে তাকে অন্যের ভাবা শক্ত। অমিয়র কবিতায় ঐ প্রকার নিজস্বতা নেই, তাই সন্দেহ হয় তার অনুভাবন অতটা তীব্র নয় যার ফলে কবিতা হিসেবে 'বৃষ্টি' ও 'গন্তব্যে'র মতন উচ্চ শ্রেণীর রচনাও বিষ্ণুর 'ঘোড়-সওয়ারে'র মতন সম্পূর্ণ হতে পারে। আমি জানি নিজস্বতা সব সময় কবিতার পক্ষে সদ্‌গুণ নাও হতে পারে ; বিষ্ণুর একাধিক কবিতায় সেটি ভঙ্গিমায় পরিণত হয়েছে। তার উল্লেখগুলি এতই গুপ্ত, জীবন থেকে এতই বহির্ভূত ও পুস্তকাশ্রিত যে বহু চেষ্টাতেও তাদের সীম্বলের কোঠায় ওঠান যায় না। অত আত্মসচেতনতা আধুনিক কাব্যধর্ম্মের প্রতিকূল। আরো প্রমাণ, তার বক্রোক্তি, যার প্রকৃতিই হল দ্বৈত সম্বন্ধে আত্মবোধের জয় ঘোষণা। তবু আমি বলতে বাধ্য যে বিষ্ণুর ব্যক্তিত্ব-প্রধানতা আত্মসচেতন হলেও আত্মকেন্দ্রিক নয়, বিশ্লেষণ বুদ্ধি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই তার রচনায় কখনও কখনও ধ্রুপদী কাঠিন্য ও সংযমের সাক্ষাৎ পেয়েছি—যেটি অমিয় ও সমর সেনের কবিতায় বিরল। আমার মন্তব্য অনেকে হয়ত গ্রহণ করবেন না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেও introspection স্থান আছে যাঁরা জানেন তাঁরা বিষ্ণুর খেয়ালকে

অনাত্মকেন্দ্রিক বলতে কুণ্ঠিত হবেন না। এই প্রকার কাব্য সাধনার জন্য কঠিন আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন। এখনও বোধ হয় অমিয় খরদৃষ্টি ও ক্ষুরবুদ্ধির প্রয়োগকে কাব্যধর্ম্মের অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন। এটাকে রাবীন্দ্রিক বিশ্বাস বলা চলে।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে অমিয় এখনও মুক্ত নয়। সেটা দোষের কথা নয়। বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক যে সে অতটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এইটাই আশ্চর্য্য। কিন্তু যে কালে প্রভাব পরিত্যাগের প্রয়াস চোখে পড়ছে তখন অমিয়র আধুনিকতাই প্রথমে বিচার্য্য। এই হিসেবে অমিয় ও সমর দুজনেই বিষ্ণুর চেয়ে রাবীন্দ্রিক প্রতিজ্ঞা বর্জ্জন করতে কম সমর্থ হয়েছে। তার কারণ এই: রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার অর্থ তাঁর আদর্শবাদকে অগ্রাহ্য করা নয়, কিংবা তার বদলে বস্তী ও 'বস্তুতান্ত্রিক' সাহিত্য উৎপন্ন করা নয়। গদ্য সাহিত্যে শরৎচন্দ্র থেকে 'কল্লোল', 'কালি কলমে'র দল এবং পদ্যে মোহিতবাবু থেকে সমর সেন পর্য্যন্ত সকলেই সে চেষ্টা করেছেন ও বিফল হয়েছেন। বিষয়বস্তু উলটে দিলেই রবীন্দ্রনাথের ভাঁড়ার খালি করা যায় না। সাধারণ প্রতিজ্ঞার সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষ কখনও জয়ী হতে পারে না। বিশেষ থেকে কবিতার উপযুক্ত কার্য্য-বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বিশেষকে নিয়মাবদ্ধ করতে হয়, সে-নিয়মের রীতি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে হয়। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে গেলে অন্তরে বিশ্লেষণ-বুদ্ধি ও তার যুক্তিতে বিশ্বাসকে অধিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই তাঁর সর্ব্বজনবিদিত লিরিক মনোভাব, তাঁর তুলনা-উপমার প্রাচুর্য্যের বদলে বাক্য-ধর্ম্মী ও গতিপ্রাণ কবিতা রচনা সম্ভব হবে। আধুনিক কোনো সাহিত্যিকের রচনায় পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তের সন্ধান পাইনি—এক সুধীন্দ্র দত্ত ছাড়া। তবু তার প্রতিজ্ঞায়, অন্তত আমার মতে, যুক্তির গলদ আছে। যুক্তিতে বিশ্বাস ও যুক্তির সম্পূর্ণতা বিভিন্ন বস্তু, তাই সুধীন্দ্রের রচনায় আমি নিট্‌শীয় দোষগুণ খুঁজে পাই। চক্রবৎ বিঘূর্ণন যদি যুক্তিসঙ্গত হত তবে সুধীন্দ্রের কবিতায় শ্রান্তির বদলে শান্তি পেতাম, প্রতিবাদী মনোভাবের বদলে নিশ্চয়াত্মক দার্ঢ্যের পরিচয় মিলত। সে যাই হোক—পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসের ফলে আধুনিক কবি হয়ত স্মরণীয় হতেন না। তাতে দুঃখ কিসের। আধুনিক মানুষ ত' হতেন। সেটা কিছু কম কথা নয়। আধুনিক কবির অন্তত আধুনিক মানুষ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

আধুনিক সাহিত্যবিচারের একটি প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা এই যে আজকালকার সাহিত্যিক তৃতীয় শ্রেণীর লেখক যাঁরা প্রাণপণে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করতে চাইছেন, অথচ যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুকরণের জন্য তৃতীয় শ্রেণীতেই রয়ে গেলেন। অর্থাৎ, as in politics so in poetry, good government is no substitute for self government। অবশ্য আমরা তৃতীয় শ্রেণীর লেখক মানতে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত বাধা অভিমান নয়, অনুকরণের অনায়াস এবং স্বাধীনতা সাধনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞতা। তাই আজ অনেকেই অমিয় ও সমরের মতন আঙ্গিকের নতুনত্ব দেখিয়েছেন, বিপ্লবী কথাবার্ত্তা কয়েছেন, তবু রবীন্দ্রোত্তর নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি।

আঙ্গিকের অভিনবত্ব সম্বন্ধে একটি কথা বলতে চাই। কি দেশী, কি বিদেশী বর্ত্তমান সাহিত্যে সাধারণ প্রতিজ্ঞায় আস্থার পরিবর্ত্তে অবচেতনাকে গ্রহণ করা হচ্ছে। সেজন্য অবশ্য অবচেতনাস্থিত দমিত প্রবৃত্তির স্ফুরণে সমাজ-জীবনের পরিবর্ত্তন সম্ভব এই ধারণাই দায়ী। অবচেতনা থেকে সাহিত্যিক দুটি জিনিষ প্রত্যাশা করেন, আঙ্গিকের দিক থেকে ইমেজ ও সীম্বল, এবং রচনারীতির বেলা ভাবধারার একটি নতুন সম্পর্ক। ইমেজ অনেকটা বুদ্‌বুদের মতন যার রঙের বাহার সত্যই চির নূতন ও যার সারি-গাঁথা অন্তঃশীল জীবন-স্রোতের পরিচায়ক। সীম্বল আরো ঘন, আরো স্থায়ী ও এতই দানা-বাঁধা যে তার সংহতির শক্তিতে প্রতিবেশী ভাসমান ভাবগুলি তার ছকের মধ্যে অতি সহজেই বিন্যস্ত হয়। জাতীয় সমগ্র-অবচেতনা থেকেই সীম্বল আহরণ প্রশস্ত, যেমন নিশিকান্তের কবিতায়। যে-কবির তার সঙ্গে যোগ বেশী তার সীম্বল ততই ভাবোত্তেজক। অতএব এখানেও সমাজবোধের প্রয়োজনীয়তা থেকে পরিত্রাণ নেই। কিন্তু সীম্বল-ইমেজ ব্যবহারের দ্বারা সাহিত্যিক বিপ্লব-সাধনা নাও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অবচেতনা বিপ্লবী সেনার শিবির নয়, তাকে চেতনা দিয়ে খোঁচালে তবে সে বিদ্রোহীর রসদ যোগায়। লোক-সংগ্রহ যেমন স্বভাবত পুরাতন-পন্থী, তাকে প্রগতিশীল করবার জন্য তাকে সচেতন করা ছাড়া যেমন অন্য উপায় নেই, তেমনই অবচেতনাস্থিত ইমেজ ও সীম্বলগুলির মধ্যে একটা পূর্ব্বজানুকরণ বৃত্তি থাকে, যাকে খণ্ডন করতে এক সচেতন-বুদ্ধিই সমর্থ। সচেতন-বুদ্ধি অর্থে কেবল নির্ব্বাচন-শক্তি বলছি না, সমাজ-বোধ উল্লেখ করছি।

তার অভাবে, নিশিকান্তর কবিতায় গভীর অর্থপূর্ণ সীম্বল থাকলেও, তিনি 'আধুনিক' কবি নন। ব্যাপারটা এই : অবচেতনার প্রক্রিয়া যান্ত্রিক নিয়মে চলে, কারণ, এক একটি বৃত্তি এক একটি বিশেষ কর্ম্মের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, সে কর্ম্মধারা রুদ্ধ কিংবা অবান্তর হলেও তার প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে সময় লাগে, ততদিন গুদোম ঘরই রয়ে যায়। তাই দেখি যে-সব রচনায় অবচেতনা আধিপত্য বিস্তার করেছে তার মধ্যে প্রকৃত সৃষ্টির নিদর্শন কম। এই হিসেবে অমিয় ও সমরের ইমেজ বর্ত্তমান সমাজের প্রতিবিম্ব হলেও নবজীবনের উপযোগী নয়। যদি হত তবে বলতাম যে তাঁরা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাই আপাতত অমিয় ও সমরের কবিতা সাহিত্যাগারের মানসিক পরীক্ষাই থাকল।

পূর্ব্বে আমি অবচেতনার সাহায্যে রচনা-রীতিতে ভাবধারার নতুন সম্পর্ক স্থাপন উল্লেখ করেছি। ভাব পুরাতন, ধারাটি ও সম্পর্কটি নতুন। তবে ভাবের মধ্যেও কারিগরী দেখান যায়, এবং ধারাও সেই চিরপরিচিত সহচারী ধারায় আটকে যেতে পারে। রচনার কৃতিত্ব সম্পর্ক-স্থাপনে। এ সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে সেটি বুদ্ধিগত যুক্তিতর্কের অতিরিক্ত। ভাবানুষঙ্গ তর্কনীতি মেনে চলে না বলেই অনেকের মতে কবিতা অর্থহীন এবং রসবস্তু। আমার মতে এই কথাটাই অর্থহীন। ভাবধারাও একটা শক্ত নিয়মে বাঁধা, তার খোঁজ য়্যারিষ্টটল না দিলেও অন্যে দিয়েছে। কথাপ্রয়োগে অর্থ নিহিত থাকতে বাধ্য, নচেৎ গান গাইলেও চলত, যদিচ গানেও অর্থ আছে রীতিমত। যার ব্যাকরণ আছে তারই অর্থ আছে। ভাল nonsense verse, limerick কেউ লিখুন দেখি। আমরা সে ব্যাকরণের নিয়মকানুন জানি না, অর্থাৎ আমাদের ভাষায় কুলোয় না এই পর্য্যন্ত। তাই বলে আমাদের অজ্ঞতা ও ভাষার অক্ষমতাকে রসবস্তু প্রভৃতি গালভরা নাম দেওয়া মনের জুয়াচুরী ও সুবিধাবাদ মাত্র। সে যাই হোক, এটা মানতেই হবে যে নতুন নতুন সীম্বলের যোগস্থাপন পুরাতন রচনাপদ্ধতিতে চলে না—নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন নতুন সীম্বলের প্রকৃতিতেই বর্ত্তমান। তাই যখন দেখি নিশিকান্ত সীম্বল-ব্যবহার সত্ত্বেও রাবীন্দ্রিক পদ্ধতিতে আশ্রয় নিচ্ছেন তখন মনে সন্দেহ ওঠে যে হয়ত তাঁর সীম্বল সেই পুরাতনেরই ভাঙ্গাগড়া, কিংবা হয়ত প্রকৃতপক্ষে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই সাহিত্যিক অনুচর। অবশ্য আমার পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের সীমা সম্বন্ধে আমি সচেতন। অধ্যাত্মজগতে

সীম্বলের প্রকৃতি অন্য প্রকারের হতে পারে আমি মানি। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে ভাবি, আত্মা কি রাবীন্দ্রিক ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষায় প্রকাশ পায় না? উপনিষদ ও গীতার সাহিত্যিক রচনা-নীতিও কি রাবীন্দ্রিক?

অবশ্য রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে মুক্তিটাই একমাত্র বিচার্য্য নয়। যখন প্রয়াস দেখি তখনই সেটা আলোচনার সামগ্রী। যেখানে প্রয়াস নেই কিংবা কম সেখানে আধুনিকতার মানদণ্ড সমাজবোধ, কিংবা বিশ্ববোধ। দুটো পরস্পরকে সমর্থন করলে রাজযোটক, নচেৎ যা পাওয়া যায় তাইতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সমর সেনের কবিতায় মুক্তির আয়াস নেই। তার কারণ নয় যে সে মুক্ত। সমরের কাব্যাগ্রহ প্রধানত সামাজিক। যার প্রতীক এই কোলকাতার জীবনযাত্রা, সেই ব্যর্থতার প্রতিভূ হিসেবে তার কবিতার একত্ব। আমার বিশ্বাস পূর্ব্বকথিত সামাজিক mobility-র সীমাবোধ তার কবিতায় সব চেয়ে বেশী সুন্দরভাবে ফুটেছে। কিন্তু এইখানে আমার বক্তব্য আছে। ব্যর্থতাবোধ-জনিত ভাবের ঐক্য ও সীমাবোধের ঐক্য, দুটিই অতি সহজে নতুনত্বের ও প্রাচুর্য্যের প্রতিকূল হয়ে ওঠে। তাই ঘটেওছে। সমরের প্রথম কবিতা পড়ে উল্লসিত হই, প্রথম কবিতা-সংগ্রহ পড়ে প্রশ্ন ওঠে এইবার কোন ধার, দ্বিতীয় পুস্তকে সে-প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। 'গ্রহণে'র দু-একটি লাইন ছাড়া এমন কোনো প্রমাণ পেলাম না, বক্তৃতার প্রমাণ, উচ্ছ্বাসের প্রমাণ বলছি না, যাতে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে সমরের ব্যর্থতাবোধের অন্তরে একটা নঙর্থক সমাজবোধ থাকলেও তার পিছনে একটা কোনো না কোনো প্রকারের বিশ্বোপলব্ধি আছে। যেমন বিশ্ববোধ হয়ত সমাজবোধের অভাবেও স্পষ্টভাবে সুধীন্দ্র দত্তের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে তার অন্যায়ের বিপক্ষে একটা ভীষণ জাতক্রোধে—indignation-এ এবং যার একান্ত অভাবের প্রমাণ বিষ্ণুর তিক্ততায়। সুধীন্দ্রের বিশ্ববোধ আমার নয়, সেটা তার সমাজবোধের দ্বারা সমর্থিত নয়। যে চক্রবৎ পুনরাবৃত্তিতে বিশ্বাসী সে ভিন্ন-ধর্ম্মী, সে বিশ্ববোধ সমাজবোধের অপূর্ণতায় উগ্র ব্যক্তিত্ববাদ, নীট্শীয় অবতারবাদ। তবু তার বিশ্ববোধ আছে, আর কারুর নেই, এই জন্য তার কবিতা আমাকে স্পর্শ করে, যদিও আমার যুক্তিধারাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে। অর্কেষ্ট্রা ও ক্রন্দসীর লেখক ব্যর্থতাকে জীবনের প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন, তিনিও

সীম্বল ব্যবহারে কৃপণ নন; কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যর্থতা থেকে মুক্তির আগ্রহকে বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্ববোধে পরিণত করবার চেষ্টার দরুণ তাঁর হতাশা সার্থক। ব্যর্থতাবোধ এ-যুগে স্বাভাবিক; তাই বলে সেটা আধুনিকতার নিদর্শন হতে হবে কিংবা নঙর্থকই হতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আধুনিক ও সদর্থক বিশ্বাসে তাকে পরিণত করবার জন্য দুটি জিনিষ সাহায্য করে, সামাজিক বিপ্লব, কেবল mobility-র গতিহার বৃদ্ধি নয়, এবং ভীষণ প্রকারের দৃঢ় শিক্ষা ও সংযম। প্রথমটি আমাদের নেই, তাই কোনো কবিকে ব্যর্থতার জন্য দোষী করি না, কিন্তু ঠিক সেই জন্যই দ্বিতীয়টির প্রয়োজন বেশী। অমিয় ও সমর এই অধিক প্রয়োজন স্বীকার করেন না। সুধীন্দ্র করেন, তাই হয়ত তার রচনা দুর্ব্বোধ্য ঠেকে, কিন্তু সেই জন্যই তার 'প্রতিপদ', 'উটপাখী', 'জেসন' প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রোত্তর কবিতা। আজ যদি তার ব্যক্তিত্ববোধ পৌরুষে অবস্থিত না হয়ে পুরুষে পরিণত হত তবে তার রচনায় আমি অন্তত শান্তি পেতাম। এই পরিবেশে আজকালকার সব কবিতারই তাগিদ অভিমান। অবশ্য কারুর বা মেয়েলী, কারুর বা পুরুষালী। কিন্তু সব অভিমানই অ-সামাজিক। কেউ অভিমানকে বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাসবোধে পরিণত করেন, কেউ বা তাকে মেজাজে বদলান। সর্ব্বত্রই সেই সমাজবোধের অভাবে একটা ভীষণ অপূর্ণতার ছাপ জ্বল জ্বল করছে। সে-অভাব যতদিন না ঘুচছে ততদিন রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের সম্পদ আমার কাছে মোহন হলেও খুব মূল্যবান নয়।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পোষ্ট-মর্টেম

অমূল্য রায় আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার পার্থিব সুখের অভাব ছিল না তবু সে কেন আত্মহত্যা করিয়া মরিল, কেহ তাহা জানে না। তিন দিন পরে তাহাকে সহর হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী একটি ঘন জঙ্গলের মধ্যস্থিত পুষ্করিণীতে পাওয়া গিয়াছিল। পোষ্ট-মর্টেম করিবার জন্য পুলিশ সেই শবদেহ হাসপাতালে লইয়া আসিয়াছে।

রোগা অমূল্য রায় ফুলিয়া একেবারে ঢোল হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে চামড়া পচিয়া খসিয়া পড়িয়া রক্তাভ গলিত মাংসকে প্রকাশ করিতেছে, দক্ষিণ উরুতে ইঞ্চি চারেক লম্বা একটি বড় ফোস্কা ; দেহটা নীল কালির মত, চুলগুলি যেন আলকাতরার প্রলেপের মত জমাট, ডান চক্ষুটা বোধ হয় মাছে ঠুকরাইয়া খাইয়াছে ; একটি হাত পাথরের খাট হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মনে হয় বক্র আঙ্গুলগুলি মেলিয়া সে যেন কাহাকেও ধরিতে চাহিতেছে, নাকের পার্শ্বে একটি গভীর শ্বেতাভ ক্ষত এবং সমস্ত দেহটা সম্পুর্ণভাবে নগ্ন।

নিরঞ্জন ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতে দেখিতে ইউক্যালিপ্টাস তৈল-সিক্ত তুলা নাকে চাপিয়া ধরিল। পচা ও গলিত মাংসের অত্যুগ্র, উৎকট দুর্গন্ধ নাকে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেহ মুহূর্ত্তে অস্থির করিয়া তুলিল, মনে হইল যেন প্রত্যেক তন্ত্রীগ্রন্থি বাহির হইয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে ভাবিতে লাগিল, অমূল্য রায় কেন আত্মহত্যা করিয়াছে ? তাহার ত' কিছুরই অভাব ছিল না ? অমূল্য রায়ের স্ত্রী স্বামীর এই বীভৎস, নগ্ন আকৃতি দেখিতে পাইলে অতীত প্রেমের রাত্রিগুলির কথা স্মরণ করিতে পারিবে কি ? অমূল্য রায় কিন্তু সব দিক ভাবিয়া মরিয়াছে ; স্ত্রীকে সে প্রায় সপ্তাহখানিক পূর্ব্বে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সে আত্মহত্যা করিল কেন ?

নিরঞ্জন একটু সরিয়া আসিল। কেমন যেন ভয় করে। টিউশানী শেষ করিয়া সে যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন বিকাশ ও আরও জন দশেক তাহাকে রাস্তায় দেখা হওয়ায় ডাকিয়া লইয়া আসিয়াছে। যৌবনের রক্ত তাহাদের

দেহে, তাই ডোমের হস্ত হইতে একটি পরিচিত হিন্দুর শবদেহ বাঁচাইয়া তাহারাই দাহ করিবে স্থির করিয়াছে।

কিন্তু কতক্ষণ আর নিরঞ্জন দূরে সরিয়া থাকিবে? অমূল্য রায়ের গলিত দেহের ছবি সাপের মত তাহার মাথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া সে আবার গিয়া দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। একজন ডাক্তার ও একজন ডোম ঝক্‌ঝকে অস্ত্র হাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শবব্যবচ্ছেদ হইবে।

একটু পরেই ছুরি চলিল। পেটের দিকের পুরাতন কাপড়ের মত চামড়া কাটিয়া ছুরি চলিল, নাড়ীভুড়ী ও জলীয় রক্তাভ পদার্থ গলগল করিয়া বাহির হইতে লাগিল। বুক চিরিল—হলদে আর লালচে রংয়ের ফুসফুস। তারপরে মাথা। হাতুড়ীর মত একটি যন্ত্রের আঘাতে খুলি খুলিয়া পশ্চাৎ দিকে হেলিয়া পড়িল আর সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ, পচা ঘিলু গড়াইয়া পড়িল। দুর্গন্ধে ভরাট কক্ষ। দেখিতে দেখিতে নিরঞ্জনের চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম হইল।

শবদাহ-কার্য্য সারিয়া বাড়ী ফিরিতে নিরঞ্জনের প্রায় পাঁচটা বাজিয়া গেল। সারা দেহে অসহ্য বেদনা, অত্যন্ত ক্লান্তি। মা বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন, দিগম্বর ছোট ভাইটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাইতে চাহিতেছিল।

তাহাকে দেখিয়া মা বলিলেন, "কোথায় ছিলি বল্‌ত এতক্ষণ? ভাবনায় না পারি খেতে, না পারি কোনও কাজ করতে, পথ চেয়ে চেয়ে দিন গেল। কোথায় ছিলি—ওমা, কাপড় জামা যে সব ভিজে! এই শীতের দিনে—ব্যাপার কি?"

ক্ষুধায় আর ক্লান্তিতে নিরঞ্জন টলিতেছিল, কেমন যেন একটি তন্দ্রাতুর ভাব তাহার দেহ ও মনে। সে কোনও উত্তর দিল না।

মা আবার প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় গিয়েছিলি, হ্যাঁরে?"

ক্লান্তকণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "মরা পোড়াতে।"

"কে মারা গেল?"

"অমূল্য রায় বলে একজন লোক আত্মহত্যা করেছে।"

"ওমা! কেন?"

"কেন তা কেউ জানে না। এখন আমায় আর কিছু জিজ্ঞেস করো না মা, কিছু ভাল লাগছে না।"

মা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

"যা যা কাপড় ছেড়ে খেতে আয় তবে, ভাত ঢাকা আছে—যা—"

নেশাখোরের মত নিরঞ্জন হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় বদলাইয়া খাইতে বসিল। চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন ঘোলাটে মনে হইতেছে, আলোটাকে অস্পষ্ট বোধ হয়। খাইতে খাইতে মায়ের পায়ের দিকে নজর পড়িল। সারাক্ষণ জলের মধ্যে কাজ করিতে করিতে পায়ের তলা ও আঙ্গুলের পার্শ্বদেশ হাজিয়া থক্‌থকে ঘায়ের মত হইয়া গিয়াছে, অনেকটা অমূল্য রায়ের শবদেহের গলিত মাংসের মত।

গ্রাস তুলিতে গিয়া সে পচা মাংসের গন্ধ পাইল, হাত থামিয়া গেল। খাবারের মধ্যে কি পচা মাংস রহিয়াছে? বমি চাপিতে চাপিতে নিরঞ্জন উঠিয়া পড়িল।

মা আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আর খেলিনে?"

"না মা, আর খেতে ভাল লাগছে না।"

"সেকি! সারাদিন খাস্‌নি আর ঐ চাট্টি ভাত—"

নিরঞ্জন নিরুত্তরে নিজের ঘরে গিয়া একটি বই খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছুই মাথার মধ্যে ঢুকিল না, অক্ষরগুলি হঠাৎ যেন দুর্ব্বোধ্য, রহস্যময় হইয়া উঠিল। মস্তিষ্কের প্রত্যেক কোটরে কোটরে কিলবিল করিতেছে অমূল্য রায়ের আত্মহত্যার কথা।

কখন সন্ধ্যা হইয়া রাত্রি হইল, রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইতে চলিল, বাড়ীর সকলে কখন ঘুমাইল, চতুর্দ্দিকের জঙ্গলে অন্ধকার আর নিঃশব্দতা কখন ভারী হইয়া উঠিল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। একবার মা আসিয়া তাহাকে আবার খাইবার জন্য ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু সে খায় নাই। একই ভাবে সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বারংবার তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল যে এই জীবন অর্থহীন—এক ঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন কতকগুলি ক্রিয়ার যন্ত্রের মত পুনরাবৃত্তি। বিদূষকের হাসির মত মিথ্যা। তিলে তিলে পলে পলে অবশ্যম্ভাবী পরিণামে পৌঁছিয়া লয়প্রাপ্ত হওয়ায় কি লাভ।

গাছপালা মর্ম্মরিত করিয়া দক্ষিণের জানালা দিয়া কক্ষে বাতাস প্রবেশ করিল। বাতাসে ইউক্যালিপ্টাস তৈল আর পচা নরমাংসের দুর্গন্ধ। নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। বাতি নিভাইয়া ঘুমাইতে গিয়া মনে হইল একটি নগ্ন গলিত শব যেন তাহারি পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ভয়ে সে ঘামিতে লাগিল।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল। নিরঞ্জন যেন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। বেশী কথা সে কোনদিনই বলে না, আজকাল সে আরও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। সব সময়েই যেন চিন্তামগ্ন। অমূল্য রায়ের কথা আজকাল আর মনে পড়ে না। জীবন তাহার কাছে অর্থহীন মনে হইতেছে শুধু, কিছুই ভাল লাগে না।

মা একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হারে নিরু, তোর কি হয়েছে বল্‌ত ?"

জোর করিয়া হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "কৈ কিছু না তো।"

মাসখানিক কাটিয়া গেল। নিরঞ্জনের ,বাড়ীতে ভাল লাগে না। মনের বল আর ধৈর্য্য যেন ফুরাইয়া গিয়াছে। মায়ের যন্ত্রের মত মূকভাবে কাজ করা, দুঃখময় জীবনের অব্যক্ত বেদনা ; পিতার বিষণ্ণ নীরবতা, ব্যর্থ জীবনের শীর্ণ মূর্ত্তিমান আকৃতি ; ছোট ভাইবোনদের দারিদ্র্যজনিত অর্দ্ধ-নগ্নতা, চিরন্তন ক্রন্দন আর অভাব দোষে পশুর মত লোলুপতা—সে সহ্য করিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্র বলিয়াই সে এখনো কোনও উচ্চপদস্থের নজরে পড়ে নাই যাহাতে একটি চাকুরী লাভ হয়, তবে—একটি প্রফেসারীর সম্ভাবনা আছে। হয়ত হইতেও পারে। যতদিন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত না হয় এই টিউশানী। কিন্তু কিছুই করিতে আর ভাল লাগে না, ইচ্ছা করে না, অর্থহীন জীবনের গোড়ায় জলসিঞ্চন করিয়া কি লাভ ? অতএব কি করিবে সে ? এই ক্লান্তিকর পারিপার্শ্বিক ত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াইয়া আসিলে মন্দ হয় না। হয়ত তাহার কোনও মানসিক ব্যাধি হইয়াছে, নূতন আবহাওয়ায় হয়ত তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। টাকা পনের না হয় সে জন্য সে ধার করিবে। ইহা হয়ত বিলাসিতা হইয়া পড়িবে, কিন্তু তাহার আর এ জায়গা ভাল লাগিতেছে না। একটু পরিবর্ত্তন তাহার এখন নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় যাইবে।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ সে তপতীর একটি চিঠি পাইয়া গন্তব্যস্থল ঠিক করিয়া ফেলিল। বহুদিন পরে তপতী চিঠি লিখিয়াছে, জানিতে চাহিয়াছে নিরঞ্জন কেন তাহাকে চিঠি লেখে না। তপতী নিরঞ্জনকে ভালবাসে।

সে তপতীকে ভালবাসে, না ভালবাসিত? নিরঞ্জন ভাবিতে লাগিল। সে উদ্দামতা, সে স্বপ্ন এখন আর তাহার নাই। সে দিন চলিয়া গিয়াছে, যখন দরিদ্র যুবক সকলের ঈর্ষাভাজন হইয়া বড়লোকের মেয়ে তপতীর সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, প্রেমও লাভ করিয়াছিল। এক বৎসর আগেকার নিরঞ্জন এখন বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সন্দেহও হয়। নিজের মনের খবর মানুষ কতটুকুই বা জানে?

তপতী এলাহাবাদ হইতে চিঠি লিখিয়াছে। তাহার কাকা, যিনি বর্ত্তমানে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তপতীকে লইয়া রাজগীরে স্বাস্থ্য বদলাইতে আসিবেন, কারণ তাঁহার বাতের পক্ষে নাকি জায়গাটি ভাল। বহুদিন যাবৎ তাহাদের দেখা হয় নাই, তপতীর মন খারাপ, তাই সে নিরঞ্জনকে রাজগীরে আসিতে লিখিয়াছে। তা ছাড়া অনেক কথা নাকি তাহার বলার আছে।

চিঠি পড়িয়া নিরঞ্জন হাসিল। দরিদ্র প্রেমিককে রাজকন্যা ভোলে নাই। ভাল।

বড়দিনের ছুটিতে সে রাজগীরে যাইবে স্থির করিল।

সকাল বেলা যাওয়ার সময় মায়ের ব্যস্ততা দেখিয়া করুণায় মন ভরিয়া উঠিল। মা বলিলেন, "ওখানে কিন্তু শীতটা অনেক বেশী, ঠাণ্ডা লাগাস্‌নি বেশী, দাঁড়া তোর খাবারটা বেঁধে দিই। গিয়েই একটা চিঠি দিস্‌, বুঝলি?"

নিরঞ্জন একদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শীর্ণা মা আর বেশীদিন বোধ হয় বাঁচিবেন না।

বাবা সেই সময় বেড়াইয়া ফিরিলেন, তাহাকে প্রস্তুত দেখিয়া বলিলেন, "সময় হয়েছে বুঝি? তা, আয় গে ঘুরে, জায়গাটা ভালই। ফিরবি কবে?"

"দিন দশেক পরে।"

ছোট বোন মণি বলিল, "আর কয়েকদিন পরে গেলে সোয়েটারটা পরে যেতে পারতে দাদা—"

"আর কত বাকী ?"

"আরও দু'তিন দিন লাগবে।"

"এসে পরব।"

ছোট ভাই বিনু আসিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

নিরঞ্জন পকেট হইতে একটি আনি বাহির করিয়া তাহার হাতে গুজিয়া দিল, বিনুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

খাবারের পুঁটলিটা দিবার সময় মা ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন, "কিছুদিন পরে ওঁকেও রাজগীরে পাঠিয়ে দেব। চেহারা দেখেছিস ওঁর, কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছেন ? আর দিনরাত বসে বসে কি যে ভাবেন শুধু—"

নিরঞ্জন একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, "আর তুমি মা ?"

মা হাসিলেন, "আমার বাবা ওসব সখ ফুরিয়েছে, তোরা এখন সুখী হ', আমিও মরি, আর কিছুই আমি চাই না।"

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে নিরঞ্জনের চোখে জল আসিল। এই মিথ্যা জীবনে একি মায়ার বন্ধন ! এই স্নেহ, এই প্রেম কি সত্য ?

ষ্টেশনের কাছাকাছি বিকাশের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরের দিন বোম্বাই যাইবে, সেখান হইতে লণ্ডন।

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "গিয়ে ভুলে যাবি না তো রে ?"

বিকাশ হাসিয়া উত্তর দিল, "প্রত্যেক বন্দর থেকে যাবার সময় একটা করে আর ওখানে গিয়ে প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি দেব বন্ধু—ভয় নেই, ভুলব না।"

ষ্টেশনে আসিয়া বিকাশ বিদায় লইল, নিরঞ্জন গাড়ীতে চড়িল।

রাজগীরে পৌঁছাইয়া সে একটি ধর্ম্মশালায় উঠিল। স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভীড় আর কোলাহলে ধর্ম্মশালা সরগরম।

সন্ধ্যার সময়ে সে কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে বেড়াইতে গেল। উপরে উঠিয়া নাটকীয় ভাবে তপতীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। একটি বই হাতে তপতী বসিয়াছিল। সে তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাহারও মুখ হইতেই কিছুক্ষণের জন্য কথা বাহির হইল না। এ যেন

নূতন করিয়া পরিচয় হইতেছে। নিষ্পলকনেত্রে তাহারা দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তপতী তাহার কাছে আসিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "এসেছ যা'হোক, আমি ভাবলাম চিঠি যখন লেখ না, আসা ত দূরের কথা, একেবারে ভুলেই গেছ হয়ত।"

নিরঞ্জন হাসিল।

তপতী হাসিয়া বলিল, "যাক্, ভোলনি তাহলে ?"

নিরঞ্জন এতক্ষণে কথা বলিল, "গরীবেরা কোনও দিন দাতাদের ভোলে না।"

তপতী হাসিয়া উঠিল, "একেবারে নভেলী নায়কের মত কথা বল্‌ছ যে! আমি দাতা! কেন ?"

"কারণ তুমি আমায় দিয়েছ প্রেম, যা পৃথিবীতে একমাত্র লোভনীয় জিনিষ।"

"কেন, পৃথিবীতে আর কোনও লোভনীয়, সুন্দর জিনিষ কি নেই ?"

নিরঞ্জন আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "হয়ত আছে, কিন্তু আমার কাছে তা কিছুই ভাল লাগে না।"

তপতী তাহাকে একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, তোমায় রোগা রোগা দেখাচ্ছে, কোনও অসুখ হয়েছিল নাকি ?"

"না তো।"

তপতী হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল, "এসো ওখানে গিয়ে বসি, বসে তোমায় দেখি, কতদিন তোমায় দেখি নি।"

নিরঞ্জন হাসিল, পরে প্রশ্ন করিল, "তোমার কাকা কেমন আছেন ?"

"ভালই, চলো একটু পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।"

"কিন্তু তুমি যে একলা এখানে এসেছ, তোমার ভয় করে না।"

"কেন মেয়েদের সাহস ত' তোমাদের চেয়ে কম নয়।"

"ওঃ—"

দুইজনে মুখোমুখি বসিল। তপতী নিরঞ্জনের একটি হাত টানিয়া লইল। তপতীর শুভ্র, নরম হাতের উষ্ণস্পর্শে কিন্তু নিরঞ্জনের দেহে পূর্ব্বের মত শিহরণ জাগিল না, রক্তে দোলা লাগিল না।

অপূর্ব্ব সুন্দরী তপতী আরও সুন্দরী হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে চক্ষু যেন

ঝলসিয়া যায়। ঘনপল্লবে আবৃত কৃষ্ণচক্ষুর গভীর দৃষ্টি মর্ম্মস্পর্শ করে, রহস্যময় মনে হয়।

প্রাণপণে নিরঞ্জন চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে সে এই সাক্ষাতের জন্য, তপতীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আনন্দিত হয়, কিন্তু পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল। জীবন অর্থহীন ও দুঃখময়, কিন্তু এই প্রেম, এই ভাবগভীর চাহনি, এই অস্ফুট গদগদ ভাষা,—এসবও কি মিথ্যা, অর্থহীন ?

তপতী পরম লোভীর মত তাহাকে দেখিতেছিল। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ নিরঞ্জনের টানাটানা চক্ষে একটা গভীর ক্লান্তির ছায়া, সে প্রশ্ন করিল, "কথা বল্‌ছ না যে ?"

হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নিরঞ্জন উত্তর দিল, "বলার মত কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।"

তপতী হাসিয়া তাহার হাতে মৃদু চাপ দিয়া বলিল, "তোমার কোনও চাকরী হল ?"

"না, এখনও কিছুই পাইনি, তবে একটা প্রফেসারীর সম্ভাবনা আছে।"

তপতী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খানিক পরে একটু সঙ্কোচের সহিত মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আমার বিয়ে নিয়ে কাকা বড় মাথা ঘামাচ্ছেন—"

অন্যমনস্কভাবে নিরঞ্জন প্রশ্ন করিল, "কেন ?"

তপতী উত্তর দিতে পারিল না। নিরঞ্জন হঠাৎ বলিল, "এলাহাবাদে গিয়ে আর কলেজে ভর্ত্তি হলে না কেন ?"

"ভাল লাগল না আর।"

নিরঞ্জন চুপ করিয়া রহিল। তপতী কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা কয়েক-বার করিল, কিন্তু পারিল না ; হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া সে দাঁড়াইয়া বলিল, "চল বাসায় যাই।"

"উ ? ওঃ—চল।"

একটি কম্বলে পা ঢাকিয়া তপতীর কাকা গুরুদাসবাবু সম্মুখে উপবিষ্ট সাতাশ আটাশ বৎসরের একজন লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। লোকটি চশমা-পরিহিত, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বেশভূষায় একটা আভিজাত্যসূচক পারিপাট্য।

তপতীকে দেখিয়া লোকটির চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পরে নিরঞ্জনকে দেখিয়া একটু সপ্রতিভভাবে তপতীকে বলিল, "এই যে, আসুন।"

তপতী কাকার নিকট গিয়া বলিল, "চিনতে পারছ কাকা নিরঞ্জনকে?"

গুরুদাসবাবু নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকাইলেন, নিরঞ্জন তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

বৃদ্ধ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, "ওঃ, নিরঞ্জন! হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি বৈকি,—এসো বাবা—বোস।"

নিরঞ্জন বসিল।

তপতী তাহাকে বলিল, "তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম,—আমাদের সঙ্গে দিন দশেকের জন্য বেড়াতে এসেছেন, ওখানকার একজন ম্যাজিষ্ট্রেট উনি—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার রায়, ইনি—নিরঞ্জন সরকার এম্-এ—"

নিরঞ্জন প্রতি নমস্কার জানাইয়া মনে মনে হাসিল। এ লোকটি যে তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহা সে তাহার দৃষ্টি দেখিয়াই বুঝিতে পারিল; কিন্তু তাহা বুঝিয়া তাহার বিন্দুমাত্রও ঈর্ষাবোধ হইল না, দুঃখও না।

গুরুদাস বাবু বলিলেন, "সব ভাল ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আজকাল কি কর্চ্ছ?"

"সম্প্রতি কিছুই না, তবে একটা চাকরীর সম্ভাবনা আছে।"

"কি চাকরী?"

"প্রফেসারী।"

"বেশ বেশ, তা এখানে ধর্ম্মশালায় উঠেছ বুঝি, কিছুদিন থাকবে ত?"

"হ্যাঁ, কয়েকদিন থাকব।"

"তা, এখানেও ত' থাকতে পার, এ্যাঁ?"

তপতী হাসিল, প্রভাতের মুখমণ্ডল অন্ধকার হইয়া উঠিল।

"আজ্ঞে না, তার দরকার হবে না, ওখানে মন্দ নয়।"

তপতী বলিল, "আচ্ছা তোমরা গল্পগুজব কর, আমি চা আনতে যাচ্ছি।"

তপতী ভিতরে গেল। গুরুদাসবাবু প্রভাতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জান প্রভাত, নিরঞ্জন একটি রত্ন, এই তো এবার ইংরাজীতে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছে।"

প্রভাত একটু হাসিয়া বলল, "শুনে সত্যই আনন্দিত হলুম নিরঞ্জনবাবু।"

"ধন্যবাদ।"

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পর চাকরের হস্তে চা প্রভৃতি লইয়া তপতী ফিরিয়া আসিল।

প্রভাত প্রশ্ন করিল, "কোনদিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন তপতী দেবী ?"

তপতী চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "আমার ভারী অন্যায় হয়ে গেছে প্রভাতবাবু, আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল হওয়ায় কুণ্ডের দিকে একাই বেড়িয়ে পড়লাম চুপি চুপি, সেখানেই পাহাড়ে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা"—

গুরুদাসবাবু হাসিয়া উঠিলেন, তোদের রবিবাবু'র এক নভেলের নায়ক নায়িকার মত যে এঁ্যা, তবে তাতে তাদের দুজনেরই মোটর ছিল আর স্থানটি হিমালয় পর্ব্বতে—না ? হাঃ হাঃ হাঃ—"

নিরঞ্জন ও তপতী সেই হাসিতে যোগ দিল, কিন্তু প্রভাতের মুখ ক্রমশঃ গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। শুষ্ককণ্ঠে হাসি থামিলে সে বলিল, "কিন্তু একলা আপনার যাওয়াটা উচিত হয়নি তপতী দেবী, হাজার হোক্ জংলী দেশ—"

তপতী উত্তর দিল না।

সাধারণ কথাবার্ত্তায় কিছুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর, আবার কক্ষে নিঃশব্দতা ফিরিয়া আসিল। দীপালোকে বৃদ্ধ গুরুদাসবাবুর জরাগ্রস্থ মুখমণ্ডলের অসংখ্য বলিরেখা নিরঞ্জন গুনিতে লাগিল, তাহার যেন আর শেষ নাই। কিন্তু এ বলিরেখার পশ্চাতের অতীত তাহার পিতার অতীতের মত ব্যর্থ নয়। এই যা পার্থক্য। তবুও সে পার্থক্য যেন আকাশ পাতালের মত। সুখ আর দুঃখ। কিন্তু কি হইবে সুখ দুঃখের কথা ভাবিয়া, এই অর্থহীন জীবনে যে দুঃখ পাইয়াছে তাহার সুখীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কি আছে, করিয়া লাভ কি, সুখী হইয়াই বা লাভ কি ?

তপতী নিঃশব্দতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, কাকামণি নিশ্চয়ই নিরঞ্জনের বাজনার কথা ভোলনি ?"

গুরুদাসবাবু বুঝিতে পারিলেন না।

"সেতার বাজনার কথা বলছি।"

বৃদ্ধের স্মরণ হইল যে নিরঞ্জন খুব ভাল সেতার বাজাইতে পারে, উৎসাহে মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, তা—তোর সেতারটি তো এনেছিস্, সেইটে এনে দে না।"

নিরঞ্জন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, "আজ্ঞে না, আজকে থাক্ কাকাবাবু, অন্যদিন হবে। শরীরটা বড় ক্লান্ত, কিছু মনে করবেন না।"

"না, না, বেশ তো, অন্যদিনই হবে।"

কিছুক্ষণ পরে সে বিদায় লইল। ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার সময় তপতী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

নিরঞ্জন চমকিয়া দাঁড়াইল। কে কাহার জন্য মূর্খের মত অপেক্ষা করিতেছে! চাঁদের পাণ্ডুর আলোকে তপতীর দীপ্ত চক্ষু দেখিতে বড় ভাল লাগে। নিঃশব্দে তপতীর একটি হাত টানিয়া লইয়া সে মৃদু হাসিল। সব খুলিয়া তপতীকে জানাইতে ইচ্ছা হইল, ইচ্ছা হইল বলে যে তাহার কাছে জীবন নীরস ও অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে, মনে হইতেছে যে প্রেম অর্থহীন, জীবনকে ঘিরিয়া যে রহস্যলোক জীবনকে অন্ধকার, যান্ত্রিক করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কিনারা তাহাকে করিতেই হইবে। ছায়াছবির মত এ জীবনের কি অর্থ, কি উদ্দেশ্য? বলিতে ইচ্ছা হইল—

> 'Beloved, lay your hands on my heart
> in it's gloom.
> Do you hear that? Like tapping inside
> of a room?
> A carpenter lives there. With malice
> and glee,
> He's building a coffin—a coffin for me.'

কিন্তু তপতী কি তাহা বুঝিবে?

বিছানায় শুইয়া সে গভীর রাত্রে জানালা দিয়া আকাশকে দেখিল। চন্দ্রালোকে প্লাবিত প্রশস্ত নীলাকাশ। দূরে গাছের শিশিরসিক্ত পাতায় পাতায়

চাঁদের আলো রূপালী জলের মত চক্ চক্ করিতেছে ; চারিদিকে একটা গভীর ধ্যানমৌন প্রশান্তি। আকাশ আর পৃথিবী যেন ইসারা করিয়া কি বলাবলি করিতেছে। সে উঠিয়া বসিল, বড় ভাল লাগিতেছে তাহার এখন। বাঁচিতে ইচ্ছা হইতেছে, কে বলে এই জীবন অর্থহীন ? তপতীর মুখ মনে পড়ায় আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিল। এই ত' জীবন। জীবন রহস্যময় বটে, কিন্তু অর্থহীন ত' নয়। পরাজয়ে গ্লানি কেন, দুঃখে বিতৃষ্ণা কেন, নৈরাশ্যে সন্দেহ কেন ; বাঁচা চাই, গ্রহণ করা চাই, ভোগ করা চাই। আকাশের দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া সে শক্তি প্রার্থনা করিল। ঈশ্বরের নিকটে নয়, কারণ সে নাস্তিক।

কয়েকদিন বেশ কাটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া তাহারা নালন্দা প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া আসিল। আনন্দে কোলাহলে দিনগুলি মন্দ কাটিতেছে না।

সেদিন তাহারা সকলে উদয়গিরির দিকে বেড়াইতে গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, পশ্চিম আকাশের মেঘে যেন আগুন লাগিয়াছে। প্রভাত অনুভব করিল যে মনের কথা ব্যক্ত করার এই উপযুক্ত সময়। কিন্তু, সুযোগ পাওয়া যাইতেছে না, বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে গুরুদাসবাবু ও নিরঞ্জনের উপস্থিতি। সে উস্‌খুস করিতে লাগিল।

গুরুদাসবাবু একটু পরে প্রভাতের অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তাই প্রভাত যখন তপতীকে বলিল, "চলুন না তপতী দেবী, ঐ মন্দিরের ওপরের পাহাড়টায় একটু বেড়িয়ে আসি"—, তখনি তিনি বলিলেন, "যা না মা, আমি নিরঞ্জনের সঙ্গে এখানে বসে গল্প করি, বেতো মানুষ—একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

তপতী নিরঞ্জনের দিকে তাকাইল, নিরঞ্জন মাথা নাড়িয়া ক্ষীণ হাসিল। সে প্রভাতবাবুর সহিত অগ্রসর হইল। তাহারা দৃষ্টিপথের অন্তরালে গেলে, গুরুদাসবাবু একটি পাথরের উপর বসিয়া বলিলেন, "জান নিরঞ্জন, প্রভাত ছেলেটি বেশ, সুন্দর ওর হৃদয়"—

নিরঞ্জন মাথা নাড়িল, "আজ্ঞে হ্যাঁ"—

গুরুদাসবাবু উৎসাহিত হইয়া বলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, সুন্দর ওর হৃদয় আর বেশ গুণী ও উপযুক্ত ছেলে। ভাবছি ওর সঙ্গে তপতীর মিলন ঘটিয়ে দি, বেশ হবে, না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—নিরঞ্জন বলিল, কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ ঈর্ষায় হতাশায় হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তপতী ত' একমাত্র তাহার, আর কাহারও সে হইতে পারে না, হইতে সে দিবেও না।

প্রভাত বলিল, "একটা কথা না বলে আর থাকতে পারছি না তপতী"—

"কি ?"

"আমি তোমায় ভালবাসি, তা জান বোধ হয় ?"

কুয়াসায় ঢাকা পাহাড়ের চূড়ার প্রতি চাহিয়া তপতী বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু আমি তো আপনাকে ভালবাসি না, শুধু শ্রদ্ধাই করি।"

বায়ুমণ্ডল কাঁপাইয়া, সন্ধ্যার আকাশ ভেদ করিয়া পাখীর দল, নূতন প্রভাতের দিকে উড়িয়া যাইতেছে।

রাত্রে নিরঞ্জন তপতীদের বাড়ীতে আহার করিল, একবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেই তপতীর চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিয়াছিল। প্রভাত কিন্তু মোটেই খাইতে পারিল না, প্রতিটি গ্রাস তাহার গলার ভিতর যেন প্রস্তরীভূত হইয়া যাইতেছিল।

খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ হইলে তপতী হঠাৎ বলিল, "কাকা, আজ নিরঞ্জনের বাজনা শুনতেই হবে, কি বল ?

নিরঞ্জন ক্ষীণ আপত্তি তুলিল, "না—না—আজ"—কিন্তু তপতী ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে সেতার আনিতে। গুরুদাসবাবু স্নেহ নেত্রপাত করিয়া হাসিলেন।

প্রভাত একটি বইয়ের পাতায় নিবিষ্টচিত্তে মগ্ন ছিল। সে মগ্নতা যেন পার্থিব নয়।

তপতী সেতার লইয়া আসিল—"সব তারই বাঁধা আছে,—বাজাও।"

বাহিরে কুয়াসায় মোড়া চাঁদের আলো, অস্পষ্ট পাহাড়ের রেখা জানালা দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনে এত আনন্দ, এত সৌন্দর্য্য! মূর্ত্তিমতী অগ্নিশিখার মত তপতীর কালো চক্ষের গভীর, মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া সে সেতারে ঘা দিল। বিচিত্র ঝঙ্কারে সেতারটি যেন কথা কহিয়া উঠিল। কহিল—এ পৃথিবী সুন্দর, রহস্যময়; এ জীবন বিচিত্র, অপূর্ব্ব, বাঁচিয়া সুখ

আছে, লাভ আছে। সুরের পৃথিবীতে তাহাদের সূক্ষ্ম-দেহী আত্মারা আনন্দের বাড়বানলের মত জ্বলিতে লাগিল।

পরের দিন সকালে তাহারা সকলে 'বাণ গঙ্গা' দেখিতে গেল। প্রভাত কিন্তু গেল না। বেলা দশটার সময় তাহারা ফিরিল। গুরুদাসবাবু দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে নালন্দা যাইবেন, সেখানকার একজন জমিদারের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছে, ভদ্রলোক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি আবার রাত্রি আটটার গাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন।

তপতী আসিবার সময় চুপি চুপি নিরঞ্জনকে বলিল, "বিকেলে আজ একটু তাড়াতাড়ি এসো বুঝ্লে ?"

নিরঞ্জন ঘাড় নাড়িল।

ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া খাওয়া দাওয়া সারিয়া সে ঘুমাইল। অনেকক্ষণ ঘুমাইবার পর যখন সে জাগিল, তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া, জামা-কাপড় পরিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। তপতী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মনের খুসী তাহার পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া দিল। শিস্ দিতে দিতে সে চলিল।

রাস্তার ধারে একটা জলো জায়গায় অসংখ্য প্রজাপতি রঙীন পাখা কাঁপাইয়া উড়িতেছিল, বসিতেছিল। একটা বড় প্রজাপতিকে ধরিবার ইচ্ছায় সে মিনিট দশেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। নিজের মনে হাসিয়া সে আবার চলিতে লাগিল।

একজন গ্রাম্যলোক পশ্চিমা ভাষায় গলা কাঁপাইয়া 'বির্হা' গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল। সে গাহিতেছিল—'মাথায় আমি যুঁই ফুল গুঁজেছি, লাল জামা পরে পায়ে আল্তা লাগিয়েছি, প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ্র শয্যার ওপর তোমার অপেক্ষায় ব্যগ্র নয়নে বসে বসে আমি শুধু প্রহর গুনছি আর দেখছি—চাঁদ চলেছে অস্তাচলে ;—হায় নিঠুর ! তুমি এখনও এলে না !'

গানের ঢেউ আসিয়া রক্তের সমুদ্রে চাঞ্চল্য জাগাইল, চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। আজ শুধু সে আর তপতী। বড় ভাল লাগিতেছে তাহার আজ ; রূপে, রসে,

গন্ধে অনুপম এই পৃথিবী যেন স্বপ্নের মত। সুন্দর এই জীবন—অদ্ভুত। নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল।

প্রভাত বাহিরে বসিয়া একমনে সিগারেট টানিতেছিল, বিষণ্ণ নয়নে একবার নিরঞ্জনের দিকে তাকাইল। নিরঞ্জন সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিল, "তপতী"—

রান্নাঘরে ঠাকুরকে কি উপদেশ দিয়া তপতী বাহির হইয়া আসিল।

"এসেছ, খুব ঘুমিয়েছিলে, না? আমিও খুব ঘুমিয়েছি।"

নিরঞ্জন কাঁপিতেছিল, তপতীর হাত চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "চল তপতী"—

তপতী বিস্মিত হইয়া উঠিল তাহার ভাব দেখিয়া—"কোথায়?"

"প্রশ্ন করো না তপতী, চল—আর কেউ নয়, শুধু তুমি আর আমি।"

"বেশ তো, দাঁড়াও—চুলটা বেঁধেনি"—

"না, না, ঐ ভাল—মেঘের মত চুল ছড়িয়ে তুমি চল,—মনে হবে যেন তুমি সদ্য-জাগ্রত রাজকন্যা"—

তপতী নিরঞ্জনের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"চল তপতী, দেরী করো না।"

"মাগো, তুমি কি রকম লোক? জামাটা গায় দিয়ে আসি, শীত লাগবে না?"

নিরঞ্জন হাত ছাড়িয়া বলিল, "শীগ্‌গীর তবে—দু'মিনিট সময় দিলুম, মনে রেখো—মাত্র দু'মিনিট।"

তপতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নির্জ্জন পাহাড়ের একটা জায়গায় তপতী বসিয়া পড়িল।

"উঃ, আর পারি না, কী যে ছুটছ তুমি"—

নিরঞ্জন তাহার পাশে বসিল। আকাশে সোণার জলে আঁকা মেঘের ছবি।

"অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে কি অত দেখ্‌ছ?" তপতী প্রশ্ন করিল।

"শুন্‌লে খুসী হবে তুমি।"

"বটে! শুনি"—

"তোমার রূপ।"

"সত্যি ?"

"সত্যি।"

লজ্জায় তপতীর গাল রক্তিম হইয়া উঠিল।

"তুমি আমায় ভালবাস তপতী ?"

তপতী নিরঞ্জনের কাঁধে মাথা রাখিল।

"কেন ভালবাস ?"

তপতী আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। একি অদ্ভুত প্রশ্ন! নিরঞ্জন তাহাকে পলকহীন নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছে।

"তোমার চোখ দুটো ভা-রী সুন্দর তপতী, ও দুটো আমায় দান কর্ব্বে ?"

"নিতে পার যদি, নাও।" তপতী হাসিয়া বলিল।

"হাঁ—ইচ্ছে করে উপ্‌ড়ে নি, এত সুন্দর তোমার চোখ দুটো"—

"অমনভাবে কথা বলো না, সত্যি বড় ভয় লাগে নিরঞ্জন।"

"ভয় লাগে! তবে থাম্‌লুম, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে একটা চুমু দাও"—

"না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—make me immortal with a kiss!"

নিরঞ্জন তপতীকে নিবিড়ভাবে বুকে টানিয়া লইল।

একটু পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তপতী বলিল—"তুমি পাগল হলে নাকি—উঃ—"

নিরঞ্জন কথা না বলিয়া হাসিতে লাগিল। তপতী তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারে না, লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া সে বলিল, "দেখ তো, আমার খোঁপাটা কি রকম খুলে গিয়েছে—"

নিরঞ্জন তাহার মাথার চুলগুলি আরও নাড়িয়া দিল। তপতী কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "অমন করলে আমি চলে যাব কিন্তু হ্যাঁ—"

"চলে যাবে ? আচ্ছা, এইবার শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক, কেমন ?"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আবছা অন্ধকার তাহাদের ঘিরিয়া ক্রমশঃ ঘন হইতে লাগিল। কুয়াসায় পাহাড়ের চূড়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

তপতী ডাকিল—"নিরঞ্জন"—

"উঁ"—

"তুমি আমায় ভালবাস ?"

"বাসি—বাসি"—

নিবিড় বাহুবেষ্টনে তপতী তাহাকে বুকে টানিয়া লইল। উষ্ণ, সুকোমল দেহের স্পর্শে হৃদয়ের স্পন্দন বাড়িয়া যায়।

"তুমি কাঁপ্ছ ?"—তপতী বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"এত আনন্দ আমি জীবনে পাইনি, জীবনে যে এত আনন্দ আছে আমি তা জানতাম না।"

তপতীর দেহের, কেশের আঘ্রাণে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, যেন নেশা হইয়াছে। রক্তের সঙ্গীত সে যেন শুনিতে পায়। উন্মত্ত সঙ্গীত।

অকস্মাৎ, অকস্মাৎ কোথা হইতে একটা পচা দুর্গন্ধ ভাসিয়া আসিল। মনে হইল তপতীর দেহের, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল তাহা ভুল। ভুল আবিষ্কার করিতেই সে শিহরিয়া উঠিল।

অমূল্য রায়ের পচা, গলা, ফাটিয়া-পড়া দেহের নারকীয় দুর্গন্ধ, আজ বহুদিন পরে, সে বারংবার পাইতে লাগিল। দম বন্ধ হইয়া আসে।

অমূল্য রায় কেন আত্মহত্যা করিয়াছিল ? সবই ত' তাহার ছিল, তবে ? জীবন অর্থহীন বলিয়া ?

বুকের উপর ক্লান্ত পাখীর মত তপতী তাহার উষ্ণ দেহ লইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, হঠাৎ নিরঞ্জন নিজেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তপতীর আলিঙ্গন হইতে পৃথক করিয়া লইল। তপতীর ঐ সুন্দর কোমল দেহ, উন্নত স্তনযুগল, গভীর চক্ষু, রক্তিম ওষ্ঠদ্বয় যদি পচিয়া যায় ? কি বীভৎসই না দেখিতে হইবে ! এ জীবন অর্থহীন, এই দেহ আরও অর্থহীন ; কেমন করিয়া সে তাহা ভুলিয়া রহিয়াছে ? গদগদ ভাষায় আবেগে প্রেম নিবেদন করিয়া হাস্যময় প্রেমের কী নিখুঁত অভিনয়ই না সে করিল !

এ জীবন অর্থহীন। একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন কতকগুলি ক্রিয়ার যন্ত্রের মত পুনরাবৃত্তি মাত্র। বিদূষকের হাসির মত মিথ্যা। তিলে তিলে পলে পলে

অবশ্যম্ভাবী পরিণামে পৌঁছাইয়া লয়প্রাপ্ত হওয়ার কি লাভ? তার চেয়ে আগেই মরা ভাল, গতানুগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া ভাল।

তপতী আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হল আবার, ওকি! উঠ্‌লে যে?"

গলিত নরমাংসের দুর্গন্ধে অধীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

"আর নয় তপতী, বাড়ী চল এবার।"

"কেন, এত তাড়াতাড়ি?"

"না—চল।"

হঠাৎ নিরঞ্জনের এই পরিবর্ত্তনে, এই রূঢ় আচরণে তপতীর অভিমান হইল। চোখে জলও আসিল, তাহা মুছিয়া, কিছু না বলিয়া সেও উঠিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রালোকিত আকাশে অনন্ত নক্ষত্রের বিবর্ণ বিকাশ। সুন্দর পৃথিবী মুহূর্ত্তে কুৎসিত হইয়া গিয়াছে, সুন্দর জীবনের সবই মিথ্যা। অর্থহীন প্রেমে কি লাভ? নিরঞ্জন নিজের বিষয়ে কতটুকু জানে? প্রশ্নের উত্তর এ পৃথিবীতে নাই।

সারাপথ নিরঞ্জন নিঃশব্দে কাটাইল। তপতীর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে সে বলিল, "এবার তুমি বাড়ী যাও তপতী, আমিও চলি।"

তপতী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, "হঠাৎ তোমার কি হল বলত?"

"কৈ কিছু না তো।"

"না তুমি লুকোচ্ছ।"

"না, তপতী, না—"

"তবে চল, কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করবে।"

"উঁহু—শরীরটা ভাল নয়।"

"আমার উপর রাগ করলে নাকি?"

"না।"

"তবে?"

"সে তুমি বুঝবে না, তপতী, কোনদিনই বুঝবে না।"

ক্রুদ্ধভাবে নিরঞ্জনের হাতটা সজোরে ছাড়িয়া দিয়া তপতী সরিয়া গেল। ধৈর্য্যের সীমা তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে, যাহাকে সে ভালবাসে তাহাকেও

খোসামোদ করা সে ঘৃণা করে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "বল্‌বে না? বল্‌বে না? আমি কিছুই বুঝি না, আমি ছেলেমানুষ, না? বেশ, যাও তুমি তাহলে—যাও-যাও"—বলিয়াই মুখে রুমাল চাপিয়া দ্রুতপদে বোধ হয় কান্না চাপিতে চাপিতে চলিয়া গেল।

নিরঞ্জনের মাথা কেমন যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে, কিছুই যেন সে বুঝিতে পারিতেছে না। একবার সে তপতীকে ডাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না। তপতীর গমনপথের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে শুধু একটু ম্লান হাসি হাসিল। হায় অন্ধ বালিকা, তোমায় মনের কথা খুলিয়া বলিলে তুমি যে শুধু হাসিতে, উপহাস করিতে, বলিতে যে নিরঞ্জনের কঠিন মানসিক ব্যাধি হইয়াছে; তাহার দুঃখ, যন্ত্রণা ত' তুমি বুঝিতে না।

নাঃ, বাড়ী ফিরিয়া যাইবে সে কাল ভোরেই। সারারাত্রি সে ঘরের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, একটুও ঘুমাইল না। মস্তিষ্ক তাহার উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু লাল। বাহিরের নিস্তব্ধ পৃথিবী যেন মৃতের মত অসাড়। কুঞ্চিত ললাটে সে ভাবিতে লাগিল। রহস্যের কিনারা কবে হইবে? কেমন করিয়া সে জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাইবে? সত্য কি?

ষ্টেশনে যাইবার সময় আবছা অন্ধকারে তপতীদের বাড়ীটা দেখা গেল। তপতী নিশ্চয়ই ঘুমাইতেছে। তপতী। আবার কবে দেখা হইবে? মূর্খ, আর দেখা হইবে না।

মাথায় কাহারা যেন সাপের মত কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে, বাতাসে একটা দুর্গন্ধ।

বেলা এগারটায় সে রক্তচক্ষু ও অবসন্ন দেহ লইয়া বাড়ী ফিরিল। বাবা আফিসে গিয়াছেন, মা কি একটা সেলাই করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন।

"সে কি রে! এত শিগ্‌গীর যে ফিরে এলি?"

"ভাল লাগল না মা।"

"চোখ মুখ অত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?"

"ও কিছু না, রেলে আসার জন্য"—

"যা চান করে আয়"—

ছোট ভাই বিন্নুর চারদিন যাবৎ বড় জ্বর হইয়াছে, নিরঞ্জন তাহার শিয়রে খানিকক্ষণ বসিল। দাদাকে বসিতে দেখিয়া বিন্নু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিল।

খাওয়ার সময় মা কেবল অনুযোগ করেন।

"খা বাবা, ঐ চাট্টি তো ভাত মোটে।"

"না মা।"

"খা না বাবা, এই খেয়েই তো বাঁচবি।" মায়ের কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল, একটু পরে তিনি আবার বলিলেন, "মণি তোর সোয়েটারটা শেষ করেছে, গায়ে দিয়ে দেখিস্ তো।"

"আচ্ছা।"

মায়ের সাড়ীর দুই জায়গায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শীর্ণা মা।

"তোর নামে একটা চিঠি এয়েছে রে।"

"কে লিখেছে ?"

"খুলিনি তো'।"

খাওয়ার পরে চিঠিটি খুলিয়া সে দেখিল, বোম্বাই হইতে বিকাশ লিখিয়াছে। না পড়িয়াই, ছিঁড়িয়া তাহা সে বাহিরে ফেলিয়া দিল। কি হইবে পড়িয়া ? তপতীকে চিঠি লিখিবার কথা মনে হওয়ায় সে হাসিল। চিঠি লেখা নিরর্থক। স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা—এ সব বন্ধন। বন্ধনই ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। মুক্তি চাই।

ঘুম পাইতেছে, কিন্তু সে ঘুমাইতে পারিতেছে না। সে স্থির করিয়াছে—আজ রাত্রি বারটার পরে এই অর্থহীন জীবনের অবসান করিতে হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে সে সেই পরম ক্ষণটির নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

বৈকাল হইল। বাবা আফিস হইতে ফিরিলেন। নিরঞ্জনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এলি ?"

"এগারটার সময়।"

খুক খুক করিয়া কাশিতে কাশিতে বাবা ভিতরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার শরীর বিশেষ ভাল নয়।

দুইটি টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহা লইয়া নিরঞ্জন বাজারের দিকে বাহির হইল। যে দিকেই সে তাকায়, মনে হয় সব লোকগুলিই যেন মৃত, যন্ত্রের মত।

সহরের ধূলি-ধূসরিত আকাশে অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান আলোতে যেন মৃত্যুর ইঙ্গিত।

বাড়ী ফিরিয়া সে অন্ধকারে ঘরের ভিতর শুইয়া রহিল।

মা ডাক দিলেন—"নিরু"—

"এঁ্যা"—

"খেয়ে যা।"

"খাব না মা, মাথা ধরেছে।"

"ওমা, কখন ধরল? বিনুর জ্বর—তোর আবার জ্বর হল না তো?"

"না মা, জ্বর নয়।"

"দেখি।"

মা ঘরে প্রবেশ করিয়া পুত্রের ললাট স্পর্শ করিয়া উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিলেন, "না, শরীর তো গরম নয়, তবুও, না খেলি—সাবধানে থাকাই ভাল।"

নাকের ডগায় চশমা টানিয়া বাবা আফিসের কাগজপত্রাদি ঘাঁটিতেছেন।

সবচেয়ে ছোট ভাইটি ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কাঁদিতেছে আর ছোট বোন মণি তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিতেছে।

শুইতে যাইবার সময় মা দরজার সামনে আসিয়া ডাকিলেন, "নিরু"—

"এঁ্যা?"

"ঘুমোলি নাকি?"

"না মা।"

"মাথা ধরা সারল?"

"না, তবে একটু কমেছে।"

"মাথাটা একটু টিপে দেব?"

"কোন দরকার নেই মা, সত্যি বল্‌ছি"—

মা তবুও একবার আসিয়া তাহার দেহে কয়েকবার হাত বুলাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। বড় ভাল লাগিল মায়ের এই যত্নটুকু!

রাত্রি গভীর হইতে লাগিল।

সে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পূর্ণিমার আলোয় আলোকিত পৃথিবী যেন মৃতের মত অসাড়। সময় হইয়াছে।

বোনের তৈয়ারী সোয়েটারটা সে পরম যত্নে পরিল।

গীর্জ্জার ঘড়িতে বারটা বাজিল। বাড়ীর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মনে হইতেছে, অদৃশ্য চক্ষু মেলিয়া কে যেন তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, আকর্ষণ করিতেছে। নিঃশব্দ পদে সে বাহির হইল। বাতাসে পচা মাংসের দুর্গন্ধ।

রেল লাইন পার হইয়া নির্জ্জন বন্য-পথ দিয়া চলিতে চলিতে সন্ধ্যাবেলায় কেনা আফিংয়ের গুলি তিনটি সে গিলিয়া ফেলিল।

ঘন জঙ্গল ভেদ করিয়া, ফণি মনসার কাঁটায় বিদ্ধ হইয়া সে শঙ্করদিঘীর দিকে অগ্রসর হইল। কিছুক্ষণ পরে পাকস্থলীতে আফিংয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। অসংখ্য বৃশ্চিকদংশনের মত যন্ত্রণা, মাথা ঘুরিতেছে, পেটে কোমরে অদ্ভুত ব্যথা, ঘোলাটে দৃষ্টি আর লালার স্রোত।

আর একটু। আর একটু। তারপরেই জীবনের গোপন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। জীবনের চতুর্দ্দিকের যন্ত্রণাময় রহস্যলোক সে ভেদ করিবে, জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাইবে।

পচা মাংসের ভ্যাপসা গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে।

নিরঞ্জন জলে নামিতে লাগিল, ধীরে-ধীরে। হঠাৎ অথৈ জল আর পাঁক। চেতনা একটু পরেই অবশ হইয়া আসিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে কি যেন হইয়া গেল। বাবা, মা, ভাই, বোন, তপতী, বিকাশ—সকলের কথা মনে পড়িয়া গেল; বাঁচিতে ইচ্ছা হইল,—বাঁচিতে ইচ্ছা হইল প্রতি রোমকূপে—প্রতি নখাগ্রে। অবশ অঙ্গ মেলিয়া সে একবার জলের চাপ ঠেলিয়া উপরে বাহিরের পৃথিবীর আলো ও বাতাস গ্রহণ করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নিস্তেজ বাহু দুইটি আরও শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িল।

সে আর উঠিতে পারিল না।

ছয়দিন পরে। হাসপাতালে। একটি গলিত ও নগ্ন শব পোষ্টমর্টেম হইবে।

একটু পরেই ছুরি চলিল। পেটের দিকের পুরাতন কাপড়ের মত চামড়া কাটিয়া ছুরি চলিল, নাড়ীভুড়ী ও জলীয় রক্তাভ পদার্থ গলগল করিয়া বাহির হইতে লাগিল। বুক চিরিল—হলদে আর লালচে রংয়ের ফুসফুস। তারপরে মাথা। হাতুড়ীর মত একটি যন্ত্রের আঘাতে খুলি খুলিয়া পশ্চাৎ দিকে হেলিয়া পড়িল আর সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ, পচা ঘিলু গড়াইয়া পড়িল।

দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠিল।

শ্রীনবেন্দুভূষণ ঘোষ

রেণে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ

গুপ্তযুগের পরবর্তী ভারতীয় চিন্তাধারা ও শিল্পকলা

মধ্যযুগের মধ্যাহ্নকালে বৌদ্ধধর্মের প্রধান সম্প্রদায় ছিল বিজ্ঞানবাদিন্ (আদর্শ বাদী) মহাযান সম্প্রদায়, যাদের প্রবর্ত্তক ছিলেন পুরুষপুর বা পেশাওয়ার নিবাসী (গান্ধারে) অসঙ্গ নামক পণ্ডিত। নোয়েল পেরি সাহেবের মতে তিনি সম্ভবত গুপ্তদের রাজত্বকালে ৩০০—৩৫০-র দিকে জীবিত ছিলেন। অন্যগ্রন্থ ছাড়া অসঙ্গ মহাযান-সূত্রালঙ্কার, ধর্মধর্মতা-বিভঙ্গ ও উত্তরতন্ত্র রচনা করেছিলেন; এবং মহাযান সম্পরিগ্রহশাস্ত্র ও সপ্তদশভূমি বা যোগাচারভূমি শাস্ত্রেরও রচয়িতা নিশ্চয় তিনি, যদিও ভ্রান্তিবশত সেগুলি বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের নামে আরোপিত হয়। অসঙ্গের ভাই বসুবন্ধু ইতিপূর্বে হীনযান-পন্থীর বৈভাষিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু অসঙ্গ কর্তৃক স্বমতে দীক্ষিত হলে পর তিনিও অনেকগুলি যোগাচারী পুস্তক প্রণয়ন করেন, প্রধানত বিংশক-কারিকা প্রকরণ। এই দুই গুরু হতে আরো বহু পণ্ডিত প্রেরণা লাভ করেন ; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য নৈয়ায়িক দিগ্‌নাগ বা দিঙ্‌নাগ ও স্থিরমতি (দুজনেই অনুমান ৪৫০—৫০০), ধর্মপাল (অনুমান ৬০০—৬৫০), শীলভদ্র (৫২৭-৬৩ ?), জয়সেন (৫৩৩-৬৩ ?), চন্দ্রগোমিন্ (অনুমান ৫৫০—৬০০)—(এই শেষোক্ত মাধ্যমিক বলেও গণ্য)—এবং ধর্মকীর্তি (অনুমান ৬৭৫—৭০০)।

এই সকল আচার্যদের অধিকাংশই মঠবহুল নালন্দা সহরে শিক্ষা দিতেন। (বর্তমান বড়গাঁও, মগধ)। ৬৩০-এ হিউয়েন-ৎসাং-এর আগমনের সময় থেকে এই সহরে যোগাচার সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য ছিল।

অসঙ্গ গান্ধার দেশের লোক সে কথা মনে রাখা আবশ্যক কারণ গান্ধার ছিল সাসানীড পারস্য রাজ্যের পার্শ্ববর্তী, এবং সিলভ্যাঁ লেভি ও Masson Oursel সাহেবের মতে সিরীয়-পারস্য সম্প্রদায়ের প্রভাব অসঙ্গের উপর সম্ভবত পরোক্ষে বিস্তৃত হয়েছিল, যারা আবার ছিল আলেকজান্দ্রীয় সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী। হয়ত যোগাচারের মতবাদ ঠিক না হোক অন্তত কতকগুলি মনোভাব

Gnosticism ও Manicheism দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। সে যাই হোক্ যোগাচারী আদর্শবাদ সাক্ষাৎরূপে মাধ্যমিক শূন্যবাদ থেকে উৎপন্ন, এবং সেই সূত্রে আলয়-বিজ্ঞান ও ভূততথতাবাদের সঙ্গে সংযুক্ত। পূর্বগামী প্রতিভাশালী অশ্বঘোষ অথবা মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদ-শাস্ত্রের রচয়িতা যিনিই হোন, ইতিপূর্বেই শেষোক্ত মতবাদের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

আমরা জানি যে বৌদ্ধধর্ম কোনপ্রকার নিত্যবস্তুর অস্তিত্ব মানেন না, ও কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গোচর অনিত্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। মাধ্যমিক শূন্য-বাদের মতে এই জগৎ মায়া ব্যতীত আর কিছু নয়। যোগাচারেরও প্রস্থানভূমি এই,—কিন্তু তাঁরা প্রশ্ন করেন মায়া বলতে কি বোঝায়?—মায়া হচ্ছে মনের মরীচিকা অর্থাৎ একটা চিন্তা। বসুবন্ধু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পূর্বক বলেন যে "ভাবের বাহ্যিক জ্ঞানের দ্বারাই অন্তর্নিহিত ভাবের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়"। মাধ্যমিকদের সঙ্গে একমত হয়ে যখনি বলি যে জগৎ মায়া মাত্র, তখনি স্বীকার করি যে জগত কেবলমাত্র বিজ্ঞপ্তি, চিত্ত, মনস্, বিজ্ঞান। অতএব শূন্যবাদ সত্ত্বেও, এমন কি শূন্য-বাদ বশতই চিন্ময়তা অথবা অসঙ্গ যাকে বলেন বিজ্ঞানমাত্র, চিত্তমাত্র তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই চিন্ময়তায় জ্ঞাতা ব্যক্তিগত অহং এবং জ্ঞেয় বা বাহ্যবস্তুর কোন স্থান নেই। অসঙ্গ বলেন "ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই, কারণ সকলই চিন্ময়; অহং একটি কুসংস্কার মাত্র।" অপরপক্ষে যাকে বলে রূপ, তারও কোন অস্তিত্ব নেই, কারণ (বসুবন্ধুর মতে) অণুপরমাণুর কল্পনা স্বতঃবিরোধী। অসঙ্গ লিখ্ছেন; "আমরা বলি যে রূপ হচ্ছে অণুপরমাণুর সমষ্টি এবং জ্ঞানবান জীব হচ্ছে ব্যক্তি। পরন্তু পরমাণু বা ব্যক্তি, আমরাই ত তাদের অস্তিত্ব স্থাপন করি কারণ আমরা মনে মনে তাদের কল্পনা করি! আমাদের এই অনুভূতির দৌলতে একটি বাহ্য জগত সৃষ্ট হয়, যার বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই।" বসুবন্ধুই আবার বলেন "সেই একই জ্ঞান বাহিরে ও অন্তরে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, অহং ও ইদং রূপে দ্বিগুণিত হয় এবং এই দুই ভ্রান্তিমূলক ভাবে প্রতিভাত হয়।"

সুতরাং নির্বিকার চিত্তমাত্র, অথবা একমাত্র পরম সত্য হচ্ছে সেই চিন্তা যার জ্ঞেয় নেই, জ্ঞাতা নেই, (অথবা জ্ঞানক্রিয়াও নেই), সেই অবিমিশ্র চিন্তা যা' অবিভক্ত, যা' অহং ও ইদং-এর পূর্বাবস্থা, অথচ অহং আদির সম্ভাবনা যাতে

বিদ্যমান। এই হেতু যোগাচারীগণ তার নাম দেন আলয়-বিজ্ঞান, অর্থাৎ যে চিন্তা সকলের আধার বা আশ্রয়। য়ুরোপীয় পরিভাষায় আলয়-বিজ্ঞানকে বলা যায় বিশ্বের মগ্নচৈতন্য। নিগূঢ় অনুভূতি ব্যক্তিত্বের নৈর্ব্যক্তিক উৎস, চেতনার অবচেতন মূলাধার। কিন্তু যোগাচারীদের উপর হিন্দুত্বের প্রভাব এইখানে যে তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশেষত তাঁদের সহধর্মী যোগীদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ পূর্বক এই অতল গভীরে নিমজ্জিত হতে চেষ্টা করেন। যেমন হিন্দু ঋষিদের পক্ষে, তেমনি তাঁদের পক্ষেও সত্যলাভ মানে একটি মানসিক জ্ঞানক্রিয়া নয়, পরন্তু একটি নিগূঢ় রহস্যময় মিলন।

অসঙ্গের ভক্তিরহস্যে তাঁর চিন্ময় দর্শন সম্পূর্ণতা লাভ করে। অশ্বঘোষ ও নাগার্জুনের পর বিশেষভাবে যাঁরা বোধিসত্ত্বের ধর্ম অনুশীলন করেন, অসঙ্গ তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান। এই ধর্ম অবশেষে মহাযানীদের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্মকেও অতিক্রম করে। অসঙ্গের বিশেষ ভক্তিভাজন ছিলেন বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়। প্রবাদ আছে যে তিনি কৃপাপূর্বক অসঙ্গকে দর্শন দিতেন এমন কি তাঁকে অনেক রচনা মুখে মুখে বলে দিতেন।

বৌদ্ধ বিশ্বব্যাপ্তিবাদ। তন্ত্র।

যে সকল নিগূঢ় ধর্মভাব মহাযানের অন্তরে ক্রমবর্দ্ধিত হচ্ছিল, সেগুলি জয়যুক্ত রইল অবতংসক, মন্ত্র এবং ধ্যান নামক সম্প্রদায়ের স্থাপনে। অবতংসক সূত্র বা "ফুলের মালা" বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর স্তবস্তুতিমালা নাগার্জুনের নামে আরোপিত হলেও সম্ভবত সেটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত। এই সম্প্রদায়ের রচনাবলীতে আমরা তথতাবাদের বিকাশ দেখতে পাই (অর্থাৎ বস্তুর তত্ত্ব বা মূল প্রকৃতি, সার সত্য), যে মতবাদ অশ্বঘোষ বা মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্রের রচয়িতা যিনিই হোন—ইতিপূর্বেই প্রচার করেছিলেন। যেমন আলয়-বিজ্ঞান দৃশ্য প্রপঞ্চে আত্মন্ তুল্য, তেমনি তথতা সেই স্থলে ব্রহ্মণ তুল্য—একাধারে নামরূপের সমষ্টি এবং লীলাক্ষেত্র (ধর্মকায়, ধর্মধাতু) অর্থাৎ নির্বিশেষ সার সত্য, যা বিশ্বের অধোতে নেই ঊর্ধতেও নেই, কিন্তু বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, যে পরম সত্য বিশ্ব ঘটনার উপাদান স্বরূপ। "জাগতিক রূপ হচ্ছে সাগর, যে পরিমাণে তরঙ্গ সাগর। তথতা হচ্ছে সাগর, যে-পরিমাণে সাগর

তরঙ্গ।" মন্ত্র-সম্প্রদায়ের হাতে এই সর্বদেবময় মতবাদ একটি রীতিমত দেবতায় পর্যবসিত হল। তথতা পরিণত হল মহাবৈরোচনের ধর্মকায়ে, অর্থাৎ বুদ্ধের চিন্ময় রূপে। "বুদ্ধ হচ্ছেন অন্তর্জগত (অবিনশ্বর জগত বা বজ্রধাতু), যার বিকীরণে বাহ্যজগত জন্মলাভ করে" (বুদ্ধদের বা তথাগতের গর্ভ)। এই মতবাদ দাক্ষিণাত্যে ও বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, কারণ বজ্রবোধি (৬৬১—৭৩২), যিনি ৭১৯-এ এই মত চীনদেশে প্রবর্তন করেন তাঁর নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যে, এবং তিনি নালন্দায় এই শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সুদূর প্রাচ্যেই এই মতবাদের ক্রমবিকাশ হয়। ধ্যান-সম্প্রদায় সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযুজ্য অর্থাৎ বোধিধর্ম নামক দাক্ষিণাত্যের (অথবা ইরাণের?) একজন ভিক্ষু সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ধ্যানতন্ত্র চীনদেশে প্রচার করেন। এই সম্প্রদায়ের ভক্তগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের যোগীদের ন্যায় অহং-এর ভিত্তির বিনাশ সাধন পূর্বক চিত্তের গভীরতম অতলে সেই নির্বাণ লাভের প্রচেষ্টা করেন যেটি "সংসারের" সমপর্যায়, অর্থাৎ বিশ্বজনীন সারসত্য, যা যুগপৎ অস্তিত্বের এবং সর্ব বুদ্ধত্বের মূলকারণ, বিশ্বজগত এবং বুদ্ধদের আত্মাস্বরূপ।

বুদ্ধত্বের উপর এই যে অধিকার ধ্যানীগণ পরমানন্দ দ্বারা লাভ করেন তন্ত্র সেটি লাভ করে অভিচার ও যাদুবিদ্যা দ্বারা। Vallee-Poussin সাহেবের মতে তান্ত্রিকধর্ম প্রধানত শৈবধর্মের আচার ও দেবদেবীর উপর বৌদ্ধধর্মের মত ও বিশ্বাস—যথা দেবতা প্রতীকাদি স্থাপন দ্বারা গঠিত। যে রহস্যাত্মক গ্রন্থাবলী (তন্ত্র) এই ধর্মের মূলভিত্তি, তার থেকেই এই নাম গৃহীত। প্রথম স্তরে বৈরোচন, বজ্রপাণি এবং অন্যান্য বহুতর নরদেবতার পূজা। পরবর্তী স্তরে শৈবধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত অতিস্থূল পার্থিব স্বর্গ এবং অতি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক নরক--আর অপ্রত্যাশিত বহুদেবতাবাদ। অপাঠ্য যাদুলিপি, অলৌকিক মন্ত্র এবং রহস্যপূর্ণ যন্ত্রলেখার বলে তন্দ্রশিষ্য "সংসার" থেকে নিষ্কৃতি পান, এবং মাঝের ধাপগুলি ডিঙিয়ে গিয়ে সরাসরি নির্বাণ লাভ করেন।

নবম শতাব্দীর পর হতে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্হিত হয়। একাদশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র বঙ্গদেশে ও বিহারে সে ধর্ম জীবন্মৃত ভাবে অবস্থান করে—মুসলমানদের দ্বারা দেশ জয় হওয়া পর্যন্ত (১২০২)। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই ধর্ম লোপের কারণ কতক পরিমাণে সেই হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান

যেটি ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম, লৌকিক ধর্ম (শৈব ও বৈষ্ণব), মীমাংসক আচার্য যথা কুমারিলভট্ট (অনুমান ৭০০-৭৫০) অথবা বৈদান্তিক আচার্য, যথা শঙ্কর (৭৮৮-৮২০) এদের সকলের দ্বারা একই সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল। অপর পক্ষে বৌদ্ধধর্মও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মণ্যধর্মে পুনর্ম্মিলিত হয়েছিল, অন্তত অবশেষে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম হয়ে পড়েছিল যে, একটা থেকে আর একটাতে যাবার জন্য কোন প্রকার মানসিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়নি ; যোগের সঙ্গে যোগাচার ও ধ্যানের ইতিমধ্যেই আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হচ্ছিল। ওদিকে মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে তান্ত্রিকধর্ম শৈব ধর্মেরই নামমাত্র রূপান্তরে পরিণত হয়েছিল।

হিন্দু বস্তুবাদ। বৈশেষিক ও সাংখ্য।

হিন্দু ভারতের সনাতন ষড়দর্শন হচ্ছে—বৈশেষিক ও ন্যায়, সাংখ্য ও যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত। এই সবগুলিই যে অবিমিশ্র দর্শনশাস্ত্র, তা নয়। মীমাংসা একটি নৈতিক ধর্মোপদেশ, যোগ কৃচ্ছ্রসাধন প্রণালীর ন্যায় একটি হেতুবিদ্যা, বৈশেষিক একটি শরীরচর্চা-পদ্ধতি, বেদান্ত একটি ধর্মমূলক দর্শন, প্রায় ঈশ্বর তত্ত্ব বল্লেই হয় ; মাত্র সাংখ্যই ঠিক একটি রীতিমত দর্শনশাস্ত্র। প্রত্যেকটি দর্শনই একটি মূলসূত্র ও তার ভাষ্যের সমষ্টি।

সম্ভবত বৈশেষিকই দর্শনগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। অন্ততঃ Masson-Oursel সাহেব তথাকথিত কণাদ-রচিত বৈশেষিক-সূত্রের কাল ১০০ থেকে ১৫০ খৃঃ-র মধ্যে ফেলেন। প্রশস্তপাদ কৃত প্রথম ভাষ্যের কাল অনুমান ৪৫০-৫০০। এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্যের মধ্যে উদয়ন ৯৮০-১০০০-এর দিকে এবং শঙ্করমিশ্র ১৪২৫-এর দিকে জীবিত ছিলেন। বৈশেষিক মত কতকটা গ্রীকদের "শারীর দর্শনের" কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তা'তে জড়পদার্থ এবং চিৎপদার্থের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। জড়পদার্থ মাত্রই অতিসূক্ষ্ম চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর পরমাণু দ্বারা গঠিত। এই পরমাণুগুলি দুটি তিনটি করে সঙ্গত হয়ে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক অণুসকল রচনা করে। পরমাণুগুলি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুতাদি শ্রেণীতে বিভক্ত ; সেগুলি ভিন্ন প্রকৃতির এবং পরস্পর পরিবর্তনীয় নয়। সুতরাং বৈশেষিক পরমাণুবাদ গুণবিভেদের উপর স্থাপিত। এই পরমাণু দল

এক অবিচ্ছিন্ন আকাশে বা প্রসারিত সূক্ষ্মপদার্থে সর্বদা মগ্ন। এবং দুই মূল নিয়মের অধীন ; কাল, অথবা ঘটনা পারম্পর্যে শক্তির প্রকাশ এবং দিশ্, অথবা ব্যাপকভাবে বস্তুর দিক নির্ণয়ে ও প্রসারতায় শক্তির প্রকাশ। এই পরমাণুর পাশাপাশি রয়েছে এক আত্মাণুবাদ ; পরমাণুর মতই অসংখ্য অমর আত্মন্, কিন্তু চিন্ময়রূপী। প্রত্যেক আত্মনের একটি মনস্ বা দ্বিতীয় রূপ আছে (বুদ্ধিগত বা বাহ্যিক অহং) যার দ্বারা সে জগতের জ্ঞান-লাভ করে এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-রূপে সংশ্লিষ্ট হয়। জড়পদার্থের সঙ্গে এই মিলনেই আত্মার অনিষ্ট সাধন হয় ও সেই কর্মের কারণ হয়, যাতে তা'কে সংসারে আবদ্ধ করে। জড়পদার্থের সঙ্গে বিচ্ছেদই তার মোক্ষলাভ, এবং এস্থলেও তার উপায় নিজের অন্তস্থলে প্রবিষ্ট হওয়া (যোগাভ্যাস)।

ঐতিহাসিক সাংখ্যে গভীরতর চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সাংখ্যের মূল উপাদানগুলি মহাভারত রামায়ণে পাওয়া যায় (ভগবদ্গীতা দ্রষ্টব্য) এবং মনুসংহিতায়ও পাওয়া যায়, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের প্রথম পুঁথি হচ্ছে সাংখ্য-কারিকা, যার তথাকথিত রচয়িতা ঈশ্বর কৃষ্ণ (অনুমান ২০০-৩৫০ খৃঃ ?) ও যার ভাষ্যকার বাচস্পতিমিশ্র (৮৫০-র দিকে)। যাকে সাংখ্যসূত্র বলে, সেটি রচিত হয় ১৪০০-র দিকে, এবং তার ভাষ্যকারের মধ্যে অনিরুদ্ধ ১৫০০-র দিকে, ও বিজ্ঞান ভিক্ষু ১৫৫০-র দিকে জীবিত ছিলেন।

বৈশেষিকের ন্যায় সাংখ্যও দ্বৈত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার মতে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা বিদ্যমান—প্রকৃতি এবং পুরুষ। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি (এই তিন গুণের পরিকল্পনা প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে দর্শনশাস্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে) যে কেবলমাত্র পূর্বোক্ত জড়পদার্থ তা' নয় পরন্তু সমগ্র বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা বা ক্রমপরিণতি। বিশ্বচরাচর যেমন দৃশ্য প্রপঞ্চ ও তেমনি আমাদের ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান, যেমন বাহ্য-জগত, তেমনি অনুভূতির জগত সকলেই তার অন্তর্গত। তার শেষ পরিণতিতে প্রকৃতি যেমন একদিকে জড়পদার্থের সৃষ্টি করে তেমনি অন্যদিকে বুদ্ধি ও দেহমনসম্বলিত ব্যক্তিত্ব, অন্তরিন্দ্রিয় বা মনস্ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানভিক্ষু আশ্চর্যরকম বিজ্ঞানসম্মত সূত্রে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এক অলঙ্ঘ্য নিয়মতন্ত্রের নিয়তির বশে প্রকৃতি অবিরত অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে স্থূল অবস্থায় পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ homogeneous থেকে heterogenous-

এর সৃষ্টি হচ্ছে। এই শক্তিটি অন্ধ এবং তার গতি নিরন্তর ভেদসৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব বা অহঙ্কার প্রবণতার দিকে।

প্রকৃতির অপরদিকে আত্মা বা পুরুষ। বৌদ্ধধর্ম আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও বিজ্ঞানভিক্ষুর চক্ষে "আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি"—এই বাক্যেই সেই অস্তিত্বের প্রমাণ। তিনি লিখছেন যে আত্মার অস্তিত্ব "আমি জানি" এই জ্ঞান দ্বারাই প্রমাণিত। যেমন বৈশেষিকে, তেমনি এস্থলেও সেই আত্মাগুলি বাস্তব, শাশ্বত, চিন্ময় এবং অসংখ্য। এখানে বলা দরকার যে প্রকৃতির ক্ষেত্রে যখন সক্রিয় বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব বিশেষ চিন্তা এবং বাহ্যজ্ঞান অস্বীকৃত হয়েছে তখন পুরুষ বা সাংখ্যের আত্মাগুলিকে নৈর্ব্যক্তিক অবচেতন এবং লিঙ্গরহিত আত্মাবিশেষ মনে করে ছাড়া উপায় নেই। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনেই বিশ্ব-জগত ও ভবযন্ত্রণার উৎপত্তি। বিশ্বজগতের উৎপত্তি এই কারণে যে প্রকৃতি জড়বৎ ও মৃতবৎ, কেবলমাত্র পুরুষের সংস্পর্শেই তাঁর সাম্যাবস্থার ভঙ্গ হয়, ও জাগতিক ক্রমবিকাশধারার সূত্রপাত হয়, এবং তিনি পুরুষের প্রতি অগ্রসর হতে থাকেন তার সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবন্ত ব্যক্তি সৃজনের উদ্দেশ্যে। এই একই প্রক্রিয়ায় এককালে ভবযন্ত্রণাও সৃষ্ট হয়, কারণ পুরুষের সঙ্গে মিলনদ্বারা প্রকৃতি উক্ত সম্পূর্ণ চিন্ময় ও নির্বিকার আত্মাণুকে আবদ্ধ করতঃ জীবে পরিণত করেন; যে জীব প্রাণ বিশিষ্ট, বেদনা বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যে জীবনের কাছ থেকে কর্ম পায় এবং যাকে কর্ম পুনঃ পুনঃ ভবযন্ত্রণা বা "সংসারের" মধ্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য করে নিমজ্জিত। পুরুষের উপর প্রকৃতির এমনই দুর্দান্ত প্রভাব যে, অবশেষে এই চিন্ময় আত্মা সামাজিক অহংয়ে পরিণত হিন্দুধর্মের কর্মফল জনিত সেই দেহমন সম্বলিত ব্যক্তিতে এমনই লীন হয় যে নিজে দুর্গম ও নির্বিকার হওয়া সত্ত্বেও এই প্রক্ষিপ্ত অহংয়ের ব্যাথার ব্যথী হয়ে পড়ে।

পুরুষ বা পরম আত্মাকে এই প্রকৃতির বেদখল থেকে ছিনিয়ে নেওয়াতেই মোক্ষলাভ। এই নিমিত্ত সংসার আত্মাকে যে খোলসে আবৃত করেছে, যে আবরণের দরুণ সে নিজের কাছে নিজেকেই বিকৃত রূপ ধারণ করে, তার থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে,—অর্থাৎ সামাজিক অহং থেকে, দেহমন সম্বলিত বা বংশানুক্রমিক অহং থেকে, ফলতঃ সকলপ্রকার সম্বন্ধ ঘটিত আপেক্ষিক চিন্তার কবল থেকে। কেবল তখনই আমাদের অন্তরে সেই পরম সত্যের সেই

নির্বিকার সত্তার প্রকাশ হবে। এস্থলেও এই সত্তা কল্পিত হয়েছে অগুণ চিন্তারূপে, শূন্য কিন্তু সম্ভাবনাপূর্ণ, লিঙ্গ রহিত, নিরাকার ও নির্বিশেষে এক অচেতন রূপে।

তথাকথিত পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন বিশেষ যোগীদের বহুযুগব্যাপী তপস্যার সঙ্গে সাংখ্য হতে গৃহীত একটী মতের সংযোগ সাধন করলেন। সুতরাং যোগসূত্র (৪০০ ও ৫০০ খৃঃ-র মধ্যবর্ত্তী ?) হচ্ছে সাংখ্যের বুদ্ধিগত অনুমান আলোচনাকে কার্যত প্রয়োগ করবার প্রচেষ্টা। সে দর্শন ব্রহ্মচারীকে "স্ব-ভাবে স্ব-প্রতিষ্ঠ" হতে উপদেশ দেয়, অর্থাৎ সেই আত্মা—পুরুষকে অন্তরে উপলব্ধি করতে, যিনি তার প্রকৃত সত্তা। এই উদ্দেশ্যে যোগশাস্ত্র একটি মানসিক কৃচ্ছ্র সাধনার সমর্থন করেন—যথা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভাবের লোপ, মনশক্তির বিরোধিতা, অহংয়ের ভিত্তিনাশ ও অন্তর্নিহিত পরমাত্মায় চিত্তের অভিনিবেশ ; সেই সঙ্গে একটি বিশেষ শারীরিক সাধনারও ব্যবস্থা দেন—যথা দীর্ঘকালব্যাপী নিশ্চলতা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আয়ত্তলাভ, অলৌকিক দর্শনলাভ পর্যন্ত স্থির দৃষ্টি, ইত্যাদি (রাজযোগ ও হঠযোগ)। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে একপক্ষে সাংখ্য যেমন নাস্তিক, অপরপক্ষে পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র একটি ঈশ্বর বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি শ্রেষ্ঠতর আত্মা, অন্যান্য পুরুষ তথা প্রকৃতি হতে স্বতন্ত্র, এবং যিনি শেষোক্ত থেকে প্রথমোক্তদের মুক্তিলাভে সহায়তা করেন।

হিন্দু একেশ্বরবাদ। শঙ্করের বেদান্ত।

বেদান্তে (বা বেদের চূড়ান্তে) উপনিষদের দার্শনিক মতবাদ (বিবিদ্ধভাবে) বা সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দর্শন প্রতিভাত। এই সম্প্রদায়ের ব্রহ্ম (বা বেদান্ত) সূত্র নামক মূল গ্রন্থ ভুলক্রমে বাদরায়ণের প্রতি আরোপিত হয়, এবং Masson-Oursel সাহেবের মতে ৩৫০ থেকে ৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত এর সূত্রগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট। মহাযানের নৈরাত্ম মায়াবাদ (acosmism ?) এবং বৈশেষিকের সরল বাস্তববাদ, উভয়ই খণ্ডন পূর্বক এঁরা আধ্যাত্মিক একমেবা-দ্বিতীয়মের উপদেশ দান করেন কিন্তু এমন অনির্দিষ্টভাবে যে, বোঝা যায় না তাঁদের মতে বিশ্বব্রহ্মময় বা তিনি তদতিরিক্ত কিছু। সুতরাং তাঁদের পরস্পর বিরোধী ভাষ্যেরও অভাব নেই, এমন কি যতপ্রকার ভাষ্য ততপ্রকার বেদান্ত

দর্শন,—অর্থাৎ প্রধানতঃ পাঁচটি ঃ—শঙ্করের, রামানুজের, নিম্বার্কের, মাধ্বাচার্যের ও বল্লভাচার্যের।

শঙ্কর (অনুমান ৭৮৮—৮২০) ছিলেন শৈবপন্থী ব্রাহ্মণ ও তাঁর জন্ম মালাবার প্রদেশস্থ কালাদিতে। তিনি কিছুকাল শৃঙ্গেরীতে (মহীশূর) অবস্থান করেন, পরে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধতা করবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষময় ভ্রমণ করেন (ও সে ধর্মের বিলয় সাধনের তিনিই প্রধানতম উদ্যোগী)। প্রভূত পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হয়ে ৩২ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় কেদারনাথে (হিমালয়) অথবা কাঞ্চিতে (মাদ্রাজ)।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে বৌদ্ধধর্মের এই পরিপন্থীর গুরু ছিলেন চিন্ময়বাদী গৌড়পাদ (অনুমান ৭৮০), যিনি ছিলেন অর্ধ বৌদ্ধ ও যে পরিমাণ উপনিষদের সেই পরিমাণেই মাধ্যমিক মতাবলম্বী, এবং যাঁর কাছ থেকে সম্ভবত শঙ্কর তাঁর বিশ্ব মায়াবাদের প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

শঙ্করের মতবাদ কেবলাদ্বৈত। উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের সমর্থন-পূর্বক, কিন্তু তদপেক্ষা প্রবলভাবে শঙ্কর স্থাপন করেন যে, ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, চিন্ময় এবং অন্তর্নিহিত। ইনি ভিন্ন অপর কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই। অন্তরে বা বাহিরে কোনপ্রকার সম্বন্ধ আপেক্ষিকতা বা বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এবং এই নির্বিকার, এই অদ্বিতীয় সত্তা, এই পূর্ণব্রহ্ম, ইনি হচ্ছেন চিত্তবস্তুর সার, প্রত্যেক জীবাত্মায় সমভাবে অনুপ্রবিষ্ট এবং পরমাত্মা। শঙ্করের মনস্তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব,—সবই উক্ত মূল উক্তি থেকে নিঃসৃত।

১। মনস্তত্ত্ব।

শঙ্কর আত্মাকে তাঁর সকল যুক্তিতর্কের মূলে স্থাপন করেন। তিনি বলেন "আত্মাই—সকল প্রকাশের ক্ষেত্র,—সুতরাং সকল প্রকাশের পূর্ববর্ত্তী।" এই আত্মন্‌কে বাস্তব ও সক্রিয় চিৎপদার্থ মনে করলেও চলবে না ; অন্যান্য হিন্দু দর্শনের ন্যায় এ স্থলেও সেটি একপ্রকার অবচেতন বস্তু, ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত অথচ নৈর্ব্যক্তিক কারণ, জ্ঞান ক্রিয়ার অন্তর ভিত্তি। বুদ্ধি ও অনুভূতির সীমাবদ্ধ "উপাধি" দ্বারা বা সামান্যতঃ বলতে গেলে "অবিদ্যা" দ্বারা প্রাণবান ও জ্ঞানবান ব্যক্তিত্ব বস্তুত অহং বা মন ও জীবাত্মা, এই আত্মনের উপরিভাগে

স্থজিত হয়। যদি আত্মন্ বা স্বয়ং”ই হয় পরাসত্য, তবে আমি বা Descartes-এর দর্শনের অহং মায়া ভিন্ন কিছুই নয়। ফলত এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, চিন্তাবিহীন আত্মন্ নির্বিশেষ ও সম্ভাব্যতাপূর্ণ চিৎপদার্থই হচ্ছে একমাত্র প্রকৃত, একমাত্র সত্য আত্মন্।

২। সৃষ্টিতত্ত্ব।

Berkeley-র ন্যায় শঙ্করও অধ্যাত্মবাদকে মায়াবাদ পর্য্যন্ত ঠেলে নিয়ে যান। বাহ্য জগতের, অর্থাৎ নামরূপের জগতের অস্তিত্ব নেই। জড় জগতের মূল যে অণুপরমাণু তত্ত্ব, সেইটেই স্বতোবিরোধী। বিশ্ব প্রপঞ্চ মরীচিকা মাত্র, মায়ামাত্র; আমাদের মানসিক ধারণাকে বাহিরে প্রতিফলিত করে' এবং একটি কাল্পনিক বহির্জগতে বাস্তবতা আরোপ করে' এই মায়া আমরা সৃজন করে থাকি। জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা, অহং এবং ইদং, এ সকলই বুদ্ধির সীমাবদ্ধ উপাধি অর্থাৎ অবিদ্যার কৃত্রিম সৃষ্টি।

৩। ভগবৎতত্ত্ব।

শঙ্করের ভগবত্তত্ত্ব তাঁর মনস্তত্ত্বেরই প্রতিরূপ—ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপ ব্রহ্মণ-আত্মন্, বা বিশুদ্ধ সত্তা ও নির্বিকার চিদ্বস্তু। ইনি অসঙ্গের আলয়-বিজ্ঞানেরই অনুরূপ, উপরন্তু বাস্তবতা বিশিষ্ট সেই নির্গুণ নির্বিশেষ সত্তা, যিনি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এমন কি জ্ঞানক্রিয়ার পূর্ববর্তী; বা অন্য কথায় বলতে গেলে সম্ভাব্যতাপূর্ণ অখণ্ড চিৎস্বরূপ। শঙ্কর বলেন “একমাত্র সত্যস্বরূপ হচ্ছেন নিরাকার, নির্গুণ, দেশকালকারণাতীত পূর্ণজ্ঞান।”

এই সম্ভাব্যতাপূর্ণ অখণ্ড সত্তা কিরূপে নিজেকে খণ্ডন ও নামরূপ ধারণপূর্বক অহং এবং ইদং সৃষ্টি করেন, বা তা'তে পরিণত হলেন ?—মায়া দ্বারা বিশ্বব্যাপী ভ্রম দ্বারা—যে তাঁর সহজাত বলে কল্পিত। মায়া বশতঃই এই নির্গুণ ও পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ সেই সকল গুণ প্রাপ্ত হন, যার দ্বারা এই দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রতিভাত হয়। মায়ার লীলাতেই নির্বিকার ব্রহ্মণ সেই সকল বিকার বা উপাধি বিশিষ্ট হয়ে পড়েন, যার দ্বারা বিশেষ রূপ ও পরিণতিরূপের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়া একাধারে ভ্রান্ত ও অনন্ত। ভ্রান্ত এই জন্য যে, ব্রাহ্মণের উপরিদেশে মায়ার এই

লীলায় তাঁর স্বভাবের কোন বিকার হয় না,—তিনি আপনাতে যেমন ছিলেন তেমনি নির্বিকার সম্ভাব্যতাপূর্ণ, চিন্তার পূর্ববর্তী সত্তাই থাকেন; অনন্ত এই জন্য যে, অনন্তকাল ধরেই মায়া ব্রহ্মাণের বুকে এইরূপ লীলা খেলা করে' আসছেন। ফলে দাঁড়ায় এই যে, শঙ্করীয় বিশ্ব একাধারে ভ্রান্ত ও অনন্ত।

এই মতবাদ থেকে মোক্ষের যে ধারণা হয়, তা' উপনিষদেরই সমতুল্য। আমার আত্মনই ব্রহ্মাণ, আমার অন্তরাত্মার সার হচ্ছেন পূর্ণব্রহ্ম—তত্ত্বমসি এই জ্ঞানের দ্বারাই বৈদান্তিক সংসারের মোহ আবরণ মোচন করেন, এবং ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করে সেই পরব্রহ্মে বিলীন হন, যিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ।

---

* শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী কর্ত্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত "রেনে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ" সম্পূর্ণ আকারে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ প্রকাশ করিবেন।

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাই হোক, একদিন যথারীতি বিভূতি আর মাধবীলতার বিবাহটা হইয়া গেল। প্রকাশ্য জীবনটা যেমন কাটিতেছিল প্রায় সেই রকমই কাটিতে লাগিল দুজনের, বেশভূষার কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল মাধবীলতার এবং চেহারাটাও যেন তার বদলাইয়া যাইতে লাগিল। যা দেখিলে মনে প্রশ্ন জাগে, এতদিন কি অসুখী ছিল মেয়েটা, এবার সুখী হইতে আরম্ভ করিয়াছে ?

বিবাহে বিপিন আসিয়াছিল, পরে আরেক দিন আসিয়া সে অনেকক্ষণ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া গেল,—সদানন্দ ছাড়া। আমল দিলে সদানন্দের সঙ্গেও হয়তো সে ভাব জমাইয়া যাইত—শত্রুতা ভুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজনে মানুষ মানুষের সঙ্গে যে রকম ভাব জমায়। মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে কেন্দ্র করিয়া নতুন একটি আশ্রম খুলিতেছে এ খবরটা বিপিন পাইয়াছিল কিন্তু রাগ দুঃখ বা হিংসার বদলে তার উৎসাহই দেখা গেল বেশী। নিজেই কথা তুলিয়া সে মহেশ চৌধুরীকে বলিয়া গেল যে, রেশারেশি আশঙ্কা করিবার কোন কারণই অনুমান করা যায় না, বিপিন আর মহেশের আশ্রমের উদ্দেশ্য হইবে সম্পূর্ণ পৃথক।

'আপনার আশ্রমের উদ্দেশ্যটা কি বিপিনবাবু ?'

প্রশ্নটা অসঙ্গত। এতকাল যে আশ্রম চলিতেছে, চারিদিকে যে আশ্রমের বেশ নামও একটু আছে, তার মালিককে বাড়ীতে পাইয়া একেবারে আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ রকম একটা প্রশ্ন না করিলেই ভাল হইত। মহেশ চৌধুরীকে বিপিন কোনদিন পছন্দ করিত না, আশ্রমে লোকটাকে সে চিরদিন দমাইয়া রাখিবার চেষ্টাই করিয়াছে, এখন হঠাৎ অতীতের কথা ভুলিয়া বাড়ী বহিয়া আসিয়া এ রকম খাতির জমানোর চেষ্টাতেই মহেশের কৃতার্থ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। আশ্রমের উদ্দেশ্য ? কে না জানে বিপিনের আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা। জিজ্ঞাসা করাটাই বাহুল্য।

বিপিনের কোন জবাব না পাইয়া মহেশ চৌধুরী আবার বলিয়াছিল, 'সত্যি কথাটা বলি, এতকাল আপনার আশ্রমে যাতায়াত করছি কিন্তু উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পারি নি। প্রভু যতকাল ছিলেন ততকাল তবু একটা কারণ ছিল ওঁর জন্যে—'

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, 'প্রভুই বটেন।'

মহেশ চৌধুরী দুই কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিয়াছিল, 'ছি বিপিনবাবু, ছি।'

তবু তো সর্ব্বজনবিদিত আশ্রমের উদ্দেশ্যটা বিপিন পর্য্যন্ত মহেশকে ঠিক ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিল না। নিজের মনেও তার ধারণা ছিল কথাটা অত্যন্ত সহজ ও সরল। বলার সময় দেশ, সমাজ ও ধর্ম্মের মধ্যে বক্তব্যটা দিশেহারা হইয়া গেল। দেশ, সমাজ ও ধর্ম্মের কল্যাণ তো বটেই, কিন্তু কোন দিকে কি ভাবে?

'আহা, আশ্রমে কি হয় না হয় সে তো আপনার জানাই আছে।'

মহেশ চৌধুরী সবিস্ময়ে বলিয়াছিল, 'কিন্তু আশ্রমে তো আপনার একরকম কিছুই হয় না? ভাল একটা যায়গা দেখে কয়েকজন লোককে শুধু থাকতে দিয়েছেন। প্রভু যখন ছিলেন তখন তবু মাঝে মাঝে দশজন এসে সদুপদেশ শুনবার সুযোগ পেত, এখন—'

'এখনও পায়।'

'কে বলেন?'

'আমি বলি। আশ্রমে যাঁরা আছেন, তাঁরাও বলেন।'

'লোকজন আসে?' মহেশ চৌধুরী সন্দিগ্ধ ভাবে বলিয়াছিল, 'শুনলাম লোকজনের আসা অনেক কমে গেছে?'

মহেশ চৌধুরীর আশ্রম স্থাপিত হওয়ার পব বিপিনের আশ্রমে লোকজনের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল,—একরকম বন্ধই হইয়া গেল বলা চলে। নূতন আশ্রমের উদ্বোধন উৎসবটা হইল বেশ জমকাল। সহর হইতে দু'চারজন নাম করা লোক আসিল, খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণও বাহির হইল। বিপিনের আশ্রমে যারা সদানন্দের উপদেশ শুনিতে যাইত তারা সকলে তো আসিলই, কাছে ও দূরের আরও অনেক গ্রামের নারী পুরুষ ছেলেমেয়ের আবির্ভাবও ঘটিল। ভিড় হইল ছোটখাট একটি মেলার মত। তার উপর

আবার ছিল কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থা। কদিন ছোটখাট গ্রামটির উপর দিয়া যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গেল তা সত্যই অভূতপূর্ব্ব। উৎসব শেষ হইয়া গেল, দূরের যারা আসিয়াছিল সকলেই প্রায় ফিরিয়া গেল, আশ্রমের চিহ্ন হিসাবে খাড়া রহিল কেবল মহেশ চৌধুরীর বাড়ীর পাশে বাগানের পিছনের মাঠে মস্ত একটা নতুন চালা আর বাগানের বাঁশের গেটের উপরে একটুকরা আলকাত্‌রা মাখানো চারকোণা কাঠে সাদা অক্ষরে লেখা 'শ্রী শ্রী সদানন্দ স্বামীর আশ্রম'। নতুন আশ্রমে মানুষের ভিড় কিন্তু কমিল না, মানুষের মুখে নতুন আশ্রমের আলোচনাও থামিল না। প্রত্যেক দিন দলে দলে লোক আসিয়া নতুন চালার নীচে বসে, মহেশ চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও সদানন্দের বিস্তারিত উপদেশ শোনে, দলে দলে সদানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সদানন্দ যতদিন বিপিনের কাছে ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে তার শিষ্যত্ব লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, অনেক বাছাবাছির পর বিপিন কদাচিৎ যাকে উপযুক্ত মনে করিত তাকেই কেবল সদানন্দ শিষ্য করিত। এখানে সব বাছবিচার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে আসে তাকেই সদানন্দ আলিঙ্গন দেয়।

আলিঙ্গনটাই শিষ্যের দীক্ষা। এখানে মহেশ চৌধুরীর পরামর্শে অথবা অনুরোধে এই নতুন প্রথায় দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের জন্য ব্যবস্থাটা অবশ্য অন্য রকম, দু'পায়ের পাতার উপর মেয়েরা মাথা নামাইলে সদানন্দ মাথার উপর দুটি হাত রাখিয়া তাদের শিষ্যত্ব দান করে। বিভূতি আশ্রমের ম্যানেজার। প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো খাতায় সে সকলের নাম, ঠিকানা এবং প্রণামীর পরিমাণটা লিখিয়া রাখে।

মন্ত্রশিষ্যও করা হয় কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। মন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে যারা আবেদন করে ও আগ্রহ জানায়, কেবল তাদেরই কাণে সদানন্দ মন্ত্রদান করে।

মহেশ চৌধুরীই একদিন সবিনয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া সদানন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, 'প্রভু, গুরু অনেকের আছে, গুরু ত্যাগ করাটা ঠিক উচিত কাজ হয় না। মন্ত্র দেওয়া তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু মন্ত্র নিয়ে শিষ্য হবার নিয়ম করলে যারা আগেই মন্ত্র নিয়েছে তাদের বড় মুস্কিল হবে। এমনি শিষ্য হতে তো দোষ নেই, উপদেশ শুনবে,

সাধন ভজন পূজা অর্চ্চনার নিয়মকানুন জেনে যাবে, সৎকাজে যোগ দেবে, আশ্রমের নিজের লোক হয়ে থাকবে, তাই যথেষ্ট। এ ভাবে শিষ্য করলে কারও আশ্রমে যোগ দিতে কোন অসুবিধা থাকবে না।'

সদানন্দ একটু খুঁত খুঁত করিয়া বলিয়াছিল, 'কিন্তু নির্ব্বিচারে সকলকে—'

মহেশ চৌধুরী বলিয়াছিল, 'বেশী বাছাবাছি করে লাভ কি প্রভু? সবাইকে নিলে আমাদের ক্ষতিও কিছু নেই। ফাঁকিবাজ বাজে লোক হয়, খাতায় শুধু তার নামটা থাকবে। শিষ্য হলেও শিষ্য হয়েছে বলেই বিশেষ কোন অধিকারও দেওয়া হবে না যে ক্ষতি করবার সুবিধা পাবে। ক্ষতি করার ইচ্ছা যদি কারও থাকে, শিষ্য হিসাবে খাতায় নাম উঠলেও যতটা সুযোগ পাবে শিষ্য না হয়েও ততটা সুযোগ পাবে।'

শুনিতে শুনিতে সদানন্দের মনে হইয়াছিল, মহেশ চৌধুরী বুঝি তাকে আশ্রম পরিচালনার কায়দা কানুন শিখাইয়া দিতেছে—গুরু যেমন শিষ্যকে শিখায়। মহেশ চৌধুরীর মুখে বিনয় ও ভক্তির স্থায়ী ছাপ থাকে, জোড় হাতে দেবপূজার মন্ত্রোচ্চারণের মত করিয়া সে কথা বলে, তবু আজকাল প্রায়ই সদানন্দের এ রকম মনে হয়। মনে হয়, এর চেয়ে বিপিন যেন ভাল ছিল, অন্তরালে সে তর্ক করিত, উপদেশও দিত হুকুমও দিত, কিন্তু সে সব ছিল বন্ধুর মত, তার কাছে নিজেকে এতটা অপদার্থ মনে হইত না।

আরও একটা ব্যাপার সদানন্দ লক্ষ্য করে। তার নামে আশ্রম করা হইয়াছে, সে-ই একরকম ভিত্তি এই আশ্রমের অথচ খাতির যেন লোকে তার চেয়ে মহেশ চৌধুরীকেই করে বেশী। লোকের কাছে নিজের দামটা আগের চেয়ে যে কমিয়া গিয়াছে এটা সদানন্দ স্পষ্টই অনুভব করিতে পারে। সকলের মুখে আর যেন আগের সেই সভয় ভক্তির ছাপটা খুঁজিয়া মেলে না, সকলের কথায় ও ব্যবহারে মানুষের বদলে নিজেকে আর দেবতা হিসাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না। মহেশ চৌধুরীর উপরে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে দিন দিন। এত যে ন্যাকামি মহেশ চৌধুরী করে, সকলের কাছে সব সময় মোসাহেবের মত নত হইয়া থাকে,—তবু!

মাঝে মাঝে সদানন্দ সন্দেহমূলক ক্ষীণ একটা অনুভূতির মধ্যে নিজের চালচলনের ভাঙ্গনধরা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠে। আগের মত

তেজ কি আর তার নাই? আগের সেই সহজ আত্ম-বিশ্বাস? একটু একটু ভয় কি সে করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে সাধারণ তুচ্ছ মানুষগুলিকে? মানুষের সংস্পর্শে আসিলে মাঝে মাঝে হঠাৎ সদানন্দ নিজেকে যাচাই করিবার চেষ্টা করে, কোথায় কি ঢিল হইয়া গিয়াছে তার নিজের মধ্যে যা সকলে টের পাইয়া যাইতেছে? টেরও কি পাইয়া যাইতেছে সত্যসত্যই? আর কিছুই সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, মৃদু একটা অস্বস্তিবোধের স্থায়ী অস্তিত্ব ছাড়া, আত্মবিশ্লেষণের অন্যমনস্কতা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইবার পর যেটা আরও বেশী জোরালো হইয়া পড়ে। সদানন্দ জানে, খুব ভাল করিয়াই জানে, এমন কোন পরিবর্ত্তন তার বাহিরে প্রকাশ পায় না কারও পক্ষে যেটা লক্ষ্য করা সম্ভব। তবু মনটা কেন যে খুঁত খুঁত করিতে থাকে! আগে কথা বলার মধ্যেও একটা বিস্ময়কর আনন্দ ছিল, নিজের কথা শুনিতে শুনিতে নিজেই সে মুগ্ধ হইয়া যাইত, সকলের অভিভূত ভাব দেখিয়া নিজের মধ্যে একটা অপাথিব শক্তির সঞ্চার অনুভব করিত। এখন কথা হয় তো সে বলে আগের মতই, সামনের ভীরু, অসহায় আর অসুখী শিষ্যগুলিকে সুখ ও শান্তির সন্ধান দিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা যে তার আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই হয় তো বলার সময়টা তার থাকে না, কিন্তু তারপর একসময় তার মনে হইতে আরম্ভ হয়, সমস্ত জড়াইয়া ফলটা সুবিধাজনক হইল না। এই ভীরু অসহায় আর অসুখী শিশুগুলির মনে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাব আগের মত কাজ করিতেছে না। করা সম্ভবও নয়, কারণ নিজেই নিজেই কি সে বুঝিতে পারিতেছে না যে আর সব ঠিক আগের মত থাকিলেও সমগ্রভাবে ধরিলে তার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের প্রভাবটা আর আগের মত নাই?

ব্যাপারটা সদানন্দের বড়ই দুর্ব্বোধ্য মনে হয়। কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না। কখনও সে ভাবে, সব কি তার নিজের কল্পনা, আজকাল একটু কল্পনাপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে? কখনও ভাবে, এখানকার প্রকাশ্য খোলাখুলি জীবন ভাল লাগিতেছে না বলিয়া, সব বিষয়ে বিরক্তি জাগিতেছে বলিয়া, এ রকম হইতেছে? বিপিনের মত একজন তাকে আড়াল করিয়া রাখে না, অধিকাংশ সময় নিজের একটি কুটীরের অন্তরালে নিজের মনে একা থাকার সুযোগ পায় না, সেইজন্য কি আনন্দ, উৎসাহ, শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে?

অথবা মাধবীলতার জন্য মন কেমন করিতেছে, চিরদিনের জন্য মেয়েটা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া ?

কিন্তু মাধবীলতার জন্য বিশেষ যে কোন কষ্ট হইতেছে তাও সদানন্দের মনে হয় না। প্রথমটা সত্যই বড় রাগ হইয়াছিল, পছন্দসই একটা খেলনা হাতের মুঠায় আসিয়া ফসকাইয়া গেলে ছোট ছেলের যেমন অবুঝ রাগ হয়, খেলনাটা একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিবার সাধ জাগে, কিন্তু সে সব সাময়িক প্রতিক্রিয়া কি মিটিয়া যায় নাই ? মাধবীলতাকে দেখিলে এখন কি একটা বিতৃষ্ণার ভাবই জাগে না তার ?

অন্য একটা কারণেও মাধবীলতার উপর আজকাল মাঝে মাঝে সদানন্দের রাগ হয়। মাধবীলতা প্রাণপণে তাকে এড়াইয়া চলে, কথা তো বলেই না, সামনে পড়িলে তাড়াতাড়ি সরিয়া যায়। মাঝে মাঝে মহেশ চৌধুরীর পারিবারিক সান্ধ্য-মজলিসে বাধ্য হইয়া যদি বা হাজির থাকে, সদানন্দের যতটা যতটা সম্ভব, পারিলে একেবারে পিছন দিকে, বসিবার চেষ্টা করে।

একদিন খুব ভোরে বারান্দায় মাধবীলতাকে একা দেখিয়া সদানন্দের একটু আলাপ করার সখ চাপিয়াছিল। নিছক আলাপ, আর কিছু নয়। হাসিমুখে সে বলিয়াছিল, 'এই যে মাধু। তোমার যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না।'

'আমার বিয়ে হয়ে গেছে জানেন ?' বলিয়া মাধবীলতা তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। মাধবীর বাড়াবাড়িতে সদানন্দের বড় জ্বালা বোধ হয়, সেই সঙ্গে হাসিও পায়। এত অবিশ্বাস কেন তাকে ? এ রকম হীন অমানুষ মনে করা ? কি ছেলেমানুষ মাধবীলতা ! তাই বটে, মেয়ে জাতটাই এরকম উদ্ভট হয় বটে !

এ সব ছাড়াও সদানন্দের মানসিক জগতে আরও একটা ব্যাপার ঘটে, যেটা আরও গুরুতর, আরও মারাত্মক, আরও বিস্ময়কর, আরও গভীর এবং আরও অনেক কিছু। অন্য কেউ নিজের মনের এরকম একটা অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে সে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া নিত লোকটার মাথা খারাপ হইয়াছে, কিন্তু নিজের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটায় সে বেশ বুঝিতে পারে মাথা খারাপ হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই, এটা

মনোবিকার নয়, মনের মধ্যে তার এলোমেলো হইয়া যায় নাই কিছুই। যা কিছু অজানা ছিল, বুদ্ধির অগম্য ছিল, দুর্ব্বোধ্য সঙ্কেতের মত সে সব অস্পষ্ট স্পষ্টতা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতকাল নিজের সমগ্র নিজস্বতা বলিয়া যা সে জানিত, পরিবর্ত্তনহীন বিচ্ছিন্নতা বজায় থাকিয়াও এই অভিনব স্পষ্টতার সঙ্গে একটা আতঙ্কময় ঝাঁপর-ঝাঁপর ভাবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সদানন্দ জানে সব সে বুঝিতে পারিতেছে, তবু বার বার নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে ব্যর্থ হইয়া যায়। বুঝাইবার চেষ্টাটা হয় নানা ভাবে। ধরা যাক, প্রকাণ্ড গভীর একটা বন, যার মধ্যে আনুমানিক আবছা অন্ধকার, বাঘ ভালুক সিংহ, চিরস্থায়ী ভয় ও বিষাদ—বনের ঠিক বাহিরে ঝলমলে সূর্য্যালোকে দাঁড়াইয়া অজ্ঞাত কারণের অসহ্য শোকে শান্ত ও নির্ব্বিকার সদানন্দ চুপ চাপ গা এলাইয়া দিয়া মাটি হইতে কয়েক হাত উঁচুতে বাতাসে ভাসিতেছে। এরকম আরও কয়েকটা ইচ্ছাকৃত স্বপ্নের সাহায্যে সদানন্দ নিজের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, নিজের মনের অপূর্ব্ব ব্যাপারটা বুঝিতে পারে বলিয়া তার যে ধারণা আছে, সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্ন যা থাকে এবং জাগিয়া থাকার সময় স্বপ্ন যা হইয়া যায়, তার পার্থক্যটা ঘুচাইয়া দিবার ক্ষমতা তার হয় না, তাই ঘুমন্ত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নকে জাগ্রতাবস্থায় ব্যাখ্যা হিসাবে সামনে খাড়া করিয়া জাগ্রত অবস্থার স্বাভাবিক স্বপ্নের সঙ্গে কোন মিল সে খুঁজিয়া পায় না। জাগ্রত অবস্থার কল্পনার স্বপ্ন হইলেও কথা ছিল, বিশেষ প্রশ্রয় না দিলেও বিচিত্র, উদ্ভট আর অসম্ভব অনেক কিছুকে সম্ভব ধরিয়া নিয়া খাপছাড়া আনন্দ উপভোগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সদানন্দের পরিচয় আছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ।

একবার কেবল সদানন্দের মনে হইয়াছিল, এই কি প্রেম, প্রিয়কে হারানোর প্রেম যা হয়, আসল খাঁটি প্রেম? মাধবীলতাকে হারানোর পর হইতেই তো তার মধ্যে এরকম হইতেছে? কিন্তু নিজের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাকুলতা এত সহজে মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অজানা ও দুর্ব্বোধ্য স্মৃতি হোক, উপলব্ধি হোক, ক্ষয়িতমূল আত্মবিকাশের বিচ্ছিন্ন অংশ হোক, অথবা আর যাই হোক, স্পষ্টতর হওয়ার যে প্রক্রিয়া চলিতে থাকে তার সঙ্গে মাধবীলতার কোন সম্পর্কই নাই। মাধবীলতা সম্বন্ধে মানসিক

দুর্ব্বলতা ঘটিবার একটা আশঙ্কা মনে আসিয়াছিল, সেই আশঙ্কাটার জন্যই এ ধরণের কথা সদানন্দের মনে আছে।

এক সময় হঠাৎ দরজা বন্ধ করিয়া সদানন্দ ঘরের কোণে মাটিতে বসিয়া পড়ে, আসন থাকিলেও মনে থাকে না। মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসে, চোখ বন্ধ করে, হাত জোর করে—ইচ্ছায়ও নয় অনিচ্ছায়ও নয়। বিড় বিড় করিয়া বলিতে থাকে—হে ঈশ্বর, দয়া কর। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকো, এ সময় আমায় দয়া কর। তুমি তো জানো আমি স্বীকার করি না তুমি আছ, তবু যদি থাকো, দয়া কর। তুমি তো সব জানো—তুমি তো জানো কি উদ্দেশ্যে আমি এখন মেনে নিচ্ছি যে তোমায় আমি স্বীকার করি না—তোমায় স্বীকার করি না মেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যটা কেন মেনে নিচ্ছি তাও তো তুমি জানো—কথা জড়াইয়া সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া যায়। মাথাটা প্রণাম করার ভঙ্গিতে মাটিতে ঠেকাইয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে

এমনিভাবে ভাবোচ্ছ্বাসের নেশায় সদানন্দ অন্যমনস্কও হয়, নিজেকে শ্রান্ত শান্ত করিয়া ঘুমও পাড়ায়।

আশ্রমের বড় চালাটার পাশে সদানন্দের জন্য একখানা নতুন ঘর তোলা হয়। সদানন্দ হাসিয়া বলে, 'বাড়ীতে রাখতে ভরসা হচ্ছে না মহেশ ?'

মহেশ আহত হইয়া বলে, 'প্রভু ?'

'আহা, এত সহজে ঘা খাও কেন বলত মহেশ ? তামাসা বোঝ না ?'

স্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ হঠাৎ বলে, 'না প্রভু, আমি সত্যই বড় অপদার্থ। আপনি যা বললেন ওই জন্যই আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি।'

মহেশ চৌধুরীর মুখে কথাটা এমন খাপছাড়া শোনায় বলিবার নয়। অন্তঃপুরে তাকে স্থান দিতে সাহস না হওয়াও মহেশের পক্ষে যেমন আশ্চর্য্য, তার সামনে এ ভাবে স্বীকার করার সাহস হওয়াও তার চেয়ে কম আশ্চর্য্য নয়। এই মহেশ চৌধুরীই না হাতুড়ি দিয়া নিজের মুখে আঘাত করিয়াছিল, মাধবীলতাকে অপমান করার জন্য সদানন্দের উপর ছেলের রাগ হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত বাবদে ?

'আমায় তুমি আর বিশ্বাস কর না, না মহেশ ?"

'বিশ্বাস করি বৈকি প্রভু, আপনি তো দেবতা। তবে সাধনার যে স্তরে

আপনি পৌঁচেছেন, এখন আর আপনাকে ঘরগেরস্থালির মধ্যে রাখতে ভরসা হয় না। আপনার জন্যে সারাদিন আমার বুকের মধ্যে কাঁপে প্রভু। আমি এ অবস্থাটা পার হতে পারি নি প্রভু, তবে আমি তো অপদার্থ বাজে লোক, আমার সঙ্গে আপনার তুলনাই হয় না,—আপনি পারবেন। আপনি নিশ্চয় পার হয়ে যাবেন।

সদানন্দ ভ্রু কুঁচকাইয়া মহেশ চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, বুঝিয়াও যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে না মানুষটাকে, দ্বিধা সন্দেহ ভয় শ্রদ্ধা মমতা প্রভৃতি কত বিভিন্ন মনোভাব যে পলকে উদয় হয় তার হিসাব থাকে না। যা বলিল মহেশ চৌধুরী তাই কি তবে ঠিক। মিথ্যা কথা তো মহেশ বলে না। কেমন করিয়া লোকটির সম্বন্ধে এই ধারণাটা তার নিজের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল নিজেই সদানন্দ তা জানিতে পারে নাই, কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে এই ধারণাটি আর সব মনোভাবকে যখন চাপা দিয়া মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন সদানন্দ এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসে। হঠাৎ মহেশের পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, 'মহেশ, আমায় তুমি রক্ষা কর—বাঁচাও আমায়।'

তিন সন্ধ্যা পরম ভক্তিভরে যার পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকায় তাকে এ ভাবে পায়ে পড়িতে দেখিয়া মহেশ চৌধুরীর মূর্চ্ছা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মানুষটা সে সত্যই খাপছাড়া। আরও কত তুচ্ছ কারণে কতবার যে ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু এখন ব্যাকুলতার বদলে আত্মপ্রতিষ্ঠাই যেন তার বাড়িয়া যায়। সহজ ভাবেই সে বলে, 'প্রভু, এ রকম করবেন না। এই জন্যই তো গেরস্থালির ভেতর থেকে আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে রক্ষা করার ক্ষমতা কি আমার আছে প্রভু? নিজকে আপনার নিজেরি রক্ষা করতে হবে—ভেবে দেখুন, নিজেকে আপনার নিজেরি রক্ষা করতে হবে।'

তারপর সদানন্দ উঠিয়া বাগানে চলিয়া যায়, লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ সদানন্দ। 'গেরস্থালি!' কতবার মহেশ কথাটা উচ্চারণ করিয়াছে! মানুষটা কি কম চালাক মহেশ, কম ফন্দিবাজ! মেয়েমানুষ নয়, গেরস্থালি! গেরস্থালির মধ্যে সদানন্দকে আর রাখিতে ভরসা হইতেছে না, তাই মহেশ তাকে সরাইয়া দিতেছে! বাগান হইতে সদানন্দ মাঠে যায়, সেখানে নেংটি পরা কে যেন একটা মানুষ একটা বাঁধা গরুকে প্রাণপণে মারিতেছিল। দেখিয়াই প্রাণপণে

ছুটিতে ছুটিতে কাছে গিয়া সদানন্দ লাঠিটা ছিনাইয়া নিয়া লোকটাকে এক ঘা বসাইয়া দেয়। 'এমন করে মারছিস্, লাগে না গরুটার?' তারপর লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া লোকটার যেখানে মারিয়াছিল সেখানে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলে, 'আহা, তোমার লেগেছে বাবা?' তারও পরে লোকটিকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া মহেশকে বলে, 'একে একটা টাকা দিয়ে দাও তো মহেশ।'

গরীব চাষাভূষা মানুষ সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াই ভড়কাইয়া যায়। তার উপর, সাধুটি কে তাও তার অজানা ছিল না। থতমত খাইয়াই ছিল, এতক্ষণে বলিল, 'মোটে একটা, আজ্ঞে?'

শুনিয়াই তো সদানন্দ চটিয়া গেল। 'ওরে হারামজাদা, যা করে মারছিলি গরুটাকে, তোকে খুন করে ফেলা উচিত ছিল। তার বদলে একটা টাকা দিচ্ছি, তাতে তোমার পোষাল না? যা এখান থেকে, ভাগ্, কিছু পাবি না তুই।'

'আজ্ঞে না কর্ত্তা, যা দিবেন মাথা পেতে লিব।'

'কিছু দেবে না তোকে—একটি পয়সাও নয়। যা এখান থেকে—গেলি? দিও না মহেশ, খপর্দ্দার দিও না।'

রাগের মাথায় সদানন্দকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া টাকার আশা ছাড়িয়া লোকটি তখনকার মত পালাইয়া যায়। টাকাটা কোমরে গুঁজিয়া সদানন্দ দাঁড়াইয়া থাকে। ঘণ্টাখানেক পরে আশ্রমের চালার নীচে মস্ত আসর বসিলে সামনেই জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দ বলে, 'আমার মনটা বড় দুর্ব্বল হয়ে গেছে, মহেশ।'

মহেশ চৌধুরী ভরসা দিয়া বলে, 'তাতো যাবেই প্রভু?'

ভরসা পাওয়ার বদলে সদানন্দ কিন্তু আবার ভয়ানক চটিয়া ধমক দিয়া বলে, 'যাবেই মানে? কি যে তুমি পাগলের মত বল তার ঠিক নেই।'

(ক্রমশঃ)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আবৃত্তি বা পুনর্জন্ম

বিগত চৈত্রের 'পরিচয়ে' আমরা আবৃত্তি বা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে উপনিষদের বক্তব্যের আলোচনা করিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছি উপনিষদে জীবের পরলোকগতির পর পুনর্জন্মের বিস্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঐ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিয়াছিল উপনিষদের পূর্ববর্তী বৈদিক সাহিত্যে জন্মান্তরের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা। এ সম্বন্ধে আমরা অধ্যাপক ডয়সনের বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বলেন—"In no Vedic text earlier than the Upnaisads can the doctrine be certainly traced." গতবারের পরিচয়ে আমরা ঐ উক্তির বলাবল পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে ঐ উক্তি ভিত্তিহীন।

জন্মান্তর সম্বন্ধে অধ্যাপক ডয়সন্ আর একটি আপত্তি উঠাইয়া ঐ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

We see here how by the side of the belief in a return to earth, the ancient ideas of a recompense of good and evil in the other world persist, and become united with the doctrine of transmigration, so that now all good and evil actions experience a *two-fold* retribution, once in the other world and again by renewed life upon earth. And thus that which has already received a *full* recompense is recompensed yet again and strictly speaking the entire conception of a recompense is destroyed. * * * পুনশ্চ: Combining the ancient Vedic eschatology with the doctrine of transmigration, (it) teaches a two-fold recompense (a recompense, therefore, of that which has already been recompensed)—on the one hand in the other world, and once again by a return to earth. অর্থাৎ, যদি পরলোকে জীবের সুকৃত বা দুষ্কৃত ভোগের-দ্বারা বিপাক লাভ করিল, তবে কিসের জন্য ইহলোকে সে জীব আবার জন্মান্তর গ্রহণ করিবে? একবার বিপাক হইল পরলোকে, আবার বিপাক হইবে ইহলোকে? এইরূপ দ্বিগুণিত (ডবল) বিপাকের সার্থকতা কি?

এ সম্বন্ধে আমি আমার 'কর্মবাদ ও জন্মান্তরে' সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। স্মরণ রাখিতে হইবে কর্ম দ্বিবিধ—ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত। ক্রিয়মাণ কর্ম ইহজন্মে কৃত কর্ম, আর সঞ্চিত কর্ম অনেক জন্মকৃত পূর্বতন কর্ম।

> ক্রিয়মাণং চ যৎ কর্ম বর্তমানং তদুচ্যতে।
> অনেকজন্ম-সংজাতংপ্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্ ॥—দেবী ভাগবত, ৬।১০।৯

পূর্ব পূর্ব জন্মে আমি যে বহু সংখ্যক জীবের সহিত কর্মপাশে বদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কয়জনই বা ইহজন্মে বিদ্যমান রহিয়াছে বা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং কয়জনের সহিতই বা আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে? অথচ যাহার সহিত কর্মসূত্রের যোগ, যে উপকার পাইয়া আমার নিকট ঋণী, অথবা যাহার অপকার করাতে আমি তাহার নিকট ঋণী হইয়াছি, তাহার সহিত সংযোগ না হইলে, সে কর্মের শেষ হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে, এক জন্মের মধ্যে সঞ্চিত কর্মের অত্যল্প অংশেরই ক্ষয় সম্ভব। এই জন্য যাঁহারা কর্ম দেবতা, অর্থাৎ কর্মের বিধাতা-পুরুষ—তাঁহারা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া এইরূপ যোগাযোগ ঘটাইয়া দেন যে, সমস্ত সঞ্চিত কর্মের মধ্যে এক নির্দিষ্ট অংশ -মাত্রেরই ইহজন্মে ভোগ সমাধা হয়। এই নির্দিষ্ট অংশের নাম 'প্রারব্ধ' কর্ম। প্র + আরব্ধ = প্রারব্ধ।

> সঞ্চিতানাং পুনর্মধ্যাৎ সমাহৃত্য কিয়ৎকিল।
> দেহারম্ভে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ ॥
> প্রারব্ধং কর্ম বিজ্ঞেয়ম্ —দেবী ভাগবত, ৬।১০।১২

'সঞ্চিত কর্ম সমূহের মধ্যে যে নির্দিষ্ট অংশ, নব জন্মের প্রাক্‌কালে কাল কর্তৃক প্রেরিত হয়, তাহাই প্রারব্ধ কর্ম।'

তবেই আমরা বুঝিলাম জীবের সমস্ত কর্ম একজন্মে ভোগ দ্বারা নিঃশেষ হয় না। সেজন্য জন্মান্তরের প্রয়োজন। ৫।১০।৫ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে শঙ্করাচার্য এই কথাই বলিয়াছেন :—

ন চ একস্মিন্ জন্মনি সর্বকর্মণাম্ ক্ষয় উপপদ্যতে। ব্রহ্মহত্যাদেশ্চ একৈকস্য কর্মণঃ অনেজন্মারম্ভকত্ব-স্মরণাৎ। স্থাবরাদি-প্রাপ্তানঞ্চ অত্যন্তমূঢ়ানাম্ উৎকর্ষ-হেতোঃ কর্মণঃ আরম্ভকত্বাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ ন একস্মিন্ জন্মনি সর্বেষাম্ কর্মণামুপভোগঃ।* * বাসনাবৎ

ন অশেষকর্মোপমর্দ ইতি শেষকর্মসম্ভবঃ। অর্থাৎ, এক জন্মেই সমস্ত কর্মের ক্ষয় উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) নহে। ব্রহ্মহত্যারূপ এমন সকল কর্ম আছে যাহার ফল অনেক জন্ম ভুগিয়া শেষ করিতে হয়, এবং স্থাবরাদি অত্যন্ত মূঢ় যোনিতে জন্মান্তর হইলে উৎকর্ষ সাধনপূর্বক তাহার প্রতিকার একরূপ অসম্ভব। তবেই এক জন্মে সমস্ত কর্মের উপভোগ অনুপপন্ন হইতেছে। * * যেমন বাসনা (সংস্কার) নিঃশেষে নিরস্ত হয় না, সেইরূপ কর্মেরও অবশেষ (remnants) রহিয়া যায়।

পুনশ্চ স্মরণ রাখিতে হইবে—পরলোক ভোগের স্থান, কর্মের স্থান নহে। পরলোকে জীব সুকৃত বা দুষ্কৃতের অনুযায়ী সুখ বা দুঃখ ভোগ করে মাত্র। সুখ-ভোগকে 'স্বর্গ' বলে, দুঃখ-ভোগকে 'নরক' বলে।

পূর্ব দেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্মবশানুগঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ॥

—দেবী ভাগবত, ৪।২১।২২

এই যে স্বর্গ বা নরক-ভোগ, তাহা কর্মকর্তার স্বগত ব্যক্তিগত ভোগ। কিন্তু যাহাদের সহিত তাহার কর্মবন্ধন, কার্মিক গ্রন্থি পূর্ব পূর্ব জন্মে গ্রথিত হইয়াছিল, পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের সন্নিধি, সম্পর্ক ও সাহচর্য স্থাপিত না হইলে, সেই সকল কর্মের বিপাক বা ফলভোগ কিরূপে সাধিত হইতে পারে ?

সেইজন্য দেবী ভাগবত বলিয়াছেন—

ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগান্ স্বর্গে বা নরকেঽথবা॥
ভোগান্তে চ যদোৎপত্তেঃ সময়স্তস্য জায়তে।
তদৈব সঞ্চিতেভ্যশ্চ কর্মভ্যঃ কর্মভিঃ পুনঃ॥
যোজয়ত্যেব তং কালঃ * *—৪।২১।২ -২৪

'দেহান্তে জীব স্বকৃত কর্মানুসারে স্বর্গ বা নরকে গমন করে। সেই স্বর্গ বা নরকে তাহাকে নানা প্রকার ভোগ ভুগিতে হয়। পরে ভোগের অবসানে যখন তাহার পুনর্জন্মের সময় হয়, তখন কাল সঞ্চিত-কর্ম সমূহের মধ্য হইতে কতকগুলি কর্মের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করে।'

ইহাই 'প্রারব্ধ' কর্ম, ইহারই ভোগের জন্য জন্মান্তর গ্রহণ।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, জীবে জীবে চরিত্র সম্বন্ধে প্রচুর প্রভেদ। কেহ ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত জন্মসিদ্ধ হরিভক্ত; কেহ চার্বাকের মন্ত্রশিষ্য নাস্তিক শিরোমণি—ঈশ্বরের নামে তাহার কর্ণজ্বর উৎপন্ন হয়; কেহ এমন শান্তশিষ্ট, মধুর, অমায়িক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে, সহস্র প্রলোভন ও অশুভ ঘটনার নির্যাতন সে প্রকৃতিকে মলিন করিতে পারে না; কেহ আজন্ম পাতকী (congenital criminal) পাপ-প্রবৃত্তি তাহার অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত, শত প্রকার নৈতিক চিকিৎসার প্রয়োগেও সে পাপ-রোগের প্রশম হয় না। কেহ অতি স্থূল জড়বুদ্ধি, শিক্ষকের অযুত বেত্র-কশাঘাতেও তাহার কঠোর মস্তিষ্কে 'ক'-অক্ষর অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে না; কেহ সুবুদ্ধি মেধাবী—(কালিদাসের ভাষায়) শরৎকালে যেমন হংসমালা অযাচিত ভাবে গঙ্গায় উপনীত হয়, সমস্ত বিদ্যা সেইরূপ বিনা প্রযত্নে তাহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়। কেন এইরূপ হয়? অধ্যাপক ডয়সন্ এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

It is the great moral difference of character, existing from birth, upon which the singers of the Rig Veda had already pondered, and which the philosophers explain in our passage on the hypothesis that a man has already existed once before his birth, and that his inborn character is the fruit and consequence of his previous action.

—The Philosophy of the Upanisads, p. 330

তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন।

শঙ্করাচার্য আরও বলেন—

মর্কটজন্মনি আরব্ধে মর্কটস্য জাতমাত্রস্য মাতুঃ শাখায়াঃ শাখান্তরগমনে মাতুঃ উদর-সংলগ্নত্বাদি কৌশলং ন প্রাপ্নোতি ইহ-জন্মনি, অনভ্যস্তত্বাৎ—৫।১০।৫ ছান্দোগ্য ভাষ্য।

'যেস্থলে জীবের মর্কটজন্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, দেখা যায় সদ্যঃজাত মর্কট-শিশুর মাতা শাখা হইতে শাখান্তরে লম্ফ দিতেছে অথচ শিশু এ জন্মে অনভ্যস্ত হইলেও মাতার শরীর-লগ্ন রহিয়াছে। এ কৌশল সে শিখিল কবে? নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে।'

ইহাকে বিজ্ঞানের ভাষায় সহজাত সংস্কার (Instincts) বলে। নিম্ন শ্রেণীর কোন কোন প্রাণীর সদ্যোজাত শাবকে ঐ Instinct সুস্পষ্ট ভাবে দর্শন দেয়—যেমন সদ্যঃজাত হংস-শাবক সন্তরণ করিতে পারে—'a newborn

mammal will suck, a just hatched bird will peck or open its beak according to its kind'। এই সকল সহজাত-সংস্কার-জনিত ব্যাপার শিক্ষা বা সাধন-সাপেক্ষ নহে—উহা সাংসিদ্ধিক। তাহাই যদি হইল, তবে ঐ সকল সহজাত সংস্কার কোথা হইতে আইসে ? শঙ্করাচার্য বলিলেন পূর্ব জন্ম হইতে। ন্যায়দর্শনকার গৌতম ঋষি বলেন সহজাত সংস্কার জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ের অভ্যাস-জনিত 'বাসনা'র ফল। দৃষ্টান্তস্বরূপ গৌতম সদ্যঃজাত শিশুর স্তন্যাভিলাষের উল্লেখ করিয়াছেন—

প্রেত্যাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ—ন্যায়সূত্র, ৩।১।২১

এই জন্মান্তর সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য ৫।১০।৫ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, আপত্তি হইতে পারে যে, পরলোকে ভোগের দ্বারা যদি সমস্ত কর্মের নিঃশেষে ভোগ হইয়া যায়, তবে ত' তৎক্ষণাৎ মোক্ষ হইবে। আবার জন্মান্তর কি ?

যদি সর্বস্যৈব ক্ষয়ঃ কর্মণঃ, চন্দ্রমণ্ডলস্থস্যৈব মোক্ষঃ প্রাপ্নোতি। ততঃ আগতস্য ইহ শরীরোপভোগাদি ন সম্ভবতি।

ইহার উত্তরে তিনি বলেন—

ইষ্টাপূর্তের ফলেই ত' স্বর্গলোক-প্রাপ্তি। ইষ্টাপূর্ত ব্যতীতও মনুষ্যের অনেকানেক কর্ম থাকে। চন্দ্রমণ্ডলে তাহাদের ভোগ হয় না। অতএব তাহাদিগের ভোগের জন্য পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

নমু ইষ্টাপূর্তদত্ত-ব্যতিরেকেণাপি মনুষ্যলোকে শরীরোপভোগ-নিমিত্তানি কর্মাণি অনেকানি সম্ভবন্তি। ন চ তেষাং চন্দ্রমণ্ডলে উপভোগঃ। অতঃ অক্ষীণানি তানি। যন্নিমিত্তম্ চন্দ্রমণ্ডলম্ আরূঢ়ঃ তান্যেব ক্ষীণানি ইত্যবিরোধঃ।

পুনশ্চ, ইহলোকে ইষ্টাদিকর্ম উপচিত্য চন্দ্রং গচ্ছন্তি। তৎক্ষয়েচ আবর্তন্তে, ক্ষণমাত্রমপি তত্র স্থাতুং ন লভ্যতে। স্থিতি-নিমিত্ত-কর্মক্ষয়াৎ—স্নেহক্ষয়াদিব প্রদীপস্য ।

ইহার টীকায় আনন্দ গিরি লিখিয়াছেন—

চন্দ্রলোকে ভোক্তব্যস্য কর্মণো ভোগেন ক্ষয়াদূর্দ্ধম্ শেষেণ অনুপভুক্তেন কর্মণা জন্ম প্রতিপদ্যন্তে।

অর্থাৎ, ইষ্টাপূর্ত ভিন্নও মনুষ্যলোকে শরীর গ্রহণের উপযোগী অনেক প্রকার কর্ম জীব কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। সে সকল কর্মের ভোগ ত' আর চন্দ্রলোকে সিদ্ধ হয় না। অতএব সে সকল কর্ম অক্ষীণ থাকে এবং তাহাদের ভোগজন্যই জন্মান্তর।

পুনশ্চ, যে কর্মের গতিকে জীব চন্দ্রমণ্ডলে নীত হয়, স্বর্গভোগ দ্বারা সেই কর্মই ক্ষয়িত হয়—অন্য কর্ম ক্ষয়িত হয় না। তেমন তৈলক্ষয়ে দীপ নির্বাণ হয়, সেইরূপ স্বর্গস্থিতিকারক কর্মক্ষয়ে জীবের স্বর্গ হইতে পতন অনিবার্য।

বৃহদারণ্যক এ সম্পর্কে বলিয়াছেন—

তেষাং যদা তৎ পর্যবৈতি অথ ইমমেব আকাশম্ অভিনিষ্পদ্যন্তে—বৃহ, ৬.২।১৬

তেষাং কর্মিণাং যদা যস্মিন্ কালে তৎ যজ্ঞদানাদিলক্ষণং সোমলোক-প্রাপকং কর্ম পর্যবৈতি পরিগচ্ছতি পরিক্ষীয়তে ইত্যর্থঃ—অথ তদা ইমমেব সিদ্ধম্ আকাশম্ অভিনিষ্পদ্যন্তে —শঙ্করভাষ্য।

নিত্যানন্দকৃত ইহার টীকা এইরূপ :—তেষাং কর্মিণাং যদা যস্মিন্ কালে তৎ যজ্ঞাদি পিতৃলোক-প্রাপকং কর্ম পর্যবৈতি ক্ষীয়তে, তদা তে ইমমেব প্রসিদ্ধম্ আকাশম্ অভিনিষ্পদ্যন্তে।

অর্থাৎ, যখন পিতৃলোক-প্রাপক যজ্ঞাদি কর্ম ভোগ-দ্বারা নিঃশেষিত হয়, তখন জীব অবশিষ্ট কর্মভোগের জন্য জন্মান্তর-গ্রহণ হেতু মর্ত্যলোকে অবতরণ করে।

অতএব অধ্যাপক ডয়সন্ যে Double Recompense-এর আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা ভিত্তিশূন্য।

এ বিষয়ের আর বিস্তার না করিয়া আমরা অতঃপর পূর্বোক্ত 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা'র আলোচনা করি। এ বিদ্যায় জীবের জন্মান্তরের জন্য স্বর্গ হইতে অবতরণ-প্রণালী সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে 'The Great Transmigration Text' বলেন। ইহা ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় হইতে দশম কাণ্ডে এবং বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে রক্ষিত আছে। ঐ বিবরণ প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুরূপ।

আমাদের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জীব যে পথে স্বর্গে উপনীত হইয়াছিল এখন সেই পথেই মর্ত্যে অবতরণ করে, কারণ, এ যাত্রা সেই স্বর্গ-যাত্রারই পুনর্যাত্রা (উল্টা রথ)। এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য বলিতেছেন—তস্মিন্ যাবদ্ সম্পাতম্ উষিত্বা অথ এতমেব অধ্বানম্ পুনর্নিবর্তন্তে যথা ইতম্।

—ছান্দোগ্য ৫।১১।৫

অর্থাৎ, জীব যে পথে স্বর্গে উপনীত হইয়াছিল, এখন স্বর্গ হইতে অবতরণের সময় সেই পথেই ফিরিয়া যায়।

When the ego is about to re-incarnate, he has to reverse the process of withdrawal, to pass downward through the very same worlds through which he came on his upward journey.—C. W. Leadbeater's 'Hidden side of things'.

ছান্দোগ্য সেই পুনর্যাত্রা এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন :—

প্রথমতঃ—আকাশম্ অভিনিষ্পদ্যতে, আকাশাৎ বায়ুম্, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি, অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি। ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধি-বনস্পতয়ঃ তিলমাষা ইতি জায়ন্তে, অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপ-তরম্। যো যো হ্যন্নম্ অত্তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ ভূয় এব ভবতি।—ছা, ৫।১০।৫-৬

বৃহদারণ্যকের বিবরণ ইহারই অনুরূপ—আকাশাৎ বায়ুম্, বায়োর্বৃষ্টিং, বৃষ্টেঃ পৃথিবীং। তে পৃথিবীং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি। তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে; ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে —বৃহ, ৬।২।১৬

অতএব পুনর্যাত্রার পথ এইরূপ :—

প্রথম আকাশ, তাহার পর বায়ু, বায়ু হইতে বৃষ্টি, বৃষ্ট হইয়া পৃথিবী; পৃথিবীতে পৌঁছিয়া অন্নের মধ্যে প্রবেশ (ছান্দোগ্য ঐ অন্নকে বিশেষিত করিয়া ব্রীহি-যব, ওষধি-বনস্পতি, তিল-মাষ বলিলেন)। ঐ অন্ন-দ্বারে জীব, যে পুরুষ অন্ন ভক্ষণ করে তাহার শরীরের মধ্যে শুক্রে প্রবিষ্ট হয়, এবং শুক্রদ্বারে মাতার কুক্ষিতে নিষিক্ত হইয়া নব জন্ম লাভ করে। ঐ যে আকাশ ও বায়ুর কথা বলা হইল, তদ্দ্বারা দ্যুলোকের (Mental Plane-এর) অরূপ ও রূপভূমি সূচিত হইল। তাহার পর মেঘ (পর্জন্য)—তদ্দ্বারা অন্তরিক্ষ অর্থাৎ ভুর্বলোক (Astral Plane) সূচিত হইল। তদনন্তর পৃথিবী অর্থাৎ ভূর্লোক (Physical Plane)। সেখানে প্রথম পিতৃদেহে প্রবেশ এবং তথা হইতে নিষিক্ত হইয়া মাতৃকুক্ষি হইতে পুনর্জন্ম।

যাহাকে 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা' বলা হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, জীবের জন্মান্তরের জন্য এই অবরোহণ-প্রণালী আরও সুস্পষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে উপদিষ্ট ঐ 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা' এইরূপ :—

অসৌ বাব লোকঃ গৌতম ! অগ্নিঃ। তস্য আদিত্য এব সমিৎ, রশ্ময়ো ধূমঃ, অহঃ অর্চিঃ, চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, নক্ষত্রাণি[১] বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সংভবতি।

পর্জন্যো বাব গৌতম ! অগ্নিঃ। তস্য বায়ুরেব[২] সমিৎ, অভ্রং ধূমঃ, বিদ্যুৎ অর্চিঃ, অশনিঃ অঙ্গারাঃ, হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ বর্ষং[৩] সংভবতি।

পৃথিবী[৪] বাব গৌতম ! অগ্নিঃ। তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিৎ, আকাশো ধূমঃ, রাত্রিঃ অর্চিঃ, দিশঃ অঙ্গারাঃ, অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ[৫]।

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ অন্নং সংভবতি।

পুরুষো বাব গৌতম ! অগ্নিঃ। তস্য বাগেব[৬] সমিৎ, প্রাণো ধূমঃ, জিহ্বা[৭] অর্চিঃ, চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ, শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ রেতঃ সংভবতি।

যোষা বাব গৌতম ! অগ্নিঃ। তস্যা উপস্থ এব সমিৎ, যদ্ উপমন্ত্রয়তে স ধূমঃ, যোনিরর্চিঃ, যদ্ অন্তঃ করোতি তে অঙ্গারাঃ, অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি[৮] তস্যা আহুতেঃ গর্ভঃ[৯] সংভবতি।

ইতি তু পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষ বচসো ভবন্তি ইতি। স উল্বাবৃতো গর্ভঃ দশ বা নব বা মাসান্ অন্তঃশয়িত্বা যাবদ্ বা অথ জায়তে—ছান্দোগ্য ৫।৪-৯ কাণ্ড। (এখানে 'অপ্' শব্দে রেতঃ (semen) বুঝিতে হইবে। তত্র পঞ্চম্যাং আহুতৌ হুতায়াং রেতোরূপা আপো গর্ভীভূতাঃ—শঙ্কর)

জৈবলি শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন :—

'হে গৌতম ! দ্যুলোক-রূপ অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন—যে

১ বৃহদারণ্যকের পাঠ—অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ

২ বৃহদারণ্যকের পাঠ—সংবৎসর এব সমিৎ

৩ বৃহদারণ্যকের পাঠ—বৃষ্টিঃ

৪ বৃহদারণ্যকের পাঠ—অয়ং বৈ লোকঃ

৫ বৃহদারণ্যকের পাঠ—পৃথিব্যেব সমিৎ, অগ্নির্ধূমঃ, রাত্রিঃ অর্চিঃ, চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ

৬ বৃহদারণ্যকের পাঠ—ব্যাত্তমেব। ব্যাত্তং=বিবৃতং মুখম্

৭ বৃহদারণ্যকের পাঠ—বাক্

৮ বৃহদারণ্যকের পাঠ— লোমানি ধূমঃ। এই পাঠই সঙ্গত মনে হয়।

৯ বৃহদারণ্যকের পাঠ—পুরুষঃ—'গর্ভঃ' (Fetus) নহে, 'পুরুষ'

অগ্নির আদিত্য সমিৎ, রশ্মিচয় ধূম, দিবা অর্চিঃ, চন্দ্রমা অঙ্গার এবং নক্ষত্র-নিকর বিস্ফুলিঙ্গ স্থানীয়। ঐ আহুতি হইতে সোমরাজার উৎপত্তি হয়।

পর্জন্যরূপ অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজাকে আহুতি দেন—যে অগ্নির সংবৎসর সমিৎ, আকাশ ধূম, রাত্রি অর্চিঃ, দিক্ সমূহ অঙ্গার এবং অবান্তরদিক্ বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়। ঐ আহুতি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়। পুরুষ-রূপ অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন—যে অগ্নির বাক্ সমিৎ, প্রাণ ধূম, জিহ্বা অর্চিঃ, চক্ষুঃ অঙ্গার এবং শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়। ঐ আহুতি হইতে রেতের উৎপত্তি হয়। স্ত্রীরূপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃকে আহুতি দেন—যে অগ্নির উপস্থ সমিৎ, লোম ধূম, যোনি অর্চিঃ, প্রবেশ (penetration) অঙ্গার এবং অভিনন্দ* বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়। ঐ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃকে আহুতি দেন। ঐ আহুতি হইতে গর্ভের (foetus-এর) উৎপত্তি হয়। এইরূপ পর পর পঞ্চম আহুতিতে (রেতোরূপ) অপ্ পুরুষ-আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এ গর্ভ কমবেশ নয় মাস কিংবা দশ মাস মাতৃকুক্ষিতে শয়িত থাকিয়া তদনন্তর জন্মগ্রহণ করে।

অতএব আমরা দেখিলাম পঞ্চাগ্নি বিদ্যার পঞ্চ অগ্নি কি কি।

১। দ্যুলোক, ২। পর্জন্য, ৩। পৃথিবী-লোক, ৪। পুরুষ, এবং ৫। নারী। এই পঞ্চাগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

> তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ
> সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাং।
> পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
> বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ ॥—মুণ্ডক, ২।১।৫

অর্থাৎ, প্রথম দ্যুলোকাগ্নিঃ (সূর্য যাহার সমিৎ এবং যে অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দিয়া সোমের উৎপত্তি); দ্বিতীয় অগ্নি পর্জন্য (অন্তরিক্ষ লোক)—যাহাতে সোম আহুতি এবং বৃষ্টি-জনিত ওষধির উৎপত্তি ; তৃতীয় অগ্নি মনুষ্যলোক (পৃথিবী); চতুর্থ অগ্নি পুরুষ (যিনি পঞ্চম অগ্নি নারীতে রেতঃরূপ আহুতি প্রদান করেন এবং যাহার ফলে বহু সন্ততির প্রজনন হয়)।

আমরা লৌকিক অগ্নিতে দেখিতে পাই তাহার সমিৎ আছে, ধূম আছে,

---

* অভিনন্দাঃ=সুখলবাঃ—শঙ্কর

শিখা (অর্চিঃ) আছে, অঙ্গার আছে এবং স্ফুলিঙ্গ আছে। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় ঐ পঞ্চ অগ্নিরও প্রত্যেকের যথাক্রমে সমিৎ, ধূম, শিখা, অঙ্গার ও বিস্ফুলিঙ্গ কল্পিত হইয়াছে। ইহা উপমান (analogy) মাত্র, প্রকৃত নহে। এ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য প্রথম অগ্নি (দ্যুলোক) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

তস্য অগ্নেঃ দ্যুলোকাখ্যস্য আদিত্য এব সমিৎ—তেন হি ইদ্ধঃ অসৌ লোকো দীপ্যতে। অতঃ সমিন্ধনাৎ সমিদ্ আদিত্যঃ। রশ্ময়োঃ ধূমঃ তদুত্থানাৎ—সমিধোহি ধূমো উত্তিষ্ঠতি।

অহঃ অর্চিঃ প্রকাশসামান্যাৎ, আদিত্যকার্যত্বাচ্চ। চন্দ্রমাঃ অঙ্গারাঃ—অহঃপ্রশমে অভিব্যক্তেঃ—অর্চিষোহি প্রশমে অঙ্গারাঃ অভিব্যজ্যন্তে। নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ—চন্দ্রমসঃ অবয়বা ইব বিপ্রকীর্ণত্ব-সামান্যাৎ।

ঐ পঞ্চ অগ্নিতে কি কি আহুতি দেওয়া হয়? প্রথম আহুতি শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় সোম, তৃতীয় বৃষ্টি, চতুর্থ অন্ন, এবং পঞ্চম রেতঃ।

দ্যুলোকাগ্নিতে দেবগণ যে শ্রদ্ধারূপ আহুতি অর্পণ করেন, ঐ শ্রদ্ধা—যাহা আহুতিরূপে অর্পিত হয়—উহা কি? শঙ্করাচার্য বলেন, শ্রদ্ধা অর্থে অগ্নিহোত্রাহুতি -পরিণামাবস্থারূপাঃ সূক্ষ্মা আপঃ।

অধ্যাপক ডয়সন্ বলেন—'The peculiar essence and so to speak the essence of the work (*Karman*) that ascends as the sacrificial vapour (*apas*) is the faith (*shraddha*) with which it is offered.'

আমি বলিতে চাই এখানে শ্রদ্ধার অর্থ শ্রদ্ধাভাবিত যজ্ঞানুষ্ঠান-জাত 'অপূর্ব'। ঐ অপূর্ব—যাহার ফলে পিতৃযানীর স্বর্গভোগ হয়, যখন ভোগের দ্বারা সেই অপূর্ব অবসিত হয়, তখনই পিতৃযানী জীব পুনর্জন্মের জন্য দ্যুলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রথম অন্তরিক্ষ বা ভুবর্লোকে অবরোহণ করে। সোমরাজার আহুতি দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে। কারণ, এখানে সোমের প্রচ্ছন্ন অর্থ (lunar body)* —যাহার অতিবাহনে জীব দ্যুলোক হইতে অন্তরিক্ষ লোকে অবতরণ করে। সেই অন্তরিক্ষ লোক হইতে 'বৃষ্ট' হইয়া অনুশয়ী জীব পৃথিবীলোকে প্রবেশ করে এবং শস্যকে দ্বার করিয়া পিতার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রেতঃরূপে মাতার কুক্ষিতে

---

* শরীরং চ তেষাং সুখোপভোগযোগ্যং চন্দ্রমণ্ডলে আপ্যং আরভ্যতে—শঙ্করভাষ্য।

নিষিক্ত হয় এবং নির্দিষ্টকাল গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হইয়া নবজন্ম ধারণ করে। ইহাই জন্মান্তরের প্রণালী এবং সেইজন্যই বলা হইল প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ আহুতি সোমে রূপান্তরিত হয়; দ্বিতীয় অগ্নিতে সোমরূপ আহুতি বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়; তৃতীয় অগ্নিতে বৃষ্টিরূপ আহুতি অন্নে রূপান্তরিত হয়; চতুর্থ অগ্নিতে অন্নরূপ আহুতি রেতে রূপান্তরিত হয় এবং পঞ্চম অগ্নিতে রেতঃরূপ আহুতি গর্ভ বা ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়।

পিতৃযানীর আবৃত্তি বা জন্মান্তরের আলোচনা এখানেই শেষ করিলাম। পরবর্তী অধ্যায়ে দেবযানীর অনাবৃত্তির কথা বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভুল ক'রেছিল

বলুন ত', কে ভুল না করে? তুনিয়াতে ভুলের অন্ত নেই, ভুলের অবশ্য প্রয়োজনও আছে। ভুলই আমাদের সমাজের বনিয়াদ। ভুল দেয় মনকে করুণভাবে সাজিয়ে, মানুষের আত্মশ্লাঘা কমিয়ে দেয়। নির্ভুল মানুষকে বরদাস্ত করা অসম্ভব। সকল ভুলই ক্ষমার যোগ্য, কেবল অপরের কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠা—এ ভুলের কোন মার্জ্জনা নেই। অন্যের বিরক্তি না জন্মিয়ে একাকী ঘরে ব'সে থাকা ভালো, কিন্তু আমরা আসল গল্পের খেই হারিয়ে, ফেলছি।

এইবার "মোডার"-এর কাহিনী শোনাব। মোডার তুর্ভাগা। সে বুদ্ধিমান ও সহৃদয় ছিল। সুন্দর তার স্বভাব, কিন্তু এ তিনটেই তার মস্ত ভুল—আর এ ভুল থেকে আরও ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। লোকসমাজে প্রবেশ ক'রেই সে নির্ভুল কাজ করবার চেষ্টা ক'রল। এর পরিণামটা শীগ্‌গীরই জানা যাবে। দৈবাৎ এক রাজকর্ম্মচারীর ও তার স্ত্রীর সঙ্গে মোডারের পরিচয় ঘটল। মোডারের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখে মহিলাটি মনে ক'রলেন তার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। আর তার স্বামীটি ভাবলেন মোডার একেবারে বোকা। কারণ তাদের তুজনে কোন মতের মিল নেই। ধীশক্তির প্রাখর্য্য দেখে মহিলাটি মোডারের ওপর পক্ষপাতিত্ব দেখাতে লাগলেন। কিন্তু মোডার প্রেমে না পড়ায় এর তাৎপর্য্য বুঝতে পারল না। ভদ্রলোকটি যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজের লেখা একখানা বই মোডারকে পড়তে দিলেন। পড়ে' মোডার সরলভাবে বললো যে লেখক যুদ্ধের চেয়ে সন্ধিটা ভালো জানেন।

এমন সময়ে একটা যুদ্ধবাহিনীর অধিনায়কের পদ খালি হ'ল, মার্কিস নামে একটা লোক এই কাজটা পেল কারণ এই ভদ্রলোককে সে একজন প্রতিভাবান লেখক ব'লে প্রশংসা করেছিল এবং মহিলাটির সঙ্গে এমন ব্যবহার ক'রেছিল যেন তার মত রূপসী আর নেই। মোডার ভালো লোক এবং ভালো লোক হওয়াটাই তার আর একটা ভুল। এই ঘটনায় মোডারের সমস্ত প্ল্যান

ভেস্তে গেল। টাকা রোজগারের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়ে প্যারিসে নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রবে ব'লে ভাবল। কি ভুল! সে ভাবলো যুবক অলসিপ খাঁটি বন্ধু। অলসিপ দেখতে ভালো, বেশ ভদ্র চেহারা; মতামত পরিষ্কার।

একদিন মলিন মুখে সে মোডারের কাছে এল। তাকে দেখেই মোডারের করুণা হ'ল। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান ও সহৃদয় তাদের মত বোকা আর নেই। অলসিপ বললো, সে একশো পাউণ্ডের একখানা নোট হারিয়েছে। মোডার কোন লেখা রসিদ না নিয়েই তাকে সে-টাকা ধার দিল, ভাবলো তার বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হ'লো, কিন্তু এই আর একটা ভুল। তারপর অলসিপ আর কখনো মোডারের সঙ্গে দেখা করেনি। অতঃপর কয়েকজন সাহিত্যিকের সঙ্গে তার ভাব হ'লো।

তারা ভাবলো মোডারকে দিয়ে তাদের লেখা নাটকগুলি যাচাই ক'রে নেবে। শুধু একটি লোকের লেখা নাটক মোডারের ভালো লেগেছিল। সেটা মিলনান্তক। মোডার সেই নাটক থেকে কিছু অনাবশ্যক অংশ বাদ দিলো। লেখককে পরামর্শ দিলো যে দৃশ্যগুলির ভেতর যেন একটা স্বাভাবিক যোগ থাকে; চরিত্রগুলি যেন ভালো হয়; ডায়ালগের মধ্যে শুকনো নীতিবাক্য থাকলে চ'লবে না—প্রাণ থাকা চাই; ভূমিকাগুলিতে চরিত্রগত পার্থক্য দেখাতে হবে। লেখক সেই অনুযায়ী সংশোধন ক'রে দেখল মোডার একজন কুপরামর্শদাতা। কারণ অভিনেতারা বললো—এ-নাটক অভিনয়ের অযোগ্য।

বিরক্ত হ'য়ে মোডার পরামর্শ দেওয়া বন্ধ ক'রল। ঠিক এই লেখকই কতগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্য জোড়াতালি দিয়ে আর এক নাটক লিখল। এইবার মোডার আর নিষেধ ক'রতে সাহস পেল না। এই আবার সে ভুল ক'রলো। দর্শকেরা ছিঃ ছিঃ ক'রে নাটককে ধরাশায়ী ক'রল। মোডার দেখল মহা বিপদ। পরামর্শ দিলেও ভুল না দিলেও ভুল। সহরের অভিনেতাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে সে বিদ্বানদের সঙ্গে ভাব ক'রতে লাগল। কিন্তু এরাও অভিনেতাদের মত বাজে রসিকতা করে। বিশেষ কিছু বক্তব্য না থাকলে

তারা চুপ ক'রে থাকে। মোডারের এ সব সহ্য হ'ল না। এইবার সে রূপসী মহিলাদের সঙ্গে মিশতে গেল। এই তার আর একটা ভুল। মোডার দেখলো ওদের শুধু একটা কথাই জানা আছে এবং তা নিয়ে ওদের যত আস্ফালন, যত রসিকতা। মোডার বুঝতে পারলো যে তাদের সঙ্গে মিশে সে ভুল করেছে। মোডার কোন বিষয়ে যুক্তি ক'রতে গেলে রূপসীরা ভাবে লোকটা আনাড়ী; আবার রসিকতার চেষ্টা ক'রলে ভাবতো—লোকটা ত' বড় উদ্ধত।

মোডার বুদ্ধিমান। তবু সে বুঝতে পারল না কোনটা তার আসল পথ। এটুকু সে বুঝলো যে আনাড়ীর মত ভালো পথে চলার চেয়ে বিজ্ঞের মত খারাপ পথে চলা ঢের ভালো। সে সভাসদ হ'তে চেষ্টা ক'রেছে কিন্তু পারেনি। বন্ধুত্ব ক'রতে চেষ্টা ক'রল কিন্তু বন্ধুরা তাকে প্রতারণা ক'রল। অভিনেতা, বিদ্বান, মহিলা—সবার সঙ্গেই মিশলো। প্রথম দু' দলে সে বিরক্ত হ'ল, তৃতীয় দলের নিকট সে নিজেই বিরক্তিকর হ'ল।

নর-নারীর প্রেমের প্রশংসা শুনে সে প্রেমে পড়াই সব চেয়ে ভালো মনে ক'রল। প্রেম করবার প্ল্যান ঠিক হ'ল। বেচারী জানে না প্রেম কী, তাই সে এমন ভেবেছে। প্ল্যান ক'রে প্রেমে পড়া চলে না। তার পরিচিত নারীদের গুণাবলী সে ওজন ক'রে দেখতে লাগলো। ভাবলো সব চেয়ে যে গুণী তার প্রেমেই সে পড়বে। ভাবলো মীনকেতনের সঙ্গে খুব সহজেই ব্যবসা করা চ'লবে। কিন্তু এই সবই বিফল হ'লো—ইচ্ছে ক'রে প্রেমে পড়বার চেষ্টা ভেস্তে গেল। একদিন হঠাৎ সে এক কুরূপা খামখেয়ালী নারীর প্রেমে পড়ে গেল। সে ভাবলো তার নির্ব্বাচন খুব ভালো হয়েছে। শেষটায় দেখলো সে মোটেই সুন্দরী নয় এবং তা'তে সে খুসিই হ'ল। ভাবলো তার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। এ কিন্তু তার ভুল। বেচারী জানে না মেয়েরা যত কুৎসিত হয়, পুরুষের মন ভোলাবার চেষ্টা তাদের ততই বেশী হয়, কৃষাণ যেমন অনুর্ব্বর জমি থেকে বহু আয়াস স্বীকার ক'রে ফসল করবার চেষ্টা করে তেমনি সেও তার কুৎসিত মুখে লাবণ্য তুলবার চেষ্টা করে। নারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে

ভালোবাসা দেখালে পুরুষের গর্ব্ব বেড়ে যায়, গর্ব্বে অন্ধ হ'য়ে পুরুষ নারীর কুরূপ আর লক্ষ্য করে না।

মোডার ঠেকে এ-কথাটা বুঝতে পারল। সে দেখলো, তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে ঘিরে আছে। তার চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। এই আর একটা ভুল। এই ভুল থেকে সে আর একটা বড় ভুল ক'রল। সে বিয়ে ক'রল এবং স্ত্রীর প্রতি খুব ভালো ব্যবহার ক'রতে লাগল। এও একটা ভুল। স্ত্রী তার চরিত্রের বিশেষত্বকে দুর্ব্বলতা ব'লে মনে ক'রল। কাজেই তার স্ত্রী তার ওপর অসাধারণ প্রভুত্ব খাটাতে লাগল। মোডার ঝগড়া করবার চেষ্টা ক'রল। এটাও তার ভুল। এই ভুল থেকে আর এক ভুলের উৎপত্তি হলো—মানে পুনর্মিলন। এই পুনর্মিলনে তার দু'টি সন্তানের জন্ম হ'ল —অর্থাৎ দুটি ভুলের জন্ম হ'ল। অতঃপর সে হ'লো বিপত্নীক। এ কাজটায় অবশ্য কোন ভুল হয়নি। কিন্তু এখানেও সে ভুল ক'রল। শোকাভিভূত হ'য়ে সে তার গ্রামের জমিদারীতে গিয়ে বাস ক'রতে লাগল।

গ্রামে গিয়ে দেখে এক উদ্ধত ধনী ব্যক্তি সেখানে বাস করছে। মোডার ভাবলো, এটা তার ভুল। ঔদ্ধত্যের বিনিময়ে সে প্রতিবেশীর সঙ্গে ভদ্রভাব দেখাতে থাকলো। এই আর এক ভুল। তার বাড়ী একটি আড্ডা হ'য়ে দাঁড়াল, তার একটুও বিশ্রাম নেই। উদ্ধত প্রতিবেশীকে সে ঈর্ষা ক'রতে লাগল। জমির দখল নিয়ে তার নামে একটা মামলা হ'ল। সে ভাবলো অন্যায়ের প্রতিবাদ না ক'রে জমিটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। ভদ্রভাবে সে সব সহ্য ক'রল। বিপক্ষকে ভোজে নিমন্ত্রণ ক'রে, ক্ষতি স্বীকার ক'রেও সে আপোষ ক'রে ফেলল। গ্রামের লোকেরা ভাবলো অর্থ উপার্জ্জনের এ ত' বেশ ফন্দী। ছোট বড় সব প্রতিবেশীরাই তাকে ভালো মানুষ পেয়ে জমির দখল নিয়ে তার নামে মিথ্যে মামলা ক'রলো। এমনি ক'রে একটা মামলা এড়াতে গিয়ে দশটা মামলা মোডারের মাথায় ভেঙে প'ড়ল।

বিরক্ত হ'য়ে সে দিল জমি বিক্রী ক'রে। আবার ভুল। এখন তার মূলধন

সে কোথায় খাটাবে? একটা কাছাকাছি সহরে একটা সঙ্গীতায়তনে টাকা খাটাবার জন্য একজন তাকে পরামর্শ দিল। ডিরেক্টার লোকটি ভালো। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই সঙ্গীতায়তন ফেল পড়ল। মোডার সর্ব্বস্বান্ত হ'ল। অতঃপর পার্থিব ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে সে মঠের সন্ন্যাসী হ'লো। তার সন্ন্যাস-জীবনে ক্লান্ত হয়ে সে মারা গেল। এই তার সর্ব্বশেষ ভুল। তবে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাটাই তার মস্ত ভুল হয়েছিল।*

* ফরাসী লেখক L'Abbe De Voisenon-এর He was wrong গল্পের অনুবাদ।

সম্রাট অশোকের শিলালিপি

দ্বিতীয় শিলানুশাসন

গিরনার

(ক) সর্বত বিজিতম্হি দেবানংপ্রিয়স পিয়দসিনো রাঞো, এবমপি[১] প্রচংতেসু[১]—যথা চোডা, পাডা, সতিয়পুতো, কেতলপুতো[১], আ তংবপংনী, অংতিয়কো যোনরাজা, যে বা পি তস অংতিয়কস সামীপং রাজানো,—সর্বত্র দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো দ্বে চিকীছা কতা—মনুস-চিকীছা চ পসু-চিকীছা চ।

(খ) ওসুঢানি চ যানি মনুসোপগানি চ পসোপগানি চ যত যত নাস্তি সর্বত্র হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ।

(গ) মূলানি চ ফলানি চ যত যত্র নাস্তি সর্বত হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ।

(ঘ) পংথেসু কূপা চ খানাপিতা, ব্রছা চ রোপাপিতা, পরিভোগায় পসু-মনুসানং।

অনুবাদ

(ক) দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর বিজিতের (রাজ্যের) সর্ব্বত্র, এবং যাঁহারা তাঁহার (প্রিয়দর্শীর) প্রত্যন্তদেশ (border, frontier)-বাসী[১] যথা—চোলগণ, পাণ্ড্যগণ, সাতিয়পুত্রগণ, কেরলপুত্রগণ[১], এমন কি তাম্রপর্ণী অ্যান্টিওকস্ (নামক) যবনরাজ, এমন কি যে রাজাগণ সেই অ্যান্টিওকসের প্রতিবেশী—সর্ব্বত্র দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী দুই (প্রকারের) চিকিৎসা (-ব্যবস্থা) করিয়াছেন—মনুষ্যের চিকিৎসা ও পশুর চিকিৎসা।

(খ) এবং মানুষের (পক্ষে) উপকারী ও পশুর (পক্ষে) উপকারী ওষধি (ঔষধরূপে ব্যবহারের উপযোগী গাছগাছড়া) যেখানে যেখানে নাই সেখানে সর্ব্বত্র (তাহা) আনয়ন ও রোপন করান হইয়াছে।

---

(১) টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

(গ) মূল ও ফল (ঔষধরূপে ব্যবহারের জন্ম) যেখানে যেখানে নাই সর্ব্বত্র (তাহা) আনয়ন ও রোপন করান হইয়াছে।

(ঘ) পশু-মনুষ্যের পরিভোগের (ব্যবহারের) জন্ম পথে পথে কূপও খনন করান হইয়াছে এবং বৃক্ষও রোপন করান হইয়াছে।

টিপ্পনী

(ক) "এবমপি প্রচংতেসু"— গিরনারের এই পাঠটির পরিবর্ত্তে অন্যস্থানের লিপিগুলিতে "যে চ অংতা" বা "এ বা পি অংতা" প্রভৃতি পাঠ পাওয়া যায়। সেইজন্য ল্যুভার্স মনে করেন যে, মূল মাগধী-প্রাকৃতে অশোক যে কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন (যাহার প্রতিধ্বনি অন্যস্থানের লিপিগুলিতে "যে বাপ্যন্তাঃ =যে বাপি অন্তাঃ" এই সংস্কৃত বাক্যের বিভিন্ন প্রাকৃত রূপে দেখা যায়)। গিরনারের অনুবাদক তাহার অর্থ ঠিক ধরিতে না পারিয়া "এব° প্রচ°" রূপে ভুল অনুবাদ করেন। এই ভুলের আরও একটি প্রমাণ এই যে অন্য লিপি-গুলিতে "অংতা" শব্দটি কর্ত্তৃকারকে আছে এবং ইহার পরের "চোডা, পাডা" প্রভৃতি শব্দগুলিও প্রথমা-বিভক্তিতে থাকিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু গিরনারের "প্রচংতেসু"র ৭মী-বিভক্তি পরের "চোডা, পাডা" প্রভৃতির ১মা বিভক্তির সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিতে পারে নাই।

"চোডা, পাডা" প্রভৃতি—চোল ও পাণ্ড্যগণ ইতিহাসে সুপরিচিত। "সাতিয়পুত্রগণ" পশ্চিম-ভারতের সত্বৎ-জাতি, এখনও মারাঠা দেশের লোকের মধ্যে "সাত্পুতে" পদবী পাওয়া যায়। গিরনারের "কেতলপু°" অন্য লিপিগুলিতে "কেললপু°" বা "কেরড°" বা "কেরল°"। ইহাতে মালাবার (<সং মলয়পার ?) প্রদেশ বুঝাইতেছে। পুতো <সং পুত্র> পা. পুত্ত ; পালিতে সমাসের শেষে পুত্ত শব্দ থাকিলে "বংশীয়" বুঝায়। "আ তংবপংনী"র "আ" শব্দটি <সং যা =বাংলা "যে"=এমন কি। ইহাকে "আসমুদ্র", "আমরণ" প্রভৃতি শব্দের আ-উপসর্গ (=পর্য্যন্ত) মনে করিয়া অনেক প্রাক্তন লেখক প্রমাদ করিয়াছেন, এই "আ" যদি "পর্য্যন্ত" বুঝাইত তবে "তংবপংনী"তে ১মা-বিভক্তি হইত না। "তাম্রপর্ণী" সিংহলের প্রাচীন নাম; দীপবংসগ্রন্থ ও মেগাথথিনিস এই নামে সিংহল দ্বীপকে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু রামায়ণ, বোম্বাই সংস্করণ—

৪।৪১।১৭ শ্লোকে এই নামে একটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহা মাদ্রাজের তিনেভেলি (<সং তৃণপল্লী ?) জেলায়। কিন্তু অশোক সম্ভবত সিংহলেরই উল্লেখ করিতেছেন।

অ্যান্টিওকস্ যবনরাজ—ইহাতে Antiochus I Soter-এর (খৃঃ পূঃ ২৮০-২৬৪) পুত্র সীরিয়ার Antiochus II Theos-কে (খৃঃ পূঃ ২৬১-২৪৬) বুঝাইতেছে। ইঁহার যে প্রতিবাসী রাজাদের অশোক উল্লেখ করিতেছেন তাঁহারা সম্ভবত ১৩শ শিলানুশাসন, কালসী, (থ) যে চারজন রাজার নাম করিয়াছে, তাঁহারা। ইঁহারা সকলে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন এবং অশোক যেরূপে ইঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় তিনি নিজেও ইঁহাদের সমসাময়িক ছিলেন। অশোকলিপিতে এই বিদেশীয় রাজাদের নাম ভারত-ইতিহাসে মহা মূল্যবান কারণ, ইঁহাদের পূর্ব্বজ্ঞাত কালনির্দ্দেশ হইতে অশোকের কালনির্দ্দেশ এবং অশোকের কাল হইতে বুদ্ধের নির্ব্বাণ, জন্ম ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার কালনির্দ্দেশ সম্ভব হইয়াছে।

"সামীপং"—এখানে লিপিটি দেখিয়া মনে হয় শব্দটি প্রথমে "সামংত" (কাল্সী, শাহবাজগ°, ধউলি ও জউগড়েও "সামংত" পাঠই আছে, মানসেহ্রাতে "সমত" আছে) লেখা হইয়াছিল এবং পরে উহাকে বদলাইয়া "সামীপং" লেখা হইয়াছে।

"দ্বে চিকীছা কতা"—এস্থলে কাল্সীর পাঠ আছে "দুবে চিকিসকা কটা" = দুই প্রকারের চিকিৎসক (-এর ব্যবস্থা) করা হইয়াছে।

(ঘ) শাহবাজগ° লিপিতে পথে বৃক্ষরোপণের কথাটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। বোধহয় এ অঞ্চলে পথে আগে হইতেই গাছ ছিল, অথবা জমি এরূপ ছিল যে গাছ ভাল জন্মিতে পারিত না।

১ম শিলানুশাসনে আমরা দেখিয়াছি অশোক রাজ্যে অধর্ম্ম নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রাণীহত্যা নিষেধ করিয়াছিলেন, "সমাজ" অকর্ত্তব্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষ রকমের "সমাজ"-এর প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন। প্রজার মঙ্গল কামনাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তথাগত যে "বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়" প্রচার করিতেন, অশোক তাহাই পালনের উদ্দেশ্যে পশু-মনুষ্যের উপকারের জন্য রাজ্যে যে সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহারই কথা ২য়

শিলানুশাসনে বলিয়াছেন। অশোকের এই প্রয়াস সর্ব্বথা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহার নিজের রাজ্যে পশু-মনুষ্যের হিতকারী এই সব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন রাজ্যের মহাপ্রতাপশালী একেশ্বর সম্রাট, অর্থ ও ক্ষমতার তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু অর্থ ও ক্ষমতা থাকিলেও মহৎ উদ্দেশ্য ও তাহার জন্য শ্রম ও প্রচেষ্টা সকলের থাকে না। অশোক এ বিষয়ে নৃপতিমাত্রেরই আদর্শস্থল।

নিজ রাজ্যের বাহিরে প্রত্যন্তদেশের রাজাদের রাজ্যেও কি তিনি সত্যই এ সব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করাইতে পারিয়াছিলেন? দূতমুখে এই সব রাজাদের সঙ্গে তাঁহার মৈত্রী ছিল, রাজারা তাঁহাকে সম্ভ্রমও নিশ্চয়ই যথেষ্ট করিতেন। অশোক হয়ত পররাজ্যে এই সব হিতকারী কার্য্যের ব্যয়ভারও বহন করিয়াছিলেন বা বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এই সব হিতকর কর্ম্মের প্রবর্ত্তন, তাহার পর্য্যবেক্ষণের জন্য পরিশ্রম, প্রভৃতির জন্য যতটা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও উদ্যোগ রাজ্যের রাজার পক্ষে প্রয়োজন, অশোকের মত তাহা কি তাঁহাদের ততটা ছিল বা হইয়াছিল? এমনও হইতে পারে যে ধর্ম্মপ্রাণ অশোক যখন দূতমুখে ঐ রাজাদের স্ব স্ব রাজ্যে ঐরূপ লোকহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান, তখন ঐ রাজারা অশোককে সন্তুষ্ট ও আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানগুলি না করিয়া বা সামান্য একটু-আধটু করিয়া অশোককে বলিয়া পাঠান যে উহা করা হইয়াছে। অশোকও তাহা বিশ্বাস করিয়া ও প্রীত হইয়া শিলালিপিতে লেখেন যে উহা করা হইয়াছে। আমরা বহুস্থানে দেখিব অশোক শুধু অত্যুৎসাহী ছিলেন না, অত্যন্ত সরলপ্রকৃতিও ছিলেন। তাঁহার উদ্দিষ্ট শুভকার্য্য অন্যেরাও যে অনুষ্ঠান করিতেছে, ইহা তাঁহাকে বিশ্বাস করান খুবই সহজ ছিল।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

প্রলয়

অগ্নিগিরিসানুদেশে এসো ঘর বাঁধি,
এসো হানি বিধাতায় শাণিত বিদ্রূপ।
জ্বলদর্চি-বিচ্ছুরিত প্রাণায়িত পরমাণু শুধু
অসম্পৃক্ত মহাশূন্যে পরিভ্রাম্যমাণ—
কর্মহীন—অবসর-অলসবিলাস—
এক-হতে-বহু-ভব বর্ণহীন লীলার বুদ্‌বুদ্‌ ?
আমাদের হাসিঅশ্রু, সূচিতীক্ষ্ণ আনন্দবেদনা,
বহ্নিজ্বালা সৃষ্টিকাম, নির্বেদের নিতল গহ্বর,
প্রাংশু স্বপ্ন, অন্তহীন নির্ভীক দুরাশা,
উদাসী স্রষ্টার তোলে ধূলি ধূলি শুধু ?

নিযুত আলোক-বর্ষ জীবনগোমুখী-উৎসারিত
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ব্যোম হ'তে ব্যোমে
দোঁহে মোরা খুঁজি' ফিরিয়াছি, আজ দেখা পেনু
এসো বাঁধি ঘর অগ্নিগিরিসানুদেশে।—
স্বাধিকারপ্রমত্ততা—সম্মিলিত সৃষ্টির উল্লাস—
বিধাতারে অতিক্রমি' সৃজনের প্রলুব্ধ প্রয়াস—
জানি জানি সহিবে না, মানবক-স্পর্দ্ধিত-বিক্রম
আপাত-ঔদাস্য তাঁর শিহরিবে স্ফুরিত ঈর্ষায়।
তবু মোরা বাঁধি ঘর চলো অগ্নিগিরিসানুদেশে—
মহীয়ান্ মুহূর্তের মৃত্যুহীন মালা গাঁথি এসো—
ভঙ্গুর প্রেমের রচি ক্ষণিকের অনন্ত অমরা।

ঐ শোনো গরজায় শৃঙ্খলিত সংহার-বাড়ব—
ধূসর আকাশে হের বিধাতার রোষরক্ত আঁখি—
ভয় কিবা—দোঁহে আজ মোরা একায়িত—ভয় নাহি মানি—
ত্বরা করো ত্বরা করো বেলা যায় স্বর্গ-রচনার।

গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

রূপকথা

মাঝে মাঝে দু-একটি
প্রাচীন দেউলের ধ্বংসাবশেষ—
আর বহু-দূর-বিস্তৃত প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য।
এক ফালি পথ চলে গিয়েছে তার মাঝ দিয়ে
মধ্যযুগের দুঃসাহসী নাইটের মতো।
সেই সরু পথটি ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম
আর মনে পড়ছিল—প্রেম, বিরহ, রোমান্স,
ট্রাজেডি—এমনি কত কি?

আর পায়ের তলার শুক্‌নো পাতার মর্ম্মরধ্বনিতে
ভেসে এলো যুগান্তরের অস্পষ্ট গান।
এলো লাখো লাখো ছায়ামূর্ত্তির দল।
শুনলাম তাদের শ্রবণাতীত কণ্ঠ—
আর কল্লোলিত বন-সমুদ্রের ঢেউয়ে পদ-মর্ম্মর।
তাদের গভীর চাহনিতে হাওয়ায় উঠ্‌ল তরঙ্গ,
দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠল আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
মহাকালের কোন গোরস্থান হ'তে
বেরিয়ে এলো ছায়ামূর্ত্তির দল।
মহানগরীর উচ্ছ্বাস আর ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধ,
কঙ্কনের আওয়াজ আর ফিস্‌ফাস্‌ শব্দ।

অন্ধকারের ফেনায় সৃষ্টি হ'য়ে উঠল
এক ছায়ালোক।

ধৌলির নিঝ্‌ঝুম্‌ শিখরদেশ হ'তে
ভাস্করেশ্বরের প্রান্তর পেরিয়ে
একটা বিচিত্র ঠাণ্ডা সুরের ঝড়
বয়ে গেল দূর দিগন্তের পারে।
মুহূর্ত্তের জন্যে মরণমৌন বসুন্ধরা
ঘোমটা খুলে তাকালো—
দেখলাম—প্রেম, বিরহ, রোমান্স, ট্রাজেডি।

তারপর—
ধীরে ধীরে প্রাচীন তোসলীতে
আবার নামল রাত্রি।

শ্রীসুশীল জানা

আমরা ও তাহারা

(আমরা)

সহস্র অলসকণ্ঠ ঐকতানে ওঠে
অতিদৈব শূন্যতার দুরন্ত আকাশে,
পতিতের ভগবান পথপ্রান্তে লোটে,
জনগণ কালগর্ভে ফেটে পড়ে ত্রাসে।
আবার ঈশানী মেঘ, মহিষের দেহ,
জগদ্দল সান্ত্বনায় ব্যোমবক্ষ চিরে।
মরুকণ্ঠে নেমে আসে বিগলিত স্নেহ।
এই মত ধৃষ্টতায় শান্তি রাখে ঘিরে
প্রকৃতির চতুরালি। হায় জনগণ,
রাবণের কামতৃষ্ণা সবুজ প্রখর,—
জীবন মন্থন করি' এইটুকু ধন !
তারপর অহরহ প্রলাপ নির্ভর।
আমার জ্বলন্ত বাণী নাস্তিক্যে উধাও :
চিরকাল লীলাখেলা, ভুলি বেদনাও॥

(তাহারা)

তাদের আগ্নেয় মন সমুদ্র-সৈকতে
বালুর আতপ্ত ঘ্রাণ পায় নোনাজলে,
উধাও প্রান্তরে ঝরে এ-মর জগতে
ফণি-মনসার দান রুক্ষ কুতূহলে।

শীতের তুষার-পাত ঘন কুয়াশার
স্তিমিত বিষণ্ণ সূর্য্য জানায় প্রভাত।
তারপরে বসন্তের দ্রুত অভিসার :
ঘুরে চলে ঋতুচক্রে ধূলিগন্ধ হাত।
নাচের আসরে তীক্ষ্ণ মদির ভাষণ
অন্নচিন্তা চমৎকারা : ত্রিভুবন কাঁপে
চতুরঙ্গ কটকের গুপ্ত সঞ্চারণ।
প্রাণের অখিল দাহ মরে বাষ্পতাপে।
তাহাদের কেন্দ্রাতিগ সাধনার বর :
নিভে আসে ; দ্বৈপায়ন সভ্যতার ঝড়

মণীন্দ্র রায়

পুস্তক-পরিচয়

দক্ষিণ-ভারত-পথে—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ প্রণীত (শ্রীগুরু লাইব্রেরী,) মূল্য দুই টাকা।

আমাদের সাহিত্যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে পড়বার মত বই খুব বেশী নেই। আলোচ্য গ্রন্থখানি সে অভাব কতকটা দূর করবে বলে আমি মনে করি। দক্ষিণ-ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণ করে' গ্রন্থকার তার একটি সুন্দর তথ্যপূর্ণ বর্ণনা দিতে পেরেছেন—এ তাঁর ভ্রমণের কম সার্থকতা নয়। কয়েক বৎসর পূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাসের দক্ষিণ-ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ পড়েছিলাম। 'তীর্থপ্রসঙ্গ' আধ্যাত্মিক উপকরণে সমৃদ্ধ হলে'ও 'দক্ষিণ-ভারত-পথে' ভ্রমণপঞ্জী হিসাবে সাধারণের নিকট অধিকতর সমাদর লাভ করবে বলে' মনে হয়। নানাবিধ নীরস ঐতিহ্য ও তথ্যে পরিপূর্ণ হয়েও সরস বর্ণনার জন্য বইখানি আগাগোড়া বেশ সুখপাঠ্য। দক্ষিণ ভারত বহু তীর্থ জনপদে পরিপূর্ণ। তার সবগুলি না হোক বেশীর ভাগ আমাদের কাছে তেমন সুপরিজ্ঞাত নয়। আমরা উত্তর ভারতের তীর্থ পর্যটনেই অভ্যস্ত। গয়া কাশী আগরা দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন বেড়িয়ে ফিরতে পারলেই যেন আমাদের তীর্থ দেখার পাঠ একরকম শেষ হলো, এমনই একটি ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যে আছে। বড় জোর ভুবনেশ্বর একবার দেখে এলেই আমাদের আর কিছু অবশিষ্ট রইল না, মনে করি। কিন্তু দক্ষিণ দিকে যে অগণিত তীর্থ, অসংখ্য দ্রষ্টব্য স্থান আছে, তা আমরা ভুলেই যাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ-তীর্থযাত্রা করেছিলেন, তার কারণ তিনি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য তীর্থ ভ্রমণ ; কাজেই তাঁকে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই ভ্রমণের বর্ণনার মধ্যে নানা অসামঞ্জস্য থাকলেও তা' বহু বাঙ্গালীকে প্রলুব্ধ করেছে। তার পরে হিন্দুদের সংস্কৃতি যদি কোথায়ও অবিকৃতভাবে দেখতে পাওয়া যায়, তবে সে তার ঐ তীর্থে, তার দেবমন্দিরে, তার বিচিত্র কারুকার্যময়ী মূর্ত্তি-কল্পনায়। ভারতের তীর্থপথই

হিন্দুস্থানের ইতিহাসের পথ। পাশ্চাত্য জগতেও তার সংস্কৃতির ইতিহাস দেখেছি ধর্মমন্দিরের মধ্যেই সজীবতা লাভ করেছে। ফলে পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে ধর্মমন্দিরের বা গির্জার পৌনঃপুনিক আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি গির্জার গঠনে, পরিকল্পনায়, সাজসজ্জায় বৈশিষ্ট্য আছে। এমনই ধর্মমন্দিরের মালা গেঁথে সমস্ত দেশের গলায় যারা পরিয়ে দিয়েছিল, তারা আজ নেই। তাদের বংশধরদের মতিগতিও অনেক বদলেছে। কিন্তু পশ্চিমের ধর্মমন্দিরগুলি আজ কাতরকণ্ঠে তাদের অভিযোগ ঊর্ধে জানাবার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের একটুকু আনন্দের কথা এই যে, আমাদের দেশের দেবমন্দির-গুলি অতীত ও বর্ত্তমানের যোগস্থাপন করতে এখনও পরাঙ্মুখ হয় নি। ঐ দেবমন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া সারা ভারতের হিন্দুকে জগতের কাছে পরিচিত করে' দিচ্ছে। বাস্তবিকই এখন ঐ তীর্থস্থানগুলিই আমাদের একমাত্র গৌরবময় পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অঙ্গুলি নির্দেশ করে' এখনও জগতকে দেখাতে পারি, বলতে পারি ঐ দেখ হিন্দুজাতির নিশান। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে হিন্দুর প্রাণের সত্যিকার পরিচয় রয়েছে, কালের ধ্বংসলীলা এখনও সেটুকু মুছে দিয়ে' আমাদেয় নিঃস্ব করে' দিতে পারে নি। এই দেশ যে হিন্দুদের লীলা-নিকেতন, এ যে সত্যি 'হিন্দুস্থান,' তা ঐ মন্দির-মেখলা ভারতভূমির দিকে তাকালে কেউ অস্বীকার করতে' পারবে না। জরিপ করতে হলে যেমন চারদিকে নিশান করে' নিতে হয়, তেমনই ভারতের চারিদিকে হিন্দুরা ৪টি ধাম তৈরী করেছিলেন— উত্তরে বদরীনারায়ণ, পশ্চিমে দ্বারকা, পূর্বে শ্রীক্ষেত্র, দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ। সুতরাং তীর্থভ্রমণ যে শুধু পর্যটকের প্রয়োজন, তা নয়, ঐতিহাসিকেরও পক্ষে অপরিহার্য। ভারতের মহাকাব্য দুইখানি সেই সুদূর অতীতে কেমন করে' এই সমগ্রতাকে আত্মস্থ করেছিল, তা ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এই বাষ্পীয় এবং বৈদ্যুতিক যুগেও যে কল্পনার বিশালতা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ধরা দিতে চায় না, প্রাচীনেরা অনায়াসে কবিতার মধ্য দিয়ে, রূপকথার মধ্য দিয়ে সেটা কেমন করে' আয়ত্ত করে' ফেললেন, তা আমরা সহজে বুঝে উঠতে পারি নে। গান্ধার থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মানস সরোবর থেকে লঙ্কা তাঁরা যে ভাবে পাড়ি দিয়েছেন, তা চিন্তা করলে এই কথাই মনে আসে যে, সে যুগে ভারত-বাসীরা নিশ্চয়ই অনেকটা সবল ছিল অর্থাৎ এখনকার মত পঙ্গু ছিল না। এই

মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যা কিছু বৈভব ছিল, তা এখনকার চেয়ে মানুষের কল্পনাকে বেশি করে' জাগাতো।

যা হোক্ জ্যোতিষবাবু আমাদের জন্যে যে ভ্রমণ-পঞ্জী সংগ্রহ করেছেন, তা বাস্তবিকই উপাদেয় হয়েছে। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পথ অতিবাহন করতে ক্লান্তি বোধ হয় না। তার কারণ তাঁর রচনা সরল ও প্রাঞ্জল। ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব-শোভার বর্ণনা, প্রবাদের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রমর্মের উদ্ঘাটন-প্রয়াস, মন্দিরের মাপজোপের সঙ্গে অন্তরের ভক্তিবিজড়িত আত্মপ্রকাশ এই পুস্তকখানিকে সাধারণ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে একটু পৃথক্ করেছে, মূল্যবান করেছে। পথঘাটের বৃত্তান্ত তিনি যেমন খুঁটিনাটির সঙ্গে দিয়েচেন, তেমনি দক্ষিণ-ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধেও তিনি মোটেই উদাসীন নন। দক্ষিণ ভারতের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উত্তর ভারতের হিমালয়ের উপত্যকার গাম্ভীর্যপূর্ণ সৌন্দর্য দক্ষিণে না দেখা পেলেও শৈলমালার শ্যামসুষমার সঙ্গে সমুদ্রের দিগন্তবিসর্পী মূর্ত্তিটি প্রায় সবখানে চোখে পড়ে। জ্যোতিষবাবুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এই নিসর্গ-শোভার নিখুঁত ছবিতে অনেক স্থলে উজ্জ্বল হয়েছে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

একদা—গোপাল হালদার (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস্) মূল্য দুই টাকা।

মুমূর্ষু পৃথিবী—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগুরু লাইব্রেরী দাম দুই টাকা।

১৯৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে এবং তারপরে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে, বিশেষ ভাবে বাংলায়, সন্ত্রাসবাদ আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় আন্দোলনের সেই করুণ, ব্যর্থ অধ্যায়ের কথা সর্ব্বজন-বিদিত। হালদার মহাশয়ের 'একদা' সেই সময়েরই পারিপার্শ্বিকতায় গঠিত ও লিখিত। সাধারণ বাঙালী পাঠক পুস্তকখানিকে উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলতে সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠবেন হয়ত। কিন্তু আসলে বইখানি উপন্যাসই। এর প্রধান কারণ অবশ্য চরিত্র-

সৃষ্টিতে লেখকের দক্ষতা; বর্ণনা-কৌশলে বইখানির নায়ক অমিত (এবং আরো কয়েকজন) বই শেষ করবার পরও পাঠকের মনকে নাড়া দেয়।

অমিত মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত যুবক, ইতিহাসের একনিষ্ঠ ছাত্র। তার জীবনে অদূর ভবিষ্যতে অধ্যাপকত্ব লাভের পর যে মসৃণ আরাম-প্রিয়তা এবং গতানুগতিক স্থাণু স্বভাবের আবির্ভাব এক-রকম অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছিল কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী ছেলের ও মেয়ের সাহচর্য্যে এসে তার মোড় গেল ঘুরে। প্রত্যক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদী দলে না মিশলেও সে যে একজন অন্তর বাহির বিপ্লব-বাদী হয়ে উঠল তাতে আর সন্দেহ রইল না। তারই আশেপাশে নানা রকম চরিত্রের ভীড় দেখা গেল—তাদের কেউ বা স্বার্থপর, কেউ আত্মত্যাগী, কারো ভিতর দিয়ে বা বুর্জ্জোয়া-সভ্যতা প্রতিনিধিত্ব জানাচ্ছে এবং অন্য কয়জন যথেষ্ট ভাবে প্রগতিসম্পন্ন। বস্তুতঃ বইখানিতে আয়তন অনুসারে চরিত্রের ভীড় যেন একটু বেশী মনে হয়। অনেক চরিত্রের কথাই শেষ পর্য্যন্ত ভুলতে হয়—যদিও বইখানির আঙ্গিকের দিক থেকে এবং এই ধরণের একটি বিরাট আন্দোলনের পট-ভূমিকা-সৃষ্টিতে, তাহাদের সকলেরই বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় দান আছে।

'একদা' পড়তে পড়তে সাবধানী পাঠক রবীন্দ্রনাথের 'চার-অধ্যায়ে'র কথা স্মরণ না করে পারবেন না। অনেক বিষয়ে অনেক পার্থক্য এবং রচনা-রীতির স্তর-বৈষম্য সত্ত্বেও মূল সুরে এবং প্রতিপাদ্য বা বক্তব্য বিষয়ে উভত্রই এক সন্ত্রাসবাদে অনাস্থা। হালদার মহাশয় লিখছেন,—'জনগণের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এসব প্রয়াসে অমিত বিশ্বাস হারাইয়াছে অনেকদিন। অথচ ইহার রোমান্টিক আপীল মধ্যবিত্তদের পাইয়া বসিয়াছে। প্রকাণ্ড পৃথিবীর ভিত্তি তাহাতে বিন্দুমাত্রও নড়িবে না। ছেলেটাই শুধু পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে। এই সব অমিতের ভাল লাগে না। তাহার বুদ্ধি, চেতনা, অতীত অভিজ্ঞতা দিয়া সে বিচার করিয়া দেখিয়াছে—সুনীলের কোথাও সুযুক্তি নাই। আছে একটা দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা—নিজকে নিঃশেষে ডালি দিবার নেশা।" (১৬৫ পৃঃ)

আঙ্গিকের দিক থেকে বইখানি বিলাতী জয়েস-উল্‌ফ সংস্কৃতির এবং ধূর্জ্জটিপ্রসাদের দেশীয় ঐতিহ্যের অনুগামী। যদিও ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সাফল্যলাভ করতে পারেন নি, তবু তিনিই প্রথম এ পথে যাতায়াত করবার চেষ্টা করেন।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ objective হয়ে পড়ে যে শিথিলতা দেখিয়েছিলেন, হালদার মহাশয়ের জমাট subjective রচনা-রীতি তাকে এড়িয়ে চলতে পেরেছে। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশেষতঃ যখন জানা যায় যে বইখানি লেখা হ'য়েছে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে। সেই সময়ের পক্ষে এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এ বিষয়ে আমি অন্তত নিঃসন্দেহ আছি। বর্ত্তমানে বছর দুয়েক আগে প্রকাশিত বুদ্ধদেবের 'পরিক্রমা' ছাড়া এ ধরণের কোনো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বাংলায় বোধ হয় আর বেরয় নি, যাতে একটি লোকের একটি দিনের ক্রিয়া ও চিন্তাকে অবলম্বন ক'রে কাহিনী রচনা করা হয়েছে। তবে বুদ্ধদেবের চেয়েও হালদার মহাশয়ের রচনার গতি বেশী মনে হয়। অমিতের সমস্ত চিন্তার মধ্যেও সে যে সর্ব্বদাই চলিষ্ণু এবং চিন্তা ছাড়াও অন্য কিছু কাজে ব্যাপৃত আছে তা সুস্পষ্ট ভাবে ফোটানো হ'য়েছে।

লেখক ধূর্জ্জটিপ্রসাদের রচনাভঙ্গীকে বর্ত্তমান পুস্তকে শ্রদ্ধা ক'রে উঠতে পারেন নি।—'কিন্তু তাঁর লেখার style এমনি বিশ্রী যে তাঁর কথা বুঝে ওঠা শক্ত (২২১ পৃঃ)।' এ অভিযোগ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত না জানিয়ে সবিনয়ে এ কথা নিবেদন করতে পারি, হালদার মহাশয়ের রচনাভঙ্গীও ধূর্জ্জটিপ্রসাদেরই প্রসাদপুষ্ট,—তবে বক্তব্য বোঝবার কোনো কষ্ট হয় না, (যা ধূর্জ্জটিপ্রসাদের লেখায় নাকি হ'য়ে থাকে,) তবে একটু বিশৃঙ্খল, (যা ধূর্জ্জটিপ্রসাদের লেখা কখনোই নয়)।

আরও একটা ত্রুটির উল্লেখ না করাও অন্যায় হবে। সেটী শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের পার্শ্বমন্তব্য সম্বন্ধে। 'প্রমথ চৌধুরী—চিন্তা ও লেখার ধার গেছে ক্ষয় হ'য়ে—অথচ কথা বলবার লোভ যায় নি (২০৭ পৃঃ) এবং 'কেউ হন বীরবল—pun-এর সস্তা শব্দ গাঁথেন।'... বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাকে কোনো কৃষ্টিবান চরিত্রের মুখ দিয়েও এইভাবে অস্বীকার করবার চেষ্টা কখনো প্রগতিশীল লেখকের লক্ষণ হওয়া উচিত নয়। প্রতিভার উন্মেষ যেমন আছে, তার ক্ষয়ও আছে তেমনি—এ নিয়ে রহস্য অর্থহীন এবং অমানবিক। যে-কথ্য ভাষায় আজ আমরা সমস্ত রকম রচনাকেই রূপ দিতে সাহসী হচ্ছি, ভুলে গেলে চলবে না, সেটা চৌধুরী মহাশয়েরই অবিরাম প্রচেষ্টার ফল।

অবশ্য, এই সব ছোট খাট ত্রুটি সত্ত্বেও আমি বলতে কুণ্ঠিত নই, বইখানি আমার ভালই লেগেছে। অমিত চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক দলের একতার উপযোগিতা সম্বন্ধে লেখক যা বলেছেন, প্রত্যেক প্রগতিপন্থীরই তা ভেবে দেখা দরকার।

লেখক আশ্বাস দিয়েছেন ভবিষ্যতে আরো দুখানি বই এরই অনুসরণে প্রকাশিত হবে। আশা করি তখন অধিকতর পরিণতির প্রমাণ পাব আমরা।

বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

একটি ধনী যুবক, তার বেপরোয়া ধনক্ষয় এবং তারি ফলে নিঃস্ব অবস্থা, জেল এবং পথচারী যাযাবরবৃত্তি—এই হ'চ্ছে দ্বিতীয় উপন্যাসখানির সারবস্তু। একেই অবলম্বন ক'রে ফেঁপে উঠেছে ২২৫ পৃষ্ঠার ব্যাপক কাণ্ডকারখানা। বস্তুতঃ পুস্তকের অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য সময়ে সময়ে পাঠককেও 'মুমূর্ষু' ক'রে তোলবার উপক্রম করে। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার অসম বণ্টন এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এক পক্ষের দায়িত্বহীন অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রা এবং অন্য পক্ষের জীবনধারণের জন্য শেষহীন সংগ্রাম—এই দুটি চিত্রই গ্রন্থকার পাশাপাশি এঁকে চলেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কোন লক্ষ্য বা কার্য্যতালিকা তাঁর নেই এবং সেইজন্য সবই শেষ পর্যন্ত নিছক হাহাকারে পর্য্যবসিত হ'য়েছে। সে দিক দিয়ে বইখানি সত্যই নিরর্থক মনে হয়। কেবল বেদনার ফিরিস্তি দিয়ে কিম্বা একটা কিছু ধোঁয়াটে রকমের লণ্ডভণ্ড করবার ইঙ্গিত দিয়ে পুস্তকের নায়ক দীনু (অর্থাৎ সুসময়ে যে ছিল মিঃ সত্যেন সেন) অন্তর্দ্ধান করল হঠাৎ। বইএরও শেষ হ'ল সেখানেই। এ অবস্থায় পাঠকের অবাক হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

গৌরচন্দ্রিকার লেখক অনেক শাসিয়েছেন অসতর্ক পাঠকের মনকে উপলক্ষ্য ক'রে।......'এর প্রতি ছত্রে আছে জীবনের সেই নির্ম্মম সত্য যা দিনের আলোর চেয়েও পরিষ্কার অথচ আগ্নেয়গিরি-ধূমায়িত বহ্নিশিখার মত লেলিহান।' অথবা 'কিন্তু সরু সূতোয় গাঁথা প্রেমের গল্প বা অবসরের হালকা-খোরাক রূপকথার কাহিনী পড়বার জন্যে যাঁরা উপন্যাস পড়েন, এ বই তাঁদের জন্য নয়।' কিন্তু এত আস্ফালনের পর ক্রিয়াটি হ'ল নিতান্তই লঘু।

ওদিকে চরিত্রচিত্রণেও সে রকম আগ্রহ দেখা গেল না। নায়ক দীনুর চরিত্রের কী যে মর্ম্মকথা আমার অন্ততঃ বোধগম্য হয় নি। অতসীর আশ্রয়

থেকে না হোক আটবার সে পালিয়েছে, ভিক্ষে ক'রে পয়সাকড়ি পেয়ে তিন-চারবার সেগুলো পথে, ভিখারীদের দিকে অথবা পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, এবং পাঠকের মনে করুণ এবং বীভৎস রসের উদ্রেকের জন্য তাকে দিয়ে করানো হ'য়েছে বা দেখানো হয়েছে অনেক কিছুই। তবু তার চরিত্রের কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

নায়িকা অতসীও বেশী রেখাপাত করে না মনে,—প্রথম দিকে যাও বা তাকে সহজ সাধারণ একটি মানুষ ব'লে মনে হয়,—বই অগ্রসর হ'তে হ'তেই সন্দেহ আসে মনে, দীনুর নিস্পৃহ ঘর-পালানো পুরুষত্বকে ফোটাবার জন্যই বুঝি তাকে দিয়ে বারবার এত মমতা প্রকাশ করানো হ'চ্ছে।

তবু অতসীকে আমার ভাল লাগলো।

অন্য ক'টি পার্শ্বচরিত্রও ফুটেছে মন্দ নয়, বিশেষ ভাবে পদ্ম বা শিবু মোহান্ত।—টাইপ চরিত্র।

ভাষার ওপর লেখকের দখল আছে। লিখতে তাঁর ক্লান্তি আসে না, শব্দ-চয়নও ভাল। তবে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবার বোধহয় তাঁর একটা বাতিক আছে; সাধারণ পাঠকের কাছে সেটা বোধহয় শ্রুতিমধুর লাগবে না। আখ্যায়িকার পাত্র-পাত্রীদের আলাপে যে ইংরেজীর খাদ আছে, তা না হয় স্বাভাবিকতার দোহাই দিয়ে হজম করা যায়, কিন্তু লেখকের বর্ণনায় ও রকম মিশাল ভাল শোনায় না। আরো অনেকের মধ্যে একটি উল্লেখ করছি: 'হাল্যুসিনেশান'। চমকে উঠতে হয়।

ভিখারী-সমস্যা, (যা নিয়ে লেখক এত অশ্রুপাত করেছেন। কোনো একটি একক সমস্যা নয়। মিস্ ব্রততী রায় বা দুচারজন বড়লোকের অতিথিশালায় এর নিরাকরণ সম্ভব নয়। রোগের উপশম করতে হ'লে মূল কারণ আবিষ্কার ক'রে ঠিক মত চিকিৎসার প্রয়োজন। তবে অসুখ ধরা পড়েছে, নেই শুধু চিকিৎসক এবং ঔষধ। মুখুয্যে মহাশয় এই দিকে আলোকপাত করলে ধনবাদার্হ হতেন। লেখক ভবিষ্যতে আমাদের এই অনুরোধটি স্মরণে রাখবেন। বিশেষতঃ তিনি যখন মাঝে মাঝে কোনো বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকায় লিখে থাকেন।

ছাপা বাঁধাই ভাল।

মণীন্দ্র রায়

Some Sayings of Buddha—translated by F. L. Woodward (Oxford University Press).

পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ-সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, তার মধ্য থেকে চিত্তাকর্ষক বস্তু খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন, কাব্যগন্ধী লেখা কখনো কখনো পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বুদ্ধবচন বলে যে সব উক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে তা বেশীর ভাগই গাঢ়বদ্ধ নয়, এবং তার বিষয়বস্তুও অত্যন্ত মামুলী ধরণের। উডওয়ার্ড সাহেব এই বুদ্ধবচন থেকেই নানা অংশ অনুবাদ করেছেন। যে সব গ্রন্থ হতে এই উক্তিগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি পরিচিত গ্রন্থ—যথা দীঘ-নিকায়, মজ্ঝিম-নিকায়, সংযুক্ত-নিকায়, অংগুত্তর-নিকায়, বিনয় পিটক, ধম্মপদ, সুত্ত-নিপাত ইত্যাদি। এর মধ্যে অনেক গ্রন্থই ইংরাজীতে পূর্ব্বে অনূদিত হয়েছে, সুতরাং উডওয়ার্ড সাহেবের অনুবাদের বিশেষ মৌলিকতা নাই। তবে তিনি যে সব উক্তি অনুবাদ করেছেন সেগুলি বিষয়বস্তু হিসাবে সাজাতে চেষ্টা করেছেন, যেমন Beginnings, Early Order, Teachings, ইত্যাদি। সুতরাং তাঁর এই চেষ্টার কিছু মূল্য যে নাই তা আমি স্বীকার করতে পারি না। কিন্তু সকল স্থানেই যে তিনি সুসঙ্গতভাবে এ সংগ্রহ করেছেন তা বলা যায় না। অবশ্য এ কার্য্যে তিনি পথপ্রদর্শক নয়। বহুদিন পূর্ব্বেই Warren তাঁর চির পরিচিত Buddhism in Translation নামক গ্রন্থে এ পথ দেখিয়েছেন। সে যা হোক্, উডওয়ার্ড সাহেবের উপযুক্ত মূল্য সকল ইংরাজ পাঠকই দেবেন। তাঁর অনুবাদ অবশ্য সরস নয় একথা বলা যেতে পারে, কারণ মূল গ্রন্থেই সে সরসতা নাই। সুতরাং মূল ও অনুবাদে যখন রসের অভাব, তখন 'তথাগত' কিংবা ঐ জাতীয় শব্দের ইংরাজী অনুবাদ করবার চেষ্টার পেছনে কোন যুক্তি নাই। তিনি 'তথাগত' শব্দের অনুবাদ করেছেন—Wayfarer ; এ অনুবাদ যে নির্ভুল তা বলা শক্ত।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

বাংলার ব্যাঙ্কিং—শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

অর্থনীতি বিষয়ে বাংলা ভাষায় আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই আজকাল স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রচেষ্টা খুব সামান্যই হইয়াছে। দু'একখানি পাওয়া যায় বটে কিন্তু অর্থনীতিশাস্ত্রের দিক হইতে তাহাদের মূল্য খুবই সামান্য। আলোচ্য পুস্তকখানি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার দিক হইতে উচ্চস্থান দাবী করিতে পারে। পুস্তকের বিষয়বস্তুও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে অসামান্য আগ্রহ থাকিলেও এদেশে সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। এমন কি money-market বলিতে যাহা বুঝায় সে সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায়ও এদেশে সুচিন্তিত গ্রন্থের একান্ত অভাব। সুতরাং বাংলাভাষায় লেখা হইলেও এ পুস্তকখানি এই অভাব কিয়দংশে পূরণ করিবে আশা করা যায়। বাংলাদেশে এমন কি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়, তাহার কার্য্যকলাপ ও তৎসম্পর্কে চলতি ভাষা সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া অনুমিত হয়। শিক্ষিত সমাজেও এ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা ও ত্রাস পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থখানি সেই দিক হইতে জনসাধারণের অভাব দূর করিবে। লেখকের খ্যাতি ও পাণ্ডিত্য ইতিপূর্ব্বেই অর্থশাস্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত এবং পুস্তকখানি সাধারণের জন্য লিখিত হইলেও অভিজ্ঞের নিকট অনাদৃত হইবে না। বাংলার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিসাধন একমাত্র ব্যাঙ্কিং জগতের উপরই বহুল প্রকারে নির্ভর করে। সুতরাং বাংলাদেশে পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

দু'একটি বিষয় সম্পর্কে মনে হয় আর একটু বিশদ আলোচনা থাকিলে ভাল হইত। যথা—মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব, শিল্পের অর্থসংস্থান সম্পর্কে পাশ্চাত্যে বহু প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে এবং সেগুলির সদৃশ কোন প্রতিষ্ঠান এদেশে সম্ভবপর কিনা ও সে সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কি কর্ত্তব্য। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে এ সমস্ত আলোচনা করিতে গেলে পুস্তকখানি বৃহদাকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও হয়ত সাধারণ পাঠকবর্গের ক্ষমতার অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়ায়। তবে এ সম্পর্কে গ্রন্থকারের নিকট ভবিষ্যতে আশা করি।

পরিভাষার গোলযোগ কিছু বর্ত্তমানে থাকিবে এবং এ গ্রন্থেও কতকগুলি

পরিভাষা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইয়াছে। Draft হইতে 'হুণ্ডি' একটু কষ্টকল্পিত মনে হয়। Organised কথাটিকে 'শৃঙ্খলিত' করাও তদ্রূপ, বিশেষতঃ গ্রন্থকার তখন 'সংহতি' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন (পৃঃ ১৯০)।

পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই উত্তম কিন্তু কোথাও মূল্যের সন্ধান পাইলাম না। সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারের ইহা একটি অন্তরায়।

শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য

India's Teeming Millions—by Dr. Gyan Chand. (George Allen & Unwin Ltd.) 12s. 6d.

'Living Space' and Population Problems—by R. R. Kuczynski, (Oxford Pamphlets on World Affairs. No 8.) Price 3d.

১৯৪১ সালের আদমসুমারির সময় আগতপ্রায়। এই আদমসুমারিতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা গত আদমসুমারির ৩৫ কোটি হইতে বাড়িয়া ন্যূনাধিক ৪০ কোটিতে দাঁড়াইবে এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। ফলে ভারতবর্ষ লোকসংখ্যায় পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান দেশ হইয়া উঠিবে। এই ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যার অনুপাতে ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধির যথাযথ প্রসার এতাবৎ ঘটে নাই এবং ভবিষ্যতেও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এই আশঙ্কায় অনেকে চিন্তাকুল হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে প্রধান আদমসুমারি ও সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারিবর্গ ও এতদ্দেশীয় কতিপয় অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ইঁহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি এক বড় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সমস্যার যথোচিত সমাধানের উপর আমাদের মঙ্গলামঙ্গল বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। একাধিক সরকারি রিপোর্ট বিবৃতি প্রভৃতিতে এবং লোকসমস্যা-বিষয়ক পুস্তকে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডক্টর জ্ঞানচাঁদের পুস্তক—India's Teeming Millions—এই পুস্তকগুলির মধ্যে নবতম।

ডক্টর জ্ঞানচাঁদ এই প্রসঙ্গে লোকবৃদ্ধিসংক্রান্ত সমস্যার যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। স্বভাবতই তাই তিনি সুরু করিয়াছেন মলটাস হইতে। কেননা, ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত মলটাস-এর লোকবৃদ্ধি বিষয়ক পুস্তক হইতে এই বিষয়ে আলোচনা প্রবর্ত্তিত হয়। মলটাস ইওরোপীয় জন-বৃদ্ধির দ্রুত হারে ভয় পাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয় পাটীগণিতের হারে অর্থাৎ ১ ২ ৩ ৪ ৫—এইভাবে, কিন্তু লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয় জ্যামিতির হারে অর্থাৎ ১ ২ ৪ ৮ ১৬—এইভাবে। ইহার ফলে ঘটে পরিবর্দ্ধিত জনসংখ্যার উপযোগী খাদ্যের অনটন এবং এই অবস্থার একমাত্র প্রাকৃতির প্রতিকার যুদ্ধবিগ্রহ মহামারী দ্বারা লোকক্ষয়। কিন্তু এই ভয়াবহ পরিণাম যাহাতে না ঘটে তজ্জন্য মলটাস পরামর্শ দেন যাহাতে জন্মের হার অত্যধিক না হয় তদ্বিষয়ে অবহিত হইতে। এই স্থানে বলা অবাশ্যক যে তিনি "নব্য মলটাসীয়" নীতি অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল অধিক বয়সে বিবাহ এবং বিবাহের পূর্ব্বে নারীসংসর্গ পরিহার। তিনি স্বয়ং ৩৯ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া চারটি সন্তানের জনক হন। তাঁহার হিসাব অনুসারে চারটি সন্তান অত্যধিক ছিল না।

সে যাহাই হউক—মলটাস্‌-এর মতবাদ একদিকে যেমন আশঙ্কার অপরদিকে তেমন তীব্র প্রতিবাদের সৃজন্‌ করিয়াছিল। আজ অবশ্য মলটাস-এর মতবাদ অর্থনীতি শাস্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে ইওরোপ সম্বন্ধে তিনি যে আশঙ্কাকুল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। তাঁহার মতবাদ প্রচারের সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরে সাগরপারস্থ উপনিবেশ প্রভৃতি হইতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কাঁচা মাল আমদানীর পথ সুগম হইবার এবং শ্রমশিল্পের বিপুল প্রসারের ফলে ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহের ফলে লোকক্ষয়ও কম হয় নাই। সম্প্রতি আবার ইওরোপে নূতন ধূয়া শুনা যাইতেছে : লোকসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি দূরের কথা, ভবিষ্যতে নাকি লোকসংখ্যা কমিবার সম্ভাবনা আছে, অবশ্য আশু ভবিষ্যতে নয়, আরো কিছু বৃত্তি পাইবার পর।

কিন্তু ইওরোপের অবস্থা যাহাই হউক ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা যে দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং এই ভাবে বাড়িতে থাকিবে—অন্নসংস্থান হউক

বা না হউক—তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিকার যদি এই দেশের অধিবাসীরা নিজে করিতে না পারে, তাহা হইলে করিবে প্রকৃতি। অর্থাৎ মলটাস-বর্ণিত 'পজিটিভ চেক'-এর প্রক্রিয়ায় মহামারী প্রভৃতিতে দেশ আচ্ছন্ন হইবে। এই দেশে মহামারীর যে অভাব নাই তাহাতে প্রমাণ হয় যে ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমান লোকসংখ্যাও এ দেশের পক্ষে অত্যধিক—অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার অনুপাতে। যাঁহারা ইহাতে সন্দেহ করেন, আদমসুমারির রিপোর্ট পাঠ করিলেই তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে।

তবে, অনেকে এই কথা বলেন যে কৃষির উন্নতি অর্থাৎ কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রয়োগ, অধুনা যে-সকল জমী অনাবাদী পড়িয়া আছে তাহাদের চাষ এবং শ্রমশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এতাবৎ এ দেশে কিছুই হয় নাই—হইলে পরে বর্ত্তমান লোকসংখ্যা দূরের কথা ভবিষ্যতে বর্দ্ধিত লোকসংখ্যারও স্বচ্ছন্দ অন্নসংস্থানের অভাব ঘটিবে না।

ডক্টর জ্ঞানচাঁদ বহু সংখ্যাতথ্য আলোচনা পূর্ব্বক এই কথার অসারবত্তা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার এমন উন্নতি সুদূরপরাহত—প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে—যাহাতে এই দেশের ক্রমবর্দ্ধমান্ অধিবাসীদের স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের আশা করা যাইতে পারে। এই সব যুক্তির মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। ভারতীয় লোকসমস্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাও এই সব কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু ডক্টর জ্ঞানচাঁদ এই দাবী করেন যে তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকটিতে এই বিষয়টি নূতন ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই নূতনত্ব কোথায়? দুঃখের বিষয় ডক্টর জ্ঞানচাঁদের পুস্তকে এমন অসাধারণ কিছু পাইলাম না যাহাতে তাঁহার নূতনত্বের দাবী সমর্থিত হয়। তবে এক বিষয়ে তাঁহার সামান্য একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা মোটামুটি এই:—

ডক্টর জ্ঞানচাঁদের মতে লোকসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ সমস্যা স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সমস্যা নহে—জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সমস্যার সমাধান যে ব্যাপক ইকনমিক প্ল্যান ছাড়া সম্ভব নহে এই কথা তিনি মানেন—শুধু তাহাই নহে তিনি এ কথাও স্বীকার করেন যে রাজনৈতিক প্রগতি ছাড়া ব্যাপক প্ল্যান-এর ব্যবস্থা অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যে আবশ্যক স্বায়ত্তশাসনলাভের জন্য

সংগ্রাম। কিন্তু এই সংগ্রামের পরিণতির জন্য বসিয়া থাকা তিনি সমীচীন মনে করেন না। তাঁহার মতে ইহাতে সাফল্যলাভ করিতে হইলে ইহার সঙ্গে জনসমস্যার সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে. কেন না জনভার প্রপীড়িত দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়ী হইবার সম্ভাবনা অল্প। তাই লোকসমস্যার আশু সমাধানের চেষ্টার তিনি পক্ষপাতী।

এইখানেই সোস্যালিষ্টদের সহিত তাঁহার পার্থক্য। সোশ্যালিষ্টরা স্বীকার করেন না যে লোকসমস্যা এমন একটা গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যা যাহার জন্য বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন আছে—ব্যাপক ইকনমিক প্যানিং-এর তাহা অন্তর্গত। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে ইহাকে একটি সমস্যা বলিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। যদি প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহা শুধু ক্যাপিট্যালিষ্ট সমাজব্যবস্থার বা অব্যবস্থার দোষ। তাঁহাদের মতে এই জাতীয় গৌণ বিষয় লইয়া বাড়াবাড়ি করার ফলে অর্থনীতির যে-গুলি প্রকৃত বড় সমস্যা সে-গুলি ধামা চাপা পড়ে। সুতরাং সোশ্যালিষ্টরা ডক্টর জ্ঞানচাঁদের প্ল্যান বা সংগ্রাম সম্বন্ধে উৎসাহ শুধু বাহিরের চটক বলিয়া দেখিবেন। যাহাই হউক, তাঁহার সংখ্যাতথ্যসমৃদ্ধ পুস্তকটি ছাত্রদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পাঠ্য হিসাবে পরিগণিত হইবার দাবী রাখে, যদিও এমন কোনো গভীর তত্ত্বের সন্ধান ইহাতে নাই যাহাতে অর্থনীতির জটিল সমস্যার উপর নূতন আলোকপাত হয়।

বিগত ১৯১৪-১৯১৮ সালের মহাসমরকে ইংরাজ ও ইংরাজের মিত্রশক্তিগণ "The war to end war"—যুদ্ধ লোপের জন্য যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর ভার্সেই-তে যে সন্ধি অনুষ্ঠিত হইল তাহার ফলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা লোপ হওয়া দূরের কথা, পরাজিত জার্ম্মাণীর অসন্তোষ সমধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আন্তর্জ্জাতিক বিবাদ বিসম্বাদ প্রবলতর আকার ধারণ করিল। বর্ত্তমান যুদ্ধ এই অসন্তোষেরই পরিণতি। তাই ভার্সেই সন্ধিকে বলা যায় the peace to end all peace অর্থাৎ এমন সন্ধি বা শান্তি-পত্র যাহাতে সকল শান্তি নষ্ট হয়।

জার্ম্মাণীর পক্ষে এই অশান্তির অন্যতম কারণ, তাহার পূর্ব্বতন আফ্রিকা দেশস্থ উপনিবেশসমূহ কাড়িয়া লওয়ার ফলে জার্ম্মাণ জাতির lebensraum (living space অর্থাৎ বাসস্থান)-এর অভাব। তাই বর্ত্তমান সময়ের

পূর্ব্বে জার্ম্মাণ কণ্ঠে উচ্চারিত lebensraum ধ্বনি সমগ্র ইউরোপে এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। 'Living space' and Population Problems নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে বিখ্যাত অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিত কুক্‌জিনস্‌কি জার্ম্মাণীর এই দাবীর যাথাতথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে জার্ম্মাণীতে যদি অধিবাসী সংখ্যার বাহুল্য ঘটিত তাহা হইলে প্রথমতঃ জন্মের হার বৃদ্ধির জন্য জার্ম্মাণ দেশে যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা হইত না; দ্বিতীয়ত, জার্ম্মাণীতে কৃষি বা শিল্প কার্য্যের জন্য যথেষ্ট মজুর নাই এই অভিযোগ শোনা যাইত না কিম্বা নবার্জ্জিত বোহেমিয়া-মোরাভিয়া হইতে জার্ম্মাণীতে মজুরের আমদানির প্রয়োজন হইত না। সুতরাং বাসস্থানের জন্য জার্ম্মাণীর পক্ষে উপনিবেশের দাবী ভিত্তিহীন। অর্থনীতিক হিসাবেও এই দাবী সমান অগ্রাহ্য, কেননা, উপনিবেশহীন জার্ম্মণীর প্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা ৮০ ভাগ সম্বন্ধে জার্ম্মাণী আত্মনির্ভরশীল অর্থাৎ অনেক উপনিবেশভোগী রাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী—এই হিসাব জার্ম্মাণী হইতে প্রচারিত। তাহা ছাড়া পূর্ব্বতন উপনিবেশগুলির পাঁচগুণ আয়তনের উপনিবেশ লাভ করিলেও জার্ম্মাণীর অর্থনীতির সমৃদ্ধি নাকি বিন্দুমাত্র বাড়িবে না। সুতরাং লেখকের মতে জার্ম্মাণীর পক্ষে উপনিবেশ দাবী একেবারে ভূয়ো।

হিরণকুমার সান্যাল

তথাপি—শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কিশোর গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

মূল্য—পাঁচ সিকা।

'তথাপি' ছোট ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্বীয় dilemmatic উপন্যাস। যে সমবায়ের সাহায্যে উপন্যাসের চৌহদ্দি ঔজ্জ্বল্য লাভ করে—চরিত্রগুলির উপর সেই সূক্ষ্ম মানসিক বোধ, ভাষার সেই রুচিস্মিত ব্যঞ্জনা এবং ঘটনাকে সাধারণ থেকে অনন্যভাবে দেখবার সেই দৃষ্টিভঙ্গী লেখকের আছে বলেই পূর্ব্ববর্ত্তী 'অন্ত্যেষ্টি' নামক একখানি উপন্যাস পড়ে যে ধারণা জন্মেছিল, বর্ত্তমান উপন্যাসখানির

সমগ্রতা মনের উপর সেরূপ কোন প্রত্যক্ষ ছাপ রেখে যেতে পারে নি। অবশ্য তাহ'লেও নিত্য-প্রকাশিত গতানুগতিক উপন্যাসের বিহারক্ষেত্র থেকে এটির স্থান যে অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র তা স্বীকার করতে কুণ্ঠার কারণ নেই।

একটি মূক নারীর মনস্তত্ত্ব অবলম্বন করেই এই উপন্যাসখানির ঘটনা প্রাধান্য লাভ করেছে। এর মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি চরিত্রই বিশেষভাবে সক্রিয়। বাকশক্তিহীনা কল্যাণী, তার স্বামী প্রণবেশ ও প্রণবেশের হিতৈষী বন্ধু ভবতোষ। বাকী দু'একটি চরিত্র প্রয়োজন বোধে যা এসে পড়েছে, আংশিক ভাবে তাদের স্বীকার করলেও উপন্যাসের মধ্যে তারা উল্লেখযোগ্য নয়।

গল্পের ঘটনা হচ্ছে এইরূপ :

কল্যাণীর বিবাহ হয় না। বোবা মেয়ের বিবাহে বিপত্তি ঘটা বিচিত্র নয়, বিশেষ করে কন্যাপক্ষীয় যখন বিত্তহীন। তাই কল্যাণীর মা ও চতুর মাতুল পল্লীগ্রাম থেকে শহরে এসে সুকৌশলে, সুশিক্ষিত, সুমার্জ্জিত, সুপুরুষ ও সৌভাগ্যশালী (সৌভাগ্যশালী কারণ, মৃত্যুকালে তার পিতা তার জন্যে বেশ কিছু রেখে গিয়েছিলেন এবং সে সম্পদের আর কেউ অংশীদার ছিল না) প্রণবেশের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ দিয়ে শহর থেকে চম্পট দেন। কল্যাণী সুন্দরী এবং এমন কি ডাকের সুন্দরী বল্‌তেও তাকে বাধে না। কিন্তু তার সব সৌন্দর্য্যই অর্থহীন হয়ে গেল, বিবাহের দু'দিন পরেই—যখন প্রকাশ হ'ল সে মূক। প্রণবেশের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ; সে ক্ষিপ্ত হয়ে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখতে লাগল এবং মনের মধ্যে আরম্ভ হ'ল তার গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব। ভবতোষ সাধারণ মানুষ—প্রায় দৈব-বিশ্বাসীর মত। তার মত হ'ল : যা ঘটেছে, তা যখন ঘটেছেই ; তখন আর করবার কি থাকতে পারে। অতএব বন্ধুকে সে সান্ত্বনা দিল, যুক্তি দেখাল। সেই যুক্তির জালে প্রণবেশের বিচক্ষণ মন কখনও ধরা দেয়, আবার কখনও তার ভেতরকার আত্মশ্লাঘী মন বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে রুখে দাঁড়ায়—জীবনে এই অভাবনীয় ঘটনাবিপর্য্যয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কল্যাণীর উপর মারমুখী হয় ; কন্যাপক্ষীয়ের চারিত্রিক নীচতা নিয়ে অকথা-কুকথা বলে। এই ভাবে দিন কেটে চলে।

আপাতদৃষ্টিতে সংসারে যা অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকে, দেখতে দেখতে তা রূপান্তরিত হয় সহজবোধে। কিন্তু বাইরের শোভা, লাবণ্য ও উজ্জ্বলতা মানুষকে সাময়িক ভাবে সান্নিধ্যে টানলেও, ভিতরের বস্তুই মানুষকে মানুষের কাছে স্থায়ী করে—দেয় মৌরুসী আসন। এই বস্তু লাভ হয় মনের মিডিয়ম্ দিয়ে, আর এই মনকে প্রকাশ করার প্রশস্ত পথ হচ্ছে ভাষা—কল্যাণী যা থেকে ছিল একান্তই বঞ্চিত। তাই প্রণবেশ যেন কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারে না। তার কৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক মনের ধাতে বৈচিত্র্যহীনা এই বোবা বৌ-এর স্বামীত্ববোধ কোথায় যেন কাঁটা ফোটায় একটা জটিল মানসিক দ্বন্দ্বে সে নিগৃহীত হয়—ডাক ছেড়ে তার কান্না আসে। এই সময় পুস্তকের কয়েক পাতায় দেখা দেয় সুজাতা নামে একটি মেয়ে। এই মেয়েটি দূর সম্পর্কে ভবতোষের ভগ্নী। প্রণবেশকে সে দাদা বলে আর কল্যাণীকে বলে বৌদি। এই সুজাতার সঙ্গে প্রণবেশের নাকি পরিণয়েরও একটা সম্ভাবনা হয়েছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তা ঘটেনি। তাই ইদানীন্তন সুজাতা প্রণবেশকে দাদা বললেও, বাক্যালাপ করে বন্ধুর মতই—গান গায় অর্গেন বাজিয়ে এবং আসে প্রায়ই। কল্যাণী বোবা হলেও বোকা নয়; তাই সে এই অবাঞ্ছিত সুজাতার আনাগোনা অপছন্দ করে এবং একদিন ঈর্ষান্বিত হয়ে মারাত্মক ভাবেই প্রণবেশের সঙ্গে সৃষ্টি করে অনর্থ। প্রণবেশেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে; অত্যন্ত নিষ্করুণ ব্যবহারই সে করে কল্যাণীর উপর এবং পরিশেষে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কল্যাণীর শারীরিক অবস্থা খারাপ জানিয়ে, কুসুমপুরে, তার মার মাছে টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডারে টাকা পাঠায় তাদের আসতে। এবং মনে মনে ঠিক করে যে, কোনরকমে সেই প্রতারক মিথ্যাচারীদের এখানে এনে, বেশ দু'চার কথা শুনিয়ে, কল্যাণীকে তাদের সঙ্গে বিদেয় করবে।

কিন্তু পরিশেষে ঘটনা ঘটে অন্য রকম; অর্থাৎ কল্যাণীর মা তার ছোট ছেলেটিকে নিয়ে এখানে এসে জামাতার মুখে বহু অকথা-কুকথা শুনেও শেষ পর্য্যন্ত থেকে যেতে বাধ্য হন—কল্যাণীরও যাওয়া হয় না। কারণ, তখন কল্যাণীর সন্তান সম্ভাবনার দিন নিকটবর্ত্তী এবং পল্লীগ্রামে উপযুক্ত ধাত্রীর অভাব হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। অতএব প্রণবেশ কল্যাণীকে উপেক্ষা করলেও বা কল্যাণীর মাকে শ্রদ্ধা করতে না পারলেও তারই ঔরসজাত আগন্তুককে সে উপেক্ষা করে

কি ক'রে।—তার নিজের জীবনের মূল্য দিয়েই বোধ হয় সে নির্দ্ধারণ করে ঐ অতিথিটির জীবন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাকেই কেন্দ্র ক'রে—দোরের প্রস্তুত গাড়ী ফিরে যায়, বাঁধা পোঁটলা-পুঁটলী খোলা হয়ে স্থান নেয় আবার যথাস্থানে এবং কল্যাণীর মা এ-বাড়ীর গৃহকর্ত্রী হয়ে ভাঁড়ারের চাবি হাতে পান, তাঁর ছোট ছেলে ভর্ত্তি হয় এখানকার স্কুলে এবং কল্যাণী নিবিড়ভাবে আশ্রয় পায় প্রণবেশের দুটি বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে।

এই হ'ল গল্পের সংক্ষিপ্ত সারাংশ।

সাধারণভাবে ঘটনাটির মধ্যে পাঠক বিশেষ কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধান না পেলেও, মধ্যে মধ্যে লেখকের চরিত্র বিশ্লেষণে নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম বিচারশীল মনের পরিচয় পাঠককে খুসি করবে। কল্যাণী চরিত্র প্রসঙ্গে সম্প্রতি অভিনীত 'মহানিশা' নাটকের নায়িকার কথা মনে পড়ে। এদের উভয়ের মধ্যে একজন মূক ও অপরজন অন্ধ। প্রণবেশ স্বভাবী (normal) মানুষ। তার চরিত্রের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ থাকলেও তাকে নিয়ে নির্দ্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। স্ত্রীর প্রতি অনুকম্পায় কখনও সে নমনীয় আবার কখনও নিষ্ঠুরতায় নির্দ্দয়। ভবতোষের চরিত্রও তাই। একমাত্র দুর্ব্বল বন্ধু-প্রীতি ছাড়া তাকে স্মরণ ক'রে রাখবার আর কোন উপকরণই পাঠক পান নি। লেখকের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বিষয় হচ্ছে তাঁর গতিশীল ও মার্জ্জিত ভাষা। তবে মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিকতার প্রভাব থেকে তা একেবারে মুক্ত হতে পারে নি। এ ছাড়া পুস্তকের ত্রুটি হিসাবে দু'একটি স্থানে লেখক ভাবের আতিশয্যে পারম্পর্য্যের সূত্র হারিয়ে ফেলেছেন বলেই বোধ হয়। কুড়ির পৃষ্ঠায় প্রণবেশ বলছে: "কালুর মা! কোথায় তুমি! সবগুলি ঘরের আলো নিবিয়ে দাও। সিঁড়ির-পথের, বারান্দার, পায়খানার, রাস্তার দিকের আলোটা—সব। এ-বাড়ীতে আজ আলো জ্বলবে না। শিগ্‌গির সব অন্ধকার করে দাও।" এর পরই আবার ঐ একই দিনের প্রসঙ্গে চব্বিশের পৃষ্ঠায় পাওয়া যাচ্ছে: "পাড়ার একটা বাড়ীতে আজ বিবাহ। অপরাহ্নের পড়ন্ত ছায়ায় শানাই ধরিয়াছে ভীমপলশ্রী।" এবং পরবর্ত্তী পঁচিশের পৃষ্ঠায় আছে: "বিয়ে বাড়ীতে আসন্ন সন্ধ্যায় সানাই এবার সাহানা ধরিয়াছে।" এটুকু পড়ার পর পাঠকের মনে স্বতঃই এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক

যে, তাহ'লে কালুর মাকে প্রণবেশ প্রথম যে আলো নিবানোর আদেশ দিয়েছিল সেটা কোন সময়ে !

অবশ্য এসব সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থাক্‌লেও, 'তথাপি'র মধ্যে স্বর্ণকমলবাবু ক্ষেত্র বিশেষে বাক্যহীনা কল্যাণীর অন্তর্জ্ঞানীয় মনের যে-সব সূক্ষ্মপ্রকাশ প্রকটিত করেছেন এবং সাধারণতঃ যে বৈলক্ষণ্য এ-জাতীয় স্ত্রীলোকদের মানসতার মধ্যে দেখা যায়, তার জীবন্ত আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুলভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

পরিচয়

অনাবৃত্তি

আমরা দেখিয়াছি যে, পিতৃযান ও দেবযান-গতির মর্মান্তিক ভেদ এই যে, পিতৃযানীর স্বর্গভোগান্তে চ্যুতি হইয়া আবৃত্তি বা পুনর্জন্ম হয়—কিন্তু দেবযানীর আবৃত্তি হয় না।

এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবম্ আবর্ত্তং ন আবর্ত্তন্তে—ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৫

'এই দেবযান পথে গমনকারীকে আর মানব আবর্তে ফিরিতে হয় না।'

অর্থাৎ, দেবযানীর পক্ষে নিয়ম—অনাবৃত্তি।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২

তেষাং ন পুনঃ আবৃত্তিঃ—বৃহ, ৬.২।১৫

ন চ পুনঃ আবর্ত্ততে—ছান্দোগ্য, ৮।১৫।১

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, দেবযানী শুদ্ধ পূত হইয়া সূর্য দ্বারে উচ্চতর লোকে প্রয়াণ করেন—

সূর্যদ্বারেণ তে বৈরজাঃ প্রয়ান্তি—মুণ্ডক, ১।২।১১

ছান্দোগ্য এই উচ্চতর লোক লক্ষ্য করিয়া দেবযানীর সম্পর্কে বলিয়াছেন—

পরং আদিত্যাৎ জয়তি—তৎ নাকং তৎ বিশোকম্—ছান্দোগ্য, ২।১০।৫

কৌষীতকী উপনিষদ্ আর একটু বিশেষিয়া বলিতেছেন—

স এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য ইন্দ্রলোকমাগচ্ছতি—এবং দেবলোকের ঊর্ধ্বে—স প্রজাপতি-লোকং, স ব্রহ্মলোকম্—কৌষী, ১।৩

আমরা জানি, এই প্রজাপতিলোকই মহর্লোক (Buddhic Plane) —প্রাজাপত্যঃ ততো মহান্—এবং ঐ ব্রহ্মলোক (Nirvanic Plane) আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ স্থান ; আর ঐ ব্রহ্মলোক ত্রিভূমিক—ব্রাহ্ম স্ত্রিভূমিকো লোকঃ। ঐ তিনটি ভূমি বা স্তর আমাদের পরিচিত—জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক।

বৃহদারণ্যকও দেবযানীর সম্পর্কে বলিয়াছেন—দেবলোকাৎ আদিত্যম্—দেবলোক পার হইয়া আদিত্য—এবং আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্। এই বৈদ্যুতলোকই কৌষীতকীর প্রজাপতিলোক। দেবযানী ঐ প্রজাপতিলোকে উপনীত হইলে তাঁহাকে—

পুরুষো মানসঃ এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি—বৃহ, ৬।২।১৫

(ব্রহ্মলোকের উক্ত তিন স্তর লক্ষ্য করিয়াই ঋষি এখানে বহুবচন 'ব্রহ্মলোকান্' বলিলেন।)

ছান্দোগ্যও দেবযানীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—চন্দ্রমসো বৈদ্যুতম্—দেবলোকের ঊর্দ্ধ্বে বিদ্যুৎ (প্রজাপতি)-লোক ; এবং সেখান হইতে এক অমানব পুরুষ দেবযানীকে ব্রহ্মলোকে উপনীত করান—

তৎপুরুষঃ অমানবঃ। স এনান্ ব্রহ্ম (ব্রহ্মলোকং) গময়তি।

ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ কাণ্ডে ধার্মিক জীবনের চরমে-স্থিত বানপ্রস্থের সম্বন্ধে এই উক্তি দৃষ্ট হয় :—

আত্মনি সর্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিস্থাপ্য, অহিংসন্ সর্বভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ ; স খলু এবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষম্ ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে। ন পুনরাবর্ততে। অর্থাৎ, ঐ ভাবে যিনি যাবজ্জীবন যাপন করেন তিনি ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন, তাঁহার আর আবৃত্তি হয় না।

অতএব আমরা দেখিলাম দেবযান গতির চরম ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি। ব্রহ্ম-লোকের ঐশ্বর্য উপনিষদের স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের বর্ণনা এইরূপ—

অরশ্চ হবৈ ণ্যশ্চ অর্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাম্ ইতো দিবি। তদ্ ঐরংমদীয়ং সরঃ, তদ্ অশ্বত্থঃ সোমসবন স্তদ্‌অপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্। তদ্ য এব এতৌ অরং চ ণ্যং চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোক স্তেষাম্ সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।—ছা, ৮।৫।৩-৪

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তম পুরুষঃ স তত্র পর্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্ * * স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে। য এতে ব্রহ্মলোকে।—ছা, ৮।১২।৩-৬

'এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গ ব্রহ্মলোক; ব্রহ্মার বসতি স্থান। সেখানে "অর" ও "ণ্য" নামক সমুদ্রদ্বয়, "ঐরংমদীয়" সরোবর, "সোমসবন" নামে অশ্বত্থ বৃক্ষ, অপরাজিতা পুরী। সেখানে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঐ অর ও ণ্য সমুদ্রদ্বয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদেরই ঐ ব্রহ্মলোক; তাঁহাদের সমস্ত লোকে কামচার (ইচ্ছাগতি) হয়।'

'সেই সংপ্রসাদ (স্বস্থ জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে স্থিত হন। তিনিই উত্তম পুরুষ; তিনি সেখানে স্ত্রী, যান বা জ্ঞাতিবর্গের সহিত রমণ করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, হাস্য করিয়া বিচরণ করেন। যে শরীরে তিনি জাত হইয়াছিলেন, তাহার বিষয় স্মরণ থাকে না। * * তিনি ব্রহ্মলোকে দৈবচক্ষু—মনের দ্বারা সমস্ত কাম দর্শন করিয়া প্রীত হন।'

কৌষীতকী উপনিষদ্ আর একটু রঞ্জিত করিয়া রূপকের ভাষায় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

তস্য বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য আরো হ্রদঃ, মুহূর্তাঃ যেষ্টিহা, বিরজা নদী, ইল্যো বৃক্ষঃ, সালজ্যং সংস্থানম্, অপরাজিতম্ আয়তনম্, ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ, বিভু প্রমিতং, বিচক্ষণা আসন্দী, অমিতৌজাঃ পর্যঙ্কঃ। * * স আগচ্ছতি আরং হ্রদং তং মনসাত্যেতি। তমিত্বা সংপ্রতিবিদো মজ্জন্তি। স আগচ্ছতি মুহূর্তান্ যেষ্টিহান্ তে অস্মদ্ অপদ্রবন্তি। স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি। তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে * * স এব বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি। স আগচ্ছতি ইল্যং বৃক্ষং। তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং, তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি অপরাজিতম্ আয়তনং, তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ তৌ অস্মদ্ অপদ্রবতঃ। স আগচ্ছতি বিভু প্রমিতং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি বিচক্ষণাম্ আসন্দীম্ * * সা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি। স আগচ্ছতি অমিতৌজসং পর্যঙ্কং, স প্রাণঃ * * তস্মিন্ ব্রহ্মাস্তে। তম্ ইত্থং-বিৎ পাদেনৈবাগ্রে আরোহতি ইত্যাদি।—প্রথম অধ্যায়, ২-৫

'সেই ব্রহ্মলোকে "আর" নামক হ্রদ, "যেষ্টিহা" নামক মুহূর্ত, "বিরজা" নামক নদী, "ইল্য" বৃক্ষ, "সালজ্য" সংস্থান (পত্তন), "অপরাজিত" আয়তন, "ইন্দ্র ও প্রজাপতি" দ্বারপাল, "বিভু" সভাস্থান, "বিচক্ষণা" আসন্দী (মঞ্চ), "অমিতৌজাঃ" পর্যঙ্ক। তিনি আর হ্রদে

উপস্থিত হন, মনের দ্বারা তাহা পার হন ; অজ্ঞানীরা এই হ্রদে নিমগ্ন হয়। তিনি 'যেষ্টিহা' মুহূর্তদিগকে প্রাপ্ত হন, তাহারা তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে। তিনি সুকৃত ও দুষ্কৃত (পাপ পুণ্য) পরিত্যাগ করেন। তিনি সুকৃত ও দুষ্কৃত-মুক্ত হইয়া ব্রহ্মাকে জানিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। তিনি 'ইল্য' বৃক্ষের সমীপস্থ হন, তাঁহাতে ব্রহ্মগন্ধ প্রবেশ করে। তিনি 'সালজ্য' সংস্থান প্রাপ্ত হন ; তাঁহাতে ব্রহ্মরস প্রবেশ করে। তিনি 'অপরাজিত' আয়তন প্রাপ্ত হন ; তাঁহাতে ব্রহ্মতেজঃ প্রবেশ করে। তিনি ইন্দ্র প্রজাপতি দ্বারপালদ্বয়ের সমীপস্থ হন ; ইহারা তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করেন। তিনি 'বিভু' সভাস্থলে আগমন করেন ; তাঁহাতে ব্রহ্মতেজঃ প্রবেশ করে। তিনি 'বিচক্ষণা' আসন্দী (মঞ্চ) প্রাপ্ত হন ; এই আসন্দীই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার দ্বারা সমস্ত বিষয়ের দর্শন হয়। তিনি 'অমিতৌজা'-পর্যঙ্কের সমীপস্থ হন ; ইহাই প্রাণ। ইহাতে ব্রহ্মা আসীন আছেন। ব্রহ্মবিৎ এক পদ দ্বারা ঐ পর্যঙ্কে আরোহণ করেন।

কৌষীতকী উপনিষদ্ যে ভাবে ব্রহ্মলোকের ভোগৈশ্বর্যের বর্ণনা করিলেন, তাহাতে স্থানে স্থানে খৃষ্টীয় ও ইস্‌লামীয় স্বর্গের কথা আমাদের মনে পড়ে—কারণ, এ বর্ণনায়ও হুরি (অপ্‌সরা) এবং নানাবিধ ব্রহ্মালংকারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

প্রিয়া চ মানসী প্রতিরূপা চ চাক্ষুষী পুষ্পাণ্যাবয়তৌ। তং পঞ্চশতানি অপ্সরসাম্ প্রতিয়ন্তি —শতং চূর্ণহস্তাঃ, শতং বাসোহস্তাঃ, শতং ফলহস্তাঃ, শতং আঞ্জনহস্তাঃ, শতং মাল্যহস্তাঃ। তং ব্রহ্মালংকারেণ অলংকুর্বন্তি। স ব্রহ্মালংকারেণ অলংকৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্ম অভিপ্রৈতি।

[বলা বাহুল্য এ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহেন, ইনি ব্রহ্মা।—ব্রহ্ম বিদ্বান হিরণ্যগর্ভজ্ঞানবান্ ব্রহ্মৈব অভিপ্রৈতি হিরণ্যগর্ভরূপমেব সর্বতঃ প্রাপ্নোতি, নতু অন্যৎ—শঙ্করানন্দ]।

'ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত দেবযানীকে পুষ্পাভরণভূষিতা মানসী ও চাক্ষুষী হ্লাদকারিণী রমণীদ্বয় অভ্যর্থনা করেন এবং চৌদিকে পঞ্চশত অপ্সরা সমবেত হয়েন—একশতের হস্তে চূর্ণ, একশতের হস্তে বাস, একশতের হস্তে ফল, একশতের হস্তে অঞ্জন এবং একশতের হস্তে মাল্য। তাঁহারা তাঁহাকে ব্রহ্মালংকারে অলংকৃত করেন (হিরণ্যগর্ভযোগ্যেন মণ্ডনেন মণ্ডয়ন্তি)। তিনি ব্রহ্মালংকারে অলংকৃত হইয়া ব্রহ্মার সমীপে উপনীত হন। স প্রাপ্তব্রহ্মলোকঃ অপ্‌সরোভিঃ ব্রহ্মালংকারেণ অলংকৃতঃ তাভিঃ সভাজনৈশ্চ আগচ্ছতি।

আমরা দেখিলাম ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উভয়েই বলিলেন ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত দেবযানীর আর আবৃত্তি হয় না—

তেষাং ন পুনঃ আবৃত্তিঃ—বৃহ,৬৷২৷১৫

ন চ পুনঃ আবর্ততে—ছান্দোগ্য, ৮৷১৫৷১

এই যে অনাবৃত্তি—ইহা কি আপেক্ষিক না আত্যন্তিক? ইহা কি গৌণ না মুখ্য? এই সম্পর্কে বৃহদারণ্যকের বক্তব্য এই :—

ব্রহ্মলোকান্ গময়তি। তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি। তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ—বৃহ, ৬।২।১৪

'তাঁহারা ব্রহ্মলোকে দীর্ঘায়ুঃব্রহ্মার আয়ুঃ-পরিমিত কাল বাস করেন। তাঁহাদের আর আবৃত্তি হয় না।' ইহার টীকায় শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী নিত্যানন্দ স্বামী লিখিতেছেন—তে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তাঃ তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ প্রকৃষ্টাঃ সন্তঃ পরাবতঃ প্রকৃষ্টান্ ব্রাহ্মমানমিতান্ সংবৎসরান্ শতসংখ্যকান্ বসন্তি। তেষাং ন পুনঃ অস্মিন্ কল্পে আবৃত্তিরস্তি। কল্পান্তরে তু আবর্ত্তন্তে। 'তেষাম্ ইহ' ইতি মাধ্যংদিনাদিশ্রুতৌ বিশেষণাৎ—অর্থাৎ, বৃহ্মলোকপ্রাপ্ত দেবযানী ব্রহ্মলোকে প্রকৃষ্ট ঐশ্বর্য লাভ করিয়া শতসংখ্যক ব্রাহ্ম সংবৎসর সেখানে বাস করেন। এ কল্পে তাঁহার আর আবৃত্তি হয় না—কিন্তু কল্পান্তরে আবৃত্তি হয়। মাধ্যংদিন শাখায় সেই জন্য 'তেষাম্ ইহ ন পুনরাবৃত্তিঃ' এইরূপ পাঠ আছে।

এই সম্পর্কে শ্রীশঙ্করাচার্যের নিজের ভাষ্য এইরূপ :—

তান্ বৈদ্যুতান্ (বিদ্যুৎলোকগতান্ বিদুষঃ) মানসঃ পুরুষ এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি (নয়তি); তে (ব্রহ্মলোকগতাঃ পুরুষাঃ) তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ (উত্তমাঃ) পরাবতঃ (বৎসরান্) বসন্তি। তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ (ইহলোকে প্রত্যাগমনং) ন (ভবতি)।

ছান্দোগ্যভাষ্যেও শঙ্করাচার্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের মর্ম এই :—ছান্দোগ্য যে বলেন 'ন পুনরাবর্ততে', এই অনাবৃত্তি আত্যন্তিক নয়। যদি আত্যন্তিক হইত তবে উহা অমৃতত্ব-লাভের তুল্য মূল্য হইত; কিন্তু ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-সিদ্ধি ভিন্ন সে অমৃতত্ব লাভ হয় না, হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে এ অনাবৃত্তি আপেক্ষিক। পুরাণেও আমরা এই-রূপ অমৃতত্বের কথা শুনিতে পাই। পৌরাণিকেরা বলেন—আভূত-সংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে—অর্থাৎ, কল্পকাল স্থিতির নাম অমৃতত্ব। (সেইজন্যই বৃহদারণ্যক বলিলেন—ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত দেবযানীর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল অর্থাৎ কল্পান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে স্থিতি হয়। পরে কল্পান্তরে তাঁহার আবর্তন হয়, যদি না ইতিমধ্যে সেই দেবযানী ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।)

ছান্দোগ্যের ঐ শঙ্করভাষ্য এইরূপ—

তত্রৈবোক্তং পৌরাণিকৈঃ—আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যত ইতি। যচ্চ আত্যন্তিকম্ অমৃতত্বম্ তদপেক্ষয়া 'ন তত্র দক্ষিণা যন্তি, স এনম্ অবিদিতো ন ভুনক্তী'ত্যাদ্যাঃ শ্রুতয় ইত্যতো ন বিরোধঃ। ন চ পুনরাবর্তন্তে ইতীমং মানবমাবর্তং নাঽহবর্তন্ত ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধঃ ইতি চেৎ—ন 'ইমং মানবম্' ইতি বিশেষণাৎ তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তীতি। যদি হ্যেকান্তেনৈব ন আবর্তেরন্, 'ইমং মানবম্' ইতি চ বিশেষণম্ অনর্থকং স্যাৎ। ইমম্ ইহ ইত্যাকৃতিমাত্রমুচ্যত ইতি চেৎ—ন অনাবৃত্তিশব্দেনৈব ইত্যনাবৃত্ত্যর্থস্য প্রতীতত্বাৎ আকৃতিকল্পনা অনর্থিকা, অত ইমমিহেতি চ বিশেষণার্থবত্তায়াম্ অন্যত্র আবৃত্তিঃ কল্পনীয়া। ন চ সদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যেবং প্রত্যয়বতাং মূর্ধন্যা নাড্যা অর্চিরাদিমার্গেণ গমনম্। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। তস্মাৎ তৎসর্বমভবৎ। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্ত ইত্যাদি শ্রুতিশতেভ্যঃ।

অর্থাৎ, এ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যদি আত্যন্তিক অনাবৃত্তি লক্ষিত হইত, তবে ঋষি 'ইমং মানবম্ আবর্তং ন আবর্তন্তে'—এরূপ বিশেষণের প্রয়োগ করিতেন না—মাত্র বলিতেন 'ন আবর্তন্তে'। অতএব বুঝিতে হইবে—অন্যত্র আবৃত্তিঃ কল্পনীয়া—কল্পান্তে অন্য লোকে আবৃত্তি হয়। আরও দেখ—যদি এখানে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞানীর কথা হইত, তবে শ্রুতি এস্থানে সুষুম্না-নাড়ীদ্বারে দেবযানমার্গে উৎক্রান্তির প্রসঙ্গ করিতেন না—কারণ, ব্রহ্মজ্ঞের উৎক্রান্তিই হয় না।

গীতার উপদেশেও আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের আবর্তন ঘটে *—যদি না জীব একান্তভাবে ভগবানে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এ সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাংগতাঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন!
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥—গীতা, ৮।১৫-১৫

অর্থাৎ, 'মহাত্মারা আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয়, অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; তাঁহারা পরমাসিদ্ধি লাভ করেন। হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও জীব পুনরায় আবর্তন করে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।'

---

* বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা—Up to the highest world of the gods, every existence becomes annihilated.

ইহা হইতে বুঝা যায় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের কল্পের মধ্যে আবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু কল্প-ক্ষয় হইলে তাঁহাকেও ফিরিতে হয়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানাম্ অনুৎপন্ন-জ্ঞানানাম্ অবশ্যম্ভাবি পুনর্জন্ম। যে এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তা স্তেষামেব তত্র উৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ নান্যেষাম্। মামুপেত্য বর্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেব।

অর্থাৎ 'ব্রহ্মলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোকগত জীবেরও অবশ্যই পুনর্জন্ম হইবে, যদি না তাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যাঁহারা এইরূপ ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে অবস্থানকালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহারা (কল্পান্তে) ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভ করেন। অপরে করিতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বরকে লাভ করিলে পুনর্জন্ম কখনই হয় না।'

এখানে শ্রীধরস্বামী নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানো প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

'কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে কৃতার্থ হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন।'

ব্রহ্মসূত্রও এই মর্মে বলিয়াছেন—

কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরম্ অভিধানাৎ—ব্রঃ সূঃ, ৪।৩।১০

'কার্যের (ব্রহ্মাণ্ডের) অবসানে তাহার অধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা পরতত্ত্ব (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।'

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যদিও ব্রহ্মলোকবাসীর স্থিতি স্বর্গলোকবাসীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ, কিন্তু কল্পান্তে তাঁহারও পতন (অর্থাৎ জন্মান্তর) হয়—যদি না ইতিমধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। কারণ, তাহা হইলে তাঁহাকে আর ফিরিতে হয় না, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন। অতএব বাদরায়ণের সূত্রোক্ত 'অনাবৃত্তি' এই ভাবেই বুঝিতে হইবে।

সেইজন্য পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় স্বকৃত শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদে এই অনাবৃত্তি-প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

'এই স্থানে আর একটি সিদ্ধান্তকথা বক্তব্য। তাহা এই—যাঁহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনায়

অর্থাৎ, পঞ্চাগ্নি বিদ্যার অনুশীলন, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি ইত্যাদি কর্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ভূত হন, তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে তাঁহারা কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়াবসানে পুনর্জন্ম পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্ত্ব-জ্ঞান-নিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহারা আর প্রত্যাবর্তন করেন না। তাঁহারা কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্ন-ব্রহ্মদর্শন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত হন।'

অতএব আমরা বুঝিলাম যে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত দেবযানী সাধক ব্রহ্মলোকে অবস্থানকালে যদি ভূয়ঃ-সাধন দ্বারা পরব্রহ্মের সহিত নিজের ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তবেই কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত তিনিও আত্যন্তিক অনাবৃত্তি বা অমরত্ব লাভ করিবেন। শ্রীধরস্বামীর লক্ষিত স্মৃতিবাক্যে ঐ কথাই বলা হইয়াছে। ইহাকেই বৈদান্তিকেরা 'ক্রমমুক্তি' বলেন। ৬।১৬ কঠভাষ্যে শঙ্করাচার্য এই ক্রমমুক্তির প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, ঐ মন্ত্রে ঋষি যে অমৃতত্বের কথা বলিয়াছেন—'তয়োর্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি'—তাহা আপেক্ষিক। তয়া নাড্যা (সুষুম্নয়া) ঊর্ধ্বম্ উপরি আয়ন্ গচ্ছন্ আদিত্যদ্বারেণ অমৃতত্বম্ অমরণধর্মত্বম্ আপেক্ষিকম্ এতি—'আভূতসংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।' ইতি স্মৃতেঃ।

তবে, কালান্তরে অর্থাৎ কল্পান্তে (ব্রহ্মলোকগত অনুপম ঐশ্বর্য ইতিমধ্যে ভোগ করিবার পর) ব্রহ্মার সহিত তাঁহার মুখ্য অমৃতত্ব-লাভ অসম্ভব নহে—ব্রহ্মণা বা সহ কালান্তরেণ মুখ্যম্ অমৃতত্বম্ এতি, ভুক্ত্বা ভোগান্ অনুপমান্ ব্রহ্মলোকগতান্।

এই ক্রমমুক্তি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব একস্থলে এইরূপ বলিয়াছেন—

They having entered the stream, after death they will no more return to this world but in one of the highest worlds of light attain Nibbana.—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 415.

এ সম্পর্কে মুণ্ডক ও কৈবল্য উপনিষদের উক্তি এই :—

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে।—মুণ্ডক, ৩।৬।২, ও কৈবল্য, ৪

'তাঁহারা সেই ব্রহ্মলোকে পরান্তকালে (অর্থাৎ কল্পান্তে=at the end of time) পর-অমৃত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন।'

ইহারই নাম 'ক্রমমুক্তি'। ইহলোকে ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা যে মুক্তি, সে 'জীবন্মুক্তি'—আর ব্রহ্মলোকে পরামৃত হইয়া কল্পান্তে যে মুক্তি, সে ক্রমমুক্তি।

তবেই আমরা দেখিলাম—ঐহিক বা ইহলোকে-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম জীবন্মুক্তি।

অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে—বৃহ, ৪।৪।৭
অত্র = ইহলোকে।

—এবং আমুষ্মিক বা পরলোকে-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম ক্রমমুক্তি।

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫
প্রেত্য = পরলোকে।

ব্রহ্মলোকে দেবযানী সাধক কি ভাবে ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য অনুভব করেন, কৌষীতকী উপনিষদে তাহার বিবরণ আছে। সে বিবরণ এইরূপ ;—

তং ব্রহ্মা পৃচ্ছতি কোঽসি ইতি—ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রশ্ন করেন—'তুমি কে?' তং প্রতিব্রূয়াৎ—তিনি প্রত্যুত্তর দেন—'আমি ভা-রূপ পর ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত আত্মা—আকাশাৎ যোনেঃ সংভূতো ভায়াঃ *—আমি সমস্ত ভূতের আত্মা—ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্য আত্মা। ত্বম্ আত্মাসি—যঃ ত্বমসি সোঽহমস্মি—ব্রহ্মা! তুমি যে আত্মা, আমিও সেই আত্মা—সোঽহম্।

ব্রহ্মা পুনর্বার প্রশ্ন করেন—কোঽহম্ অস্মি—আমি কে? উত্তর—'সত্যম্ অসি—ইদং সর্বম্ অসি ইদং সর্বম্ অসি—তুমি সত্য (পরব্রহ্ম স্বরূপ—তুমি এই সমস্ত, এ সমস্তই তুমি?' ব্রহ্মা বলেন—ঠিক বলিয়াছ। আপো বৈ খলু মে, হসাবয়ং তে লোক ইতি—বিশ্বভুবন মদীয় (হিরণ্যগর্ভস্য পরব্রহ্ম-অভিন্নস্য), উহা অদ্য হইতে ত্বদীয় হইল—কারণ তুমি পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে।'

সুফিদিগের মধ্যে এই ধরণের একটি গল্প প্রচলিত আছে। (সুফিরা পারস্যের বৈদান্তিক সাধক)। সে গল্পটি এই :—

এক সাধক বহু সাধনার পর অত্যুচ্চ গিরি-চূড়ায় অবস্থিত সিদ্ধি-মন্দিরের সমীপস্থ হইয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল 'কে তুমি'? সাধক উত্তর করিলেন 'আ-মি'। ভিতর হইতে প্রত্যুত্তর হইল 'ফিরিয়া যাও—এ মন্দিরে দুইজনের স্থান নাই'। সাধক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

* ভায়াঃ : স্বয়ং প্রকাশাৎ ব্রহ্মণঃ সংভূতঃ উৎপন্নঃ—শঙ্করানন্দ।

আরও কত বর্ষ সাধন করিয়া পুনরায় সেই শঙ্কট গিরিপথ বাহিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পুনরায় করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল 'কে তুমি'? সাধক এতদিনে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অনুভব করিয়াছেন। তিনি উত্তর করিলেন 'তু-মি'। অমনি মন্দিরদ্বার স্বয়ং উদ্‌ঘাটিত হইল এবং সাধক মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া সেই পরম জ্যোতিতে বিলীন হইয়া গেলেন।

এই যে পর জ্যোতিঃ—যাহার সহিত একীভাব সাধন-সিদ্ধির চরম লক্ষ্য, ছান্দোগ্য এই ভাষায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন :—

পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ * * অথ যদ্ অতঃ পরো দিবো জ্যোতি দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু ইদং বাব তদ্ যদ্‌অস্মিন্ অন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ—ছান্দোগ্য ৩।১৩।৭

এখানে ছান্দোগ্য যে পঞ্চ ব্রহ্ম-পুরুষের কথা বলিলেন—যাঁহারা স্বর্গলোকের দ্বারপাল, তাঁহারা ব্রহ্মার অনুচর (বলা বাহুল্য যে ঐ স্বর্গলোক দ্বারা ব্রহ্মলোকই সূচিত হইয়াছে; কারণ, শঙ্করের ভাষায়, ঐ পঞ্চ পুরুষ ব্রহ্মণো হার্দস্য পুরুষাঃ)। কিন্তু, সাধকোত্তমের যে পরজ্যোতিঃ লক্ষ্য—তাহা ঐ দ্যুলোকের পরপারে, বিশ্বের ঊর্ধ্বে, উত্তম অনুত্তম সমস্ত লোকের পশ্চাতে। উহা স্বয়ংপ্রভ ও সদাপ্রকাশ—স্বয়ংপ্রভং সদাপ্রকাশত্বাৎ দীপ্যত ইব দীপ্যতে (শঙ্কর)। সাধন-সিদ্ধ অনুভূতি করেন যে, সেই পরমজ্যোতিঃ এবং তাঁহার অন্তঃস্থ জ্যোতিঃ অভিন্ন। বামদেব ঋষি ঐ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে উচ্চতম লোকে অমৃতত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন।

স এবং বিদ্বান্ অস্মাৎ শরীরভেদাদূর্দ্ধঃ উৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ—ঐতরেয়, ৩।৬

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—

ঊর্ধ্বঃ পরমাত্মভূতঃ সন্ সর্বাত্মভাবম্ আপন্নঃ সন্ অমুষ্মিন্ যথোক্তে অজরে, অমরে, অমৃতে, অভয়ে, সর্বজ্ঞে, অপূর্বে, অনপরে, অনন্তে, অবাহ্যে, প্রজ্ঞানামৃতৈকরসে প্রদীপবৎ নির্বাণম্ অত্যগমৎ।

ঐ অমৃতত্ব-সিদ্ধির কথা আমরা আগামী অধ্যায়ে বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্যান্থার

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে প্রকাণ্ড সাততলা বাড়ী, ঝক্‌ঝক্ করছে। পাশ দিয়ে হাঁটবার সময় রং আর চূন-সুড়কীর গন্ধ পাওয়া যায়।

হিরণ্ময় লিফ্‌টের কাছে গিয়ে সুইচ্ টিপলে, লিফ্‌ট নেমে এলো। লিফ্‌ট-ম্যান লোহার দরজা খুলে হিরণ্ময়কে দেখে নিঃশব্দে আঙ্গুল দিয়ে পাশের সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলে, তারপর পুনরায় যথাস্থানে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ওপরে উঠতে লাগলো। হিরণ্ময় লিফ্‌টম্যানকে একটা ঘুসি দেখালে, লোকটা তখনও তাকিয়ে ছিলো তার দিকে।

অফিসটা সাত তলায়।

পাঁচ তলা পর্য্যন্ত উঠে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, উদ্দেশ্য ক্ষণিক বিশ্রাম, পকেট থেকে রুমাল বার করে সে মুখ মুছতে লাগলো, ঘেমে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে স্যুট পরা একটা লোককে উঠতে দেখে হিরণ্ময় তাড়াতাড়ি রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেললে। উঠে যাবার সময় সে দেখতে পেলে ভদ্রলোকের হাতে একটা লম্বা অফিস খাম। বোধ হয় তারই সহযাত্রী। স্যুট পরা লোকটা যাবার আগে সিগারেটের শেষ টুকরোটা হাত দিয়ে জান্‌লার দিকে ছুঁড়ে মারলে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জ্বলন্ত সিগারেট-প্রান্তটা হিরণ্ময়ের জামায় এসে পড়লো; ক্ষিপ্র হাতে সে পরিচ্ছদ থেকে ছাইটা ঝেড়ে ফেলে লোকটার দিকে একবার তাকালে। এক মিনিট পরেই নূতন উদ্যমে তাকে আবার সিঁড়ি ভাঙতে দেখা গেল।

'কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে'র বন্ধ দরজার সামনে গুটি পনেরো যুবক; একটি দারওয়ান তাদের সমবেত বিশৃঙ্খলা দমন করতে ব্যস্ত।

হিরণ্ময়কে দেখে দারওয়ান এক টুকরো কাগজ আর পেনসিল নিয়ে এলো; 'নাম লিখ্‌কে দিজিয়ে।'

'বহুত আচ্ছা!' বলে সে প্রদত্ত কাগজে লিখলে—হিরণ্ময় বসু; তারপর লিখলে এম-এ, লিখেই সেটা ভালো করে কেটে দিলে, তারপর আবার লিখলে, এম-এ। 'কেত্তা দেরী হোগা?'

'মালুম নেহি !'

কয়েক মিনিট পর পর দারওয়ান এক এক জনকে ডেকে নিয়ে যায়, খানিক্ষণ পরেই উক্ত ভদ্রলোক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। এমন মুখের ভঙ্গী নিয়ে আসে যেন চাকরী তার হয়ে গেছে ! বাইরের অপেক্ষারত লোক-গুলির চোখে ফুটে ওঠে হতাশা।

পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। তবে কি কাজ সেটা বিজ্ঞাপনে ভালো করে উল্লেখ করে নি। স্বয়ং সাক্ষাৎ করবার নির্দ্দেশ আছে। বসবার কোন স্থান নেই, সিঁড়ির পাশে ভিড় বেড়ে চলেছে। গ্রীষ্মের প্রখর দ্বিপ্রহর, অল্প বিস্তর সকলেই ঘর্ম্মাক্ত। কেউ কেউ সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়েছে ; কোঁচার খুঁটের সাহায্যে মুখের কাছে ঈষৎ হাওয়া সঞ্চালনের চেষ্টায় আরও বেশী করে ঘামছে।

'ডি. কে. রায় !' দারওয়ান হাঁক দিল, 'কৌন হায়, ডি. কে. রায় ?'

জুতোর একটা ত্বরিত-খস্-খস্ শোনা গেল। সেই ভদ্রলোক—যে তার গায়ে পোড়া সিগারেট ছুঁড়ে মেরেছিলো। দরজার ও-পাশে সাহেব অদৃশ্য হল।

আর কারুর রক্ষে নেই। কর্ম্ম-প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ধিক্কার দিচ্ছিলো, আপ্রাণ চেষ্টা করলে একটা প্যান্ট আর একখানা টাই সংগ্রহ করা এমন কিছু শক্ত কাজ হত না।

অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই সে বাইরে এলো।

চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরলো সবাই কালীঘাটের ভিক্ষুকের মত।

'কি জিজ্ঞেস করলে মশাই ?'

'কি করতে হবে জানলেন কিছু ?'

'প্রস্‌পেকট আছে ?'

উত্তর হল, 'what silly questions ! আর বলবেন না মশাই, যত সব idiotic affair !'

দারওয়ান হাঁকছে, 'হিরোন-ময় কৌন হায় !'

হিরণ্ময় এগিয়ে গেল। 'আপ্‌কে নাম ?'

ও ঘাড় নাড়লো।

ঘরের মধ্যে ঢুকে ও দেখতে পেলে প্রকাণ্ড টেবলের ওপর রাশি রাশি নানা

রকমের কাগজপত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো। দরখাস্তগুলো এক পাশে ক্লিপ দিয়ে আঁটা। সমস্ত কাগজ আর ফাইলের ওপর এক জোড়া পা প্রথমেই হিরণ্ময়ের নজরে পড়লো, জুতো সমেত।

একটুখানি এগিয়ে গিয়েই হিরণ্ময় লোকটির মুখ দেখতে পেলে, যুবকও বলা যায়, প্রৌঢ়ও বলা চলতে পারে, চোখ দুটো সম্পূর্ণ বন্ধ নয়। দ্রুত-চালিত পাখার হাওয়ায় লাল রঙের দামী টাই-টা উড়ছে। চেয়ারে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থা লক্ষ্য করে হিরণ্ময় চিন্তিত হল। অজস্র লোকের সঙ্গে বাজে বকে বকে বোধ হয় ভদ্রলোক ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু হিরণ্ময়কে দেখেও টেবলের উপর থেকে পা নামাবার বিন্দুমাত্র আভাষ পাওয়া গেল না।

কাছে এসে সে যথাসম্ভব মাথাটা নিচু করে একটা নমস্কার করলে ; ভদ্রলোক ডান চোখটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম ?' বাঁ চোখটা তখনও বন্ধ ! বোধ হয় চোখের ব্যারাম আছে—হিরণ্ময় ভাবলে।

'হিরণ্ময়, হিরণ্ময় বসু।'

ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন ; হিরণ্ময় ব্যস্ত হয়ে ঠিক সামনের ফাইলটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলে।

হঠাৎ দুটো চোখ সম্পূর্ণ খুলে অফিসার মশাই ছুঁড়ে মারলেন, 'I say, where's your application ?'

হিরণ্ময় তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে দরখাস্তটা বার করে দিলে।

চোখ বুলোতে বুলোতে—'I see, এম-এ পাশ করেছেন দেখছি ! কোন বছর ?'

'আজ্ঞে এ বছরেই।' বিনীত উত্তর হল।

'কি সবজেকট ছিলো ?'

'ইংরেজী !'

'কোন ক্লাশ ?' সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট নিয়ে দেশলাই জ্বালতে গিয়ে নিবে গেল। 'পাখাটা বন্ধ করুন ত।'

হিরণ্ময় সুইচ্‌টা টেনে দিয়ে স্বস্থানে এসে দাঁড়ালো। পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরী কি সোজা কথা নাকি ? পাশ করার পর এই তার অষ্টম চেষ্টা। প্রথম প্রথম লজ্জায় সে কত জায়গা থেকে লোকের সঙ্গে দেখা না করে ফিরে এসেছে।

সঙ্কোচ জয় করতে না পেরে দূর থেকে সে কত অফিসের দানব-প্রমুখ বাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখেছেই। মাড়ওয়াড়ি ফার্মে এক বাঙ্গালী ম্যানেজারকে চড় মেরে তাকে পুরো একদিন হাজত-বাস করতে হয়েছিলো।

এখন সে শিক্ষিত সৈনিক, কাঁটাতারকে আর ভয় করে না।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মিঃ মিত্র (খবরের কাগজে ঐ নামই ছিলো) পাখাটার দিকে একবার তাকালেন, হিরন্ময় এক লাফে এগিয়ে গিয়ে আবার সুইচ্‌টা নামিয়ে দিয়ে এলো।

'সার্টিফিকেট এনেছেন?'

কয়েক মুহূর্ত্ত প্রশ্ন কর্ত্তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করলে, 'কিসের?'

'আর কিসের আবার?' প্রায় আকাশে মেঘ ডেকে উঠলো, 'আপনি যে এম-এ পাশ করেছেন বলছেন সেটা আমি গণৎকার হলেও আমার জানা সম্ভব নয়, got it?'

'সার্টিফিকেট তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না,' স্তিমিত গলায় হিরণ্ময় বললে, 'য়্যুনিভারসিটির ব্যাপার, জানেনই ত?'

'না আমি কিছু জানি না।' আবার গর্জ্জন হল।

হিরণ্ময় ঘাবড়ে গেল।

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা। শুধু পাখাটার একটা দ্রুত স্পন্দন আর দেওয়ালে একখানা ক্যালেণ্ডারের খস-খস শব্দ।

দরখাস্তের ওপর চোখ বুলিয়ে মিঃ মিত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'কৈ বললেন না ত কোন ক্লাশ পেয়েছিলেন? কবার আমি এক প্রশ্ন আপনাকে বার বার জিজ্ঞেস করবো।'

হিরণ্ময় কি একটা উত্তর সামলে নিলে, বোধ হয় কোন বক্রোক্তি। পঁয়ত্রিশ টাকা! লাল দীঘির পাড়ে বসে চানাচুর চিবানো আর মেট্রোর লবির সামনে দাঁড়িয়ে দারওয়ানের খিঁচুনি সে ভোলে নি।

'ফার্ষ্ট হয়েছি ফার্ষ্ট ক্লাশ!' হিরন্ময় চেয়ারটায় বসে পড়লো।

মিঃ মিত্র ঘাড়টা সোজা করে বললেন, 'আশ্চর্য্য! আর পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরীর জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন?'

'ঘুরে বেড়াবো না ত কি করবো বলুন ?' হতাশ কণ্ঠে হিরণ্ময় উত্তর দিলে, 'তবু ত চাকরী পাই না।'

'পাবেন কি করে। অফিসের কি জানেন ? শিখেছেন কিছু ? কোন technical qualification আছে ? আপনারা পড়বেন বি-এ, এম-এ, পি-আর-এস, ছাই ভস্ম কত কিছু।'

'Technical qualification ? সর্ব্বনাশ। হিরণ্ময়ের রক্ত নিমেষে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যাঃ আবার বোধ হয় চানাচুর !

'এ্যাকাউণ্টস্-এর কাজ কিছু জানা আছে না খালি ফার্ষ্ট-ই হয়েছেন ?'

উঃ। নির্ম্মলটা সব সময় তার অফিসের কথা বক্ বক্ করতো বলে কতবার হিরণ্ময় তাকে ধমক দিয়েছে। কোন একটা অডিট্ অফিসে সে চাকরী করে, যত তার একাউণ্টস্-এর গল্প শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে,—আর আজ সে-ই কিনা তাকে বাঁচালো। নির্ম্মল হতভাগার কাছেই সে শুনেছে অর্থহীন কথাগুলো, 'ডাব্ল্ এন্‌ট্রি' 'ডেবিট্ ক্রেডিট' 'প্রফিট এ্যাণ্ড লস্'।

'হঁ্যা, জানি,' হিরণ্ময় গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে, 'আপনাদের এখানে ডাব্ল্ এন্ট্রি সিস্টেম-এ একাউণ্টস্ রাখা হয় ?'

'নিশ্চয়!' তাচ্ছিল্যের স্বরে মিঃ মিত্র বললেন, 'হিসেবের কাজ জানেন বলছেন—অথচ কোন নিয়মে হিসেব রাখা হয় তা জিজ্ঞেস করছেন ? আপনি কি বাংলা খাতা পেয়েছেন নাকি ?'

'না, দেখুন; তা আমি বলতে চাইনি, তবে কিনা—'

'থামুন। ফাইলিং জানা আছে ?'

'আছে।' এম-এ ক্লাশে ফ্ল্যাট ফাইলে লেকচার নোটস্ পাঞ্চ করে করে হাতে কড়া পড়ে গেছে।

'এ-সব আবার শিখলেন কোথায় ?'

ওর মনে খটকা লাগলো, 'এম-এ পরীক্ষা দিয়ে বসেছিলুম কয়েক মাস, তখন কিছু কিছু শিখে নিয়েছি, জানিই ত শেষ কালে কলম পিষতে হবে।'

মিঃ মিত্র টিন থেকে আর একটা সিগারেট বার করলেন; এবার আর হিরণ্ময়কে বলতে হল না কিছু, চেয়ার ছেড়ে সে সুইচ্ বোর্ডের কাছে গিয়ে

পাখাটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো, সিগারেট ধরানো হয়ে যাবার পর ও পাখাটা আবার চালিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বসলো চেয়ারটায়।

'টাইপ করতে পারেন?' আবার আক্রমণ সুরু হল।

ঘামতে লাগলো সে; 'পারি তবে out of practice, দু'দিন হাত চালালেই ঠিক হয়ে যাবে।

'আপনি হাত-চালানো ঠিক করবেন, আর আমার অফিসের কাজ suffer করবে তা চলবে না কিন্তু বলে দিলাম, বরং আপনি বাড়ী গিয়ে আপনার চালানো ঠিক করে নিন।

'নিশ্চয়! নিশ্চয়!' সোৎসাহে বেচারা হিরণ্ময় উত্তর দিলে।

মিঃ মিত্র সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে কর্ম্মপ্রার্থীর দিকে একটা সন্দেহ-মিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, 'what নিশ্চয়?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন আরক্ত চোখে।

হিরণ্ময়ের মনে খটকা লাগলো বিষয়টা কি? 'না, এই মানে দুদিন মেসিনে হাত দিলে—'

'আঃ কি বাজে বকছেন? শুনলাম ত একবার!' মিঃ মিত্র চোখ বুজলেন।

মাছটা ঘাঁই মেরেই ছিটকে গেল বুঝি! 'দেখুন, কাজ কর্ম্ম কিছু কিছু জানা আছে,' আস্তে আস্তে সে চাড় ফেলতে লাগলো, 'একটা chance পেলে', হিরণ্ময় তার বিদ্যের একটু ঝিলিক না ছড়িয়ে পারলে না, বললে, 'surely I shall work my fingers to the bone!'

জুতসই কথাটা বলে সে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলো, কিন্তু মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে পাপের জন্যে অনুতপ্ত হল। কিন্তু সৌভাগ্য তার আগুণের আভাই দেখা গেল মাত্র!

'কি বলছিলেন?' পাখার শব্দটা চাপা পড়লো, 'কাজ কর্ম্ম কিছু কিছু জানা আছে? আপনার আগে যারা এ-ঘরে এসেছিলো তাদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ জন লোকের কিছু কিছু নয়, সম্পূর্ণ জানা আছে।'

মিঃ মিত্র চুপ করলেন।

জল একেবারে নিস্তরঙ্গ, মাছের সাড়াশব্দ পর্য্যন্ত নেই।

'আচ্ছা !' মিত্র দরজার দিকে তাকালেন।

হিরণ্ময় শেষবার একটা ঢিল মারবার লোভ সংবরণ করতে পারলে না, 'কিছু মনে করবেন না,' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে সে বললে, 'কোন hope আছে কি?' বেহালার ছড়ির শেষ টানের মত শোনালো তার গলার কম্পিত শব্দ।

'Hope ? By Jove, no harm in hoping !' মিঃ মিত্র এবারে হাসলেন; ও-রকম অদ্ভুত, প্রায় অশোভন ভাবে হাসতে হিরণ্ময় কোন লোককে দেখেনি কোন দিন।

সুইঙ্গিং দরজা ঠেলে হিরণ্ময় হাটের মাঝখানে ছিটকে পড়লো।

কর্ম্ম-প্রার্থীর দল তাকে ঠেলতে ঠেলতে দেয়ালের কোণায় নিয়ে গেল।

'আপনার হয়ে গেল, না দাদা ? Good luck !'

'এতক্ষণ ত কারুর সঙ্গে কথা বলেনি মশাই !'

'ঠিক ঠিক পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে ত ?'

'আপনার চেহারা দেখেই বোধ হয় পছন্দ হয়েছে।'

হিরণ্ময় ঠাট্টার সুরে বললে, 'চেহারা দেখে ? ভেতরে টেবিলের ওপর পা তুলে বসে আছে কে জানেন ? এক জন পুরুষ, dam, swine ! মেয়ে নয় !' নিজে সে অবাক হয়ে গেল, এতক্ষণ পরে রাগে তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। ওর ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে লোকটার চিবুকে একখানা প্রচণ্ড ঘুসি মেরে আসে, না ঘুসি নয়, বসা-অবস্থায় ঘুসি জমবে না! চেয়ারটা পেছন দিকে ঠেলে দেয়া। হিরণ্ময়ের হৃদপিণ্ডটা লাফাতে লাগলো। 'নাঃ যাক গে। কি হবে বেচারাকে মারধোর করে ? সব অফিসের লোকই ত সমান !'

দারওয়ানটা চেঁচাচ্ছে, 'নদের চাঁদ কৌন্ হ্যায়, জলদি !'

হিরণ্ময়কে ছেড়ে দিয়ে সবগুলো লোক আবার যথাস্থানে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

শ্রান্ত পায়ে আস্তে আস্তে সে নামতে লাগলো, সিঁড়ি আর শেষ হচ্চে না!

রাস্তায় পা দিয়ে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ঘড়িটায় দেখলে, দুটো পনেরো।

ধর্ম্মতলায় একটা কাগজের অফিসে একজন সহ-সম্পাদকের জন্যে দরখাস্ত

পাঠিয়েছিলো দিন চারেক হল, ইচ্ছে ছিলো সে-অফিসটাও ফেরবার সময় হয়ে যাবে।

ড্যাল্‌হাউসীর দিকে সে এগোতে লাগলো। লোকের ভিড়ে ফুটপাত দিয়ে চলা দুষ্কর, কিন্তু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে মোটারের নিচে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

প্রকাণ্ড একটা বাড়ী তৈরী হচ্ছে, 'লোহার আর ইঁট কাঠের শব্দ, মানুষ আর যন্ত্রের শব্দ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে শুনলে বুদ্ধি-ভ্রংশ হবার সম্ভাবনা! কদর্য্য, কুৎসিৎ লামাগুলো প্রবাল বিক্রি করছে। নেংটি-পরা রুগ্ন এক বৃদ্ধ সামনে থালার ওপর শিব-লিঙ্গ রেখে প্রসারিত হাতের ওপর উপুর হয়ে পড়ে আছে। হিরন্ময় ঘণ্টা দেড়েক আগেও যাবার সময় লোকটিকে একই অবস্থায় দেখে গেছে।

লাল দীঘির জলে হাত মুখ ধুয়ে ও একটু সুস্থ হল। এ্যাসপ্লানেড পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়ে সেখান থেকে ট্রাম কিংবা বাস ধরা যাবে।

নিউম্যান্‌স্‌-এর সো কেস্‌ দেখলে, নুতন বই কিছুই রাখেনি, বইগুলো দেখে দেখে তার মলাট পর্য্যন্ত মুখস্থ হয়ে গেছে।

সাতরাম দাসের আলমারীতে একখানা সোণার হার সে না দেখে কোন দিন এ ফুটপাত দিয়ে যেতে পারেনি।

এই হারটাই পায়ের নিচে যে চৌকো স্ল্যাবটা—তার ওপর দাঁড়িয়ে তারা দু'জন এক সঙ্গে দেখেছে।

'ভারি চমৎকার না?' হিরণ্ময়ের দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

'অদ্ভুত!'

'তোমাকে কেমন মানাবে বল তো?'

আজও সেদিনের মত তার হৃদপিণ্ডে লাগলো প্রচণ্ড একটা ধাক্কা।

'তুমিই বল না কেমন মানাবে।'

'প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই এটা আমি তোমার জন্যে কিনবো', হিরণ্ময় বলেছিলো।

'বাবা তোমায় তাঁর অফিসে যে কাজটা দিতে চাচ্ছেন—সেটা নিচ্ছ না কেন?

এম-এ পাশ করে কি হবে ? এখন দরকার সেটেল্‌ড্ হওয়া, কতদিন আর ভেসে বেড়াবে ? বয়েস বাড়ছে না ?'

'এম-এ পাশ করে অনেক প্রস্‌পেক্ট্, তুমি বুঝতে পারছো না মায়া ! ভালো রেজাল্ট্ করতে পারলে চাই কি কোন কলেজে একটা প্রফেসারিও জুটে যেতে পারে, কে বলতে পারে !'

'কিন্তু হাতের একটা পাখীর গল্প ভুলো না, পরে এ chance ত নাও আসতে পারে। তা ছাড়া বাবা ভারি রাগ করছিলেন ?'

'সত্যি ?' হিরণ্ময় চিন্তিত হয়ে উঠেছিলো ; 'তুমি একটু বুঝিয়ে বললে না কেন ?'

'আমি কি বলবার কিছু বাকি রেখেছি ?'

'কি বলছিলেন তিনি ?'

'না, তেমন কিছু না ; চল, সব কথা শুনতে হবে না !'

'বল না লক্ষ্মী !'

মায়ার চোখে প্রবাহিত হল একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ ! কিন্তু তার বাবার শাণিত মন্দ বাক্য সে হিরণ্ময়কে বলতে পারেনি।

তারপরে হিরণ্ময়ের জীবনে অকস্মাৎ ঘটলো একটা ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন। হঠাৎ দেশ থেকে খবর এলো বাবার মৃত্যুর। তাঁর সামান্য পেনসনের টাকাতেই সংসার চলছিলো। হিরণ্ময় চারদিক অন্ধকার দেখলে। গোটা তিনেক ট্যুসানি না জোটাতে পারলে সে যাত্রা কি হত বলা যায় না !

মাস দুয়েক-এর জন্যে তাকে যেতে হল দেশে, বিধবা মা আর অবিবাহিতা ভগিনী !

দেশের বাড়ীতেই এক সকালবেলা মায়ার বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রটা সে পেলে। গায়ে ফতুয়া আর পায়ে চটি নিয়েই সে ছুটতে ছুটতে ষ্টেসানে এলো কলকাতার ট্রেন ধরবার জন্যে, কিন্তু ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে !

আবার গাড়ী সেই কাল সকালবেলা।

সে যখন পরশু দিন কলকাতা গিয়ে পৌঁছাবে, তখন মায়ার মৃত্যু হয়েছে। ষ্টেসান থেকে সে গেল তিন মাইল দূরে পোষ্ট অফিসে, সেখান থেকে টেলিগ্রাম

ফরম্-এ লিখলে: বিয়েটা যেন অতি অবশ্যই স্থগিত রাখা হয়, সে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে অবিলম্বে। কিন্তু টেলিগ্রামটা সে পাঠালে না।

অনর্থক।

হিরণ্ময় যখন তার মেসে পৌঁছালো তখন বিকেল।

স্নান করে সে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিলে, চমৎকার লাগছে শরীরটা, সমস্ত ক্লান্তি তার দূর হয়ে গেছে। সিগারেট খাওয়া সে ছেড়ে দিয়েছিলো, আজ অনেক দিন পরে সে রাস্তায় এসে পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে তার অপরিসর ঘরের মেঝেয় মলিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে টানতে লাগলো; আজ সে সম্পূর্ণ সিগারেটটাই টানবে—শেষ পর্য্যন্ত! যতক্ষণ না আঙ্গুলে আগুনের সেঁকা লাগে। আজ আর কোন রকমেই আধখানা সিগারেট সে নিবিয়ে রাখছে না। সন্ধ্যার অন্ধকারে, একা ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বাইরের ক্লেদাক্ত পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা পুরো সিগারেট ধীরে সুস্থে টানার মধ্যে কি অদ্ভুত রোমাঞ্চ। আনন্দে সে শরীরটাকে একটা চাড়া দিলে।

এ সময়টা সম্পূর্ণ তার নিজের, তার এই পরিধির মধ্যে নিজেকে সে স্বাধীন ভাবে, পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করতে পারে, পারে নিজের নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থিতিকে অনুভব করতে। এখানে কমার্শিয়্যাল ব্যাঙ্কের সে রাস্কেলটাও নেই, গায়ের ওপর জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে মারবারও কেউ নেই। এখানে সে মুকুটহীন অধিপতি, নিঃসঙ্গ, নির্ব্বান্ধব!

সিগারেটের প্রান্তটা তার হাত থেকে মাটিতে ঝরে পড়লো, ঘুমে তার মাথাটাও, বালিশের এক পাশে আড়ষ্ট, অসাড়!

'ও হিরণ্ময় বাবু! হিরণ্ময় বাবু!'

ধড়মড় করে সে উঠে বসলো, ইস্! না জানি কত রাত হয়েছে।

'ক'টা বেজেছে মশাই বলতে পারেন?' হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করলে।

'প্রায় আটটা হবে', মেসের এক ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'কিন্তু নিচে যে একজন পিয়ন এসে বসে আছে অনেক্ষণ!'

'পিয়ন ?' হিরণ্ময়ের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো, 'কার কাছে ? আমার কাছে নয়, নিশ্চয়ই !'

'আরে হ্যাঁ মশাই ! হিরণ্ময় বসুর কাছে !'

খালি গায়েই সে তিনটে করে সিঁড়ি এক সঙ্গে ডিঙিয়ে নিচে নামতে লাগলো।

'আপনার নামই কি হিরণ্ময় বাবু ? আপনার একখানা চিঠি আছে !'

'চিঠি ? কোত্থেকে ?' লম্বা খামটা নেবার সময় তার হাত রীতিমত কাঁপছিলো।

এক মুহূর্ত্তও দেরী না করে সে খামটা ছিঁড়ে ফেললে।

কর্ম্মাশিয়্যাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ মিত্র লিখছেন পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরিটা নেবার পক্ষে তার যদি কোন আপত্তি না থাকে তা হ'লে সোমবার দশটার সময় সে যেন অতি অবশ্যই সেক্রেটারির কাছে কাজ বুঝে নেয়।

পিয়ন-বইটা বন্ধ করে পিয়ন তখনও অপেক্ষা করছিলো, অন্ততঃ চার আনা পয়সাও তাকে বকসিস্ করা উচিত।

'একটু দাঁড়াও !' মিষ্টি হেসে হিরণ্ময় তাকে বললে, 'আস্‌ছি এক মিনিটের মধ্যেই।'

ছেঁড়া মনিব্যাগটা খুলে সে পরীক্ষা করে দেখলে যে কয়েক আনা পয়সা অবশিষ্ট আছে। তার থেকে চার আনা পয়সা যদি ব্যয় করে তা হলে—মাসের এখনও তিন দিন বাকি !

হিরণ্ময় সন্তোষ বাবুর ঘরে এলো ; 'কিসের চিঠি মশাই এত রাত্রে ?' সন্তোষ বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'দেখুন না ! কিন্তু আগে চার আনা পয়সা ধার দিন দিকি !'

'মাসের শেষে পয়সা কোথায় পাবো ?' রুগ্ন, প্রৌঢ়, প্রায় বৃদ্ধ লোকটি উত্তর দিলেন, 'ক্ষেপেছেন নাকি ?'

হিরণ্ময় বার কয়েক পয়সা ধার নিয়ে কথা মত দিতে পারেনি, সন্তোষ বাবু বোধ হয় সে-কথা ভোলেনি। 'চিঠিটা পড়েই দেখুন না !' প্রায় রাগান্বিত গলায় সে বললে।

লণ্ঠনের আলোয় চিঠিটা পড়ে ভদ্রলোকটি বললে, 'Congratulations, এই নিন চার আনা।'

পিয়নটা সিঁড়ির কাছে তখনও দাঁড়িয়ে ছিলো, 'এই নাও ভাই, এখন আর হাতে কিছু নেই, মাইনে পেলে তোমার কথা ভুলবো না।'

ওপরে নিজের ঘরে এসে সার্টটা গায়ে দিয়েই সে ছুটলো নির্ম্মলের বাড়ী।

'কিরে! এত রাত্রে কি মনে করে? হাফাচ্ছিস কেন?' অডিট্ অফিসের নির্ম্মলচন্দ্র জিজ্ঞেস করলে।

পকেট থেকে চাকরীর শমনটা বার করে হিরণ্ময় নির্ম্মলের হাতে দিলে। চিঠিটা পড়ে সে বললে, 'চমৎকার! এদ্দিনে একটা কিনারা হল তোর, একদিন উৎসব, মেট্রো—'

'কিন্তু মুস্কিল—' ঢোক গিলে হিরণ্ময় বললে।

'আবার মুস্কিল কি?'

আমায় জিজ্ঞেস করেছিলো এ্যাকাউন্ট্স্ জানি কিনা, টাইপ করতে পারি কিনা, বলেছি জানি, কিন্তু দুটোর একটা সম্বন্ধেও আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই!'

চিন্তিত হয়ে নির্ম্মল বললে, হিসেবটা রাখা সম্বন্ধে আমি তোকে কিছু কিছু আইডিয়া দিতে পারি, কিন্তু টাইপ কি করবি?'

'তাই ত ভাবছি!'

'আচ্ছা ভাল টাইপ করতে হলে কদিনের প্র্যাক্‌টিস্ লাগে?'

'কদিনের? বল্ ক' মাসের?'

'সর্ব্বনাশ! তা হ'লে কি হবে?'

কয়েক মিনিটের ভারাক্রান্ত নিস্তব্ধতা!

এক কাজ কর, কালকেই একটা টাইপ-স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে লেগে যা। যত তাড়াতাড়ি pick up করতে পারিস!'

পরদিনই কয়েকটা টাকা ধার করে সে বাড়ীর কাছেই একটা স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে গেল, এখনও হাতে তিন দিন সময় আছে।

ঘণ্টাখানেক খটাখট্ করবার পর কোমরে আর ঘাড়ে এমন কন কন করে যে বাধ্য হয়ে তাকে থামতে হয়। জীবনে অনেক কষ্টকর এবং ক্লান্তিকর কাজ সে করেছে, কিন্তু এই ঘাড় গুঁজে টাইপ করার মত এমন জঘন্য কাজ তাকে কোন দিন করতে হয়নি। সমস্ত জীবন তাকে এই খটাখট্ করতে হবে ভেবে তার হৃদপিণ্ডের গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। কিন্তু সমস্ত জীবনই তাকে এ-কাজ করতে হবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? কালক্রমে সেও হয়তো ঐ ব্যাঙ্কের কোন শাখার ম্যানেজার হতে পারে। প্রথমে সব কাজেই একটু কষ্ট করতে হবে বৈ কি। উতলা হলে কি বড় হওয়া যায়! জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে অসীম ধৈর্য্যের প্রয়োজন। আবার আরম্ভ হয় খটাখট্।

নির্ম্মলের কাছে হিসেবটা হাতে কলমে খানিকটা সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। কিন্তু টাইপটা তিন দিনে সে কিছুই করে উঠতে পারে নি; তিন মাসেও পারবে কিনা তার সন্দেহ হচ্ছে।

ঠিক দশটার সময়েই সে কমার্সিয়্যাল ব্যাঙ্কের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নামটা লিখে পাঠিয়ে দিতেই দারওয়ান তাকে মিত্র সাহেবের কামরায় নিয়ে গেল।

পা দুটো আজ নিচেই আছে। হিরণ্ময় নমস্কার করে বললে, 'অনেক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাচ্ছি।'

'Don't be sloppy!' মিত্রের মুখে সেই সেদিনকার হাসি, 'বসুন'।

যাক্! হিরন্ময়ের বরাত তা হলে ভালো।

কোন রকম ভূমিকা না করেই মিঃ মিত্র বললেন, এই তিন খানা খাতা আপনাকে লিখতে হবে—সমস্ত দিনের যা transaction হয়। List আপনাকে ভবতোষ দেবে। পাশের ঘরেই ওর পাশে বসে আপনি কাজ করবেন। খাতায় যা তা লিখে কাটাকুটি করবেন না; না পারলে ভবতোষের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবেন। আর আজকের ডাক দেখে কি কি চিঠি টাইপ করতে হবে বলে দিচ্ছি।

হিরণ্ময়ের মুখ দিয়ে ধন্যবাদের কথা বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিলো, সামলে নিলে, নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে সে ডান হাতটা টেবলের ওপর রাখলে।

'আঙ্গুলে কি হল আপনার?' মিঃ মিত্র তার ডান হাতের ব্যাণ্ডেজ করা দুটো আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'ওঃ এতে কাজ কিছু আটকাবে না, লিখতে পারবো ঠিক'! ম্লান কণ্ঠে হিরন্ময় উত্তর দিলে, 'সকাল বেলা দাড়ি কামাতে গিয়ে ক্ষুরে দুটো আঙ্গুল কেটে গেছে। কাজ ঠিক চালিয়ে নেবো।'

মিঃ মিত্র তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু আজ ত আপনি কামিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না!'

'নাঃ আর কামালাম না, প্রথম কাজেই বাধা পড়লো বলে আজ আর—'

'Nonsense! কিন্তু ঐ আঙ্গুলে আপনি টাইপ করবেন কি করে?'

হিরণ্ময় চুপ করে রইলো।

কিন্তু তার বরাত ভালো, বেশী কিছু তাকে শুনতে হল না।

'যান খাতাগুলো নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিন, আর ঐ কাগজগুলো ফাইল করুন। ও-ঘরে একটা filing cabinet আছে দেখতে পাবেন।'

খাতা ক'খানা হিরণ্ময় তুলে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে কাগজের বাণ্ডিলটাও।

পাশের ঘরে তার জন্যে একটা আলাদা টেব্‌ল চেয়ারের বন্দোবস্ত হয়েছে, ও পাশে প্রকাণ্ড কাউন্টার। অনেক লোক কাজ করছে। দু'জন লোক অবিশ্রাম টাইপ করছে, কি সুন্দর হাত! Key board-এর দিকে একবারও চোখ তুলে তাদের তাকাতে হচ্ছে না। তার সন্দেহ হল, তিন মাসেও কি সে তাদের মত দক্ষ হতে পারবে?

'আপনার নামই কি ভবতোষ বাবু?' হিরণ্ময় চেয়ারটায় বসে ঘামতে ঘামতে জিজ্ঞেস করলে।

কাগজ পত্র থেকে মুখ তুলে ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, ও আপনি—আপনি বুঝি—তা বেশ বেশ!' ভবতোষ বাবুর বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হবে, গলাবন্ধ কোট, মাথায় টাক, চোখে চশমা, একটা সাইড সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে আটকানো।

হিরণ্ময় খাতাটা সামনে খুললো, কে জানে কখন আবার মিত্র এসে হাজির হবে। ভবতোষ বাবু ক্লিপে আঁটা প্রকাণ্ড এক তাড়া কাগজ তার দিকে এগিয়ে দিলেন; 'আস্তে আস্তে সব এনট্রিগুলো শেষ করুন। তাড়াহুড়ো করবেন না।'

'এ-কটা কাগজ ফাইল করতে বললেন।' হিরণ্ময় রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে মুছতে বললে।

ভবতোষ বাবু আঙ্গুল দিয়ে আলমারির মত প্রকাণ্ড ক্যাবিনেট-টা দেখিয়ে দিলেন।

হিরণ্ময় উঠে গেল, হাতল ধরে ডালাটা খুলতেই দেখলে সারি সারি ড্রয়ার, সঙ্গে index records। কাগজ ক'খানা হাতে নিয়ে হিরণ্ময় দাঁড়িয়েই রইলো। চার পাশে সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কাগজগুলো কোথায়, কি ভাবে, কোন কাগজের ফাঁকে রাখবে কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না। মনে হল মিঃ মিত্র নিঃশব্দে ঠিক তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর দেরী কিছুতেই করা যায় না; ক্ষিপ্র এবং কম্পিত হাতে যেখানে যেটা ইচ্ছে হল গুঁজে রেখে ডালাটা বন্ধ করে দিলে। কাগজগুলো যদি ভবিষ্যতে দরকার হয় স্বয়ং ঈশ্বর এলেও খুঁজে বার করতে পারবে কি না সন্দেহ।

ভবতোষ বাবুর কাছ থেকে কাজ বুঝে নিয়ে সে আরম্ভ করে দিলে। কিন্তু ব্যাপারটা সম্যক সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা মাঝে মাঝে খাতার ওপর ঝরে পড়ছে।

খানিকটা এগিয়ে সে ভবতোষ বাবুকে জিজ্ঞেস করলে, 'ঠিক হচ্ছে কি না দয়া করে দেখবেন একবার?'

ভবতোষ বাবু দেখলেন, কাজ ঠিক হচ্ছে, কিন্তু দেড় ঘণ্টার মধ্যে একটা পৃষ্ঠাও সে শেষ করতে পারে নি; ও, তার আঙ্গুল কেটে গেছে বুঝি? তবে মিত্তির বড্ড রাগী, কোন অসুবিধের কথাই কানে তুলতে চায় না।

বেয়ারা এসে খবর দিলে বড় বাবু ডাকছেন।

হিরণ্ময় লাফিয়ে উঠলো।

মিঃ মিত্র মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'পাতা এন্‌ট্রি করেছেন?'

'আজ্ঞে এটা থার্ড পেজ্।' হিরণ্ময়ের বুকটা কেঁপে উঠলো।

'থার্ড পেজ? এতক্ষণ কি ঘুমোচ্ছিলেন?'

হিরণ্ময় অসহায় ভাবে তার ব্যাণ্ডেজ-করা আঙ্গুলের দিকে তাকালে।

'কে আপনাকে বলেছিলো আঙ্গুল কাটতে?' কামান থেকে গোলা বিক্ষিপ্ত

হল, 'জানেন না আঙ্গুলগুলোয় আপনার কোন অধিকার নেই, ও-গুলো কমার্সিয়্যাল ব্যাঙ্কের ?'

ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা কয়েক মুহূর্ত্তের !

'ফাইল করা হয়ে গেছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ !'

'ওর মধ্যে একটা investment scheme ছিলো, নিয়ে আসুন তো, একবার দরকার হচ্ছে।'

হিরণ্ময় কম্পিত পায়ে কেবিনেটটার সামনে এসে দাঁড়ালো ; আবার ফুটপাথ আর চানাচুর ! হায় ঈশ্বর ! কাগজগুলো রাখবার আগে সে যদি অন্ততঃ একবার দেখেও রাখতো কোনটা কি কাগজ ! কিন্তু ঠিক ঐ সময়েও তার ভারি একটা মজার কথা মনে পড়লো, তার অবস্থাটা বোধ হয় মূর্চ্ছিত হবার ঠিক পূর্ব্বাবস্থা ! এত দুঃখেও তার হাসি পেলো।

কিন্তু আর দেরী করা যায় না, এখুনি আবার হাঁক দেবে !

সামনে যে ড্রয়ারটায় হাত পড়লো তার মধ্যেই অভিনিবেশ সহকারে সে পরিপাটি রূপে সাজানো কাগজগুলো দেখতে লাগলো, একটা কাগজ যেন একটুখানি তের্‌চা হয়ে আছে, টেনে বার করলে সে, ভাঁজ খুলে দেখলে investment schme খানাই বটে।

ছুটে সে কাগজখানা নিয়ে গেল মিত্রের কাছে।

'কি ব্যাপার বলুন তো ?' প্রশ্ন বর্ষিত হল।

হিরণ্ময় বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলো।

'এত দেরী হল কেন তাই জিজ্ঞেস করছি।'

সুযোগ পেয়ে index board-টা একবার দেখে নিচ্ছিলাম, কি কি কাগজ পত্র আছে, কিছু জেনে রাখা—'

'অতি চালাক কিনা ! আমি এ-ধারে হাঁ করে বসে আছি, আর আপনি—আপনার হাতের কাটা কত দিনে সারবে বলুন তো ? আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে !'

সামান্য একটু কেটেছে, দিন তিন চার, utmost পাঁচ দিন !'

'এই পাঁচ দিন তা হলে ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখতে হয়, কি বলেন ?'

'কিছু কিছু আমি করতে পারবো বৈ কি !'

'যান এখন !' মিত্র প্রায় ধমক দিয়ে উঠলো।

একটার সময় আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সবাই চা খাবার ইত্যাদি খায় এবং পরনারী চর্চ্চা করে। কিন্তু সে-সময়টুকু হিরণ্ময় নষ্ট করলে না, কাজ যতখানি এগোয়।

পাঁচটার পর মিঃ মিত্রকে দীর্ঘ নমস্কার করে সে বাইরের খোলা বাতাসে এসে দাঁড়ালো।

হু হু করে কয়েকটা দিন কেটে গেল।

শুক্রবার দিন যাবার সময় মিত্র বললেন, 'এই নিন আড়াইটা টাকা, কাল অফিসে আসবার সময় মেট্রোর ছু'খানা রিয়ার ষ্টলের টিকিট বুক করে নিয়ে আসবেন।'

নিতান্ত কৃতার্থ হয়ে হিরণ্ময় হাত বাড়ালে। সে ক'দিন ধরেই দেখে আসছে মেট্রো হাউসের সামনে অসম্ভব লোকের ভিড়। খুব ভালো ছবি দিয়েছে এ হপ্তা। দেখা যাক, বইটা তারও কাল দেখবার ইচ্ছে আছে, যদি টিকিট পায়।

সে চলে যাচ্ছিলো ; 'শুনুন !' মিত্র ডাকলেন।

'আপনার হাত সারলো ? কাল কিন্তু কয়েকখানা জরুরি চিঠি আপনাকে টাইপ করতেই হবে।'

'তা পারবো !'

বিকেলে অফিস থেকে ফেরবার সময় মিত্রের গাড়ীখানা রোজ তার নজরে পড়ে। লম্বা একখানা টুরার, গাড়ীর নামটা সে দেখেছে, প্যান্থার।

শনিবার দিন ছু'খানা টিকিট সে আসবার সময় কিনে নিয়ে এলো। অফিসে ঢোকবার সময় সে আজ মিত্রের গাড়ীখানা দেখতে পেলে না ; ব্যাপার কি ? আসেনি নাকি ?

অফিসের আব-হাওয়া দেখে বড় বাবুর অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তার রইলো না।

টিকিট ছু'খানা সে মিত্রের দিকে এগিয়ে দিলে, মিত্র তার দিকে একবার তাকালেন মাত্র।

নিজের টেবলে বসে যথানিয়মে সে কাজ করে যেতে লাগলো। কাজটা তার বেশ খানিকটা হয়ে গেছে। পুরোণো দোকান থেকে Copes-এর একখানা "Filing System" কিনে সে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নিয়েছে, ভবিষ্যতে যেন কোন অসুবিধে না হয়।

প্রায় আড়াইটা বাজে।

মিত্রের এবার যাবার সময় হল।

কাল রবিবার, ওঃ আজও প্রায় অর্দ্ধেকটা দিন তার ছুটি! আজ মেশে ফিরতে ফিরতে সে ভাববে কাল কি করা যেতে পারে। তার চাকরী-জীবনে এই প্রথম রবিবার। আনন্দে আর উত্তেজনায় সে ঝলমল করে উঠলো।

বেয়ারা এসে খবর দিলে বড় বাবু ডাকছেন।

হিরণ্ময় গিয়ে দাঁড়াতেই মিঃ মিত্র তার দিকে দু'খানা কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'নিন, দু'খানা চিঠি চট করে টাইপ করে দিন তো! আর দশ মিনিট আমি আছি; আজকের ডাকেই চিঠি দু'খানা যাওয়া চাই, যান, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন হাঁ করে?'

'হাতের কাটা এখনও—' হিরণ্ময় থামলে।

'হাতের কাটা?' টেবলে প্রকাণ্ড একটা কিল মেরে মিঃ মিত্র বললেন, 'সামান্য একটা কাটা শুকোতে আপনার সাতদিন লাগছে? সাতদিনে যে কাটা গলা জুড়ে যায়। কৈ দেখি কি হয়েছে আপনার হাতে।'

'আইওডিন দিয়ে শিল করা আছে, খুললে আবার—'

'সাতদিন কখনও আইওডিন লেগে থাকে না, খুলুন!'

হিরণ্ময় নিজেই যেন বুঝতে পারছে না কি করছে সে, সমস্ত বোধ-শক্তি তার যেন লোপ পেয়েছে। আস্তে আস্তে সে আঙ্গুলের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেললে, পরিষ্কার আঙ্গুল, আইওডিন বা একটি আঁচড়ের চিহ্ন মাত্র নেই।

মিঃ মিত্র চেয়ারটায় বসে পড়লেন, হিরণ্ময়ের দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে তিনি হঠাৎ ফেটে পড়লেন, "You are fired this minute, get out! get out!"

হিরণ্ময় নিজের টেবলের কাছে ফিরে এলো। চেয়ারটায় বসে পড়লো সে। যাচ্ছেই ত সে, পাঁচ মিনিটে এমন কিছু একটা এসে যাবে না।

হুক থেকে কয়েক মিনিট পরে কোটটা সে গায়ে দিয়ে নিলে, ফাউণ্টেন পেনটা রাখলে পকেটে ; তারপর দরজাটা টেনে আস্তে আস্তে বেড়িয়ে পড়লো।

রাস্তায় পা দিয়েই মিত্রের গাড়ীটার দিকে তার নজর পড়লো। মিত্র গাড়ীতে ষ্টার্ট দিচ্ছে। কিন্তু তাঁর পাশে—পাশের মেয়েটি কে? ভারি যেন চেনা চেনা। আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল সে, আরে! এ যে মায়া! মায়া!

মায়া হাসছিলো কি একটা কথা বলে, অদ্ভুত এক গ্রীবভঙ্গী করে। হুস করে লম্বা গাড়ীটা একটা পাক খেয়ে বেরিয়ে গেলো।

গাড়ীটার নামটা যেন কি? প্যান্‌থার!

রজত সেন

রেগে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ

বৈষ্ণব চিন্তা—রামানুজ।

অসঙ্গের যোগাচারের বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে শঙ্করের অতীন্দ্রিয় অদ্বৈতবাদের আশ্চর্য রকম মিল দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য তিনি উপনিষদ দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, কিন্তু অজ্ঞাতসারে যোগাচারের দৃষ্টিতেই উপনিষদকে দেখেছিলেন। যদিও শঙ্কর ব্রহ্মণ এবং আত্মনের বাস্তব সত্তা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর "চিন্তাবিহীন আত্মন" ও তাঁর নিবিকার নির্বিশেষ ব্রহ্মণ, উভয়ই সকল প্রকার মানসিক বা দার্শনিক গুণশূন্য হয়ে অতিমাত্রায় আলয় বিজ্ঞান ও নির্বাণের রূপ ধারণ করেছিল। এর ফলে ধর্ম হয়ে পড়েছিল ভিত্তিহীন, কারণ যে দেবতাকে পূজা করা হত, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর—তিনি মায়ার সৃষ্টি ভিন্ন কিছুই নন।

হিন্দু সাম্প্রদায়িক ধর্ম, বিশেষত বৈষ্ণব ধর্ম, এ প্রকার মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। তারা শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে দোষ দিতে লাগল, এবং এ অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনও বলা যায় না। বাস্তব ধর্ম বলে যদি কিছু থাকতে হয়ত মানুষকে দেবতা থেকে পৃথক করা চাই, মায়ারূপ অনির্দিষ্ট ধারণার উচ্ছেদ করা চাই, এবং জ্ঞানমূলক ভক্তির প্রতিষ্ঠা করা চাই। রামানুজ, নিম্বার্ক ও মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যগণের উদ্দেশ্য ছিল তাই। তাঁরা স্ব-সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদমূলক মতের সঙ্গে বেদান্তের মূল একমেবাদ্বিতীয়মের সমন্বয়ে ব্রতী হলেন।

রামানুজ ছিলেন কর্ণাটস্থ কাঞ্চী নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ (অনুমান ১০৫০-১১৩৭ ?)। তিনি থাকতেন ত্রিচিনপল্লীর নিকটস্থ শ্রীরঙ্গমে। আমরা দেখেছি যে এক সময়ে তিনি মহীশূরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কর্ণাটের চোল বংশীয় রাজাদের উৎপাত এড়াবার জন্য ; কারণ তাঁরা তাঁকে বৈষ্ণব ধর্ম ত্যাগ পূর্বক শৈব ধর্ম গ্রহণ করাবার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁর মতবাদকে বলা হয় বিশিষ্টাদ্বৈত বা স্বতন্ত্র অদ্বৈতবাদ। তিনি তিন প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ঃ—

ব্রহ্মণ, চিৎ চিত্ত বা আত্মিক জগত এবং অচিৎ বা জড়জগত। আত্মিক জগত ও জড়জগতের সঙ্গে ব্রহ্মণের সেই সম্বন্ধ, শরীরের সঙ্গে মানবাত্মার যে সম্বন্ধ অর্থাৎ তারা যুগপৎ ব্রহ্মণের সঙ্গে পৃথক এবং তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত। চিৎ এবং অচিৎ মিলে ব্রহ্মণের সেই স্বরূপ সৃজন্ করে, যাকে বলে বিশ্বজগত। এই মিলন সংঘটনের ফলে আত্মাসকল অধঃপতিত হয়, এবং ব্রহ্মণের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য বিলুপ্ত হয়। অপর পক্ষে ভগবানের (এ স্থলে বাসুদেব বা বিষ্ণুর) প্রতি ভক্তি দ্বারা তারা জড় প্রকৃতির বন্ধন ছেদন পূর্বক নিজেদের দৈবী প্রকৃতি পুনঃ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তখনো তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লোপ পায় না। তারা ব্রহ্মসদৃশ হয়ে তাঁ'তেই অবস্থিতি করে সন্তোষ লাভ করে।

নিম্বার্ক (১১৬২) ছিলেন তেলুগু ব্রাহ্মণ। তাঁর জন্মস্থান বেলারির নিকট, এবং তাঁর নিবাস গঙ্গাপ্রদেশস্থ মথুরায়। তিনি দ্বৈতাদ্বৈত নামে ব্রহ্মসূত্রের অনুরূপ অদ্বৈতবাদের এক দ্বৈত ভাষ্য প্রবর্ত্তন করেন। রামানুজের অনুসরণে তিনি একপক্ষে ঈশ্বর বা কৃষ্ণ, অপরপক্ষে চিৎ এবং অচিতের ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য বলে স্বীকার করেন। কিন্তু রামানুজের কাছে যেমন অভেদটাই প্রধান, সে স্থলে নিম্বার্কের কাছে ভেদ এবং অভেদ একই পর্য্যায়ভুক্ত।

এঁর পরবর্তী ভাষ্যকার মধ্ব ছিলেন কানাড়ী ব্রাহ্মণ (১১৯৯—১২৭৮)। তাঁর আমলে বৈষ্ণব বেদান্ত দ্বৈতবাদে উপনীত হয়। ব্রহ্মণ, জীব ও প্রকৃতির মধ্যে মধ্বাচার্য্য সম্পূর্ণ প্রভেদ, ও চিরন্তন ব্যবধানের স্থাপনা করলেন— কেবলমাত্র স্বভাবগত নয়, কিন্তু সত্তাগত। মোক্ষলাভের পরেও জীবগণ ব্রহ্মণ হতে স্বতন্ত্র থাকবেন।

শেষ ভাষ্যকার ছিলেন বল্লভ (১৪৭৯—১৫৩১)। তিনিও ছিলেন মথুরাঞ্চল নিবাসী তেলুগু ব্রাহ্মণ। এই লেখকের মতবাদ শুদ্ধাদ্বৈত বলে পরিচিত। এ অদ্বৈতবাদ শঙ্করের অতীন্দ্রিয় মায়াবাদী অদ্বৈতবাদের মত নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ, বাস্তব এমন কি প্রায় জড়বাদী। জড় ও চিত্ত (অন্যান্য স্থূল পরমাণুর মধ্যে চিত্ত সূক্ষ্মতর পরমাণু মাত্র) ব্রহ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অভিন্ন, অর্থাৎ উভয়ই তাঁর উপাদান স্বরূপ। বিশ্বজগত মায়ার সৃষ্টি নয়, পরন্তু মায়ার মধ্যস্থতায় নিরপেক্ষ ব্রহ্মণ স্বতঃই স্বপ্রকাশ। অতএব ভক্তিদ্বারা মানুষ ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও প্রায় ইন্দ্রিয়জ সম্বন্ধলাভে সমর্থ হয়।

পৌরাণিক ধর্ম-সমন্বয়। বৈষ্ণব ভক্তি রহস্য।

বিষ্ণুভক্তি, কৃষ্ণভক্তি ও শৈবভক্তি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্মভাব এইরূপে সনাতন ব্রাহ্মণ্য দর্শনকে নিজ সুবিধার্থে আত্মসাৎ করলে পর, পুরাণগুলিও তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হল। এই পুরাণ ভারতবর্ষে ইতিহাস ও জন-বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করে। এই কাব্যগুলিতে কথিত আছে ভারতবর্ষের দৈবী, অলৌকিক ও বীরত্বপূর্ণ অতীত কাহিনী; সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্বজগতের প্রলয় ও পুনর্জ্জন্ম, দেবতা ও নরদেবতাদের বংশাবলী, বীরগণের কীর্তিকলাপ ও মানব রাজবংশের কিম্বদন্তিমূলক ইতিহাস। ত্রিমূর্তির তিন দেবতার মধ্যে অষ্টাদশ পুরাণ বিভক্ত :—ছয়টি বিষ্ণুর, ছয়টি শিবের, ছয়টি ব্রহ্মনামক বিশিষ্ট দেবতার। সম্ভবত বিষ্ণু পুরাণই প্রাচীনতম (৩০০—৩৫০ ?) এবং ভগবত পুরাণই সর্বপ্রধান (১০ম শতাব্দী)। এতদুভয়ই বৈষ্ণব। ভাগবত পুরাণ যে দর্শনের ব্যাখ্যা করেন, সেটি একটি সমন্বয় বিশেষ, যার মধ্যে বেদান্তই প্রধান, এমন কি কথনো কথনো শঙ্করীয় বেদান্তও একটা। কবি ভাগবতের যে সংজ্ঞা দেন তা' বৈদান্তিক ব্রহ্মণ-আত্মনেরই সমতুল্য—"ভগবৎ জীবের আদি, অন্ত ও মধ্য। তিনি অনন্ত শক্তি বিশিষ্ট চিৎ। ব্রহ্মা, শিব ও দেবতাসকল তাঁর প্রকাশ। তিনি আপনাতেই সকল জীবের মিলন স্থল, অন্তরাত্মা এবং সৃষ্টিকর্তা। তাঁর থেকেই রহস্যপূর্ণ মায়ার প্রভাবে জড় পদার্থ, কাল, এবং এই দৃশ্য প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়। তাঁর সামান্য এক জ্ঞানক্রিয়ার দ্বারাই মায়ার প্রভাবে তিনি আপনার মধ্যে ভেদ সকল স্থাপন করতে পারেন ; সে মায়া তাঁর আজ্ঞাবহ, যে মায়া এই জগত সৃষ্টি করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে বিষ্ণুভক্তি ক্রমশই একেশ্বরবাদে পরিণত এবং সেই কারণে ইসলামধর্মের নিকটবর্তী হতে লাগল—শেষোক্ত ধর্ম তখন সবেমাত্র গাঙ্গেয় প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মনের এইরূপ গতির দ্বারা প্রেরিত হয়ে ভক্তবৃন্দ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে অযোধ্যা প্রদেশে বিষ্ণুর আদি অবতার রামের প্রতি ভক্তি প্রচার করছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রামানন্দ, যিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশীধামে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন, এবং তার শিষ্য কবীর (কাশী ও বাঙ্গালাদেশ, ১৪৪০—১৫১৮এর দিকে) ও তুলসীদাস (অযোধ্যা ও

কাশী, ১৫৩২—১৬২৩ বা ১৬২৪)। শিখ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নানক, যিনি ১৪৬৯ থেকে ১৫৩৮ পর্যন্ত পাঞ্জাবে ছিলেন, তিনিও সম্পূর্ণরূপে একেশ্বরবাদী ছিলেন। হরি এবং রাম নামে যে দেবতার তিনি পূজা করতেন, তিনি আল্লার গুণ বিশিষ্ট (জগৎ-আতিরিক্ত্য, ব্যক্তিত্ব) বিষ্ণু বই অন্য কেউ ন'ন কেবল বিশ্বজগতের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ঐক্য রক্ষা করেছেন।

কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায়গুলি যে নীতিমার্গে উপনীত হলেন, সেও কম চিত্তাকর্ষক নয়। বাঙ্গালাদেশের মহাপ্রভু চৈতন্য (১৪৮৫—১৫৩৩), নিম্বার্ক ও মধ্ব ভাগবত-পুরাণ থেকে এক অভিনব "ভক্তি" ধারা উৎসারিত করলেন, যদ্দারা যোগীদের সম্পূর্ণ মানসিক ও শারীরিক তপস্যার পরিবর্তে কৃষ্ণের প্রতি একটি কোমল প্রেমপূর্ণ রহস্যময় ভক্তিভাব স্থাপিত হল। এ স্থলে আমরা মুসলমান সুফীধর্মের আভাস পাই।

গুপ্ত-শিল্পকলা।

দ্বিতীয় শতাব্দীর পর হতেই গান্ধারীয় শিল্পকলার যে দ্রুত অবনতি ঘটে, তার থেকে বোঝা যায় যে গ্রীক সৌন্দর্যতত্ত্ব ভারতবর্ষের অন্তরকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। হুবিষ্ক ও বাসুদেবের রাজত্বকালে (২য় শতাব্দী) মথুরার যে প্রথম (বা দ্বিতীয়) শিল্পসম্প্রদায়ের বিকাশ হয়, যার নিকট আমরা কঙ্কালীর জৈন স্তূপের অধিকাংশ ভাস্কর্যের জন্য ঋণী, তারা গান্ধারীয় বুদ্ধের নকল বা উপর উপর স্বদেশী রূপান্তর করতে গিয়ে কেবল মাত্র স্থূল ও সাধারণ শিল্পসৃষ্টি করেছে। উপরন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যদিও মথুরার ভাস্করগণ গান্ধার দ্বারা প্রভাবিত হন, বিশেষত বুদ্ধের মূর্তিকল্পনার ক্ষেত্রে, তৎসত্ত্বেও তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় রীতি পরিত্যাগ করেন নি। গান্ধারের স্থূল নকলের পাশাপাশি, মথুরায় আমরা এমন সব নগ্ন স্ত্রী মূর্তি দেখতে পাই, যার যৌবনের সরসতা ও সবলতায় কার্লী এবং সাঁচির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উপলব্ধি করা যায় (জৈন স্তূপের প্রাচীরস্থ যক্ষিণী, ২য় খৃঃর দিকে ?)। কিন্তু এই বিধর্মী সবলতা ভারতবর্ষীয় আদর্শের পক্ষে আর পর্যাপ্ত বোধ হল না। যুগপৎ গ্রীসীয় রীতি বিস্মৃত হয়ে এবং স্বদেশের চিরাগত সংস্কারকে আধ্যাত্মিক রূপ দিয়ে একটি নিজস্ব সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্ভাবন করে গুপ্ত শিল্পের অভ্যুদয় সম্ভবপর হল।

গ্রীসীয় সংস্কারমুক্ত এই সৌন্দর্যতত্ত্ব চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের আমলের মুদ্রাতে পূর্বে প্রকাশ পেলেও (সিংহাসনারূঢ় শায়িত সিংহবাহিনী লক্ষ্মীমূর্তি) পঞ্চম শতাব্দীতে নির্দিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা ইচ্ছা করেই "নব্য সৌন্দর্যতত্ত্বের" উল্লেখ করেছি, কেবলমাত্র "নব্য শিল্পকলার" নয়। বস্তুত গুপ্ত যুগে যে শিল্পকলার উন্মেষ হয়, তা হিসেব মত সে শিল্পযুগ গত হলেও আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল ভারতীয় শিল্প সম্প্রদায়কেই অনুপ্রাণিত করেছে।

এই ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের মূলে হেলেনীয় রীতির সঙ্গে পরিচয় ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সে পরিচয় ঘটেছিল কেবলমাত্র তার থেকে মুক্তি লাভ করে নিজস্ব একটি সমকক্ষ রীতির উদ্ভাবনার্থে। ফলত গ্রীসীয় সনাতন রীতির এ ক্ষেত্রে যে রূপ অবনতি হয়েছিল, তার থেকে মুক্ত হয়ে গুপ্ত শিল্প একটি নূতন আদর্শ রীতির সৃষ্টি করলে যেটি জীবন্ত, কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রসূত। কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় পরিধেয় বা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জীবনযাত্রার জ্ঞান থেকে গুপ্ত শিল্পের ভাস্কর্যের নিয়ম আবিষ্কার হয়নি, পরন্তু প্রত্যক্ষ ভারতবর্ষীয় লোকদের শরীর বিজ্ঞান থেকেই তার উদ্ভব। যে বস্ত্র তার এই শরীরকে চেপে ছিল—তাকে তারা সরিয়ে ফেলল, কারণ সে শরীর কেবলমাত্র ফিন্‌ফিনে মল্‌মলেই অভ্যস্ত—এমন পাতলা কাপড় যে মনে হয় ভিজে গিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লেপ্টে রয়েছে, তারই তরল বঙ্কিমতা বা ঢেউ খেলানো রেখা দ্বারাই বসন সূচিত হল। ক্রমশঃ সে বঙ্কিম রেখাও লুপ্ত হয়ে বসনের ইঙ্গিত দেবার জন্য রইল শুধু সীমারেখাগুলির পরস্পর সূক্ষ্ম সন্ধিস্থল।

সেই সঙ্গে গুপ্ত শিল্পীর হাতে ভারতীয় অঙ্গসৌষ্ঠব তার স্বাভাবিক নমনীয়তা ও কমনীয়তা ফিরে পেল। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠনের মানদণ্ড তারা খুঁজত গ্রীসীয়দের ন্যায় জ্যামিতির মাপজোখের মধ্যে নয়,—পরন্তু প্রকৃতিদত্ত জীবন্ত বক্ররেখায়, ফুলের ভঙ্গিমায়, জীবদেহের কমনীয় তরঙ্গভঙ্গে : পানের পাতা যোগাত মুখের বেড়ের উপমা, বিম্বফল ওষ্ঠাধরের, বাচ্ছা হাতীর শুঁড় উরুর এবং স্কন্ধের, পদ্মফুল হাতের এবং পায়ের ইত্যাদি। সুতরাং কোন দিকে আর চোখে লাগাবার মত কিছু রইল না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সীমা-রেখাগুলি একটি অনির্বচনীয় মাধুর্যপূর্ণ কোমলতায় মিলে মিশে গেল।

এইরূপে একটি সরল, সুষীম ও নমনীয় শিল্প সঙ্কলনের উদ্ভব হল, যাতে সমগ্রের রেখার মধ্যে কোন প্রকার অবান্তর তুচ্ছতা প্রক্ষিপ্ত না হওয়ায়, মর্ত্যে সৌন্দর্যের দ্বারা উচ্চতম স্বর্গীয়ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হল। গুপ্ত যুগের নগ্নমূর্তির মত এমন শুদ্ধসত্ত্ব নগ্নতা আর কোথাও নেই। এদিকে সাঁচির সহজ আদিকালীন শিল্প অপর দিকে মধ্য দাক্ষিণাত্যের স্থূল ইন্দ্রিয়সর্বস্ব শিল্প উভয়ের মধ্যস্থলে আমরা আর্য মাহাত্ম্যের উন্নততম লোকে বিচরণ করি।

আজ পর্যন্ত গুপ্ত ভাস্কর্য্যের যত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে ধর্মচক্র প্রচারের মুদ্রায় আসীন চক্‌চকে বেলে পাথরের বুদ্ধমূর্তি, যেটি সারনাথের যাদুঘরে রক্ষিত, এবং যে দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তিটি জামালপুর থেকে মথুরার যাদুঘরে আনীত হয়। প্রথমটি প্রায় বিবস্ত্র, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম বস্ত্রে আবৃত, এবং উভয়েরই মাথার চতুর্দিকে গুপ্ত যুগের প্রকাণ্ড গোলাকার মণ্ডল শোভিত। Goloubew সাহেব, যিনি এ সকল বিষয়ের চরম বিশেষজ্ঞ, বলেন যে এ স্থলে আমরা যে শিল্পের সাক্ষাৎ পরিচয় পাই তা আর ইন্দো-গ্রীসীয় নয়, পরন্তু গ্রীস দেশ ও পাশ্চাত্য দেশ উভয়েরই বর্জনে সনাতন ভারতীয়।

অজন্তার প্রাচীর শিল্প।

গুপ্ত শিল্পের মধ্যে অজন্তার বৌদ্ধ প্রাচীর-চিত্রকে ভুক্ত করা যেতে পারে; যেগুলির অধিকাংশ Foucher সাহেব কর্তৃক সম্প্রতি সনাক্ত করা হয়েছে, এবং যেগুলিতে বুদ্ধের শেষ জীবনের অথবা জাতকের ছবি আছে। বস্তুত এই প্রাচীর চিত্রের কতকাংশ হিসাব মত গুপ্ত যুগের পূর্ববর্তী। অজন্তার শিল্প সজ্জার কাজ পাঁচ শতাব্দী যাবত চলেছিল, সুতরাং সেটি সাঁচির শিল্প এবং গুপ্ত শিল্পের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ। Percy Brown সাহেব মনে করেন যে নবম ও দশম গুহার চিত্রাবলী খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজত্বকালে অঙ্কিত। এগুলি ভারহুত সাঁচি এবং অমরাবতীর আদি বৌদ্ধ শিল্পকলা স্মরণ করিয়ে দেয়, আর পরবর্তী মহত্তর প্রাচীর চিত্র পদ্ধতির লক্ষণ তা'তে তখনো দেখতে পাওয়া যায় না। দশম গুহার স্তম্ভ-চিত্রগুলির বস্ত্রবিন্যাসে গান্ধারোত্তর শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়, ও সেগুলি সম্ভবত গুপ্ত যুগের (৩৫০-র দিকে); ষোড়শ ও সপ্তদশ গুহার চিত্র অনুমান গুপ্ত যুগান্তের (৫০০-র দিকে)

এবং প্রথম ও দ্বিতীয় গুহার চিত্র চালুক্য রাজত্বকালের (৬২৬-৬২৮-এর দিকে)।

কিন্তু এস্থলে নিক্তির ওজনে তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব নয় কারণ উল্লিখিত শ্রেণী বিভাগ থেকে যতটা মনে হয় অজন্তার চিত্রাঙ্কন রীতিতে মোটেই সে রকম সুনির্দিষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। সাঁচির আদিকালীন নবীন সূক্ষ্মরুচি মনোভাবের দর্শন শেষকালের প্রাচীর চিত্রে পর্যন্ত মেলে: পশু চিত্রাবলী (হাতী, বাঁদর, হরিণাদি), প্রেমিক যুগল, নারীর মুখাবয়ব—সেই নিখুঁৎ পানের মত মুখ, টানা টানা চোখ, মুখের ভাব একাধারে পবিত্র, যৌবনোচ্ছল ও বিষণ্ণ, দীর্ঘাকৃতি সুশ্রী দেহযষ্টি নানা সভব্য ভঙ্গিতে রক্ষিত—এ সকলই সেই আদি ভাবে অনুপ্রাণিত। এই বিশুদ্ধ কোমলাঙ্গী নগ্নমূর্তি দৃষ্টে রাফেলের পূর্ববর্তী Botticelli অঙ্কিত স্বর্গীয় রমণী মূর্তির কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়। অথচ এস্থলে একমাত্র সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষীয় রমণীরই জয়গান করা উদ্দেশ্য। ভারতনারীর দেহের রেখা ও ভঙ্গীর, তার "আনত আনমনা লালিত্যের" শিল্পিক মূল্য যে কতখানি, তা এমন কবিত্ব সহকারে ইতিপূর্বে কখনো, এমন কি কালিদাসের কাব্যেও প্রচার করা হয়নি। কিন্তু এই শ্রীসম্পন্ন মূর্তিগুলি সমগ্র চিত্রের ধর্মভাবের সঙ্গে যুক্ত (১৭নং গুহার "বুদ্ধকে মাতার নিজ শিশু প্রদর্শন" চিত্র দ্রষ্টব্য)। যে অপার্থিব করুণায় তাদের অন্তর পূর্ণ কেবলমাত্র হাতের অঙ্কন পদ্ধতিতেই তা পরিস্ফুট হয়। তুচ্ছতম ভঙ্গীতে কি স্বর্গীয় ভাব, গভীরতম প্রেমের ইঙ্গিতে কি পুণ্যময় রহস্য। এমন কি নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীতে শরীর মন উভয়ই ভক্তির আবেগে পরিপূর্ণ। এই সকল স্বভাব-চিত্র অতি মাত্রায় গূঢ় ধর্মভাবানুরঞ্জিত, এবং প্রগাঢ়তম ভক্তি ও উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে সর্বদাই আপনার উর্ধে উত্তোলিত। ফলত বুদ্ধের অথবা বোধিসত্ত্বদের ধ্যানীমূর্তিকে রূপ দেবার ক্ষেত্রে অজন্তা সারনাথের সমতুল্য। এবং পশ্চাতপটে যে ভারতীয় পল্লীদৃশ্য বা পুষ্পিত কাননের অবতারণা করা হয়, সে কেবলমাত্র বোধিসত্ত্বদের মূর্তি ফুটিয়ে তোলবার জন্য। অজন্তার গুহায় এই যে অপ্রাকৃত মূর্তির আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি মানুষের কল্পনার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে গণ্য হবার যোগ্য। আশ্চর্যের মধ্যে পরমাশ্চর্য বস্তু হিসেবে কেবলমাত্র ১নং গুহার বোধিসত্ত্বের বিরাট মূর্তি স্মরণ

করা যাক্—যার পরণে স্বচ্ছ মল্‌মল্‌, মাথায় উচ্চ কিরীট "যাতে কাজ করা সোনার জমির উপর পদ্মফুল ও জুঁইফুল ফুটে রয়েছে", এবং ডান হাতে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে লীলাকমল ধৃত। এই মূর্তিটি বিশ্বশিল্পের দরবারে Chapelle Sixtine-এর শ্রেষ্ঠ মূর্তির পাশে Leonardo da Vinci-র আধ্যাত্মিকতম চিত্রাবলীর পাশে স্থান পাবার যোগ্য।

অজন্তার প্রত্যেকটি প্রধান বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হবার উপযুক্ত। এই যে ফুলের মত সুন্দর, নগ্ন নারীমূর্তি সমূহ, যাদের দেহের রেখার স্বাধীনতায় এবং ভঙ্গীর বৈচিত্র্যে যেন হিন্দু রমণীর একটি কাব্য রচিত হয়েছে,—তাদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত। যথা ১নং গুহায় মারের আক্রমণের দৃশ্যে মোহিনীদের প্রলোভনের প্রকাশ্য প্রয়াস, যার কামুকতা একাধারে অভিজ্ঞতাসূচক ও শিশুসুলভ। অজন্তার প্রেমিকদের যুগলরূপ একে একে বর্ণনা করা যেতে পারে,—তাদের অলস রভস ও সুকুমার সারল্য, তাদের ভঙ্গীর মাধুর্য ও পরস্পরকে আদর করবার মধ্যেও সংযম রক্ষা, সর্বোপরি তাদের আধ্যাত্মিক ভাববিলাস,—সেই অপার করুণা যার দরুণ বৌদ্ধ মন্দিরেও এইরূপ বিষয়বস্তুর অবতারণায় বেসুরা বাজে না। এইরূপ অজন্তার পুরুষমূর্তির সম্বন্ধেও একটি সম্পূর্ণ নিবন্ধ রচনা করা যেতে পারে—একদিকে সভ্যতম নাগরিক বেশধারী ক্ষত্রিয়, মুখে অল্প গোঁফের রেখা, পরণে ফিনফিনে কাপড়, নারী সুলভ নমনীয় শরীরের গড়ন—অপরদিকে কমবেশ ইরাণী বা শকজাতীয় চেহারা, দাড়ি ভরা মুখ, ছুঁচলো গড়নের টুপি ও মোটা কাপড়। উপরন্তু রাজসভার ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যও লক্ষ্য করবার বিষয়। ১নং গুহায় যে হাতীতে চড়া তরুণ রাজপুত্রের সাঙ্গোপাঙ্গ অশ্বারোহী দেহরক্ষীদলসহ প্রাসাদ থেকে বেরুচ্ছে; ১৭নং গুহায় যে মহামূল্য সাজ পরা সারবন্দী হাতীর উপর যোদ্ধাসকল আরূঢ়, তাদের চতুর্দিকে অশ্বারোহী সৈন্য;—এই যথার্থ মহাকাব্যোচিত দৃশ্যটিকে আগে লোকে মনে করেছিল সিংহল দ্বীপের আর্য বিজেতা বিজয় সিংহের আগমন ও অভিষেক চিত্র, কিন্তু Foucher সাহেবের মতে এটি আসলে সিংহলাবদান, অর্থাৎ সিংহল নামক সদাগরের সিংহলের রাজা হবার কাহিনী। জঙ্গলের দৃশ্যগুলিরও বিস্তারিত বর্ণনা করতে হয়, যেখানে অজ্ঞাতনামা চিত্রকর পশু-জীবনের প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে এমন এক বাস্তবতা ও প্রাণবেগের সঞ্চার

করেছেন, যা সাঁচির পশুশিল্পীদের সমতুল্য ; বিশেষত ১নং গুহার মহিষের লড়াই, ১৯নং গুহার হাতীর যুদ্ধ, এবং ১০নং গুহার "ষড়দন্ত" জাতকের হস্তীযূথ। আবার এরই সঙ্গে সমশ্রেণীতে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে ১নং গুহার পাড়ের উপর সজ্জাস্বরূপ ব্যবহৃত চমৎকার হাতীগুলি। হরিণবৃন্দের যারপর নাই অঙ্গসৌষ্ঠব, বানরের ভঙ্গীর অথবা নেকড়ে বাঘের মুখের চমকপ্রদ বাস্তবতা, ময়ূরের চিত্রিত রূপের সমারোহও উল্লেখ করবার জিনিষ, এবং তা সাঁচির শিল্পের সমকক্ষ।

এই সূত্রে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বারে সাসানীয় পারস্যদেশে এক ক্ষমতাশালী পশুশিল্পী সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। কেবলমাত্র তাখ্-ই-বুস্তানের হাতী ও হরিণের ধাঁচের সঙ্গে অজন্তার সেই সেই জানোয়ারের রূপ তুলনা করে দেখা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হওয়া সম্ভব। তা'তে স্থানীয় প্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি লক্ষণে সাদৃশ্য লক্ষিত হতে পারে। ফলত অজন্তায় সনাতন রীতির উদ্বর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একটি প্রবন্ধ নিয়োজিত করা যায়। ছোট ছোট ডানাওয়ালা পরী বা জিন্ জাতীয় জীবেরা মোরগ বা ছাগশিশুকে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করেছে এ বিষয়টি সম্পূর্ণ গ্রীসীয়রোমক, অথচ কখনো কখনো একে একটি সম্পূর্ণ ভারতবর্ষীয় বিষয় বস্তুর সঙ্গে সম্মিলিত দেখে আশ্চর্য হতে হয়। গ্রীক পুরাণ কথার নারীপক্ষী থেকে নকল করা কিন্নরমূর্তি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযুজ্য। আর কিছুদূরে কতকগুলি দৃশ্যে এই সকল সনাতন রীতির ভারতবর্ষীয় রূপান্তর লক্ষ্য করতে পারা যায়। ২নং গুহার সম্পূর্ণ গ্রীসীয় মোহিনী নারীর ছাঁদে গঠিত নাগকন্যাদের পাশে অন্যান্য অপ্রাকৃত জীবের চিত্র রয়েছে, যাদের দেহের নিম্নভাগ ও পুচ্ছ মোহিনী নারীর ন্যায়, কিন্তু মাথা ও সম্মুখভাগ মহিষের বা গরুর মত। এ আদর্শ সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিভার সৃষ্টি। তদ্রূপ আমরা দেখতে পাই পাড়ের সজ্জার মধ্যে সনাতন প্রেমী শিশুর আকৃতির সঙ্গে মিলিত রয়েছে গ্রীষ্ম প্রকৃতির ফুলপাতা বা পালাক্রমে বানর, মহিষ এবং শিশুশ্রীমণ্ডিত সুন্দর হাতী। এই একই পাড়ের উপর আমরা অন্যত্র দেখতে পাই, পারস্য বংশমর্যাদা চিহ্নসূচক খাড়া জানোয়ারের মূর্তি, যা' মধ্য আসিয়ার তুর্ফাণ নগর পর্যন্ত পরে পাওয়া গেছে।

এই বিচিত্র অনুভূতিগুলিকে একটি মাত্র সূত্রে সংহত করতে হলে আবার বলতে হয় যে অজন্তায় যে জিনিষের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, সেটি হচ্ছে বিদেশী ভাবের আমদানি, অথবা বিদেশী ভাবকে স্বদেশীতে রূপান্তর পূর্বক স্বতন্ত্র রাখা, এবং সাঁচির নিতান্ত সরল ও নবীন পুরাতন ভারতবর্ষীয় স্বাভাবিকতার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম রহস্যের অপার করুণার অন্তরঙ্গ ও সুসমঞ্জস সমন্বয়। এই কারণে অজন্তা ভারতীয় আত্মার সমষ্টীকৃত রূপ।

এই সঙ্গে বলতে হয় যে অজন্তা কেবলমাত্র তার প্রাচীর চিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ নয়। ১৯ নং গুহারই দেওয়ালে নাগযুগল (৫ম শতাব্দীর দিকে) গুপ্ত ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শনের মধ্যে গণ্য।

সিংহলের সিগিরীয়ার প্রাচীর চিত্র অজন্তার রূপরীতির সগোত্র। Percy-Brown সাহেবের মতানুসারে সে-গুলি কাশ্যপ রাজের সমসাময়িক (৪৭৯-৪৯৭); Botticelli-চিত্রের অনুরূপ শ্রীসম্পন্ন সিগিরীয়ার নারী মূর্তিগুলি এই রাজার পত্নীগণ।

অবশেষে, প্রাচীর চিত্রের তৃতীয় একটি কেন্দ্র বর্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যের বাগ নামক স্থানে অবস্থিত। এই চিত্রগুলি মনে হয় অজন্তার স্বর্ণ যুগের সঙ্গে অনুস্যূত (৭ম শতাব্দী), কিন্তু কতকাংশে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের (গড়পড়তা ৭০০-র দিকে ?)। অজন্তার সঙ্গে প্রভেদ এই যে, এগুলি আর সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ বলে মনে হয় না, বরং অধিকাংশই সম্পূর্ণরূপে ধর্মবর্জিত। যে অশ্বরোহীর সার বা হস্তীর শোভাযাত্রা অজন্তায় ধর্ম-প্রেরণার আনুষঙ্গিকরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে-গুলি এস্থলে স্বতন্ত্র প্রাধান্য লাভ করেছে। সুতরাং বলতে হয় বাগের উৎপত্তি সেই কালে যখন বৌদ্ধ ধর্ম অবনতির মুখে দাঁড়িয়েছে, এবং অনতিবিলম্বে যে হিন্দু ধর্ম তাকে গ্রাস করবে, তার সঙ্গে আপোষে রফা করতে বাধ্য হয়েছে।

হিন্দু ভাস্কর্য: এলোরা, এলিফাণ্টা ও মাবলীপুরম।

চালুক্য এবং রাষ্ট্রকূট বংশের ভাস্কর্য্য (মহারাষ্ট্র, ৭ম-১০শ শতাব্দী) গাঙ্গেয় গুপ্ত শিল্প এবং কর্ণাটক ও মহীশূরের "দ্রাবিড়" শিল্পের মধ্যবর্তী সেতুস্বরূপ।

বাদামী মন্দির (ষষ্ঠ শতাব্দী), এলোরার মন্দির, যার মধ্যে কৈলাসই

প্রসিদ্ধতম (৭৬০-র দিকে) এবং এলিফাণ্টার মন্দির (৮ম-৯ম) এই কয়টিই চালুক্যদের প্রধান কীর্তিস্তম্ভ এবং পর্বতে ক্ষোদিত প্রকৃত মহামন্দির বিশেষ। যে ধর্মভাবে এই অধিকাংশ মন্দির পরিকল্পিত, বিশেষত কৈলাসে ও এলিফাণ্টায় যার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, সেটি হচ্ছে দ্রাবিড়দের মুখ্য ধর্ম বা শৈব ধর্ম। এই রুদ্র দেবতা সেই বিশ্বশক্তির প্রতীক, যে প্রকৃতি অনন্তকাল ধরে সৃজন ও প্রলয়ে রতা। সুতরাং এলোরাতে কঠোর এবং ভীষণ মুখশ্রীবিশিষ্ট মূর্তির প্রাদুর্ভাব। তথাপি সনাতন গুপ্ত শিল্প ধর্ম সর্বত্র বিদ্যমান। তারই প্রভাব দেখা যায় প্রকাণ্ড হস্তী শ্রেণীর সমারোহে, মন্দিরের ভিত্তির ভার যার উপর ন্যস্ত বলে মনে হয়। শিবমূর্তিগুলিও তারই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। কৈলাস এলিফাণ্টার শিব এখনও গুপ্ত শিল্পের অনুযায়ী মূর্তি, কেবল বুদ্ধের শিরোমণ্ডলের বদলে বসেছে রাজমুকুট, এবং ত্যাগ ও নির্বাণের প্রতীকের পরিবর্তে উদ্দাম ঐশ্বর্য সহকারে সমগ্র জীবনের রূপ। ভিতরের ভাবের বদল হয়েছে, কিন্তু শিল্প রীতি একই রয়ে গেছে। এমন কি ভৈরবের মূর্তিতেও এলিফাণ্টায় শিব দেহের রেখাগুলি সরল ও বিশুদ্ধ, এবং নগ্নতনু মথুরা ও সারনাথের মূর্তির মত নমনীয়, সংযত ও কোমল। প্রলয় নৃত্যে যদিও সংখ্যাবহুল বাহু প্রথমে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, কিন্তু পরে বোঝা যায় যে, সকলই একটি আভ্যন্তরীণ নিয়মের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক বাহুযুগলের ভঙ্গী আপনাতে আপনি আদর্শ সুরুচিপূর্ণ—ফলত সমগ্র নটরাজ মূর্তিটি যেন ভীষণ আনন্দবশে এক বিরাট সামঞ্জস্য স্পন্দমান। রাবণ-কা-খাই এলোরায় গুহার নটরাজ, (৭ম-৮ম শতাব্দী)। অপর পক্ষে প্রলয় শক্তির প্রতীক স্বরূপে নয় কিন্তু প্রেমের সহজ প্রবৃত্তির রূপ দিতে যখন শিবকে আহ্বান করা হয়েছে—যে প্রেম নিত্য নূতন জীবন সৃজনে রত—তখন তার সমগ্র সত্বা থেকে কি অনুপম লাবণ্য, কি করুণ কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই সূত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখযোগ্য এলিফাণ্টার হর-পার্বতীর বিবাহের অর্দ্ধোৎকীর্ণ মূর্তি, এবং কৈলাসের যুগলরূপ বা চুম্বনের দৃশ্য (সেই একই লোকের ?)। পূর্বোক্ত নটরাজ মূর্তিতে বিশ্বের উদ্দাম হিংসোন্মত্ততায় মানবাত্মার কবিত্বময় স্বীকৃতি প্রকাশিত হয়েছে ; আবার শিবের বিবাহে সেই একই প্রতীকের অপর পিঠ দেখানো হল। এই যে তরুণ রাজা অনির্বচনীয় গর্বসূচক ভঙ্গীতে আথেনীয় কুমারীসম সলজ্জা কুমারীটিকে হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন—এও সেই বিশ্বশক্তি,

এক মুহূর্ত পূর্বে যা নিষ্করুণ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ধ্বংসকারী আনন্দে পূর্ণ, পর মুহূর্তে তা অসীম মাধুর্যময় প্রেম সঙ্গীতে অভিব্যক্ত।

অবশেষে ভাস্কর যখন ত্রিমুণ্ড আবক্ষ মূর্তিতে আমাদের শিবের তিন রূপের সমন্বয় দেখান—মাধুর্য, গাম্ভীর্য এবং ভীষণ মহত্ত্ব—তখন মানুষের কল্পনাপ্রসূত বিশ্ব দেবাত্মার চরমুৎকৃষ্ট প্রতিরূপ আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হয় (এলিফাণ্টার মহেশ মূর্তি বা ত্রিমুণ্ড শিব)। অধিকন্তু বক্তব্য এই যে, কৈলাসে আমরা বহু মূর্তি সমন্বিত চমৎকার প্রকাণ্ড দৃশ্যের সাক্ষাৎ পাই, যেমন রাবণ কৈলাস পর্বতকে নাড়া দিচ্ছেন, আর উপরে হর-পার্বতী সিংহাসনে বসে আছেন। এই সকল দিক দিয়ে বিচার করলে এলোরা এবং এলিফাণ্টার উৎকীর্ণ মূর্তি Chapelle Sixtine-এর ছাদচিত্রের পার্শ্বে স্থান পাবার যোগ্য, এবং এখনকার দিনে তাদের এরূপ ভগ্নাবস্থা বলে অধিকতর মনোজ্ঞ।

মাবলিপুরম্ বা মামল্লপুরমে যে রথ, বা মাথার উপর খোলা এক পাথরে কাটা মন্দির এবং তার চারদিকে যে সকল উৎকীর্ণ মূর্তি রয়েছে—সেগুলি অপেক্ষা ৭ম-৮ম শতাব্দীর পল্লব শিল্পকলাগুলির প্রেরণা অপেক্ষাকৃত কম কঠোর এবং বেশী স্বাভাবিক। এই অঞ্চলের “গঙ্গাবতরণ (বা নকল অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত”) রূপ প্রকাণ্ড প্রস্তরে ক্ষোদাই কার্যের উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে নাগনাগিনী ঝরণার জলে খেলা করছে এবং চতুর্দিকে পশু, ঋষি, যক্ষ, রক্ষদের দেবী প্রভৃতির ভিড় জমে গেছে। কল্পনা বিন্যাসের বিশালতা পুণ্য প্রপাতের প্রতি প্রত্যেক জীবের প্রণতিতে সূচিত ; গতিভঙ্গীর সরলতা, এবং স্বভাবের সৌন্দর্যের প্রতি গভীর ও সতেজ প্রীতি সবসুদ্ধ মিলে এই ভাস্কর্যটিকে সনাতন শিল্পের পরাকাষ্ঠায় পরিণত করেছে। এই একই ভাবধারা লক্ষিত হয়, মহাবলিপুরমের অর্জুন রথ, ধর্মরাজ রথ এবং দ্রৌপদী রথে, যাতে পল্লব জাতীয় যুগল রাজপুরুষ বা পুরাণ কাহিনী ক্ষোদিত হয়েছে, (যথা পার্বতী ও স্কন্দ, লক্ষ্মীর স্নান বা জন্ম ইত্যাদি)। এই দীর্ঘাকৃতি সুশ্রী পবিত্র নগ্ন মূর্তিগুলিতে নারীদেহের শৈল্পিক মূল্য যেরূপ সুন্দর ভাবে প্রকটিত হয়েছে, সে-রূপ অন্যত্র দুর্লভ ; এবং অমরাবতী ও অজন্তার মূর্তির সঙ্গে এগুলির অতি নিকট সম্বন্ধ। অধিকন্তু বক্তব্য এই যে মাবলিপুরমে যে-সকল প্রকাণ্ড প্রস্তর জন্তুর আকারে ক্ষোদিত হয়েছে (হস্তী, মেষ, বানরবৃন্দ) তাতে প্রকাশ পেয়েছে এক সবল ও বাস্তব, অথচ সংযত এবং

প্রকৃষ্টরূপে সমন্বয়কারী পশু-অঙ্কন পদ্ধতি অর্থাৎ যা গুপ্ত শিল্পের সাক্ষাৎ বংশধর।

ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী ভারতীয় স্থাপত্য।

ভারতীয় আর্য, জৈন, চালুক্য, হয়সল ও দ্রাবিড় রীতি মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্যের অন্তর্গত।

যে স্থাপত্য-রীতিকে বলে "উত্তরপন্থী" বা "ভারতীয়-আর্য" এবং যাকে সোজা-সুজি বলা যেতে পারে "উড়িষ্যার রীতি"—উন্নত-শির গম্বুজ (শিখর বা শিক্রা) থেকে তা সহজে ধরা যায়। এগুলি যেন এক ঝলকে আকাশের প্রতি উৎক্ষিপ্ত এবং শীর্ষদেশ একটি আমলক পরিশোভিত, তার উপর সাধারণত একটি ফুলদানি গড়নের হাল্‌কা টোপর স্থাপিত। এই সবল ও সমন্বয়কারী রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন উড়িষ্যায় দেখতে পাওয়া যায় পুরীর নিকটস্থ ভুবনেশ্বর মন্দিরসমূহে; কণার্ক বা কণারকে (ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর মন্দির ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী, লিঙ্গরাজ মন্দির ৯ম শতাব্দী, এবং রাজরাণী মন্দির ১৩শ শতাব্দীর দিকে ; কণার্কে সূর্য মন্দির ১৩শ শতাব্দী) ; এবং বুন্দেলখণ্ডে খজুরাহ মন্দিরগুলিতে (১০ম-১২শ শতাব্দী)।

"জৈন" নামক রীতিটি যদিও ভারতীয়-আর্য থেকে উৎপন্ন, তবু উক্ত ধর্মের কীর্তিস্তম্ভে ব্যবহৃত হয়েছে বলে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য। এ রীতি বিস্তার লাভ করেছে কাথিয়াওয়াড়ে (পালিটানা ১১শ শতাব্দী, গিরনার ১২শ শতাব্দী) এবং রাজপুতানায় (আবু পাহাড়—বিমল সাহের মন্দির ১০৩১, তেজ পালের মন্দির ১২৩০)। এই রীতিতে নির্মিত জৈন মঠগুলি সাধারণত একটি চতুষ্কোণ ঢাকা বারান্দা দিয়ে ঘেরা। সেটি কুলুঙ্গীস্থিত মূর্তিদ্বারা পরিশোভিত, এবং তার মধ্যে দিয়ে একটি গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করা যায়, যেটি প্রতিষ্ঠাতার নামে উৎসর্গীকৃত। এই ঘেরাওয়ের মধ্যস্থলে খিলানযুক্ত চারিটি ঢাকা বারান্দা চারিদিক থেকে একটি প্রবেশ গৃহ রচনা করে, এবং একটি অষ্টকোণে সম্মিলিত হয়। তার উপর একটি সুগোল গম্বুজ স্থাপিত, যেটি ভারতীয়-আর্য শিখরের নকল, কিন্তু ভিতরে ফাঁপা, এবং অধিকতর লম্বা ও উদ্‌গ্রীব। এর পরে আসে গর্ভমন্দির ও তার বহির্গৃহ, তার উপরেও

সুগোল গম্বুজ। এই প্রধান শিখরগুলির আশে পাশে অপরাপর নিম্নতর গৃহশিখর থাকে। অসংখ্য স্তম্ভ, হাওয়া-ঘর, চূড়া, গম্বুজ, ঘণ্টা-ঘর, মিনার ইত্যাদির ভিড়ের সঙ্গে নির্মাণের উপাদান এবং অলঙ্কারের অসীম বৈচিত্র্য মিলিত হয়ে (আবু পাহাড়ের মন্দিরগুলি শ্বেত পাথরে গড়া তার উপর গহণার ন্যায় ক্ষোদাই ও কারুকার্য করা) এমন এক লঘু সুঠাম সৌষ্ঠবশ্রীর ছাপ মনে বসিয়ে দেয়, যা আরব শিল্পকলার সমতুল্য। প্রথম ভারতীয়-মুসলমান স্থপতিগণ যে জৈন আদর্শ দ্বারা এত গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তা'তে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শেষ

* শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী কর্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত "রেনে গ্রুসে-র ভারতবর্ষ" সম্পূর্ণ আকারে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ প্রকাশ করিবেন।

সাগরিকা

পাত্র-পাত্রীগণ :—

ডাক্তার বাঙ্গেল্		
এলীডা বাঙ্গেল্	...	দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী
বোলেত্	...	প্রথমা স্ত্রীর কন্যাদ্বয়
হিল্ডে (অল্প বয়স্কা)		
আর্ন্ হলম্	...	কলেজের অধ্যাপক
লিঙ্গ্ ষ্ট্রাণ্ড		
বেলেষ্টাড্		
একজন পরদেশী		
সহুরে তরুণ-তরুণীগণ		
ভ্রাম্যমান্ ও আগন্তুক দল		

ঘটনাস্থল :—

উত্তর নরোয়ের একটি ক্ষুদ্র ফিওর্ড* সহর।

প্রথম অঙ্ক

(*দৃশ্য* :—ডাক্তার বাঙ্গেলের বাগান-বাড়ী। বিস্তৃত বারান্দার সম্মুখে ও চতুর্দ্দিকে উদ্যান। বারান্দার নীচে একটি ধ্বজা-স্তম্ভ। উদ্যানে কুঞ্জ, কুঞ্জে টেবিল-চেয়ার। লতা-বেষ্টনীর অন্তরালে ক্ষুদ্র দেউড়ি। অদূরে, সমুদ্রের ধারে ধারে তরু-বীথিকার মধ্যে রাস্তা। তরুরাজির অবকাশ-পথে ফিওর্ড এবং উত্তুঙ্গ পাহাড়ের শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। গ্রীষ্মের ঈষদুষ্ণ অত্যুজ্জ্বল স্বচ্ছ প্রভাত কাল।

প্রৌঢ় বেলেষ্টাড্ মখমলের কোর্ত্তা ও চওড়া ধার-ওয়ালা শিল্পীর টুপি পরিয়া ধ্বজা-স্তম্ভের নীচে দাঁড়াইয়া রজ্জু সামলাইতেছেন। ধ্বজা মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহারই অনতিদূরে

---

* সমুদ্র বা নদীর যে অপ্রশস্ত ও অগভীর অংশ পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করা যায়, তাকে ফিওর্ড বলে। এখানে সমুদ্রের একটি অংশ সহরের মধ্যে খাড়ির মতন ঢুকিয়া পড়িয়া অববাহিকা সৃষ্টি করিয়াছে ; তাতেই ফিওর্ড-সহর বলা যাইতেছে।

একটি চিত্র-ফলকের উপরে ক্যান্‌ভাস্‌ বিছানো। ফলকের পাশে ক্যাম্প-ষ্টুলের উপরে, তুলি, রং-দানি ও রঙের বাক্স।

বোলেত বাঙ্গেল্‌ কক্ষাভ্যন্তর হইতে সম্মুখের দরদালানে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে বড় ফুল-দানিতে ফুল। ফুলদানিটি টেবিলের উপরে রাখিলেন।)

বোলেত্‌—কেমন বেলেষ্টাড্‌! তর্‌তর্‌ করে হচ্ছে তো?

বেলেষ্টাড্‌—জরুর, দিদিমনি! টুক্‌টাক্‌ সেরে নিচ্ছি। জিজ্ঞেস করি—আজ বুঝি অভ্যাগত কারুর আসার কথা?

বোলেত্‌—আজ সকালে মিঃ আর্ন্‌হলম্‌ আসবেন। রাত্রিতে সহরে এসে পৌঁছেছেন।

বেলেষ্টাড্‌—আর্ন্‌হলম্‌? ও! আর্ন্‌হলম্—তিনিই তো, এ-বাড়ীতে যিনি কয়েক বছর আগে মাষ্টার ছিলেন?

বোলেত্‌—হ্যাঁ, তিনিই।

বেলেষ্টাড্‌—বটে? আবার এখানে আস্‌ছেন?

বোলেত্‌—তাঁর জন্যেই আজ ধ্বজা ওড়ানো।

বেলেষ্টাড্‌—সাধু সাধু।

(বোলেত্‌ পুনরায় কক্ষাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড রাস্তা পার হইয়া ভিতরে আসিলেন এবং চিত্র-ফলক ও চিত্রণের সরঞ্জাম দেখিয়া আকৃষ্ট ভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তরুণটি কৃশকায়, পরিচ্ছদ গরিবানা হইলেও যত্ন-বিন্যস্ত, দেখিতে পেলব।)

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—(লতা-বেষ্টনীর ওদিক্‌ হইতে) সুপ্রভাত।

বেলেষ্টাড্‌—(পেছনে তাকাইয়া) হ্যালো! সুপ্রভাত। (ধ্বজা তুলিতেছেন) এই যে, বেলুন উঠ্‌লো বলে'। (রজ্জু বাঁধা শেষ হইলে চিত্র-ফলক লইয়া ব্যস্ত হইলেন) সুপ্রভাত মশাই! আপনার সঙ্গে আগে দেখা হওয়ার সুযোগ হয়েছে, মনে হচ্ছে না।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—দেখ্‌ছি আপনি একজন রূপকার।

বেলেষ্টাড্‌—আলবৎ। না হবার যো কি?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—তাতো দেখ্‌তেই পাচ্ছি। একটু কাছে এসে দেখ্‌তে পারি কি?

বেলেষ্টাড্—আপনি দেখ্‌তে চান এসে ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—হ্যাঁ, ভারি ইচ্ছে কচ্ছে।

বেলেষ্টাড্—এখনো তেমন কিছু দেখার হয়নি। তা আসুন। আরেকটু এগিয়ে আসুন।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—ধন্যবাদ। (বাগানের দেউড়ি দিয়া প্রবেশ করিলেন।)

বেলেষ্টাড্—(অঙ্কন-রত) দ্বীপ-গুলোর মাঝামাঝি ফিওর্ড এঁকে তুল্‌ছিলুম।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—তাই দেখ্‌ছি।

বেলেষ্টাড্—এখনো ফিগার আঁকা হয়নি। এ-সহরে মডেল নেই।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—ফিগার-ও একটি থাবে বুঝি ?

বেলেষ্টাড্—হ্যাঁ, পাহাড়-গুলোর পাশে সাম্‌নেটায় থাকবেন শায়িতা অৰ্দ্ধমৃতা মৎস্য-নারী।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—অৰ্দ্ধমৃতা কেন ?

বেলেষ্টাড্—ইনি সমুদ্দুর থেকে এই অবধি এসে আর বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে, তাঁকে ঐ অৰ্দ্ধ-লোনা জলে মুমূর্ষু হয়ে শুয়ে পড়তে হয়।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—হয়-ই তো।

বেলেষ্টাড্—এই বাড়ীর কর্ত্রী আমায় আঁক্‌তে দিয়েছেন; মস্য-নারীর ব্যাপারটিও তাঁরই পরিকল্পিত।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—শেষ হলে ছবির নাম কী দেবেন ?

বেলেষ্টাড্—ভাবছি নাম রাখ্‌বো "মৎস্য-নারীর লীলান্ত।"

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—বাঃ! মনোজ্ঞ নামটি! আপনার হাতে নিশ্চয়ই এ অতি সুন্দর জিনিষ হয়ে উঠ্‌বে।

বেলেষ্টাড্—(চোখ তুলিয়া) আপনারও এই ব্যবসা ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—কী—চিত্রাঙ্কণ ?

বেলেষ্টাড্—নয় ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—না, চিত্রকর নই আমি। ভাস্কর্য্য শিখ্‌ছি। আমার নাম হেন্স লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড।

বেলেষ্টাড্—বটে ? আপনি ভাস্কর হবেন ? ভালো, ভালো। আর্টের রাজ্যে ভাস্কর্য্যেরও একটা বিশেষ ঋদ্ধি ও শ্রী রয়েছে। মনে হচ্ছে, যেন রাস্তায় দু' একবার আপনাকে দেখেছি। বেশ কিছুদিন হলো এখানে এসেছেন—না ?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড—দু' সপ্তাহ হয়েছে। তবে গ্রীষ্মের শেষ অবধি থাক্‌বার ইচ্ছে।

বেলেষ্টাড্—সমুদ্র-স্নান উদ্দেশ্য তো ?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড—হাঁ ; কিছুদিন এখানে থেকে শরীরটা একটু তাজা করতেই আসা।

বেলেষ্টাড্—আপনাকে দুর্ব্বল বলে তো মনে হয় না ?

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড—একটু দুর্ব্বল বৈকি! ভয়ের কিছু নেই অবিশ্যি ; এই বুকে একটু ব্যথা।

বেলেষ্টাড্—ও কিছু নয়। ভাল একজন ডাক্তার দেখান।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড—ডাক্তার বাঙ্গেলের সঙ্গে দু'একদিনের মধ্যে পরামর্শ কর্‌বো ভাবছি।

বেলেষ্টাড্—তাই করুন। (বাম দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া) ঐ যে আরেকখানা ষ্টীমার যাত্রীতে বোঝাই! কী আশ্চর্য্যের ব্যাপার ? এই ক'বছরের মধ্যে এখানে যাত্রী-সমাগম দেদার বেড়ে গেছে।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড—ব্যবসা খুব জমেছে বলেই বোধ হয়—

বেলেষ্টাড্—তার ওপর গ্রীষ্মাবকাশের আগন্তুকরা-ও অনেকে জোটেন কিনা। প্রায়ই আমি ভাবি, এমনি বিদেশী সমাগম যদি চল্‌তে থাকে তাহলে আমাদের এই নামকরা সহর তার বৈশিষ্ট্যটি হারিয়ে না বসে!

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড—আপনি এই সহরেরই অধিবাসী ?

বেলেষ্টাড্—না। এখানকার আবহাওয়াতে নিজেকে স্-সইয়ে নিয়েছি। কিন্তু অনেক কাল আবার কাজ-কর্ম্মের বন্ধনের দরুণ এই যায়গাটির সঙ্গে এক রকম সম্পর্ক-ও দাঁড়িয়ে গেছে।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড—তার মানে, এখানে অনেকদিন বসবাস হলো, বলুন ?

বেলেষ্টাড্—প্রায় সতেরো-আঠারো বছর হবে। স্কীভ্ নাট্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রথম এখানে আসি। কিছুটা হাঙ্গামের জন্যে দলটি ভেঙ্গে গেলো। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়্‌লো।

লিঙ্গ্ষ্ট্রাণ্ড—আপনি এখানেই রইলেন।

বেলেষ্টাড্—হাঁ, থেকে ভালোই করেছি। সে-সময়ে আমি বিশেষ ভাবে মণ্ডল-শিল্পীর কাজ করতুম, বুঝলেন কিনা।

(বোলেত্ একখানা দোলন-চেয়ার আনিয়া সম্মুখের দরদালানে রাখিলেন।)

বোলেত্—(প্রকোষ্ঠের দিকে মুখ করিয়া) হিল্ডে, দেখ্ দিকি জরির-কাজ করা পাদপীঠটি পাস্ কিনা! বাবার জন্যে দরকার।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—(বারান্দা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া—নত মস্তকে) সুপ্রভাত, মিস্ বাঙ্গেল!

বোলেত্—(রেলিঙ-এর পার্শ্ব হইতে) বাঃ রে, আপনি যে, মিঃ লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড! সুপ্রভাত! একটু ক্ষমা করবেন; এক্ষুণি আস্‌ছি। এই শুধু—(কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।)

বেলেষ্টাড্—এই পরিবারের সঙ্গে পরিচয় আছে?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—খুব নয় যদিও। বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে বেড়ানোর সময় মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে; মিসেস্ বাঙ্গেলের সঙ্গে আমার একবার আলাপ-ও হয়েছিলো "View"-তে, এই গেলো জলসার দিন। তিনি বলেছিলেন, আমি এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা-মেলা করতে পারি।

বেলেষ্টাড্—তাহলে বুঝলেন, এঁদের সঙ্গে পরিচয়টা পাকা করে নিন্।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—হাঁ, আমি দেখা কর্‌বার কথা ভাবছি। প্রথমবার বাড়ী এসে দেখা করাটা একটু লৌকিক ভাবে হওয়া দরকার। তাই যদি যা-হোক একটা ছুতো পেতুম—

বেলেষ্টাড্—ছুতো কি ছাই? (বাম দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া) ঐ যাঃ (সরঞ্জাম গুছাইতে গুছাইতে) পোড়া জাহাজটা যে একেবারে pier-এ ভিড়লো। আর দেরী নয়; হোটেলে যেতে হবে। হয়ত আগন্তুকরা কেউ কেউ আমায় খুঁজতে পারেন। আমি আবার চুল-ছাটার কাজেও আছি যে।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—মশাই একজন গুণীলোক সন্দেহ নাই।

বেলেষ্টাড্—ছোট্ট সহরে নিজেকে নানান্ বিষয়ে স্-সইয়ে নিতে হয় তো? যদি চুলের সুগন্ধ তেল-টেল দরকার পড়ে ত' নৃত্য-শিক্ষক বেলেষ্টাডের কাছে জানালেই হলো।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—আবার নৃত্য-শিক্ষক ?

বেলেষ্টাড্—আপনাদের অনুগ্রহে অধিকন্তু উইণ্ড ব্যাণ্ড সোসাইটির পরিচালনাও করে থাকি। "View"-তে আজ বিকেলে আমাদের কন্সার্ট আছে। আসি তবে। নমস্কার।

(চিত্র-সরঞ্জাম লইয়া বাগানের দ্বার-পথে বাহির হইয়া যাইতেই, হিল্ডে পাদ-পীঠটি লইয়া বাহিরে আসিল। বোলেত্ আরো কিছু ফুল আনিল। লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড নীচে বাগান হইতে উদ্দেশে হিল্ডেকে নতি করিলেন।)

হিল্ডে—(রেলিঙ-এর পার্শ্ব হইতে, প্রতি-নমস্কার না করিয়া) বোলেত্ বল্‌ছিলো, আজ আপনি নিতান্তই যে এসে পড়লেন।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—সাহস করে এইমাত্র ঢুকে পড়লুম।

হিল্ডে—সকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—না-না, সকালের বেড়ানো আজ আর হয়ে উ্লো না।

হিল্ডে—তবে কি স্নানে গেছ্‌লেন ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—হাঁ। নাওয়া অল্পেই সেরে নিয়েছি। আপনার মাকে দেখ্‌লুম স্নানের কল-গাড়ীতে করে যাচ্ছেন।

হিল্ডে—কে ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—আপনার মা।

হিল্ডে—ও। বুঝেছি। (দোলন্-চেয়ারের সাম্‌নে পাদপীঠটি স্থাপন করিল।)

বোলেত্—(বাধা দিয়া) ফিওর্ডে বাবার নৌকা দেখ্‌তে পেলেন ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—একখানা পাল-নৌকো যেন পারের দিকে ভিড়তে দেখ্‌লুম।

বোলেত—নিশ্চয় তবে বাবার নৌকা। ঐ দ্বীপ-গুলোয় রোগী দেখ্‌তে যান কিনা। (টেবিলের উপর জিনিষ-পত্র গুছাইয়া রাখিতেছেন।)

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—(সিঁড়ির উপরে এক পা দিয়া দরদালানের দিকে অগ্রসর হইয়া) বাঃ। এখানকার ফুল-সজ্জা চমৎকার।

বোলেত্—বেড়ে দেখায় যা-হোক।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—তোফা। যেন বাড়ীতে আজ উৎসব।

হিল্ডে—নিশ্চয়।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—বল্‌বো ? আপনাদের বাবার জন্মদিন।

বোলেত্‌—(হিল্ডেকে শাসাইয়া) হুঁ-হুঁ !

হিল্ডে—(শাসানো গ্রাহ্য না করিয়া) না ; মা'র।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—ও ! আপনাদের মা'র !

বোলেত্‌—(রাগতভাবে কিন্তু নরম গলায়) দেখ্‌ হিল্ডে !

হিল্ডে—(পূর্ব্ববৎ) আরে থামো ! (লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ডের প্রতি) আপনি এখন ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ খেতে বাড়ী যাচ্ছেন বোধ হয় ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—(সিঁড়ি হইতে নামিয়া) হাঁ, এখন বাড়ী যাই ;—কিছু খেতে হবে।

হিল্ডে—হোটেলে খাওয়া-থাকা আপনার খুব ভালোই হচ্ছে, নিশ্চয়।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—এখন তো আমি হোটেলে নেই। বড্ড খরচ আমার পক্ষে।

হিল্ডে—তবে আছেন কোথায় ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—মিসেস্‌ জেন্‌সেনের বাড়ীতে।

হিল্ডে—কি বল্লেন ?—মিসেস্‌ জেন্‌সেন্‌ !

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—হাঁ, ঐ যিনি ধাত্রীর কাজ করেন।

হিল্ডে—মিঃ লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড, ক্ষমা করবেন—আমার হাতে অনেক কাজ এখন।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—সত্যি ! এ আমার বলা উচিত হয়নি।

হিল্ডে—কী উচিত হয়নি ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—এই যা বল্‌লুম।

হিল্ডে—(তাঁহার দিকে গুমর করিয়া তাকাইয়া) আপনার কথা আদৌ বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—না-না, এবেলা তবে আসি।

বোলেত্‌—(সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া) নমস্কার মিঃ লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড ! এখন আমাদের ক্ষমা কর্‌তেই হবে। আরেকদিন—আপনার প্রচুর অবসর যখন হবে—অনুগ্রহ করে বাবাকে—আমাদেরকে দেখ্‌তে আস্‌বেন তো ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—আস্‌বো বৈকি। এ তো খুবই আনন্দের কথা।

(নতি করিয়া উদ্যানের দেউড়ি দিয়া বহির্গত হইলেন। রাস্তায় যাইতে-যাইতে বারান্দার দিকে উদ্দেশে আরেকবার নতি করিলেন।)

হিল্ডে—(মৃদুতর স্বরে) বিদায় মস্তিয়! দয়া করে শ্রীমতী জেন্‌সেন্‌কে আমার কথা বলো।

বোলেত্‌—(অনুচ্চ কণ্ঠে, হাত ঝাঁকানি দিয়া) হিল্ডে! কী ধিঙ্গী মেয়ে তুই! অতো ছেব্‌লামো কেন তোর? হয়তো তোর কথা শুন্‌তে পেয়েছে।

হিল্ডে—বয়ে গেলো। বুঝ্‌লে—ওসব আমি থোড়াই কেয়ার করি।

বোলেত্‌—(ডান দিকে চাহিয়া) এই যে বাবা!

(ভ্রমণোচিত পরিচ্ছদে বাঙ্গেল্‌ ছোট একটি ব্যাগ্‌ হাতে ফুট্‌পাথ হইতে নামিয়া আসিতেছেন।)

বাঙ্গেল্‌—ক্ষুদে লক্ষ্মিরা! কেমন এলাম ঘুরে! (উদ্যানের দ্বার-পথে প্রবেশ)

বোলেত্‌—(বাগানের প্রান্তে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া) উঃ! কী ফুর্ত্তি, তুমি এলে!

হিল্ডে—(অনুসরণ করিয়া) বাবা, তোমার আজ দিন-ভর্‌ ছুটি?

বাঙ্গেল্‌—নারে, একবারটি অফিসে যেতে হবে। শোন্‌—আর্ন্‌হলম্‌ এসেছেন কি? কিছু জানিস্‌?

বোলেত্‌—গত রাত্তিরেই এসেছেন। হোটেলে খবর পাঠিয়েছি।

বাঙ্গেল্‌—এখনো দেখা হয়নি?

বোলেত্‌—না। কিন্তু আজ সকালেই এখানে আস্‌বেন—জানো।

বাঙ্গেল্‌—তা নিশ্চয়ই আস্‌বেন বৈকি।

হিল্ডে—(পিতাকে কাছে টানিয়া) বাবা, একবার চার্‌দিকে চেয়ে দেখো না।

বাঙ্গেল্‌—(বারান্দার দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া) দেখ্‌ছি তো বাছা;—এ যে রীতিমতো উৎসব!

বোলেত্‌—আমাদের সাজানো সুন্দর হয়নি, বলো না?

বাঙ্গেল্‌—বল্‌ছি তো—চমৎকার!...বাড়ীতে শুধু আমরা ছাড়া আর—আর কেউ নেই?

হিল্ডে—না। উনি গেছেন—

বোলেত্‌—(তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া) মা স্নানে গেছেন।

বাঙ্গেল্‌—(বোলেতের প্রতি স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহয়া মাথায় হাত বুলাইয়া আদর

করিলেন। অতঃপর ইতস্তত করিতে-করিতে বলিলেন) বাছারা। সমস্ত দিনই এই সাজ্-গোজ্ থাক্‌বে ? নিশান-ও উড়্‌বে ?

হিল্ডে—নিশ্চয়। তা কি তুমি বোঝো না, বাবা ?

বাঙ্গেল্—হুঁ, কিন্তু দেখ্—

বোলেত্—(তাকাইয়া, মাথা দোলাইয়া) তোমার তো অজানা নেই বাবা, এ সব আর্ন্‌হলমের শুভাগমন উপলক্ষে। তাঁর মতো একজন খাঁটি বন্ধু যখন তোমাকে নিজে থেকে দেখ্‌বার জন্যে আস্‌ছেন—

হিল্ডে—(মুচ্‌কি হাসিয়া, পিতাকে ঝাঁকানি দিয়া) ভেবে দেখো বাবা, অভ্যাগতটি যে-সে ন'ন্, একেবারে বোলেত্-দি'র মাষ্টার! (ব্যাগ হাতে বাগানের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘুরিয়া হাত দিয়া দেখাইল) দেখো, একজন ভদ্রলোক এদিকে আস্‌ছেন। নিশ্চয়ই তোর মাষ্টার, দিদি !

বোলেত্—(ঐ দিকে তাকাইয়া) সত্যি ? (স্মিতমুখে) ভালো কথা। ঐ আধ-বুড়ো লোকটিই আর্ন্‌হলম্, বাবা ?

বাঙ্গেল—রোস্ দেখি। অ্যা—ও-ই তো। এতে আর সন্দেহ কি !

বোলেত—(শান্ত বিস্ময়ে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া) বটে ! আমি কিন্তু ভেবেছিলুম—

(আর্ন্‌হলম্ রাস্তা দিয়া আসিতেছেন। প্রভাতোচিত নিখুঁত বেশ-ভূষা, চোখে সোনার চশমা, চিকন ছড়ি হাতে। পরিশ্রান্ত দেখাইতেছে। উদ্যানের ভিতরের দিকে একবার তাকাইলেন। তারপর বন্ধুচিত নতি-পূর্ব্বক বাগানের দেউড়ি দিয়া প্রবেশ করিলেন।)

বাঙ্গেল্—(প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া) স্বাগত আর্ন্‌হলম্! তোমার পুরোণো আবাসে আবার তোমাকে সাদরে আহ্বান কর্‌ছি।

আর্ন্‌হলম্—ধন্যবাদ, ডাক্তার বাঙ্গেল্; ধন্যবাদ—শত-সহস্রবার ধন্যবাদ। (কর-কম্পনান্তে একসঙ্গে উদ্যানের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া আসিলেন।) এই যে মেয়েরা রয়েছেন দেখ্‌ছি! (হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া, তাঁহাদের পানে চাহিয়া) এঁদের দু'জনকে এবারে চিন্‌তে পার্‌লে হয়।

বাঙ্গেল্—আরে—কী যে বলো !

আর্ন্‌হলম্—তবু, বোলেত্-কে সম্ভবত চিন্‌তে পার্‌বো বৈকি।

বাঙ্গেল্—পারবে ?—টানা আট-নয় বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা। তাইতো হে, ইতিমধ্যে কতো পরিবর্ত্তন ঘটে গেলো!

আর্ন্হলম্—(চারিদিকে চাহিয়া) কই, তেমন কি দেখ্ছি? শুধু গাছগুলো চোখে-পড়ে-মতন বেড়েছে। আর ঐ কুঞ্জটি যা তুলেছো।

বাঙ্গেল্—না হে, বাইরের পরিবর্ত্তন নয়।

আর্ন্হলম্—(মৃদু হাসিয়া) আর অবিশ্যি তোমার দু'টি কন্যাই বড়ো-সড়ো হয়েছে।

বাঙ্গেল্—বড়ো-সড়ো ?—সে তো শুধু একটি।

হিল্ডে—(একান্তে) বাবার কথা শোনো একবার।

বাঙ্গেল্—চলো, বারান্দায় বসা যাক্। এখানের চাইতে ঠাণ্ডা হবে। এসো।

আর্ন্হলম্—ধন্যবাদ ধন্যবাদ,—ডাক্তার মশাই!

(তাঁহারা দরদালানে উঠিলেন। বাঙ্গেল্ তাঁহাকে দোলন-চেয়ারটায় বসিতে সঙ্কেত করিলেন।)

বাঙ্গেল্—আভি ঠিক্ হ্যায়। একটু আরাম করে বসো। বিশ্রাম করে নাও। পথ-শ্রমে তোমাকে একটু ক্লান্ত করেছে।

আর্ন্হলম্—কিছু নয়। এখানে এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে—

বোলেত্—(বাঙ্গেলের প্রতি) বস্বার ঘরে গিয়ে একটু সোডা বা সরবৎ খেলে ভালো হয় না? অল্পক্ষণের মধ্যেই কিন্তু এখানটা বেজায় গরম হয়ে উঠ্বে।

বাঙ্গেল্—হ্যাঁ সোডা-সরবৎ বা একটু কোনিয়েক্ হলে-ও মন্দ হয় না।

বোলেত্—এখন কোনিয়েক্?

বাঙ্গেল্—এই এক-আধ ফোঁটা যদি কারুর লাগে।

বোলেত্—আচ্ছা। হিল্ডে, যা ব্যাগ্ রেখে আয় তো অফিসে।

(বোলেত্ প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। হিল্ডে ব্যাগ্ লইয়া বাগানের ভিতর দিয়া বাড়ীর পেছন দিকটায় চলিয়া গেলেন।)

আর্ন্হলম্—(বোলেতের গতি-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতে-করিতে) সুন্দর মেয়ে! দু'টিতেই এঁরা সুন্দর!—বয়সও হলো।

বাঙ্গেল্—(উপবেশন করিয়া) তোমার-ও তাই মনে হয় ?

আর্ন্‌হলম্—হবে না ? আশ্চর্য্য হবার নেই এতে ?—দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বোলেত্ আবার হিল্ডেও কেমন বেড়ে উঠ্‌লো ! ভালো,—এবারে তোমার কথা হোক্ ডাক্তার। এখানেই জীবনের সব কটা দিন কাটাবে স্থির করলে ?

বাঙ্গেল্—কি জানি। বল্‌তে গেলে, এখানেই জন্ম-কর্ম্ম যা কিছু। কী সুখেই না তাঁর সঙ্গে এখানে ছিলুম ! সে অতো আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেলো ! আগের বার তুমি যখন ছিলে তখন তো তুমি তাঁকে দেখেছো, আর্ন্‌হলম্ ?

আর্ন্‌হলম্—দেখেছি বৈকি ওঁকে।

বাঙ্গেল্—এখন যে তাঁর স্থলবর্ত্তিনী, তাঁর-ও সঙ্গে বেশ সুখেই আছি। মোটামুটি ভাগ্য আমাকে নেকজরেই দেখ্‌ছেন।

আর্ন্‌হলম্—তোমার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে-পুলে নেই ?

বাঙ্গেল্—দু'বছর আড়াই বছর হলো আমাদের একটি ছোট্ট খোকা হয়েছিলো। তা বেশীদিন বাঁচলে না ; চার-পাঁচ মাস বয়সেই মারা গেলো।

আর্ন্‌হলম্—গিন্নী আজ বাড়ীতে নেই ?

বাঙ্গেল্—আছেন। এই এলেন বলে'। স্নান কর্‌তে গেছেন। রোদ্-বিষ্টি যাই থাকুক্ রোজই এম্‌নি যান।

আর্ন্‌হলম্—কি—অসুখ ?

বাঙ্গেল্—ঠিক অসুখ না হলেও এই গত বছর থেকে মাঝে-মাঝে বড্ড স্নায়ু-রোগে ভুগ্‌ছেন। আমি সঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে রোগটা আদতে কী। কিন্তু সমুদ্র-স্নানে তাঁর পরম আনন্দ দেখেছি।

আর্ন্‌হলম্—এ আমি আগেই জান্‌তুম।

বাঙ্গেল্—(অলক্ষিতে হাসিয়া) বটে ! তুমি স্কিওল্‌ভাইকেন্-এ মাষ্টারি করার সময় থেকেই এলীডাকে জান্‌তে—না ?

আর্ন্‌হলম্—হাঁ। প্রায়ই পাদ্রীদের ওখানে বেড়াতে যেতেন। তবে আমার সঙ্গে দেখা হতো বেশীর ভাগ বাতি-ঘরে ;—ওখানে যখন ওঁর বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতুম, তখন।

বাঙ্গেল্—তাহলে বল্‌ছি শোনো। ঐ সময়কার বেড়ানোতেই তাঁর মনে একটা গভীর ছাপ রেখে গেছে। এখানকার সহুরে লোকদের কাছে ও যেন একটা হেঁয়ালি বিশেষ; তারা ওঁকে "সাগরিকা" বলে ডাকে।

আর্ন্‌হলম্—তাই নাকি ?

বাঙ্গেল্—হাঁ। এই ক'দিন তুমি তাঁর সঙ্গে পুরাতন দিনের কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে দেখো না, আর্ন্‌হলম্;—এতে যদি তাঁর উপকার হয়।

আর্ন্‌হলম্—(সংশয়-দৃষ্টিতে চাহিয়া) তোমার এ-কথার কোনো হেতু আছে ?

বাঙ্গেল্—আছে হে, আছে।

এলীডা—(বাগানের বাহিরে তাঁহার গলা শোনা যাইতেছে) কিগো, বাঙ্গেল্ এসেছো ?

বাঙ্গেল্—(গাত্রোত্থান করিয়া) হাঁ, ডীয়ার।

(বাঙ্গেল্-পত্নী এলীডা বৃক্ষ-বীথির মধ্য দিয়া আসিতেছেন—পরিধানের কাপড় ঢিলা পাত্‌লা, ভিজা চুল ঘাড়ের উপর অবিন্যস্ত ভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আর্ন্‌হলম্ দাঁড়াইলেন।)

বাঙ্গেল্—(বাহু প্রসারিত করিয়া স্মিতমুখে) এই যে, এসো মৎস্য-নারী।

এলীডা—(আস্তব্যস্ত ভাবে বারান্দায় উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন) হা ভগবান্! তোমায় পেয়ে বাঁচ্‌লুম। হ্যাঁগা, কখন এসেছো ?

বাঙ্গেল্—এই তো কিছুক্ষণ আগে। (আর্ন্‌হলম্-কে দেখাইয়া) পুরোণো বন্ধু তোমার সম্ভাষণের অপেক্ষা কর্‌ছেন যে।

এলীডা—(আর্ন্‌হলম্-এর দিকে হাত বাড়াইয়া) এই যে! সুস্বাগতম্! ক্ষমা কর্‌বেন, বেরিয়ে গেছ্‌লুম।

আর্ন্‌হলম্—ক্ষমা না-ই বা চাইলেন ? এতো ভদ্রতা আমার সঙ্গে ?

বাঙ্গেল্—কি গো, আজ্‌কের জলটা বেশ ঢল্‌ঢলে তক্‌তকে মনে হলো ?

এলীডা—আবার তক্‌তকে! এখানকার জলের যা ছিরি! কেমন যেন গরম আর অচেত। ইস্, ফিওর্ডের জল এখানটায় কী বিশ্রী!

আর্ন্‌হলম্—বিশ্রী ?

এলীডা—বিশ্রী ! একেবারে জ্বর ক'রে ছাড়ে।

বাঙ্গেল্—(হাসিমুখে) তুমি আমাদের স্নান-তীর্থের আচ্ছা গুণ-গান কর্‌লে দেখ্‌ছি !

আর্ন্‌হলম্—আমার কিন্তু মনে হয়—সমুদ্দুরের সব-কিছুর সঙ্গে আপনার একটা বিশেষ যোগ আছে, মিসেস্ বাঙ্গেল্।

এলীডা—হবে বা। আমিও তাই ভাবি।···দেখ্‌ছেন, আপনার অভ্যাগমে মেয়েরা কেমন উৎসব-সজ্জার আয়োজন করেছে ?

বাঙ্গেল্—(ত্রস্ত) হুঁ, (ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) এক্ষুণি আমাকে চট্‌পট্ সেরে আস্‌তে হবে—

আর্ন্‌হলম্—এসব তবে আমার জন্যে ?

এলীডা—হাঁ। আমরা রোজ তো আর এ রকমটি সাজাই নে ? আঃ ! এই ছাদের নীচে কী দম-বন্ধ করা গরম ! (উদ্যানে নামিয়া) এখানে চলে আসুন। তবু এখানে একটু বাতাস আছে। (কুঞ্জে আসন লইলেন।)

আর্ন্‌হলম্—(অনুগমন করিয়া) হুঁ, এখানে বাতাসটি ঝর্‌ঝরে মনে হচ্ছে।

এলীডা—আপনার বোধ হয় সহুরে বদ্ধ-হাওয়াই গা-সওয়া হয়ে গেছে। শুনি সহরে গর্‌মিকালটা ভয়ানক ?

বাঙ্গেল্—(বাগানে নামিয়া গিয়া) এলীডা, লক্ষ্মিটি ! তুমি আমাদের বন্ধুটিকে একলাই কিছুক্ষণ দেখো-শোনো, বুঝ্‌লে ?

এলীডা—তুমি কাজে বেরোচ্ছো ?

বাঙ্গেল্—অফিসে একবার যেতেই হবে। তারপর কাপড় বদ্‌লে ফস্ করে আস্‌ছি।

আর্ন্‌হলম্—(কুঞ্জে বসিয়া) শোনো ডাক্তার, তাড়াহুড়ো কিচ্ছু নেই। তোমার গিন্নীতে ও আমাতে সময় কেটে যাবেখ'ন।

বাঙ্গেল্—(মাথা দোলাইয়া) বেশ, বেশ। নিশ্চয় কাট্‌বে। আচ্ছা তবে আসি। (বাগানের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।)

এলীডা—(কিছুক্ষণ পরে) বাইরে এসে খাসা আরাম বোধ হচ্ছে—না ?

আর্ন্‌হলম্—হ্যাঁ, বেশ আরাম।

এলীডা—এরা বলে, এটি আমার কুঞ্জ। আমি তৈরী করে নিয়েছি কিনা ;—বাঙ্গেল্‌ই আমার জন্যে করিয়ে দিয়েছেন।

আর্ন্‌হলম্—প্রায়ই বসেন এখানে ?

এলীডা—সারা দিনই কাটাই।

আর্ন্‌হলম্—মেয়েরাও সঙ্গে থাকেন ?

এলীডা—না, মেয়েরা বারান্দায়ই বসে।

আর্ন্‌হলম্—আর বাঙ্গেল্—

এলীডা—ও! বাঙ্গেল্ একবার এখানে একবার ওখানে কাটান ;—কখনো আমার কাছে, কখনো মেয়েদের কাছে থাকেন।

আর্ন্‌হলম্—আপনারই এরকম ইচ্ছে বুঝি ?

এলীডা—আমার মনে হয়, এ-ব্যবস্থায় সবাই খুশী। দেখুন, কথাবার্ত্তা কওয়ার কিছু পেলে হেথা-হোথা বসেও আমরা পরস্পর আলাপ চালাতে পারি।

আর্ন্‌হলম্—(মুহূর্ত্ত-কাল চিন্তা করিয়া) আপনার যাত্রার মুখে সেই যে একবার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলুম—মানে, স্কিওলভাইকেনে শেষ-দেখার দিন পর্য্যন্ত—সত্যি, সে আজ অনেকদিন !

এলীডা—তখন আপনি যে আমাদের দেখ্‌তে আস্‌তেন, সেদিন থেকে আজ পুরো দশ বছর হবে।

আর্ন্‌হলম্—হাঁ, হবে। বাতি-ঘরের কথা আমার মনে পড়ে। সেই বুড়ো পাদ্রীটা আপনাকে হিদেন্ বলে ডাক্‌তো। কারণ আপানার বাবা আপনার নাম রেখেছিলেন একটি পুরানো জাহাজের নামে ;—ক্রীশ্চানোচিত নামকরণ আপনার নাকি হয়নি। এসব আপনার বাবার মুখেও শুনেছি।

এলীডা—হাঁ, তাতে কি ?

আর্ন্‌হলম্—সে-সময়ে আমি কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তুম না যে, আপনাকে এখানে বাঙ্গেল্-জায়া রূপে দেখ্‌তে হবে।

এলীডা—সে-সময়ে তো বাঙ্গেল্ আসেননি। সে-সময়ে যে এই মেয়েদের মা বেঁচে ছিলেন—তাদের আপন মা ;—তাই—

আর্ন্‌হলম্—না-না বল্‌ছি, যদি উনি না-ও থাক্‌তেন, যদি বাঙ্গেল্ অবিবাহিত-ও থাক্‌তেন—তবু কখনো ভাব্‌তে পারতুম না যে, এ রকমটি হবে।

এলীডা—আমি ত পারতুম না। সে-সময়ে কখ্‌খনো পারতুম না।

আর্ন্‌হলম্—বাঙ্গেল্ কিন্তু খুব ভালো লোক—গুরুগম্ভীর সদাশয় ব্যক্তি, সকলের সঙ্গেই ভাব।

এলীডা—(উচ্ছ্বসিত আবেগে) সে ঠিক।

আর্ন্‌হলম্—তবু যেন মনে হয়, আপনার সঙ্গে আগাগোড়া অমিল।

এলীডা—এটি খাঁটি কথা বলেছেন। সত্যি তাই।

আর্ন্‌হলম্—আচ্ছা তবে, এ কিসে হলো ? কেমন করে ঘট্‌লো ?

এলীডা—আঃ, ভাই ! ঐ কথা আমায় জিজ্ঞেস করো না। এ আমি তোমাকে বোঝাতে পার্‌বো না। যদিও বা বোঝাতে চেষ্টা করি তুমি এর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

আর্ন্‌হলম্—হুঁ ! (মৃদুকণ্ঠে) আপনার স্বামীর কাছে আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলেছেন কি ? আমার সেই ব্যর্থ আসক্তির কথা—যে আসক্তিকে আমি এককালে আস্‌কারা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছিলুম।

এলীডা—না গো, তুমি যার কথা বল্‌ছো সে-সম্বন্ধে একটি কথাও বলিনি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

আর্ন্‌হলম্—শুনে সুখী হলুম। এই ভেবে বিশ্রী লাগ্‌ছিলো যে,—

এলীডা—দরকার না থাকলে কেন বল্‌বো ? যা সত্য তা-ই শুধু তাঁকে বলেছি। বলেছি যে, তোমাকে খুব পছন্দ কর্‌তুম। সেখানে সকলের মধ্যে তুমিই আমার সেরা বন্ধু ছিলে।

আর্ন্‌হলম্—ধন্যবাদ সেজন্য। কিন্তু বলো দিকি, আমার চলে যাওয়ার পরে আমায় চিঠি লেখোনি কেন ?

এলীডা—ভাব্‌লুম, তোমার অনুরাগের আহ্বানে যে সাড়া দিতে পার্‌লো না, তার চিঠি তোমার কাছে মর্ম্মন্তুদ হবে। যে-বিষয়ের পুনরালোচনায় বিষাদ, তা বন্ধ হোক্ !

আর্ন্‌হলম্—হুঁ, তা বলেছো ঠিক।

এলীডা—কিন্তু তুমি লিখ্‌লে না কেন ?

আর্ন্‌হলম্—(স্মিতমুখে তাকাইয়া, অর্দ্ধ-তিরস্কারের সুরে) আমি আগে লিখ্‌বো ?

অতোখানি পরাভবের পর ফের নতুন করে আরম্ভ করার চেষ্টায় আছি বলে সন্দেহ করো আর কি।

এলীডা—থাক্ থাক্, আমি সবই বুঝি। এর পরে আর তুমি কোন বিবাহ-সম্বন্ধ পাতানোর কথা চিন্তা করোনি?

আর্ন্‌হলম্—নিশ্চয়ই না। আমার সেই প্রথম অনুরাগের স্মৃতি আজো হৃদয়ে জাগরুক।

এলীডা—(অর্দ্ধ বিদ্রূপের সুরে) বোকারাম! ও-ই বিষাদ-স্মৃতি নিয়ে আর কেন? আমি বলি, তুমি এখন বিয়ে করে সুখী হও।

আর্ন্‌হলম্—তবে আর দেরী কর্‌ছিনে, মিসেস্ বাঙ্গেল্। ভেবে দেখো—বল্‌তে লজ্জা করে, আমি এরই মধ্যে সাঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেছি!

এলীডা—তাহলে তো আরো তাড়াতাড়ি করা উচিত। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, নীচুস্বরে আবেগভরে) ভাই আর্ন্‌হলম্! এখন তোমায় বলি। সে-সময় আত্মরক্ষার জন্য তোমার কাছে ভাঙ্‌তে পারিনি।

আর্ন্‌হলম্—কি?

এলীডা—এই যে তুমি বল্‌ছিলে তোমার ব্যর্থ আসক্তির প্রশ্রয় দেওয়ার কথা। তখন তোমার ইচ্ছানুরূপ প্রতিদান দেওয়ার উপায় আমার ছিলো না।

আর্ন্‌হলম্—তোমার একমাত্র দেবার জিনিষ ছিলো বন্ধুতা। সে আমি জানি। ভালো করেই জানি।

এলীডা—কিন্তু তুমি জান্‌তে না যে, আমার মন-প্রাণ আমি একজনকে সমর্পণ করে দিয়েছিলুম।

আর্ন্‌হলম্—তখন-ই?

এলীডা—হাঁগো, তখন-ই।

আর্ন্‌হলম্—একী সম্ভব? তোমার সময়ের ভুল হচ্ছে। আমার মনে হয়, সে-সময়ে তুমি বাঙ্গেল্‌কে জানতেই না।

এলীডা—বাঙ্গেলের কথা বল্‌ছিনে।

আর্ন্‌হলম্—বাঙ্গেল্ নয়? কিন্তু সে-সময়কার স্কিওল্‌ভাইকেনে আর কাউকে তো জানিনে যাকে তুমি সম্ভবত ভালবাস্‌তে পারো।

এলীডা—আমার দুরদৃষ্টের কথা আর বলো কেন? সত্যি, এর সুরু থেকে শেষ অবধি এক দারুণ উদ্দামতার মধ্যে কেটে গেছে যেন।

আর্ন্‌হলম্—কি, কি শুনি?

এলীডা—এইটুকু বল্লেই হবে, আমি বাগদত্তা হয়েছিলুম।—জান্‌লে এখন?

আর্ন্‌হলম্—যদি বাগ্‌দত্তা না হতে—তবে?

এলীডা—তবে কি?

আর্ন্‌হলম্—তবে, আমার চিঠির উত্তর কিছু অন্য-রকম হতো?

এলীডা—কী করে বলি?—বাঙ্গেল্ যখন এলেন তখন তো উত্তর আমার অন্যরকমই হলো।

আর্ন্‌হলম্—তুমি বাগ্‌দত্তা ছিলে, একথা আমাকে খুঁটিয়ে বলার কিছু দরকার ছিলো?

এলীডা—(ভীত ও অস্থির ভাবে দাঁড়াইয়া) কারুর কাছে না বলে যে সোয়াস্তি পাইনে। না, না—উঠো না, বসো তুমি।

আর্ন্‌হলম্—স্বামীকে এ-সম্বন্ধে কিছু বলোনি?

এলীডা—তাঁকে গোড়ায়ই জানিয়েছি যে, একবার আমি আরেকজনকে ভালো-বেসেছিলুম। তিনি কখনো এর বেশী জান্‌তে চাননি। তারপর থেকে এ-নিয়ে আমাদের একটা কথাও হয়নি। আদতে, এ আমার পাগ্‌লামো বৈ তো নয়? তাই ওখানেই ওর ইতি হলো কিছুটা।

আর্ন্‌হলম্—(উঠিয়া) কিছুটা? সবটা নয়?

এলীডা—হাঁ গো, হাঁ। হায় ভগবান্! তুমি যা বুঝ্‌ছো তা নয়, ভাই। এ-ব্যাপার আগাগোড়া এমন দুর্ব্বোধ, তোমাকে তা কি করে বোঝাই—বলো। তুমি ভেবে বস্‌বে, আমি অসুস্থ ছিলুম নয়তো আস্ত পাগল হয়ে গেছ্‌লুম!

আর্ন্‌হলম্—লক্ষ্মিটি! আমায় সব খুলে বল্‌তে হবে, বলে দিচ্ছি।

এলীডা—আচ্ছা, বল্‌ছি তাহলে। বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে এমন লোককে বোঝানো ভারি কঠিন, যে—(চারিদিকে চাহিয়া মাঝখানে থামিয়া গেলেন।) রসো, একজন কে এলো।

(লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড রাস্তা দিয়া আসিতে-আসিতে বাগানে ঢুকিলেন। তাঁর বাটন্‌-হোলে ফুল, হাতে কাগজ-মোড়া রেশমী ফিতেয় বাঁধা একটা বড় ফুলের তোড়া। একটু আশ্‌পাশ্‌ করিয়া বারান্দার কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছেন।)

এলীডা—(কুঞ্জ হইতে) মিঃ লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড! মেয়েদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছো?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—(ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন) এই যে মাসীমা! আপনি ওখানে? (নতি করিয়া কাছে আসিলেন।) না; ওঁদেরকে নয়, আপনাকেই খুঁজ্‌ছি। মনে আছে, আশা করি, আমাকে এখানে এসে দেখা করার অনুমতি দিয়েছেন?—

এলীডা—হ্যাঁ, দিয়েছি বৈকি। যখন খুশী হয় এসো।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—আমার সৌভাগ্য যে, আজকের দিনে এখানে বিশেষ একটি অনুষ্ঠান—

এলীডা—তুমি জান্‌তে পেরেছো?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—হাঁ। তাই মিসেস্‌ বাঙ্গেল্‌-কে এটি উপহার দিতে এসেছি। (নতি করিয়া তোড়াটি হাতে দিবার উদ্যোগ করিলেন।)

এলীডা—(হাসিয়া) কিন্তু মিঃ লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড! এই সুন্দর ফুলগুলি কি তুমি মিঃ আর্ন্‌হলম্‌-কে উপহার দেবে না? কারণ, আজ যে তাঁরই—

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—(দোটানার মধ্যে উভয়ের দিকে তাকাইয়া) মাপ কর্‌বেন, আমার সঙ্গে এ-ভদ্রলোকের জানা নেই। আমি শুধু এই জন্মদিন উপলক্ষে এসেছি; মিসেস্‌ বাঙ্গেল্‌।

এলীডা—জন্মদিন? ভুল কর্‌ছো, মিঃ লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড। আজ তো এখানে কারুর জন্মদিন নয়।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—(দুষ্টু-হাসি হাসিয়া) তাই বুঝি! আমি তো জেনেই ফেলেছি। কিন্তু জান্‌তুম না যে, ব্যাপারটিকে অতো গোপন করা হবে।

এলীডা—কী জানো তুমি?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—আজ আপনার জন্মদিন।

এলীডা—আমার?

আর্ন্‌হলম্‌—(জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাইয়া) আজ নিশ্চয়ই নয়।

এলীডা—(লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ডের প্রতি) কি-করে জান্‌লে, শুনি?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—মিস্‌ হিল্ডে কথাটা বা'র্‌ করে দিলেন। একটু আগে একবার এখানে এসেছিলুম। ওঁদেরকে জিজ্ঞেস কর্‌লুম, কেন ফুল পতাকা এসব দিয়ে এ-স্থানকে অমন্‌ করে সাজাচ্ছেন ?

এলীডা—তারপর ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—তখন মিস্‌ হিল্ডে বল্লেন, "আজ যে মা'র জন্মদিন।"

এলীডা—'মা'র—ও বুঝেছি।

আর্ন্‌হলম্‌—ও! (তিনি ও এলীডা অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন।) এখন, যুবকটি যখন জেনেই ফেল্‌লেন—

এলীডা—(লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ডের প্রতি) এখন, যখন জেনেই ফেলেছো—

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—(আবার তোড়াটি তুলিয়া ধরিলেন) তবে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে অনুমতি দিচ্ছেন ?

এলীডা—(ফুলগুলি গ্রহণ করিয়া) আমিও প্রত্যভিনন্দন কর্‌ছি। কিছুক্ষণ বস্‌বে না, মিঃ লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড ? (এলীডা, আর্ন্‌হলম্‌ ও লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড কুঞ্জে আসন লইলেন।) এই জন্মদিন-পর্ব্ব আজ গুপ্ত রাখারই কথা ছিলো, মিঃ আর্ন্‌হলম্‌।

আর্ন্‌হলম্‌—বটে ? আমরা বহিরঙ্গরা উৎসবে বাদ পড়ে যাবো তাহলে।

এলীডা—(তোড়াটি রাখিয়া) যা বলেছো ;—বহিরঙ্গরা বাদ পড়্‌বে।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আমার কাছ থেকে এর বাষ্প-ও কেউ জান্‌তে পাবে না।

এলীডা—না হে, বিষয়টি তা নয়। যাক্‌, তুমি কেমন আছো ? আগের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে তো তোমায়।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—খুব ভালোই যাচ্ছে। যদি আগামী বছর দক্ষিণে যেতে পাই—

এলীডা—তুমি নাকি দক্ষিণ দেশে যাচ্ছো ?—মেয়েদের কাছে শুন্‌লুম।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—হাঁ। বার্গেনে আমার একজন হিতার্থী বন্ধু আছেন। আমার খুব যত্ন নেন্‌। আস্‌ছে বছর আমাকে অর্থ-সাহায্য কর্‌বেন, কথা দিয়েছেন।

এলীডা—এ রকম বন্ধু কোথায় পেলে ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—অদৃষ্টে জুটে গেলেন। একবার আমি তাঁর জাহাজে নাবিক হয়ে যাচ্ছিলুম—

এলীডা—সত্যি ? তোমার নাবিক হবার সাধ ছিলো ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—না, তা নয়। মা মারা যাওয়ার পর বাবা দেখ্‌লেন, আমার বাড়ীতে বসে থেকে লাভ নেই। তাই আমাকে নাবিকের কাজে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর বাড়ী ফেরার পথে ইংলিশ্‌ চ্যানেলে আমাদের জাহাজ-ডুবি, সেই থেকে আমারো অদৃষ্ট খুল্‌লো।

আর্ন্‌হলম্‌—মানে ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—এই জাহাজ-ডুবির সময় থেকেই আমার বুক একটু দুর্ব্বল। কারণ, ডাঙ্গায় তুলে আনবার আগে পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে পড়েছিলুম। সেই থেকে নাবিক হওয়া ছাড়লুম। অদৃষ্টও হাস্‌লেন।

আর্ন্‌হলম্‌—শুনি কি-রকম ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—দেখুন, দুর্ব্বলতাটা তেমন কিছু দুশ্চিকিৎস্য নয়। অথচ ভাস্কর হবার এতো-যে আগ্রহ আমার ছিলো, তা-ই এখন হতে পার্‌বো। একবার ভেবে দেখুন, আঙুলের সযত্ন স্পর্শে কাঁচা মাটি থেকে কেমন প্রতিমূর্ত্তি গড়ে তোলা যায় !

এলীডা—তুমি কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছো ?—মৎস্য-নর বা মৎস্য-নারী অথবা সেকেলে উত্তর সাগর-চর বোম্বেটে দল-টল্‌ কিছু ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—না ;—ওসব কিছু নয়। সুযোগ পেলেই একটা বড়-রকমের সৃষ্টি-কার্য্যে হাত দেবার ইচ্ছে আছে—যাকে বলে 'গ্রুপ্‌'।

এলীডা—কি বিষয় নিয়ে 'গ্রুপ্‌' ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—বিষয়টি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া।

আর্ন্‌হলম্‌—বলো কিহে ?—ও-হলে ঠিক পথই ধরেছো।

এলীডা—বিষয়টি তো বল্লে না।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—ব্যাপারটি হবে এ রকম : একজন তরুণ নাবিক অসাধারণ অশান্তির মধ্যে ঘুমুচ্ছে ; আর তার পত্নী স্বপ্নে বিভোর। এমনি গড়বো যে, দেখে মনে হবে—পত্নীটি ঠিক স্বপন্‌ দেখছে !

আর্ন্‌হলম্‌—আর কিছু থাক্‌বে ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড—আরেকটি তৃতীয় মূর্ত্তি থাক্‌বে, যাকে বলে 'অপচ্ছায়া'—তার স্বামী।

স্বামী যখন বিদেশে বেরিয়ে যায় তখন পত্নীটি ব্যভিচারিণী হলো ; সে-ও ইতিমধ্যে সাগরে ডুবে মারা গেল।

আর্ন্‌হলম্—অ্যা ?

এলীডা—সাগরে ডুব্‌লো ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—হাঁ, সাগর পেরোবার সময় ডুবলো। ঐখানটাই হবে সব চেয়ে অপরূপ। তখন রাত্রিকাল। ও যেন বাড়ী ফিরে এসেছে। পত্নীর শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মুখের পানে চেয়ে আছে। তার দাঁড়ানোটা হবে, যেন সদ্য সমুদ্দুর থেকে কেউ উঠে এলো—গা বেয়ে জল ঝর্‌ছে।

এলীডা—(চেয়ারে হেলান দিয়া) কী অদ্ভুত পরিকল্পনা! (চোখ বুজিয়া) চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট জীবন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি।

আর্ন্‌হলম্—কিন্তু, দুনিয়ায় এতো শত থাকৃতে শেষে—, আমি ভেবেছিলুম বুঝি, আপনার অভিজ্ঞতা থেকে গড়্‌বেন।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—হাঁ, অভিজ্ঞতা থেকে বৈকি—কতকটা অন্তত।

আর্ন্‌হলম্—লোকটিকে ডুবতে দেখেছেন ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—দেখুন, একেবারে সত্যি সত্যি চোখের আগে দেখলুম—তা বলিনে। তবু—

এলীডা—(ব্যস্তভাবে উৎসুক হইয়া) ঘটনাটি তুমি যদ্দূর জানো সবিশেষে বলো দিকিন্‌। কাহিনীটি আমায় আস্ত জানা চাই-ই।

আর্ন্‌হলম্—(ঈষৎ হাসিয়া) বটেই তো। এ তোমার চিন্তাধারার অনুকূল কিনা। সমুদ্রকে নিয়ে কাল্পনিক রঙ্গ-লীলার ছোঁয়াচ্‌ এতে পেয়েছো—আর যায় কোথা!

এলীডা—কি বল্লে, মিঃ লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড—বিবরণটি এই : একবার হ্যালিফেক্স্‌ সহর থেকে আমাদের পাল-ছাড়্‌লো বাড়ীর দিকে। যে পাল-রক্ষী তাকে হাঁসপাতালে রেখে আস্‌তে হয়েছিলো। তার যায়গায় একজন আমেরিক-কে বহাল করা হলো। এই নতুন রক্ষী—

এলীডা—কে—আমেরিক।

লিঙ্স্ট্রাণ্ড—হাঁ একদিন সে কাপ্তেনের কাছ থেকে একতাড়া পুরানো খবরের কাগজ চেয়ে আন্‌লে। এনেই অবিরাম পড়্‌তে সুরু করে দিলে। বল্লে যে, নরোজিয়ান্ শিখছে।

এলীডা—তারপর ?

লিঙ্স্ট্রাণ্ড—একদিন বিকেলে হঠাৎ ঝড় উঠ্‌লো। পাল-রক্ষী ও আমি বাদে মাঝি-মাল্লারা সবাই ডেক্-এ এসে দাঁড়ালো। রক্ষীর পা গেছ্‌লো মচ্‌কে। আর আমার মনটা ছিলো বড্ড খারাপ; তাই বার্থ-এ শুয়েছিলুম। পাল-রক্ষী ডেকের নীচে নাবিকদের কক্ষে বসে-বসে পুরানো খবরের কাগজ পড়ছিলো।

এলীডা—তারপর ?

লিঙ্স্ট্রাণ্ড—শান্ত ভাবে বসে-বসে পড়ছে, হঠাৎ তার যেন গোঙানি কানে এলো। তাকিয়েই দেখি তার মুখ খড়ির মতো সাদা হয়ে গেছে। কাগজ-খানাকে পিষে দলা কর্‌তে লাগ্‌লো; তারপর সহস্র টুক্‌রো করে ছিঁড়্‌লো। কিন্তু কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নেই।

এলীডা—কোন কথা বল্লে না ? মুখে কিছু বলেছিলো ?

লিঙ্স্ট্রাণ্ড—না, তক্ষুণি কিছু বলেনি। ক্ষণেক পরে আপন মনে বলে গেল, 'আমার অজান্তে আরেক জনকে বিয়ে করেছে।'

এলীডা—(চক্ষু বুজিয়া, যেন নিজের মনে-মনেই বলিতেছেন) তাই বল্লে ?

লিঙ্স্ট্রাণ্ড—হাঁ। বল্‌বি তো বল্ একেবারে বিশুদ্ধ নরোজিয়ান্ ভাষায়। বিদেশী ভাষা খুব সহজে শিখতে পার্‌তো নিশ্চয়।

এলীডা—তারপর কি হলো ?

লিঙ্স্ট্রাণ্ড—ঐখানটাই সব চেয়ে আশ্চর্য্য !—এ আমি যদ্দিন বাঁচ্‌বো কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌বো না। সে অচঞ্চল ভাবে বল্লে, 'তবু ও আমার, আর আমারি হয়ে ও চিরকাল থাক্‌বে। গিয়ে আমি ওকে নিয়ে আস্‌বো—এই নীল সাগরে ডুবে না মরে যদি বেঁচে থাকি। ওকে আমার অনুগামিনী হতেই হবে।'

এলীডা—(এক গ্লাস্ জল ঢালিয়া লইতেছেন, হাত কাঁপিতেছে) উঃ। কী হাওয়া।

লিঙ্স্ট্রাণ্ড—কথাগুলি এমন জোর দিয়ে বল্লে, মনে হলো—যা বল্ছে সে কর্বেই।

এলীডা—লোকটার পরে কি হলো, কিছু জানো ?

লিঙ্স্ট্রাণ্ড—মাসীমা, সে আর নিশ্চয়ই বেঁচে নেই।

এলীডা—(তৎক্ষণাৎ) কেন বলো তো ?

লিঙ্স্ট্রাণ্ড—কারণ, তার পরেই চ্যানেলে আমাদের জাহাজ-ডুবি। বড় নৌকোটায় কাপ্তেন ও আরো পাঁচ জনের সঙ্গে আমি উঠ্লুম। ল্যাংবোটে কাপ্তেন-সঙ্গীটি উঠ্লেন ; আমেরিক-ও ওখানে ছিলো ; আরো একটি লোক।

এলীডা—সেই থেকে আর কোনো খবর নেই ?

লিঙ্স্ট্রাণ্ড—না, যে-বন্ধুটি আমার তত্ত্ব নেন্, সম্প্রতি একখানা চিঠিতে তাইতো আমাকে জানিয়েছেন। এই জন্যে আরো এটাকে শিল্প-বস্তু করে তোলার স্পৃহা আমার বেড়ে গেছে। আমি যেন জল্জ্যান্ত দেখ্তে পাচ্ছিঃ কলঙ্কিণী নাবিক-রমণী আর সেই প্রতিশোধ-কাম লোকটি—সমুদ্রে ডুবেও যে বাড়ী ফিরে এলো! দু'জনকেই স্পষ্ট দেখ্ছি।

এলীডা—আমিও দেখ্ছি। (উঠিলেন) চলো, ভেতরে যাই। নয়তো বাঙ্গেলের কাছে যাওয়া যাক্। যা গরম—দম আট্কে যায় যেন। (কুঞ্জের বাহিরে চলিয়া যাইতেছেন।)

লিঙ্স্ট্রাণ্ড—(ঝট্পট্ দাঁড়াইয়া) আমাকে মাপ কর্বেন কিন্তু। জন্মদিন উপলক্ষেই শুধু অল্পক্ষণের জন্যে দেখা কর্তে এসেছিলুম।

এলীডা—বেশ, বেশ (তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া)। ফুলগুলোর জন্যে ধন্যবাদ। (লিঙ্স্ট্রাণ্ড নতি করিয়া বাগানের দেউড়ি দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।)

আর্ন্‌হলম্—(প্রত্যুত্থান করিয়া এলীডার নিকটবর্ত্তী হইলেন) মিসেস্ বাঙ্গেল্, গল্পটা তোমার কাছে হৃদয়স্পর্শী বলে' মনে হচ্ছে।

এলীডা—ঠিক। যদিও—

আর্ন্‌হলম্—তা বেশ তো। যা অবশ্যম্ভাবী তার বাড়া তো কিছু ঘটেনি?

এলীডা—(বিস্ময়-দৃষ্টি) এই বুঝি অবশ্যম্ভাবী?

আর্ন্‌হলম্—আমার কাছে তো তাই মনে হয়।

এলীডা—সে আবার ফিরে এলো! মৃত্যু থেকে জীবন পেলে!—এসব অবশ্যম্ভাবী?

আর্ন্‌হলম্—ও! এই কথা! তুমি এখনো ঐ পাগলা ভাস্করের সাগর-গল্পের কথাই ভাব্‌ছো?

এলীডা—আর্ন্‌হলম্, যাই বলো না কেন—কে-জানে, একেবারে অলীক না-ও হতে পারে।

আর্ন্‌হলম্—সেই মগ্ন লোকটি সম্বন্ধে আবোল্-তাবোল্ কথা শুনে দুঃখু কর্‌তে লাগ্‌লে? আমি ভেবেছি কিনা—

এলীডা—কি?

আর্ন্‌হলম্—আমি সোজাসুজি ভাব্‌লুম যে, অনর্থক তুমি এখানে বসে ভেবে আকুল হচ্ছো;—কারণ, বাড়ীর উৎসবের খবর তোমার কাছে গোপন করা হয়েছে। যে স্মৃতি-উৎসবে তোমার স্বামী ও স্বামী-পুত্রীরা যোগ দিচ্ছেন, সেখানে তোমার অধিকার নেই বলে'।

এলীডা—না-না-না। ওতে দোষ কিচ্ছু নেই। স্বামীকে অখণ্ড রূপে শুধু আমার করে পাবার কোনো অধিকার আমার নেই।

আর্ন্‌হলম্—আমি বলি, আছে।

এলীডা—হাঁ, আছে, আবার নেই-ও। আমারো তো একটা অংশ আছে, যেখান থেকে তারা বাদ পড়ে গেছে।

আর্ন্‌হলম্—কী! (নীচুস্বরে) তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাসো না?

এলীডা—আরে, তা কেন? সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁকে ভালোবাস্‌তে শিখেছি।

সেইজন্যেই যে আরো ভয়ানক।—এতো রহস্যময়, কিছুতেই বোঝানো যায় না।

আর্নহলম্—তাহলে তোমার দুঃখকষ্টের সব কথা আমাকে বল্‌তেই হবে। বল্‌বে বলো, মিসেস্ বাঙ্গেল্!

এলীডা—না বন্ধু, পারিনে। এখন নয় অন্তত। দেখি যদি পরে—

(বোলেত্ দরদালানে বাহির হইয়া বাগানে নামিয়া আসিলেন।)

বোলেত্—বাবা অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। সবাই মিলে বস্‌বার ঘরে গেলে ভালো হয় না?

এলীডা—হাঁ, চলো।

(নব পরিচ্ছদে বাঙ্গেল্ হিল্ডেকে লইয়া বাড়ীর পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিতেছেন।)

বাঙ্গেল্—ব্যস্—এইবার বলো কি কর্‌তে হবে। এসো না, কিছু সরবৎ-টরবৎ খাওয়া যাক্।

এলীডা—ওগো, একটু অপেক্ষা করো।

(কুঞ্জে গিয়া তোড়াটি আনিলেন।)

হিল্ডে—বাঃ! কী সুন্দর ফুল! কোত্থেকে আন্‌লে?

এলীডা—ভাস্কর লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড দিয়ে গেলো।

হিল্ডে—(চমকিত) লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড?

বোলেত্—(আশ্‌পাশ্ করিয়া) লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড ফের এসেছিলেন?

এলীডা—(অল্প হাসিয়া) হাঁ। এই ফুলগুলি নিয়ে এলো—জন্মদিন উপলক্ষে। জানিস্?

বোলেত্—(হিল্ডের দিকে তাকাইয়া) ও!

হিল্ডে—(বিড়্‌বিড়্ করিয়া) কী বোকা!

বাঙ্গেল্—(ব্যথিত বিক্ষুব্ধ ভাবে এলীডার প্রতি) হুঁ, দেখো এলীডা, লক্ষ্মিটি! তোমাকে বলা-ই হয়নি—

এলীডা—(বাধা দিয়া) আয় তো বাছারা! এই ফুলগুলি অন্যান্য ফুলের সঙ্গে ভিজিয়ে রেখে আসিগে। (বারান্দায় উঠিলেন।)

বোলেত্—(হিল্ডেকে) দেখ্‌লি ? ভেতরে-ভেতরে খুব ভালো।

হিল্ডে—(নীচুস্বরে রাগত ভাবে) ভড়ং ! বাবাকে ঠকানোর ফন্দি যতো।

বাঙ্গেল্—(বারান্দায় উঠিয়া এলীডার করতলে চাপ দিয়া) সাধু সাধু। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এজন্যে, ডীয়ার।

এলীডা—(ফুলগুলি সাজাইতে-সাজাইতে) কী যে বলো ! এদের মা'র জন্মদিনে আমার কর্ত্তব্য নেই ?

আর্ন্‌হলম্—হুম্। (বাঙ্গেল্ ও এলীডার নিকটবর্ত্তী হইলেন। বোলেত্ ও হিল্ডে নীচে বাগানে রহিয়া গেলেন।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলকুমার দেব

ইব্‌সেনের "The Lady from the sea" হইতে অনুদিত

সম্রাট অশোকের শিলালিপি

তৃতীয় শিলানুশাসন

গিরনার।

(ক) দেবানংপিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ—

(খ) দ্বাদস-বাসাভিসিতেন ময়া ইদং আঞাপিতং :—

(গ) সর্বত বিজিতে মম যুতা চ, রাজুকে চ, প্রাদেসিকে চ পংচসু পংচসু বাসেসু অনুসংযানং নিযাতু; এতায়েব অথায়—ইমায় ধংমানুসস্টিয় যথা অঞায় পি কংমায়,—

(ঘ) "সাধু মাতরি চ পিতরি চ সুস্রূসা; মিত্র-সংস্তুত-ঞাতীনং বাম্হণ-সমণানং সাধু দানং; প্রাণানং সাধু অনারম্ভো; অপ-ব্যয়তা অপ-ভাডতা সাধু।"

(ঙ) পরিসা পি যুতে আঞপয়িসতি গণনায়ং হেতুতো চ ব্যংজনতো চ।

অনুবাদ।

(ক) দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এরূপ বলিতেছেন—

(খ) (আমার) অভিষেকের দ্বাদশ বর্ষ পরে আমার দ্বারা এইরূপ আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল :—

(গ) আমার বিজিতের (রাজ্যের) সর্ব্বত্র যুক্ত(গণ), রাজুক(গণ) এবং প্রাদেশিক(গণ)* (প্রতি) পাঁচ বৎসর পর পর (তাঁহাদের অধিকার ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র) ভ্রমণে বাহির হইবেন; (তাঁহারা) এই উদ্দেশ্যে (ভ্রমণে বাহির

* ইঁহারা বিভিন্ন পদস্থ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

হইবেন)—এই ধর্ম্মানুশাস্তির (ধর্ম্মোপদেশ প্রচারের) জন্য এবং অন্যান্য কর্ম্মের জন্য—(যথা),

(ঘ) "মাতা পিতার শুশ্রূষা (আজ্ঞাপালন করা) সাধু; মিত্র-সংস্তুত (পরিচিত ব্যক্তি)-জ্ঞাতিদিগকে ও ব্রাহ্মণ-শ্রমণদিগকে দান করা সাধু; প্রাণীবধ না করা সাধু; অল্প ব্যয় করা ও অল্প ভাণ্ড (দ্রব্যসামগ্রী, সম্পত্তি) থাকা সাধু।

(ঙ) (মন্ত্রী)-পরিষদ্ ও যুক্ত (রাজকর্ম্মচারী বিশেষ) গণকে (এই আজ্ঞাগুলি) হেতুতঃ (কি কারণে ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা দেখাইয়া) ও ব্যঞ্জনতঃ (আক্ষরিকভাবে) গণনা করিতে (নিজ নিজ দপ্তরে যথা-বিধি রক্ষা করিতে, to file, to register, to record) আজ্ঞা দিবেন।

টিপ্পনী।

(খ) কলিঙ্গ-বিজয়ের পর হইতে অশোকের ধর্ম্মভাব প্রবল হয় এবং তাহার কিছুদিন পর হইতে তিনি লোকহিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কলিঙ্গ-বিজয় ঘটিয়াছিল অশোকের অভিষেকের আট বৎসর পর। অতএব অশোক যখন এখানে নিজেকে "দ্বাদশবর্ষাভিষিক্ত" বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন তখন এই অনুশাসনোক্ত আজ্ঞাগুলি তিনি কলিঙ্গ-বিজয় ও তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান-আরম্ভের ৪ বৎসরের মধ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

(গ) এখানে "যুক্তগণ" বহুবচনে কিন্তু "রাজুক" ও "প্রাদেশিক" একবচনে আছে, শেষ দুইটিও বহুবচনে থাকা উচিত ছিল। যুক্ত=উচ্চ রাজকর্ম্মচারী বিশেষ, কৌটিল্যও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলভী অনুশাসনে "আযুক্তক" ও "বিনিযুক্তক" নামক উচ্চরাজকর্ম্মচারীদের উল্লেখ আছে। "রাজুক"= Revenue বা Settlement Officer, জমি মাপিবার রজ্জু হইতে নামটির উদ্ভব হইয়াছে। "প্রাদেশিক"="মহামাত্র"-শ্রেণীর উচ্চ কর্ম্মচারী (তু. ১ম স্বতন্ত্র অনুশাসন, ধউলি, য—চচ); রাজতরঙ্গিনী ৪।১২৬ "প্রাদেশিকেশ্বর"-এর উল্লেখ আছে। "প্রাদেশিক" বোধ হয় প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন,

যদিও প্রদেশ বলিতে আমরা বাংলা, বিহার প্রভৃতি যে আকারের ভূখণ্ড বুঝি, অশোকের যুগের প্রদেশ তাহার চেয়ে ছোট ছিল।

(ঙ) পরিষদ্ = মহমোত্র (মন্ত্রী)-পরিষদ্, তু. ৬ষ্ঠ শিলানু°, চ। কৌটিল্যও "মন্ত্রী-পরিষদের" উল্লেখ করিয়াছেন। "ব্যঞ্জনতঃ", তু. সারনাথ ছোট স্তম্ভ-লিপি, ঝ, ঞ।

ইহাতে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে অশোকের যুগে রাজদপ্তরে Statute Book-এর মত records থাকিত।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

অহিংসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সদানন্দ ভাবে : আমি নিজে যে কি সাধনা করছি, আমি নিজে তা জানি না কেন? সাধনার কোন স্তরে আমি পৌঁছেছি আমার চেয়ে মহেশ চৌধুরী তা বেশী জানে কেন? ব্যাপারখানা কি?

নিজের কাছে ফাঁকি খুব ভালরকমই চলে কি না, সদানন্দ তাই ভাবিয়া পায় না ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় কি ভাবে কোন্ সাধনাটা সে কবে করিয়াছে। আসন করিয়া অনেক সময় বসিয়া থাকিয়াছে বটে, আবার অনেক সময় বসিয়া থাকেও নাই। কিন্তু আসন করিয়া বসিয়া থাকিলেই কি সাধনা হয়, আর কোন রীতিনীতি নিয়ম কানুন সাধনের নাই? আসন করিয়া বসিয়াই থাক আর বিছানায় চিৎ হইয়া পড়িয়াই থাক, চিন্তা সে যে একরকম সব সময়েই করে, জীবনের তুচ্ছতম বিষয়টির মধ্যে রহস্যময় দুর্ব্বোধ্যতা আবিষ্কার করা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট রহস্যগুলির ফাঁকি ধরিয়া ফেলা পর্য্যন্ত নানা ধরণের বিচিত্র চিন্তায় মসগুল হইয়া সে যে দিন কাটাইয়া আসিতেছে, এটা তার খেয়ালও হয় না। দিনের পর দিন নিজেকে নতুন চেনায় চিনিয়াছে, আবার নতুন অচেনায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারটাকে সদানন্দ সাধারণ বাঁচিয়া থাকার পর্য্যায়েই ফেলে। এক একজন মানুষ থাকে যারা ঘরে বসিয়া এলোমেলো লেখাপড়া করে, আগে শেষ করে দ্বিতীয়ভাগ তারপর ধরে প্রথমভাগ, জ্ঞান হয়তো তাদের জমা হয় অনেক ডিক্রীধারী নামকরা জ্ঞানীর চেয়ে বেশী, কিন্তু জ্ঞান বলিয়া কিছু যে তারা সংগ্রহ করিয়াছে এ ধারণাটাই তাদের মনে আসে না। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া যেখানে উঠিতে হয়, বাঁশের খুঁটি বাহিয়াও যে সেইখানেই উঠিয়া পড়িয়াছে, উঠিবার পরেও অনেকে তা বিশ্বাস করিতে চায় না। সাধুসন্ন্যাসীর যোগ সাধনার বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ হইলেও বরং কথা ছিল, এসব যে ছেলেখেলা নয় সদানন্দ তা ভাল করিয়াই জানে। নিজের অজ্ঞাতসারে সাধনার

পথে অগ্রসর হইয়া চলা এবং কঠিন ও বিপজ্জনক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছানো যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে কোনমতেই তার মাথায় ঢুকিতে চায় না।

রাত দুপুরে ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া মহেশ চৌধুরীকে ডাকিয়া পাঠায়।

'ভয় করছে প্রভু ?'

প্রশ্ন শুনিবামাত্র সদানন্দ টের পায়। এতক্ষণ ভয়ই করিতেছিল বটে। একটা দুর্ব্বোধ্য বীভৎস আতঙ্ক মনের মধ্যে চাপিয়া বসিয়াছে।

তবু সাহস করিয়া সদানন্দ বলে, 'তুমি ভুল করছ মহেশ। আমি তো কোনদিন সাধন ভজন কিছু করিনি।'

'রাত দুপুরে জেগে বসে এই যে হিসাব করছেন সাধনভজন কিছু করেছেন না কি, এটা কি প্রভু ?'

সদানন্দ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

জোড়হাতে সবিনয়ে মহেশ চৌধুরী সদানন্দকে নানারকম উপদেশ দেয়। সদানন্দ নিজে কেন জানে না সে সাধক ? কেন জানিবে! সাধক যে নিজেকে সাধক বলিয়া জানে, সেই জানাটা কি, সদানন্দ কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছে ? অনন্যসাধারণ প্রক্রিয়াগুলি ওই জ্ঞানের জন্ম দেয় আর যতদিন সাধক ওই জ্ঞানকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে না পারে ততদিন সিদ্ধিলাভের কোন ভরসাই থাকে না। সদানন্দের জানিবার তো কোন কারণ ঘটে নাই যে সে সাধনা করিতেছে, প্রক্রিয়া সে ঠিক করিয়া গিয়াছে নিজে, ও সব তার কাছে বাঁচিয়া থাকারই অঙ্গস্বরূপ। তা ছাড়া, যে রকম সাধনা সে কোনদিন করে নাই লোকের কাছে নিজেকে সেইরকম সাধক বলিয়া পরিচিত করার ফলে মনে মনে একটা তার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, সাধনার ব্যাপারে সে ফাঁকিবাজ। আসলে কিন্তু—

'আমি যে ফাঁকিবাজ তাও দেখছি তুমি জানো, মহেশ ?'

'ফাঁকিবাজ তো আপনি নন প্রভু।'

সদানন্দ চটিয়া বলে, 'এই বলছ লোককে ফাঁকি দিই, সঙ্গে সঙ্গে আবার বলছ ফাঁকিবাজ নই, তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি না মহেশ।'

'আজ্ঞে, দশজনকে জানিয়েছেন, আপনি সাধু—তাতে তো ফাঁকিবাজির

কিছু নেই। দশজনের ভালর জন্য নিজেকে সাধু ঘোষণা করাও সাধু ছাড়া অন্যের দ্বারা হয় না প্রভু। নিজের জন্য তো চান নি, লোকে সাধু ভাবুক অসাধু ভাবুক আপনার বয়ে গেল।'

সদানন্দ সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, 'নিজের জন্য চেয়েছিলাম কিনা কে জানে!'

'না, প্রভু, না। তাই কি আপনি পারেন।'

খানিক পরে প্রকারান্তরে সদানন্দ মহেশ চৌধুরীকে এখানে শুইয়া থাকার অনুরোধ জানায়, কিন্তু মহেশ রাজী হয় না। বলে যে, ভয়কে এড়াইবার চেষ্টা করিলে তো চলিবে না, ভয়কে জয় করিতে হইবে।

মহেশ চৌধুরীর তুলনায় নিজেকে সদানন্দের অপদার্থ মনে হয়।

গভীর হতাশায় মন ভরিয়া যায়, রাগের জ্বালায় দেহের মধ্যে কি যেন সব পুড়িয়া যাইতে থাকে। মহেশ চৌধুরী বাঁচিয়া থাকার কোন মানে হয় না, এই ধরণের উদ্ভট চিন্তা অসংখ্য খাপছাড়া কল্পনার আবরণে আসিয়া ভিড় করে। ক্রমে ক্রমে একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার সে লক্ষ্য করে। মহেশ চৌধুরীর একটা বড় রকম ক্ষতি করার চিন্তাকে ভাল করিয়া প্রশ্রয় দিলেই হঠাৎ নিজেকে যেন তার সুস্থ মনে হইতে থাকে, দেহ মনের একটা যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থ অবস্থা যেন চোখের পলকে জুড়াইয়া যায়। যে আতঙ্কময় ফাঁপর ফাঁপর ভাবটা আজকাল তাকে থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে, আর যেন তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। মহেশ চৌধুরীকে মনে মনে হিংসা করিবার সময়টা জাগ্রত স্বপ্নের প্রভাব হইতে সে মুক্তি পায়, মাথার ঝিমঝিমানি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বাতাসে ভাসিয়া বেড়ানোর বদলে হঠাৎ যেন শক্ত মাটিতে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া টের পায়।

মহেশ চৌধুরীকে তীব্রভাবে ঘৃণা করিয়া, দশজনের কাছে তাকে হীন প্রতিপন্ন করার সম্ভব অসম্ভব মতলব আঁটিয়া আর নিজেকে তার চেয়ে ছোট মনে করার প্রতিক্রিয়ায় জর্জ্জরিত হইয়া গিয়া সদানন্দ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। অন্ততঃ তার তাই মনে হয়। ভয়টা যে এড়ানো যায়, রক্ত চলাচল শ্লথ করিয়া দেওয়ার মত উত্তেজনাবিহীন সর্ব্বগ্রাসী ভয়, তাও কি কম? মহেশ চৌধুরী

অবশ্য ভয় এড়ানোর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ও এসব ব্যাপারের কি বোঝে, কি দাম আছে ওর উপদেশের? সদানন্দকে উপদেশ দিতে আসে, স্পর্দ্ধাও কম নয় লোকটার!

দিন কাটিয়া যায়। মহেশ চৌধুরী শান্ত চোখে সদানন্দের চালচলন আর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে! মুখখানা যেন তার দিন দিন অল্পে অল্পে বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া উঠিতে থাকে।

একদিন মহেশ চৌধুরী বলেন, 'প্রভু?'

সদানন্দ একটা শব্দ করে, যেটা জবাব হিসাবেও ধরা যায়, আবার অবজ্ঞা হিসাবেও ধরা যায়।

'আর এগোতে পারছেন না প্রভু, না?'

'কিসের এগোতে পারছি না? কে বললে তোমাকে এগোতে পারছি না?'

মহেশ চৌধুরীর চোখ ছল ছল করিতে থাকে, 'এগোতে না পারলে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন, পিছিয়ে আসছেন কেন প্রভু? এখন পিছু হটতে সুরু করলে কি আর উপায় আছে! প্রথমটা একটু ভাল লাগে, কিন্তু দুদিন পরে নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছা হবে। এমন যন্ত্রণা পাবেন এখন তা ভাবতেও পারবেন না।'

'তোমার উপদেশ বন্ধ কর তো মহেশ।'

'উপদেশ নয়, কথাটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। নিজেই বুঝে দেখুন, কি বিপদ ঘটাচ্ছেন নিজের।'

সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও সদানন্দ কিছু কিছু বুঝিতে পারে। মহেশ চৌধুরীর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পালানোর এরকম জোরালো ইচ্ছা আগে তার হইত না এবং মহেশ চৌধুরীর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার কাজে এতটা শক্তিক্ষয়ও করিতে হইত না! নূতন একটা অনুভূতি আজকাল তার কাছে ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের জীবনের ব্যর্থতার অনুভূতি। অনুভূতিটা একেবারে নূতন, এ পর্য্যন্ত চাপা পড়া সঙ্কেতের মতও কোনদিন অনুভব করে না। মানুষের জীবনের ব্যর্থতার কথা অবশ্য সে অনেক ভাবিয়াছে, মাঝে মাঝে গভীর বিষাদে হৃদয় ভরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে যেন ছিল অন্য জিনিষ। রোগে শোকে একজন মানুষকে কষ্ট পাইতে দেখিলে সহানুভূতির মধ্যে যে বিষাদ জাগিত,

সমস্ত মানুষের জীবনের মূল্যহীনতা জাগাইয়া তুলিত সেই বিষাদ। কিন্তু এখন সে যা অনুভব করে সেটা যেন ঠিক বিষাদ নয়। মানুষের বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ নাই, তার নিজের জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত লোক বাঁচিয়া ছিল তাহাদের জীবনও ব্যর্থ এবং ভবিষ্যতে যত লোক পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে তাদের জীবনও ব্যর্থ—কিন্তু তাতে যেন কিছু আসিয়া যায় না। ব্যর্থতার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর নাই, জীবনের প্রতিকারহীন জীবনব্যাপী ব্যর্থতা—। অথচ তাও যেন সদানন্দের কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বিকার ভোঁতা একটা ক্ষোভ শুধু সে অনুভব করে। জ্বর আসিবার আগে শরীর ম্যাজ ম্যাজ করার মত এটা কি ভয়ানক কিছুর সূচনা?—মহেশ চৌধুরীর আলোচনা এই প্রশ্ন আর ভয় তার মধ্যে জাগাইয়া দেয়।

মহেশ চৌধুরীর ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে যেন কমিয়া আসিতে থাকে। জোড়-হাতে ছাড়া সদানন্দের সঙ্গে সে একরকম কথাই বলিত না, আজকাল হাত জোড় করিতে ভুলিয়া যায়। প্রভু শব্দটাও তার মুখে শোনা যায় কদাচিৎ। মহেশ চৌধুরীর ভক্তি শেষের দিকে সদানন্দকে বিশেষ কিছু তৃপ্তি দিত না, কিন্তু ভক্তির অভাব ঘটায় আজকাল তার ভয়ানক রাগ হয়।

সভায় কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দ্যাখে। মহেশ চৌধুরীর মত অন্য সকলের ভক্তি শ্রদ্ধাও কি কমিয়া গিয়াছে? এতকাল যাদের সে শিশু মনে করে আসিয়াছে, মতামত নিয়া কোনদিন মাথা ঘামায় নাই, আজকাল তাদের তাকানোর ভঙ্গিতে অনুকম্পা আর অবজ্ঞা আবিষ্কার করিয়া বুকের মধ্যে হঠাৎ তার ধড়াস্ করিয়া ওঠে। কি করিয়াছে সে? কার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে? কার সঙ্গে কিসের বাধ্য-বাধকতায় সে আটক পড়িয়া গিয়াছে? দেহবাদী এইসব অপদার্থ মানুষ কেন তাকে সর্ব্বদা ইঙ্গিত করিতেছে: আমরা কাপুরুষ, কি হে মহাপুরুষ, তোমার চেয়ে কত সুখেই আমরা বাঁচিয়া আছি!

নিছক ভাবপ্রবণতা? যে জিনিষটা চিরদিন সে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে? বুঝিয়াও সদানন্দ যেন বুঝিতে পারে না। কোনটা মনের দুর্ব্বলতা জানিবার পরেও সেটাকে দমন করা যে এমন কঠিন ব্যাপার এতকাল তার জানা ছিল না। আগে ঘরের কোণে নিজের ছেলেমানুষীর কথা ভাবিয়া তার হাসি পাইত,

এমন তুচ্ছ একটা বিষয়কে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে কেন ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইত---আজকাল ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দেওয়ার দুর্ভাবনায় মাথা যেন তার ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম করে। হাত পা নাড়ায় বাধা দিলে শিশু যেমন ক্ষেপিয়া যায়, ছেলেমানুষীকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া সদানন্দের সেইরকম উন্মাদের মত আর্ত্তনাদ করিতে ইচ্ছা যায়।

একবার বিপিন আসিয়া বলে, 'তোর চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে সদা।'

সদানন্দ রাগিয়া বলে, 'গেছে তো গেছে, তোর কি?'

বিপিন উদাস ভাবে বলে, 'আমার আবার কি! তুই মরলেই বা আমার কি।'

ফিরিয়া যাওয়ার সময় মহেশ চৌধুরীর সঙ্গে বিপিনের দেখা হয়। বিপিন হাসিয়া বলে, 'সাধুজীকে খেতে দেন না নাকি? মুখের চামড়া যে কুঁচকে যেতে আরম্ভ করেছে মশায়?'

মহেশ চৌধুরী বলে, 'না খেলে কি মুখের চামড়া কুঁচকে যায় ভাই? নিজের মনকে কুঁচকে দিচ্ছেন, মুখের চামড়ার কি দোষ!' বিষণ্ণভাবে মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়ে, 'অনেক আশা করেছিলাম, সব নষ্ট হয়ে গেল। কি খেলাই যে ভগবান খেলেন! এমন একটা মানুষ আমি আর দেখিনি বিপিন বাবু, অবতার বলা চলত। কি যে হল, নিজেকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছেন।'

বিপিন অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী আবার বলে, 'গুরুর নির্দ্দেশ মেনে সারা জীবন প্রাণপাত করে বড় বড় যোগী ঋষি যে স্তরে উঠতে পারেন না, উনি নিজের স্বাভাবিক প্রেরণায় বিনা চেষ্টায় সেই স্তরে পৌছেছিলেন। এক একবার আমি ভাবি কি জানেন, আমিই ভুল করলাম নাকি? আমি সচেতন করিয়ে দিয়েছি বলে কি বিগড়ে গেলেন? যেমন অবস্থায় ছিলেন তেমনি অবস্থায় থাকলে হয় তো নিজের চেষ্টায় আপনা থেকে সামলে এগিয়ে চলতেন।'

মহেশ চৌধুরীর আপশোষ দেখিয়া বিপিন আরও অবাক হইয়া যায়। এতকাল লোকটাকে একটু পাগলাটে বলিয়া তার ধারণা ছিল, আজ হঠাৎ যেন ধারণাটা নাড়া খায়। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী আবার

বলে, 'এসব লোকের মধ্যে প্রচণ্ড তেজ আর শক্তি থাকে। যেই জেনেছেন সাধনার পথে এগোতে হবে, অমনি বিদ্রোহ করে বসেছেন। সামনে এগিয়ে দেবার জন্য আমি একটু আধটু ঠেলা দিয়েছি বলেই বোধ হয় রাগ করে পিছু হটতে আরম্ভ করেছেন। কি সর্ব্বনাশটাই আমি করেছি বিপিনবাবু ?'

'যা করেছেন ভাল উদ্দেশ্যেই তো করেছেন।'

'তবু আমার ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করাই হয় তো উচিত ছিল।'

দিন দশেক পরে মহেশ চৌধুরী একদিন সকালে বিপিনের আশ্রমে গেল। বিপিন আশ্রমে ছিল না, উমা আর রত্নাবলী মহেশকে আদর করিয়া বসাইল। আজকাল মহেশ চৌধুরীর সম্মান বাড়িয়াছে—মাধবীলতা তার ছেলের বৌ।

রত্নাবলী বলিল, 'আপনার ওখানে এবার আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিন ?'

মহেশ হাসিয়া বলিল, 'আমাদের ওখানে কি কারও থাকবার ব্যবস্থা আছে ?—গিয়ে থাকতে হয়।'

উমা বলিল, 'আমাদের যেতে দিতে আপনি আপত্তি করছেন কেন বুঝতে পারি না।'

'আপত্তি ? আপত্তি কিসের ! তবে কি জানেন, আপনারা গেলে বিপিনবাবু রাগ করবেন কিনা তাই আপনাদের নিয়ে যাইনি।'

'বিপিনবাবু রাগ করবেন বলে ইচ্ছে হলেও আমরা কোথাও যেতে পারব না ! আমরা কি বিপিনবাবুর কয়েদী নাকি ?'

'উঁহুঁ, তা কেন হবেন। আপনাদের ইচ্ছে হলে আপনারা যেখানে খুসী যাবেন, কিন্তু আমার কি নিয়ে যাওয়া উচিত ? সেরকম ইচ্ছেও আপনাদের হয়নি যাওয়ার, হলে আপনারা নিজেরাই যেতেন, জোর করে যেতেন।'

'থাকতে দিতেন গেলে ?'

'থাকতে দিতাম বৈকি।'

রত্নাবলী একটু খোঁচা দিয়া বলিল, 'কিন্তু বিপিনবাবু যে রাগ করতেন ?'

মহেশ সহজভাবেই বলিল, 'রাগ করলে কি আর করতাম বলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাইনি, আপনারা নিজের ইচ্ছায় গিয়েছেন, তাতেও যদি বিপিনবাবু রাগ করতেন—করতেন।'

'আপনি আশ্চর্য্য মানুষ।' উমা বলিল।

'উচিত অনুচিত জ্ঞানটা আপনার যেন একটু বেশী রকম সূক্ষ্ম। সব ব্যাপারেই কি এমনি করে বিচার করেন?' রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

'বিবেক বড় কামড়ায় কিনা, বিচার না করে উপায় কি? বিবেকের কামড় এড়াবার এত সহজ উপায় থাকতে জেনে শুনে সাধ করে কামড় খাওয়া কি বোকামি নয়?'

'জীবনটা একঘেয়ে লাগে না আপনার?' রত্নাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

'কেন, একঘেয়ে লাগবে কেন? সবাই বিচার করে কাজ করে, আমিও করি। অন্য দশজনে নিজের নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মত কর্ত্তব্য ঠিক করে, আমিও তাই করি। কেউ জেনে শুনে ভুল করে, কেউ বুদ্ধির দোষে ভুল করে, কেউ কেউ আবার ভুল করছে কি না করছে গ্রাহ্যও করে না। আমি একটু চালাক মানুষ কিনা তাই সব সময় চেষ্টা করি যাতে ভুল না হয়। তবু আমিও অনেক ভুল করে বসি। আমার যদি একঘেয়ে লাগে, তবে পৃথিবীর সকলেরি একঘেয়ে লাগবে।'

'আপনিও তবে ভুল করেন?'

'করি না? মারাত্মক ভুল করে বসি। সাধুজীকে নিয়ে গিয়ে একটা ভুল করেছি।'

উমা ও রত্নাবলী দুজনেই একসঙ্গে বলে, 'বলেন কি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। জীবনে এমন ভুল আর করিনি।'

উমা আর রত্নাবলী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।—'কিন্তু বিপিনবাবু ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো আপনি—'

মহেশ চৌধুরী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না না, তাড়াবেন কেন। দুজনে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল, বন্ধু কিনা দুজনে। বিপিনবাবু তাই রাগ করে—যাকগে, কি আর হবে ওসব কথা আলোচনা করে?'

ঘণ্টাখানেক পরে বিপিন ফিরিয়া আসিলে মহেশ চৌধুরী তাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া গেল। তাকে আশ্রমে দেখিয়াই বিপিন অবাক হইয়া গিয়াছিল, প্রস্তাব শুনিয়া তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

'ওকে ফিরিয়ে আনতে বলছেন?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আগের অবস্থায় ফিরে এলে হয়তো আত্মসম্বরণ করতে পারবেন।'

'ও কি ফিরে আসবে?'

'আসবেন বৈকি।'

বিপিন চুপ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়। তারপর হঠাৎ বলে, 'দেখুন, আপনাকে সত্যি কথা বলি। মাঝে মাঝে আমি যে আপনার ওখানে যেতাম, আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সদা চলে যাওয়ার পর আমার কতগুলি ভারি মুস্কিল হয়েছে, তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে আমরা বন্ধু, ওকে ছেড়ে থাকতেও কেমন কেমন লাগছে। তাই ভেবেছিলাম, বলে কয়ে আবার ফিরিয়ে আনব। আমি অনেক বলেছি, ও কিন্তু রাজী হয়নি।'

মহেশ চৌধুরী বলিল, 'তা জানি। আমিও ওই রকম অনুমান করছিলাম।'

বিপিন চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া থাকে।

মহেশ চৌধুরী আবার বলিল, 'এতকাল রাজী হন নি, এবার বললেই রাজী হবেন। এখানে উনি ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছেন।'

(ক্রমশঃ)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্দশপদী

হৃদয়ে জেগেছে প্রেমের মধুর জ্বালা
তুমি তো পড়েছ সুললিত পদাবলী
সেই আমাদের হৃদয়ের পাঠশালা
সেই ভাষাতেই আমরা তো কথা বলি।
সংক্ষেপে বলি, সব লক্ষণই জানো —
বসন্ত এল সহরে, মানো না মানো,
গরম হাওয়ায় সেই সুখবর বটে
গলা পিচে আর উচ্ছল ডাষ্ট্‌বিনে।
স্ক্যাভেন্‌জারের অকাল ধর্মঘটে
বসন্ত এল দুর্গন্ধের দিনে।
হৃদয় জেনেছে তোমার পায়েই লোটা।
যুগধর্মের তালে তালে এসো চলি
এদিকে ওদিকে বদ্‌লিয়ে পদাবলী
নীড় বেঁধে দেয় গন্ধশিশির ফোঁটা।

বিষ্ণু দে

ইউলিসিস

শান্ত হয়েছে বেলা।   দিনান্তের বিপুল মূর্চ্ছনা
অবরুদ্ধ জনতার পদক্ষেপে, এক সুরে বাঁধা।
নভচারী রাত্রি শুধু জন্মান্তরে বিঁধেছে মনীষা
শান্ত হয়েছে বেলা, প্রান্তরের বন্ধ্যা ব্যাকুলতা।

বন্ধুর বিনিদ্র রাত, যাযাবর নক্ষত্র সঙ্গীত।
ইউলিসিস গৃহহীন, পদ্মক্ষেত মন্থর সৌরভে।
আকাশের শূন্যপাত্রে অন্ধকার সুরা ধার দিল
অবরুদ্ধ ইঙ্গিতের উপবাসী মন।

ঝিল্লীস্বরে তীক্ষ্ণ ধার।　আমাদের আসন্ন বিদায়
বিবর্ণ মৃত্তিকা তুলে অর্থহীন প্রার্থনা জানাই :
সঙ্গীতের প্রয়োজন নাই।

মৃত শিশু প্রৌঢ় হাসে, বৃদ্ধ বুঝি শৈশবে ফিরেছে
শ্বেত মেঘে আকাশের বার্দ্ধক্য-সীমানা
ফিরিবার মন্ত্র নাই : সায়াহ্নের শূন্য কারখানা।

চিরকাল শূন্য শুধু।　অক্ষত, নির্ম্মম।
চিরকাল ঝিল্লীস্বরে ধার
বুদ্ধিহীন কম্পিত কামনা।　চিরকাল
সাধনার শেষে শব।　বিচ্ছেদ, বিদায়,
ইউলিসিস গৃহহীন, যাযাবর নক্ষত্র সঙ্গীত,
আয়ুশেষ,
বাসা বাঁধি,
প্রার্থনা জানাই

চিরকাল।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শেষ মুক্তি

শিরদাঁড়া ভাঙা, তূণে মামুলি তো বুলি।
দিক্‌ভ্রান্ত রাজপথে বিহঙ্গ বেকার!
তুলেছে তো অট্টালিকা আকাশে অঙ্গুলি,
জনারণ্যে রৌদ্রতাপে ঘোরাফেরা সার।

নিখিলমিছিলে মিলি গূঢ় প্রত্যাশায়।
জীবনের শেষ লগ্ন স্তিমিত, ধূসর।
যথারীতি ভিড় তবু জমে সিনেমায়,
শ্রমক্লিষ্ট স্নায়ু, চোখ পরস্ত্রীকাতর।

উত্তেজিত জনস্রোতে নেমেছে জোয়ার।
মহা বক্তা! এ দুর্যোগে তোমাকে প্রণাম।
রাজনীতি বক্তৃতায় আজো ক্ষুরধার,
বলো দেখি কবে সিদ্ধ হবে মনস্কাম?

পথে পিচ বিগলিত সূর্য্যের চুম্বনে।
অহিংসায় ব্রতী, তরী তাই তো ভাসাই
খাদি ও চরকার স্রোতে,—রেখেছি স্মরণে
বৈরাগ্য সাধনে মৃত্যু, গত্যন্তর নাই।

আশার ছলনে কাটে শূন্যগর্ভ দিন।
নবতম অবদান রেডিয়োর গানে
সন্ধ্যায় অশ্লীল তৃপ্তি,—উত্তেজনাহীন।
অলিগলিমোড়ে ভিড় চায়ের দোকানে।

এরি মাঝে জেনে রেখো আজ বাদে কাল
হয়তো চকিত বজ্র শিথিল শরীরে।
রঙীন পতাকা হাতে পথে পঙ্গপাল
সেনানীরা, শেষ মুক্তি জনগণ ভিড়ে॥

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

North Cape—by F. D. Ommanney (Longmans) 10/6.

ফ্রয়েড্-পরবর্ত্তীদের কাছে অপাপবিদ্ধেরা বকধার্ম্মিকদের সগোত্র ; এবং এ-কথা আপাতত সত্য যে অবিশ্বাসের চূড়ান্তে না পৌঁছালে, আধুনিক সভ্যতার নিত্য বিভীষিকায় মাথা ঠিক রাখা দুষ্কর। তাহলেও বিশ্বব্যাপী অনাস্থা ব্যসনবিশেষ ; এবং চন্দ্রাদির কলঙ্ক তো সর্ব্বগোচর বটেই, উপরন্তু বিদূষকদের ধর্ম্ম যেহেতু মহতের ছিদ্রান্বেষণ, তাই তাদের অর্ঘ সব চেয়ে সুলভ ; কোনো কিছু পূজনীয় নয় ভেবে তারা নির্ব্বিচারে সকলের কাছে মাথা নোওয়ায়।

অর্থাৎ অন্ধ ভক্তির মতো অনায়াস অশ্রদ্ধাও আত্মপ্রবঞ্চনার উপলক্ষ ; এবং প্রতর্কই যদিচ দার্শনিক মনের ভিত্তি, তবু নিজের অবসরবিনোদের জন্যে নিখিল সংশয়ের উৎপাদন অহৈতুক আত্মশ্লাঘার পরিচায়ক। অন্তত পক্ষে এটুকু নিশ্চিত যে অজানার আহ্বানে অভিসারের বিস্ময় না জাগলে, প্রাণপণ প্রযত্নে দুর্গম দেশের রহস্যোদ্‌ঘাটন শুধু পণ্ডশ্রম ; এবং পশুজগতের পাশবিকতা এমনই স্বতঃপ্রমাণ যে, মানুষী আত্মপ্রসাদের ইন্ধন জোগানো ছাড়া, সে-প্রসঙ্গে বাক্যব্যয় নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু অভিভাব আধুনিক কাঠিন্যের পরিপন্থী ; এবং সেইজন্যেই "সাউথ্ ল্যাটিট্যুড্"-নামক তাঁর প্রথম পুস্তকে কুমেরুভ্রমণের বৃত্তান্ত দিতে দিতেও ওমানি সাহেব একটি বার উচ্ছ্বাস করেন নি, স্বভাবোচিত আধিক্যের বৈপরীত্য দেখিয়ে লোকরঞ্জনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য তাঁর চেষ্টা বিফলে যায় নি ; একাধিক যথার্থ গুণ সত্ত্বেও "সাউথ্ ল্যাটিট্যুড্" বিক্রির দিক থেকে ১৯৩৮ সালের অন্য সমস্ত জনপ্রিয় পুঁথিপত্রকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

অতঃপর নূতন ভ্রমণকাহিনী না লিখে ওমানি সাহেবের গত্যন্তর নেই ; এবং মেরুযাত্রীরা তাঁর অবজ্ঞাভাজন হলেও, পৃথিবীর প্রান্তপরিদর্শন যেহেতু আলোকসামান্য ব্যাপার, তাই এ-বারে বিষয়সংগ্রহে বেরিয়ে তিনি কোনো দুঃসাহসিক অভিযানে ভেড়েন নি, সমুদ্রে মাছ ধ'রে যাদের দিন চলে, এমন

জন-কয়েক জেলের নির্ব্বিশেষ সংসর্গে মাসখানেক কাটিয়েছেন। বস্তুত এই উপজীবিকার চেয়ে কম রোমাঞ্চকর ব্যবসায় অভাবনীয়। অথচ এর থেকে আদায় ঘোড়দৌড়ের থেকে আয়ের চেয়েও অনিশ্চিত। ন মাসে ছ মাসে একবার আশানুরূপ মাছ উঠলে, প্রত্যেক জোয়ানের ভাগে দিন-মজুরির উপর দেড় শ দু শ টাকা জোটে বটে, কিন্তু যতখানি গতর খাটিয়ে তারা এই সামান্য লাভ করে, তার সিকির সিকিও কোনো ঘোড়দৌড় মাঠের ত্রিসীমানায় দেখা যায় না।

অধিকন্তু তাদের জীবনে বৈচিত্র্যের নাম-গন্ধ নেই; এমনকি কোনো অবিস্মরণীয় দৈবদুর্ব্বিপাকও তাদের একঘেয়ে কর্ম্মকাণ্ডে স্থান পায় না। নিয়মের একান্ত ব্যতিক্রম না ঘটলে, তারা প্রত্যহ যত বিপদে পড়ে, সে-সমস্তই গতানুগতিক নৌবিদ্যার মামুলী বিপদ; এবং আৎলান্তিকের ঝড়ে প্রাণ হারানো যদিও কুমেরুর তুষারমরুতে জ'মে মরার মতোই চরম ও পরম, তবু যত্নের অভাবে কাটা ঘা পাকা বা ভাঙা হাড় জুড়তে হাসপাতালে ঢোকা ভুক্তভোগীর পক্ষেই যন্ত্রণাদায়ক, সে-রকম দুর্ঘটনা দর্শকের চিত্তশুদ্ধি আনে না।

সুতরাং নাবিকজীবনের সব চেয়ে বড় আপদ ডাঙায়; সেখানে তাঁদের জন্যে জাল পেতে রাখে উপোসী স্ত্রীলোক আর মৎলবী শুঁড়ী; এবং এক হপ্তার চিরাচরিত অনাচারে মাসখানেকের পুঁজি খুইয়ে তারা যখন অগত্যা আবার কোনো বহির্ম্মুখী জাহাজের শ্রমিক-তালিকায় নাম লেখায়, তখন যার দাঁত বাঁধানোর দরকার, সে ফোক্‌লাই থেকে যায়, যে ছেঁড়া পোষাকে বন্দরে নেমেছিলো, সে নূতন পরিচ্ছদে নায়ে ওঠে না।

অতএব "নর্থ্ কেপ্"-এ ওমানি সাহেবের মিতভাষী প্রতিভা আত্মবিস্মৃতির সুযোগ পেয়েছে; এবং 'লিঙ্কন্ ষ্টার'-এ মাসাবধি কাল কাটিয়েও তিনি যেহেতু রোমহর্ষের সূচনামাত্র অনুভব করেন নি, তাই এ-বারে আর তাঁকে অতিরঞ্জনের ভয়ে সঙ্কুচিত হতে হয় নি, পুঁজিতে অসামান্য কীর্ত্তিকলাপের বালাই না থাকায়, তিনি অখ্যাত সহযাত্রীদের চরিত্রচিত্রণে মন দিতে পেরেছেন।

তৎসত্ত্বেও বর্ত্তমান পুস্তকে বাক্‌সংযমের অভাব নেই; এবং তাঁর নিরাভরণ আলেখ্যশিল্পের সারল্য যেমন নীরব সোভিয়েট্ ফিল্ম্-এর স্মৃতি জাগায়, তেমনই

তাঁর গল্প বলার ধরণ স্মরণে আনে হেমিংওয়ে-র কথাসাহিত্যকে। তবে হেমিংওয়ে বাকব্যয়েই অনিচ্ছুক, তাঁর কুশীলবেরা কখনোই নিরীহ বা নির্ব্বিরোধী নয়; এবং ওমানি সাহেবের সাময়িক বন্ধুরা এমনই লাজুক ও শান্তস্বভাব যে নৌকাডুবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাদের জিভের আড় ভাঙাতে পারে না।

তাই ব'লে তাদের ব্যক্তিস্বরূপ অপ্রকট নয়; তাদের অপ্রগল্‌ভ হাব-ভাবে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ আছে; এবং ওমানি সাহেব বিনা কার্পণ্যে তাদের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন, তাদের প্রসঙ্গে কোথাও মুরুব্বিয়ানা দেখান নি। অথচ বইখানিতে আত্মবিলোপের চেষ্টা নেই; এবং এখানেও তাঁর রচনারীতি যদিও প্রশংসনীয় রকমের নৈর্ব্যক্তিক, তবুও এ-বারে উল্লেখযোগ্য ঘটনার অপ্রতুলবশত তিনি ফাঁকগুলো ভরেছেন নিজের জীবনবৃত্তান্ত থেকে তথ্য কুড়িয়ে।

হয়তো বা সেইজন্যেই "নর্থ্ কেপ্" "সাউথ্ ল্যাটিট্যুড্"-এর চেয়ে কম গাঢ়বন্ধ, এবং তার পিছনে কোনো আন্তরিক তাগিদ আছে কিনা সন্দেহ। গোড়া থেকেই খটকা লাগে গ্রন্থকার যেন সমুদ্রবিষয়ক আর একটা বই লেখবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ; এবং বর্ত্তমান উপাখ্যানে তিনি যেহেতু কর্ম্মীদের অন্যতম নন, তাই শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য্য ঠেকে যে কলম চালাবার তাড়ায় তিনি মনোমতো বিষয়নির্ব্বাচনের অবকাশ পান নি। অর্থাৎ এ-যাত্রায় তাঁর অভিজ্ঞতা মাপসই হয় নি; এবং সেই অল্প অভিজ্ঞতাকে পুনরুক্তি তথা অবান্তর প্রসঙ্গের সাহায্যে ফাঁপিয়ে তিনি প্রকাশকের দাবি মিটিয়েছেন।

ফলত তাঁর রচনারীতি আর আগের মতো ক্ষুরধার নেই; সেই প্রাথমিক ঋজুতা ব্যবসায়ী লেখকের ছলা-কলায় অনেকখানি সমাচ্ছন্ন। তবু ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর তুল্য বর্ণনাশক্তি বিরল; এবং নানা দোষ সত্ত্বেও "নর্থ্ কেপ্"-এর গুণে তাঁর খ্যাতি আরও বাড়বে। কারণ এই বই যাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে, তাঁর করুণা অকপট ও অনুকম্পা সর্ব্বগ্রাহী, এবং মুমূর্ষু যন্ত্রসভ্যতার অবরোহী দুর্গতি তাঁর কাছে এমনই সুপরিস্ফুট যে প্রোপ্যাগ্যাণ্ডার ছোঁয়াচ বাঁচিয়েও তিনি সে-দৃশ্যকে আশ্চর্য্য রকমের জাজ্জ্বল্যমান করে তুলেছেন।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

The Field of the Embroidered Quilt—(কবি জসীম উদ্‌দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ'-এর অনুবাদ)—by E. M. Milford (Oxford University Press).

মূল পুস্তকটির সঙ্গে অল্পবিস্তর আমরা সকলেই পরিচিত। বাংলার পল্লী জীবনের ছোট একটি গল্প অবলম্বনে কবিতাগুলো লিখিত। সরল গ্রাম্য-জীবনের যে-মাধুর্য্য কবি জসীম উদ্‌দীন তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে ভাষান্তরিত করা সত্যি সুকঠিন। জাতীয় জীবনের অবিমিশ্র স্বকীয়তার সন্ধান মিলে সরল গ্রাম্য জীবনে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ না হয়েও বিদেশীয় মহিলাটি যে-নিপুণতার সঙ্গে সহজ ভাষায় ও ভঙ্গীতে ঝরঝরে ভাবে অনুবাদ করে' গেছেন, তা খুবই প্রশংসনীয়। যাচাই-বাছাই না করে'ও অনুবাদের যে-কোনো অংশ মূল কবিতার পাশাপাশি রেখে পড়লেও রস কোথাও ব্যাহত হয়েছে বলে' মনে হয় না।

এ-গাঁও চেয়ে ও-গাঁর দিকে, ও-গাঁও এ-গাঁর পানে,—
কতদিন যে কাটবে এমন, কেইবা তাহা জানে।
মাঝখানেতে জলীর বিলে জ্বলে কাজল-জল,
বক্ষে তাহার জল-কুমুদী মেলছে শতদল।

This village looks to that,
And that one looks to this :
Who knows how many days will pass
Just like this ?
Between them lies the Joli lake,
Her waters sparkling jet ;
The thousand-petalled lily opens,
Upon her bosom set.

* * *

সেইখানে এক চাষীর মেয়ে নামটি তাহার সোণা,
সাজু ব'লেই ডাকে সবে, নাম নিতে যে গোনা।

লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী,
ভোরের হাওয়া যায় যেন গো প্রভাতী মেঘ নাড়ি'।

There lives the peasant's daughter Shona,
Whom all call Saju—chaffing.
Like feathers of a bright red cock
Her sari flies,
Like the breeze of dawn the clouds dispelling
From morning skies.

সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে অনুবাদটি গড়িয়ে গেছে, কোথাও জড়তার লেশমাত্র নেই। অবিশ্যি সর্ব্বাংশে অনুবাদ কখনও মূল রচনার সমকক্ষ হতে পারে না; তার ভাষাগত কতকগুলো স্বাভাবিক বাধা ও অসুবিধা থাকবেই।

যেমন—

রূপাই ছিল ঘর বাঁধিতে, পিছন ফিরে চায়;
পাঁচটি মেয়ের রূপ বুঝি ওই একটি মেয়ের গায়!
পাঁচটি মেয়ে, গান সে গায়, গানের মতই লাগে,
একটি মেয়ের সুর ত নয় ও বাঁশী বাজায় আগে।
ওই মেয়েটির গঠন-গাঠন চলন-চোলন ভালো,
পাঁচটি মেয়ের রূপ হ'য়েছে ও'রির রূপে আলো।

He turned his head and down he looked,
And saw five maidens all,
But the beauty of five was centered in one,
And her voice like a flute seemed to call.
Her form and her carriage far excel
Those of the other four,
She is the lamp that illumines
Their beauty all the more.

অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গীণ হওয়া সত্ত্বেও মেঠো সুরের মাধুর্য্যটুকু যেন পাওয়া যায় না। শব্দ ও তার ধ্বনির সঙ্গে যে মাধুর্য্য ও সরলতা জড়িয়ে আছে তার অনুবাদ সম্ভবও নয়। কিন্তু এ-কথাও স্বীকার করতে হয় যে স্থানে স্থানে রস-মাধুর্য্যে অনুবাদ মূল কবিতাকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলার পল্লী-জীবনের একটি নিখুঁত চিত্রের এমন নিখুঁত অনুবাদের জন্যে মিসেস মিল্‌ফোর্ডের নিকট বাংলা দেশ কৃতজ্ঞ থাক্‌বে।

ইংরেজী ভাষাভাষীদের কাছে কবিতাগুলোর পরিচয় দেবার ভার নিয়েছেন Verrier Elwin, তাঁর ভূমিকাটিও হয়েছে মনোজ্ঞ।

অবশ্যম্ভাবী—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য (কাত্যায়নী বুকষ্টল)—দাম ২॥০

বইখানা লেখকের প্রথম উপন্যাস। বই-এর আখ্যান-ভাগ প্রশংসনীয় বলা চলে না। ঘটনাবলীর প্রবাহ তেমন সহজ ও স্বাভাবিক হয় নি। স্বভাব-প্রকৃতির স্বাধীনতা যে শিল্পীর নেই সে-বিষয়ে তাঁর অবহিত থাকা উচিত। পৃথিবীতে ঘটতে পারে যখন-তখন যা-কিছু, কিন্তু শিল্পজগতে প্রবেশাধিকার পেতে হ'লে সে-সব ঘটনাকে অনেক কলা-কৌশল অবলম্বন করতে হয়। মানুষকে ভালো লাগানো বা বিশ্বাস করানোর দায় প্রকৃতির নেই, কিন্তু শিল্পীর আছে। আকস্মিক বা অদ্ভুত ঘটনা ঐশী শক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাতে ঈশ্বরের মহিমা বাড়ে; কিন্তু উপন্যাস বা গল্পের ঘটনা শিল্পীকে তার স্রষ্টা হিসেবে স্মরণ করিয়ে দিলে শিল্পীর গৌরব হয় ক্ষুণ্ণ। এ উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে সে-ত্রুটি বর্ত্তমান। ঘটনার অবতারণা স্থানে স্থানে খুবই আকস্মিক বলে' মনে হয়; তা ছাড়া গল্পের নায়ক রাসবিহারী এবং অন্যান্য চরিত্রের কার্য্যকলাপ অবস্থা অনুযায়ী স্বাভাবিক বলে' গ্রহণ করবার মত অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি সকল ক্ষেত্রে লেখক করতে পেরেছেন বলে' মনে হয় না। একশো তিরিশ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই নেই, তাই গোড়ার দিকে পড়তে পড়তে পাঠকের আগ্রহে ঢিল পড়ে। অবিশ্যি গৃহত্যাগের পর রাসবিহারীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন যাত্রার বর্ণনায় কোন

অংশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত হিসেবে সার্থক বলা যেতে পারে। প্রচুর সুযোগ থাকা সত্বেও দু' এক স্থান ব্যতীত কথোপকথন তেমন মনোজ্ঞ হয় নি। ভাষার চাকচিক্য, যা আখ্যানবস্তু সমৃদ্ধ করে, তার উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় শেষের অংশে। বই-এর শেষের অংশ সকল দিক দিয়েই আশান্বিত করে—লেখকের পরবর্ত্তী পুস্তক প্রথম প্রচেষ্টার ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্জ্জিত হয়ে দেখা দেবে বলেই আশা করা যায়।

পরিশেষে বইখানির অতিরিক্ত মূল্যের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারলাম না।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবী—শ্রীতারিণীকমল পণ্ডিত প্রণীত এবং ২০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য : দুই টাকা।

নৈষ্ঠিক সাহিত্যানুরাগীর কাছে রসঘন উচ্চাঙ্গ উপন্যাসের আকর্ষণ যেমন অপরিহার্য্য ; তেমনি বিপরীতক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয় ও অসংযত ঘটনার অকারণ অত্যুক্তিতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভবও অপরিহার্য্য। বহুক্ষেত্রেই সহিষ্ণু সমালোচকের অদৃষ্টে ঈদৃশ অবস্থার সম্মুখীন হওয়া অসন্দিগ্ধভাবেই অবশ্যম্ভাবী।

বর্ত্তমান উপন্যাসখানি সম্পর্কেও আমায় উক্তরূপ অহেতুক অস্বস্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছে।

প্রথমত এই উপন্যাসখানির কয়েক পৃষ্ঠার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের মনে এই ধারণা জন্মাবে যে, তিনি যেন প্রাচীন যুগের কোন এক পড়ন্ত মহল্লায় গিয়ে পড়েছেন এবং সেখানে অধুনা বানপ্রস্থগত বঙ্কিমী চরিত্রগুলির সঙ্গে তাঁর মুলাকাত হচ্ছে। বঙ্কিম প্রভাব-মুক্তির এই সুদীর্ঘ দিন পরেও তারিণীকমল পণ্ডিতের ন্যায় এরূপ একজন প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকের সম্বন্ধে বঙ্কিম-ভক্তরা আশান্বিত হলেও, বিদগ্ধরসিক সমাজে এরূপ গ্রন্থের সমাদর লাভ সুদূর পরাহত।

পুস্তকে নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের লিখিত পরিচিতি থেকে জানবার সুযোগ ঘটে যে, এই উপন্যাসের সাহায্যে লেখক তাঁর জীবনের অভিজ্ঞাতাগুলিকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য অভিজ্ঞতা যে উপন্যাসের উপাদান হওয়া অসঙ্গত তাতো নয়ই, বরং সঙ্গতই ; কিন্তু জীবনের সকল অভিজ্ঞতাই এবং একমাত্র নিছক অভিজ্ঞতাকেই যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হ'তে হবে তা একান্তই অসমীচীন। সোনার সঙ্গে খাদের সংমিশ্রণ যেমন গড়নের সহযোগিতা করে, সাহিত্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার আংশিক মিশ্রণও সেইরূপ রসায়িত করে সাহিত্যের গড়নকে। তাই উপন্যাসের মধ্যেও অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার যোগাযোগ স্থান বিশেষে একান্ত অপরিহার্য্য বিষয় এবং সেই সূক্ষ্ম কল্পানানুভূতিই বহুক্ষেত্রে উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। বর্ত্তমান ঔপন্যাসখানির মধ্যে, বহু স্থানে বহু অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে এবং স্থান বিশেষে সংযমাভাবও উপন্যাসকে মূল গন্তব্য স্থানের থেকে স্থানচ্যুত করেছে। অর্থাৎ যেখানেই গ্রন্থকর্ত্তার চিত্রবৃত্তির সঙ্গে গ্রন্থস্থ বিষয়বস্তুর সংযোগ ঘটেছে, সেখানেই তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, তিনি ভাবাবেগে অতিকথা কয়ে বসেছেন। ঔপন্যাসিকের পক্ষে এই বিষয়টির প্রতি সর্ব্বদা সচেতন থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এছাড়া ত্রুটি হিসাবে পুস্তকের পরিবেশে সব সময়েই একটা অতি-নৈতিকতার একঘেয়েমী পাঠককে বিশেষ ভাবেই বিপর্য্যস্ত করেছে এবং বানান ভুলেও সংশয় জাগিয়েছে যথেষ্ট। মোটের উপর গ্রন্থখানি পড়তে আমার মোটেই ভাল লাগে নি এবং দামের বাহুল্য হেতু জনসাধারণের নিকটও যে বইটি সহজলভ্য হবে তা মনে হয় না।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

দাবী। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়। ভারতী-ভবন। মূল্য বারো আনা।

মহানগরীর উপাখ্যান। শ্রীকরুণাকণা গুপ্তা। ৫৪ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড়টাকা।

'দাবী' বৃহৎ আকারের 'ছোটো গল্প' বা ক্ষুদ্র উপন্যাস। নায়ক ও নায়িকার নিষ্ফল প্রেম ইহার আখ্যায়িকার মুখ্য অবলম্বন। সুতরাং ইহাকে রোম্যান্টিক উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারিত, যদি না এই অতি মামুলি কাহিনীর উপর একাধিক বে-মামুলি সমস্যা ও চমকপ্রদ ঘটনার প্রলেপ বুলাইয়া লেখক ইহাকে জটিল করিয়া তুলিতেন। লেখকের এই প্রয়াসের ফলে, রোম্যান্‌স্‌, মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব এই তিন উপাদানে গঠিত এক মিশ্র ব্যাপারের উদ্ভব হইয়াছে। মিশ্র বলিলাম এই জন্য যে অবিমিশ্র রসসৃষ্টি হিসাবে 'দাবী' মনকে তৃপ্ত করে না, পড়া শেষ করিয়া মনে যেন কেমন একটা অস্বস্তি থাকিয়া যায়। মনে হয় যেন লেখক শুধু আমাদের ক্ষুধা জাগাইয়া তুলিলেন, কিন্তু খোরাক জোগাইলেন না।

অথচ একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে লেখকের লিপিদক্ষতা অসাধারণ। সমসাময়িক কথা-সাহিত্যিক আর কেহ এমন জমাট ও জোরালো বাংলা লেখেন বলিয়া আমার জানা নেই। তাই 'দাবী' পড়িতে কোথাও সামান্যমাত্র অবসাদ আসে না। প্রায় এক নিঃশ্বাসে পাতার পর পাতা শেষ হইয়া যায়, লেখকের সবল ভাষা ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়া চিত্তকে সজাগ রাখে। যদি শিল্পসৃষ্টি হিসাবে 'দাবী' অখণ্ডতা অর্জ্জন করিয়া থাকে তাহা শুধু ইহার ভাষার অব্যাহত শক্তির দৌলতে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে 'দাবী' সম্পূর্ণ সার্থক শিল্পসৃষ্টি হয় নাই তাহার প্রধান কারণ চরিত্রাঙ্কনে যাথাযথ্যের অভাব। গল্পের আরম্ভে ইহারা সকলেই অতি সহজ ও সজীব মানুষ, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লেখকের মনগড়া কতকগুলি 'টাইপ'-এ

ইহাদের পরিণতি ঘটে। এই জন্যই 'দাবী' শেষ করিয়া মন বিস্মিত হয়, তৃপ্ত হয় না।

এই ত্রুটির কারণ সম্ভবত লেখকের সেই অসাধারণ সৃজনীশক্তির অভাব যাহার যাদুতে 'টাইপ' মানুষ হইয়া উঠে, অতি স্বাভাবিক নরনারীর মধ্যেও অসাধারণ আদর্শ নিঃসন্দেহে মূর্ত্ত হয়। অর্থাৎ যে-পরিসরের মধ্যে লেখক তাঁহার রচনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একাধিক জটিল চরিত্র লইয়া সার্থক শিল্পসৃষ্টি করিতে হইলে যে শেক্‌স্‌পীরীয় প্রতিভার আবশ্যক নীরেন্দ্রনাথের তাহা অবশ্য নাই। কিন্তু এই ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি সার্থক হইতে পারিতেন যদি আরও ধৈর্য্যসহকারে ফলাও করিয়া তিনি তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। তাহা হইলে অবশ্য 'দাবী' বড় বা মাঝারি আকারের উপন্যাসে পরিণত হইত। কিন্তু মনে হয় তাহাই হওয়া উচিত ছিল। কেননা বৃহৎ আকারের উপন্যাসের উপযুক্ত উপকরণ ইহাতে প্রচুর আছে।

" 'মহানগরীর উপাখ্যান' যে চার্লস্ ডিকেন্সের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'A Tale of Two Cities-এর ভাবমূলক অনুবাদ তা বলাই বাহুল্য।" এই মত লেখিকার হইলেও সমালোচকের নহে। কেননা এই ভাবমূলক অনুবাদে লেখিকা শুধু ঐতিহাসিক পটভূমিকার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করেন নাই, স্থানে স্থানে 'দৃশ্যপট ও চরিত্রগুলির পরিবর্ত্তন' করিতে নাকি বাধ্য হইয়াছেন। ফলে যে রচনাটি আমরা পড়িতে পাই ডিকেন্স্-এর ধার দিয়াও তাহা যায় না। তাহার কারণ চরিত্র-সৃষ্টি ঔপন্যাসিকের একমাত্র কাজ নহে, যে-পটভূমিতে এই চরিত্রগুলি বিকাশ লাভ করে তাহার বর্ণনা ও বিস্তারও ঔপন্যাসিকের এক প্রধান কাজ, বিশেষভাবে A Tale of Two Cities-এর মতন উপন্যাসে। এই জাতীয় রচনায় পটভূমির সহিত চরিত্রদের সম্বন্ধ একেবারে অঙ্গাঙ্গী। সুতরাং এই পটভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য পটভূমিতে তাহাদের উপস্থাপিত করাকে আর যাহাই বলা হউক অনুবাদ—এমন কি 'ভাবমূলক' অনুবাদও বলা চলে না।

আমার এই উক্তিগুলির মূলে যে প্রতিবাদ তাহা শুধু লেখিকার ভূমিকার

বিরুদ্ধে, তাঁহার রচনার বিরুদ্ধে নহে। কেননা তাঁহার রচনা সত্যই সুখপাঠ্য ও সার্থক। বিশেষভাবে প্রশংসনীয় ঐতিহাসিক পটভূমির সৃজনে লেখিকার দক্ষতা। তাই তাঁহার নিকট আমরা ভবিষ্যতে এইরূপ বিকৃত অনুবাদ নহে, মূল ঐতিহাসিক উপন্যাস পাইব আশা করি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে-অভাব ঘটিয়াছে লেখিকা তাহা পূরণের চেষ্টা করিতে পারেন। তাহা করিবার মতন লিখিবার ক্ষমতা ও জ্ঞান উভয়ই তাঁহার আছে।

হিরণকুমার সান্যাল

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
আষাঢ় ১৩৪৭

পরিচয়

অমৃতত্ব-সিদ্ধি

বৈদিক ঋষি মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

আমরা নর নারী প্রত্যেকে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের সন্তান। সে জন্য মর্ত্য মানুষ হইলেও আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রতিক্ষণ ব্রহ্মক্ষুধা সন্ধুক্ষিত হইতেছে।—পাশ্চাত্যেরা ইহাকে 'Hunger for the Absolute' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে হেতু আমরা অমৃতের পুত্র (heirs of immortality), সেইজন্য অমৃতত্বই আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিত্য বস্তু। *

চাতক যেমন ফটিক জল ভিন্ন অন্য বারিতে তৃপ্ত হয় না, জীব তেমনি 'অমৃতত্ব' ভিন্ন অন্য কিছুতেই স্বস্তি বোধ করে না। তাই তাহার চিরন্তন প্রার্থনা —মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় (বৃহ, ১।৩।২৮)—তাহার নিরন্তর কামনা 'তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি' (ঋগ্বেদ, ৯।১১৩)

প্রচলিত ভাষায় দেবতাদিগকে 'অমর' বলে—'অমরা নির্জরা দেবাঃ'। বৈদিক যুগে অনেকে মনে করিতেন, কোনো উপায়ে মানুষ যদি দেবস্থান

* To conquer death,—this question has been the great question of mankind from its first beginnings, and will remain so, as long as there are men.—The Doctrine of the Buddha, p. 4.

স্বর্গলোক—স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে' (কঠ, ১।১৩)—জয় করিতে পারে, তবে সেও অমর হইবে; এবং দেবতাদিগের সহিত মহনীয় 'স্বধামাদং' সম্ভোগ করিবে। ঐ স্বর্গজয়ের অমোঘ উপায় তাঁহাদের মতে যজ্ঞ—স্বর্গকামো যজেত। এজন্য বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞের এত বাহুল্য। উহার মূল কথা এই ছিল যে, বৈদিকেরা আশা করিতেন দেবতাদিগের অনুগ্রহে বা মধ্যস্থতায় অমৃতত্বের অধিকারী হইবেন।

দক্ষিণাবংতো অমৃতং ভজংতে
দক্ষিণাবংতঃ প্রতিরংত আয়ুঃ—ঋগ্‌বেদ, ১।১২৫।৬

'দক্ষিণাবন্তের অমৃতত্ব লাভ হয়, দক্ষিণাবন্ত আয়ুঃ উত্তরণ করেন'।

ত্বং তম্ অগ্নে! অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত্যং দধাসি—ঋগ্‌বেদ, ১।৩১।৭

'হে অগ্নি! তুমি মর্ত্য মানুষকে উত্তম অমৃতত্বে স্থাপন কর '

আভূষেণ্যং বো মরুতো মহিত্বনং

* *

উতো অস্মান্ অমৃতত্বে দধাতন।—ঋগ্‌বেদ, ৫।৫৫।৪

'হে মরুদ্‌গণ! তোমাদের মহিমা মহনীয়! তোমরা আমাদিগকে অমৃতত্বে নিধান কর।'

'হে মিত্রাবরুণ! বৃষ্টিং বাং রাধো অমৃতত্বম্ ঈমহে—(ঋগ্‌বেদ, ৫।৬৩।২)—তোমাদের ধন এখানে বর্ষণ কর—যেন আমরা অমৃতত্বের ভাগী হইতে পারি।'

ঐ সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে 'সোমযাগ' একটি বিশিষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত।

অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম
অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্।

'আমরা সোম পান করিয়াছি, জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছি, দেবতাদিগকে জানিয়াছি,—আর ভয় কি? আমরা অমর হইলাম!'

গীতাকার এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে- গীতা, ৯।২০

'সোমপান দ্বারা পূতপাপ হইয়া সোমযাজী, বৈদিক বিধিমার্গে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করেন।'

এই সোমযাগ সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিয়াছেন—

সোম-যাজী শতে শতে সংবৎসরেষু, অগ্নিচিৎ কামম্ অশ্নাতি, কামং ন। তদ্ হৈতৎ যাবৎ শতং সংবৎসরাঃ তাবদ্ অমৃতম্ অনন্তম্ অপর্যন্তম্—শতপথ, ১০।১।৫।৪

'সোমযাজীর শত বৎসরে একবার ভোজন, অগ্নিচয়নকারী ইচ্ছামত ভোজন করেন কিংবা না করেন। এই যে শত সংবৎসর ইহাই অমৃত অনন্ত অনবধি (unending and everlasting)।

অপরে বলিতেন—তং যথা যথা উপাসতে তদ্ এব ভবতি—'যে যেরূপ উপাসনা করে সে সেইরূপ হয়। তাই তাঁহারা দেবতার সহিত সারূপ্য ও সাযুজ্য দ্বারা অমরতা অর্জনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল—

কর্মণা দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যতে —বৃঃ, ৪।৩.৩৩ *

দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—ছান্দোগ্য

এ সম্পর্কে বৈদিক সাহিত্যে নানাবিধ উদযোগ—উপায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

স এবং বিদ্বান্ অগ্নিং চিনুতে ভূয়ানেব ভবতি, অভীমান্ লোকান্ জয়তি। বিদু রেনং দেবাঃ, অথো এত সামেব দেবতানাং সাযুজ্যং গচ্ছতি—কৃষ্ণযজুর্বেদ, ৫।৭।৫।৭

'যিনি এইরূপ জানিয়া অগ্নি চয়ন করেন, তিনি ভূয়ান্ হয়েন, অভীম লোক জয় করেন। দেবতারা তাঁহাকে জানেন, তিনি ঐ সকল দেবতার সাযুজ্য লাভ করেন।'

ব্রহ্মণঃ স যুজ্যং সলোকতাম্ আপ্নোতি এতাসাম্ এব দেবতানাং সাযুজ্যং সাষ্টিতাং সমান-লোকতাম্ আপ্নোতি স এতম্ অগ্নিং চিনুতে —তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১১।৫।১২

'ব্রহ্মার সাযুজ্য, সালোক্য প্রাপ্ত হন। এই সকল দেবতার সাযুজ্য, সাষ্টিতা (সমান ঐশ্বর্য), সালোক্য প্রাপ্ত হন —যিনি এই অগ্নি চয়ন করেন।'

ছান্দোগ্য উপনিষদেও ইহাদিগের উল্লেখ আছে—

এতাসাম্ এব দেবতানাং সলোকতাং সাষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি—ছান্দোগ্য, ২।২০।২

বৃহদারণ্যকেও ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি, নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি, মৃত্যুরস্য আত্মা ভবতি, এতাসাং দেবতানাম্ একো ভবতি—বৃহ, ১।২।৭

'যিনি এইরূপে অশ্বমেধের প্রতীক ভাবনা করেন, তিনি দেবতাদিগের অন্যতম হন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, মৃত্যু তাঁহার আত্মা হয়।' *

---

* বৃহদারণ্যক অন্যত্র (৪।৩.৩৩) আজান-দেব ও কর্ম-দেবের ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা কর্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহারা কর্মদেব ; আর যাঁহারা জন্মসিদ্ধ দেবতা, তাঁহারা আজান-দেব।

কিন্তু, এই সকল উপায় কি সদ্‌-উপায় না অপায়! ইহাদ্বারা যে অমৃতত্ব অর্জন করা যায় তাহা কি মুখ্য না গৌণ? দেবযানীর ব্রহ্মলোকে স্থিতি প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করিয়াছি।—এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। কেবল পাঠককে গীতার একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিব। গীতা বলেন—সোমযাজী স্বর্গে গমন করেন বটে এবং স্বর্গে প্রচুর দেবভোগ ভোগ করেন বটে—

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দেবি দেবভোগান্ ॥—গীতা, ৯।২০

কিন্তু—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ॥—গীতা, ৯।২১

'সেই বিশাল স্বর্গভোগের পর, ভোগদ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্বর্গবাসীর স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।'*

কেবল সোমযাজী বা ইষ্টাপূর্তকারী কেন? যাঁহারা, দক্ষিণ মার্গে না গিয়া, তপঃশ্রদ্ধার অনুষ্ঠান দ্বারা দেবযান-পথে উত্তর মার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন, তাহারাও (কল্পান্তে) পুনর্মৃত্যুর কবলে পতিত হন; অতএব মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষার নিধি 'অমৃতত্ব' তাঁহাদের পক্ষেও সুদূরপরাহত থাকে। এইজন্য দেখি কঠ-উপনিষদে নচিকেতাঃ যমরাজকে বলিতেছেন—'যম! তুমি আমাকে চিরজীবিকা (অমৃতত্ব) দিবে বলিতেছ। কিন্তু তোমার সহিত সাযুজ্যে—মাত্র 'জীবিষ্যামি যাবদ্ ঈশিষ্যসি ত্বম্'—(১।২৭)—তুমি নিজেই যখন চিরজীবী নহ, আমাকে চিরজীবিকা দিবে কিরূপে?' মনুষ্যের তুলনায় দেবতারা দীর্ঘজীবী বটেন, কিন্তু তাঁহারা ত' চিরজীবী নহেন।

নচিকেতাঃ যমকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্ত দেবতা—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, এমন কি যিনি, 'ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ সংবভূব' (মুণ্ডক, ১।১।১) —দেবতাদিগের যিনি প্রথম ও প্রধান—সেই ব্রহ্মার সম্পর্কেও ঐ কথা বলিতে হয়।

---

* এই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩।১১।৭) দ্রষ্টব্য। ঐ স্থানে আদিত্যম্ অবরেণ লোকঃ (যাহা অন্তবৎ ক্ষয্য) এবং আদিত্যং পরেণ লোকঃ (যাহা অনন্ত অপার অক্ষয্য)—এই উভয়ের ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্রাঃ
ব্রহ্মপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।

অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, দিবাকর, রুদ্র কেহই চিরজীবী নহেন। কালের করাল গতিতে শীঘ্র বা বিলম্বে সকলকেই ধ্বংসমুখে পড়িতে হইবে।

এজন্য প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—

বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে।
কালেন সমতীতানি কালো হি দুরতিক্রমঃ॥

কত সহস্র ইন্দ্রের, কত লক্ষ দেবতার কালের গতিতে পতন হইয়াছে। কালের গতি কে অতিক্রম করিবে? কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ।

অতএব, অমৃতত্বে উপনীত হইবার প্রকৃষ্ট পন্থা দেবতা ধরিয়া নয়, দেবতা হইয়াও নয়—ঐ সারূপ্য ও সাযুজ্য অমৃতত্বের পথ নয়, বিপথ—অমৃতত্বকামীর পক্ষে ঐ পথে বিচরণ ব্যর্থশ্রম মাত্র।

তবে অমৃতত্ব-সিদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা কি? ইহার এক কথায় উত্তর—ব্রহ্ম-সাযুজ্য—যিনি অনশ্বর, যিনি অজর, অমর, অক্ষর, যিনি অদ্বয়, অব্যয়, অক্ষয়, —সেই অজিত, অমিত, অক্ষিত ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য। জীব যদি কোনো মতে সেই সনাতন, পুরাতন, চিরন্তনে প্রবিষ্ট হইতে পারে, জীব যদি কোনো দিন তাঁহার সত্তায় নিজ সত্তা নিমজ্জিত করিতে পারে,—এক কথায় জীব যদি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইতে পারে (ইহাই 'সাযুজ্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ) —তবেই সে আপেক্ষিক নয়, আত্যন্তিক অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে—সেই স্থায়ী, অবিনশ্বর, শাশ্বতিক অমৃতত্ব, যে অমৃতত্বের অপচয় উপচয় নাই, উদয় অস্ত নাই, ক্ষয় ব্যয় নাই—যে অমৃতত্বের অস্তিকে পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু কোন দিন অগ্রসর হইতে পারিবে না। এই শাশ্বতিক অমৃতত্বই মোক্ষ। অমৃতত্ব অর্জনের, মোক্ষ সাধনের, পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু বারণের ইহাই আর্য পন্থা—অদ্বিতীয় অমোঘ পথ।

তমেব বিদিত্বা অমৃতত্বম্ এতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়। —শুক্লযজুর্বেদ, ৩১।১৮
তাঁহারে জানিলে জীব যায় মৃত্যু পার।
অয়নের তরে অন্য গতি নাহি তার॥

ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সূত্রাকারে বলিয়াছেন—

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বমেতি—ছা, ২।২৩।১

ঐ স্থলে ছান্দোগ্য তিনটি ধর্মস্কন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—যাহা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থের করণীয়। ঐ তিন আশ্রমীই পিতৃযান বা দেবযান পথে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন বটে—সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি—কিন্তু যিনি ব্রহ্মসংস্থ (ব্রহ্মণি সম্যক্ স্থিতঃ), তাঁহারই অমৃতত্বে অধিকার। ইহার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন ঐ অমৃতত্ব—'পুণ্যলোকবিলক্ষণম্ অমরণভাবম্'। উহা আত্যন্তিক—দেবযানীর ন্যায় আপেক্ষিক নয়—'আত্যন্তিকম্ এতি ন আপেক্ষিকম্ দেবাদ্যমৃতত্ববৎ'।

কেন আত্যন্তিক? ইহার উত্তরে শঙ্করাচার্য বলেন—

পুণ্যলোকাৎ পৃথক্ অমৃতত্বস্য বিভাগকরণাৎ। যদি চ পুণ্যলোকাতিশয়মাত্রম্ অমৃতত্বম্ অভবিষ্যৎ, ততঃ পুণ্যলোকত্বাৎ বিভক্তং নাবক্ষ্যৎ।

'এখানে অমৃতত্বকে অন্যলোক-প্রাপ্তি হইতে পৃথক্ করিয়া বলা হইয়াছে। যদি অমৃতত্ব পুণ্যলোকেরই আতিশয্য হইত, তবে এরূপ বলা হইত না।

ছান্দোগ্যধৃত ঐ সূত্রের ('ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতমৃত্বম্ এতি') পূর্বরূপ আমরা সুপ্রাচীন শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত হই। সেখানে ঋষি বলিতেছেন :—

স এষঃ অকামঃ সর্বকামো ন হ্যেতং কশ্চন কামঃ। তদেষ শ্লোকো ভবতি—"বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥" ইতি। ন হৈব তং লোকং দক্ষিণাভিঃ ন তপসা অনেবংবিদ্ অশ্নুতে, এবংবিদাং হৈব স লোকঃ।—
শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৫।৪।১৫-৬

'যিনি অকাম সর্ব্বকাম, তাঁহাকে কোনও কামনা স্পর্শ করে না। এই সম্পর্কে এই শ্লোক আছে। যখন সমস্ত কাম পরাগত (তিরোহিত) হয়, তখন বিদ্যাদ্বারা তিনি অধিগত হন। সেখানে দক্ষিণাবন্ত যাইতে পারে না, অবিদ্বান্ তপস্বীও যাইতে পারে না।

যে 'এবংবিৎ' নয়, (যে অবিদ্বান্), দক্ষিণা দ্বারা তপস্যা দ্বারা সে ঐ লোক (position) প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, সেই লোক এবংবিদেরই লোক।' ঐ লোক ভূমি নহে, ঐ লোক ব্রহ্ম।

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

অথ অকাময়মানো যঃ অকামো নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ * ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬

* ইহাই মুণ্ডকের 'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ'—৩।১।৪

যিনি কামনারহিত, যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না ; তিনি ব্রহ্ম হইয়া 'ব্রহ্মাপ্যয়' প্রাপ্ত হন।'

এই যে ব্রহ্মে অপ্যয় (একীভাব)—ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য। যাঁহার কাম (স্পৃহা) নিঃশেষে নির্ধূত হইয়াছে, তাঁহার আর উৎক্রান্তি (পরলোক ও পুনর্মৃত্যু) ঘটিবে কেন ? সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন :—

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদ্ অয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥

—বৃহ, ৪।৪।১২

'যিনি ব্রহ্মের সহিত আপন ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোঽহং ভাবে সুস্থিত হইয়াছেন, কিসের ইচ্ছায়, কোন্ কামনায় তিনি আবার শরীরে সন্তপ্ত হইবেন ?'

অন্যত্র ও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম' এইভাবে জীবকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তবেই জীব অমরত্ব লাভ করিবে।

তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্—বৃহ, ৪।৪।১৭

'তাঁহাকে আত্মা বলিয়া ধারণা করিলে, সেই অ-মৃত ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলে, তবেই অমৃত হইতে পারিব।' যে তদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি—বৃ ৪।৪।১৪

এই জ্ঞান ইহলোকে, শরীরধারণেই হইতে পারে। যাঁহার হয়, তিনিই অমৃত হন।

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্ বয়ং, ন চেদ্ অবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ
যে তদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥—বৃহ, ৪।৪।১৪

'ইহলোকে থাকিয়াই পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায়। যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই অমৃত হন। আর অপরে—যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের মহতী বিনষ্টি (মৃত্যু ও পুনর্মৃত্যু) এবং (জন্মে জন্মে) দুঃখভোগ হয়।

এই যে অমৃতত্ব—শোপেনহয়র যাহাকে Indestructibility *without* continued existence' বলিয়াছেন, জর্জ গ্রিম যাহার নাম দিয়াছেন 'The great riddle of deathless and tranquil Eternity (The Doctrine of the Buddha, p. 502.)—নিখিল উপনিষৎ-সাহিত্য ঐ অমৃতত্বের গম্ভীর ঝঙ্কারে মুখরিত।

স যো হবৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ * * * গুহাগ্রন্থিভ্যোঃ বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি—মুণ্ডক ৩।২।৯
যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন তিনি গুহাগ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত হন।

যে পূর্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্ বিদুঃ
তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ—শ্বেত, ৫।৬

'দেবতা বা ঋষি—পূর্বতন যাঁহারাই তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় (ব্রহ্মময়) হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন।

য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি—কঠ, ২।৬

'যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হন।'

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫

যিনি 'সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ,' ভূতে ভূতে তাঁহার অনুধ্যান করিয়া ধীর ব্যক্তি অমৃত হন।'

কারণ, তিনি 'প্রতিবোধবিদিত' (অগ্র্যাবুদ্ধির গম্য), তাঁহাকে জানিলেই অমৃতত্ব।

প্রতিবোধবিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে—কেন, ২।৪

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে—মুণ্ডক, ৩।২।৬

ব্রহ্মলোকে উন্নীত জীব পরান্তকালে (কল্পের অবসানে) পরম অমৃতত্ব লাভ করিয়া পরিমুক্ত হন।'

শুধু পরলোকে কেন, ইহলোকেও যেই তাঁহাকে জানিবে সেই অমৃতত্ব লাভ করিবে।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥—কঠ, ২।৬

'যে কেহ মর্ত্য মানুষ চিত্তকে নিষ্কাম করিতে পারেন, তিনিই অমৃত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।'

অমৃতত্ব-সিদ্ধির সম্পর্কে আরও বক্তব্য আছে, আগামীতে বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

টি-বি

"ছাখো না", ট্রেণ ছাড়তে সুধাময় বললো, "দেওঘর তোমার খারাপ লাগবে না।"

"আর খারাপ লাগলেই বা উপায় কি?" ঝাঁঝালো গলায় বিশাখা উত্তর দিলো। "আমাদের আবার ভালো লাগা আর খারাপ লাগা। বাঁদীর জীবন, ঝি রাখতে পয়সা লাগে তাই বিয়ে কর। দু বেলা দু মুঠো খেতে দিলেই, ব্যাস্, মর্ মাগী তুই খেটে।"

আর কোন কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, সুধাময় জানে। গলার স্বর ক্রমশ সরু আর শাণানো হয়ে উঠবে। কামরার সবগুলো জীবন্ত চোখ নিঃশব্দে বিনা পয়সার মজা দেখবে। কথা না বলাই ভালো, বিগত জীবনের অভিজ্ঞতা এই কথা মনে করিয়ে দিলো। আর সে হঠাৎ ব্যস্তভাব দেখিয়ে টাইম-টেবিলের পাতা খুলে বস্‌লো। কিন্তু দেওঘর না গিয়ে আর কী তার উপায় ছিলো? গত দু-তিন বছর সেখানে যাওয়া হয়নি। ইস্‌মাইল লিখেছে, বাড়ীটা সারানো দরকার। পশ্চিমের পাঁচিলটাও নাকি মাটিতে মিশেছে। তা ছাড়া সাম্‌নের দিকে গোটা দুয়েক নতুন ঘর তোলাতে হবে। তা হলে অনেক বেশী ভাড়া পাবার আশা আছে। এই দুর্দ্দিনে দুপয়সা বেশী কে না চায়?

কিন্তু বিশাখাকে এসব কথা বোঝানো অন্ততঃ সুধাময়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তার নিজের মতটাই প্রধান ও চরম যুক্তি। সুধাময়ের শ্বশুরবাড়ীর সবাই এবারে গোপালপুরে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ঠিক ছিল, তারাও যাবে। কিন্তু তার পরেই এলো ইস্‌মাইলের চিঠি আর সুধাময় ভেবে দেখলো এই পূজোর ছুটিতে দেওঘর গিয়ে নিজেদের বাড়ীগুলোর সংস্কার না করলে আবার সময় পাওয়া কঠিন। আর তা ছাড়া, কী-ই বা এমন খারাপ দেশ দেওঘর? কত লোকেই তো সেখানে চেঞ্জে যায়। সেখানেই তো নিজেদের প্রথম বিবাহিত জীবন কেটেছে! টাইম-টেবিলের অঙ্ক আর ষ্টেসনের নামের ওপর চোখ রেখে আজ হঠাৎ সুধাময় দার্শনিক হয়ে উঠলো; কত তাড়াতাড়ি

পৃথিবী তাদের কাছে রঙ বদ্‌লাচ্ছে! কত তাড়াতাড়ি! সে যেন বৈজ্ঞানিক, অনেক দূরে বসে টেলিস্কোপের মধ্যে মঙ্গল গ্রহকে দেখছে: এই তো সেদিনো সেখানে কমলানেবুর রঙ ছিল, আজ গেল কোথায়?

আর দেওঘরই ভালো, মনে মনে সুধাময় ভাবলো, দেওঘরই ভালো। ছুটিতে লোকে কেন দল বেঁধে বেরোয়? মানুষ, বছরের অধিকাংশ দিনগুলোই তো হিজিবিজি মানুষের ভীড়ে অসাড়। পরিমিত জায়গায় ঠাসাঠাসি করে নিয়মিত দিন কাটানো। মন বিষিয়ে ওঠে। ক্লান্তি লাগে। মানুষের কথা ভাবতে ক্লান্তি লাগে সুধাময়ের। সেই ছুটির দিনে মানুষের সমুদ্র সাঁতরে কোন নির্জ্জন দ্বীপে উঠতে সে ভালোবাসে। চেনা লোকের ভীড় ঠেলে, তৈলাক্ত মসৃণ কথার স্রোত পেরিয়ে কোনো নীল নির্জ্জন দ্বীপ।

তাই, দেওঘরই ভালো।

কিন্তু বিশাখাকে এ কথা বোঝাবে কে? গত কয়েকটা দিন সে বিষাক্ত ঘা-এর মত কুৎসিৎ করে তুলেছে। সুধাময় একবার মত বদ্‌লেছিল, যত ক্ষতিই হোক তারা গোপালপুরে যাবে। কিন্তু বিশাখা বেঁকে বস্‌লো। এ ধরণের দয়ার তার নাকি কোনো প্রয়োজন নেই। গোপালপুরে সে যাবে না। সে দেওঘরে যাবে। সে কথা শোনাবে। ছুটির দিনগুলো সে বিষাক্ত করে তুলবে। আশ্চর্য্য!

কোল্‌কাতার জীর্ণ আকাশের আভাস এখানে নেই। ট্রেণ অনেক দূরে এসে পড়েছে। আশ্বিনের ধারালো নতুন আকাশ, শীতের ছোঁয়া লেগেছে সামান্য। মাঠে এখনও জল শুকোয় নি। ফসলের চারা সতেজ, সবুজ।

আড়চোখে বিশাখার দিকে চেয়ে সুধাময় সিগারেট ধরালো। কামরার কোণে হেলান দিয়ে জানলার বাইরে চেয়ে সিগারেট টানা সুধাময়ের একটা চরম বিলাস। ভারি তার ভালো লাগছে। শুধু বিশাখা যদি খানিকটা বুঝতো।

বিশাখা ডিবে থেকে পান বার করল। নিজে নিলো একটা, তারপর ডিবেটা ঠেলে দিলো সুধাময়ের দিকে। এটা শুভ লক্ষণ, সুধাময় জানে। এখন তাকে শুধু আরো খানিক চুপ করে থাকতে হবে। তারপরে হয়তো কেটে যাবে এই বিষাক্ত কুয়াশা।

উৎসাহিত হয়ে সুধাময় আর একটা সিগারেট ধরালো। এতক্ষণে সবাই ঢিলে হয়ে বসেছে। জীর্ণ দেহ, ফ্যাকাশে পাণ্ডুর চোখ: কত চাপা মানুষের ভীড়। আজ ছুটির দিনে, কত দিন পরে এরা আপিসের খাতা-কলম থেকে চোখ তুলে বাইরে চাইবার অবসর পেয়েছে! কত দিন পরে! এই কদিনের ছুটি তাদের ব্যবহৃত পুরোণো দেহে যেন জীবনের নতুন পালিস লাগিয়েছে। কাজের কুয়াশা নেই। নতুন পালিস, বেশ বোঝা যায়।

বিশ্বাস করা শক্ত এমন সুন্দর দিনে ট্রেণে করে যেতে কারুর খারাপ লাগে। কি করে খারাপ লাগতে পারে? গোপালপুরই হোক আর দেওঘরই হোক, এই যাওয়াটাই তো সব চেয়ে বড় কথা! সুধাময় ভাবলো এই যাওয়াতেই তো চরম আনন্দ, এই যাওয়া। এই নাগরিক জীবন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা। দু-পাশের ক্ষেতে এখন উদ্ধত সবুজ চারা আর ওপরে আশ্বিনের ধারালো নতুন আকাশ। কি করে খারাপ লাগতে পারে?

তবে বিশাখাকে সুধাময় অনেকটা চিনে ফেলেছে। তার মনের চামড়া বয়সের ট্যানিন এ্যাসিডে শক্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সেখানে সামান্যতম অনুভূতির ঢেউও আর তোলে না। সংসারের স্থূল চাপে সে সুস্থ থাকে: স্থূল সংসার। সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে সুধাময় ভাবলো বিশাখার সঙ্গে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের জলজ জন্তুর একটা সাদৃশ্য আছে। তারা কখনো ওপরে ভেসে ওঠে না, চায় না সোনালী-সবুজ আকাশ আর সোনার সূর্য্য। জলের চাপ কম্‌লে তারা ফুলে ওঠে, ফেঁপে ওঠে, ফেটে যায়। বিশাখাও তাই। সংসারের স্থূল চাপের বাইরে সে আসতে চায় না। নির্জ্জনতা নিয়ে সে হাঁপিয়ে ওঠে। বিশাখা বুঝি মরে যায়। এ কারণেই সে গোপালপুরে যেতে চেয়েছিলো। সেখানে বিরাট সংসার, প্রচুর হৈ-চৈ। সেখানে স্থূল সাংসারিক চাপ। সেখানে সে সুস্থ।

বিশাখা চুপ করে রয়েছে। সুধাময় ডিবে থেকে একটা পান বার করলো। কায়দা করে এবারে কথা আরম্ভ করলে ফল ভালো হতেও পারে। সুধাময় জানে। এখন সে ওস্তাদ বৈজ্ঞানিক হয়েছে: বিশাখার মত জটিল আর সূক্ষ্ম যন্ত্রকে ঠিক মত চালাবার কায়দা সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। কখন কোন্

সময় কোন্ চাবি টিপতে হয় সে জানে। মাঝে মাঝে এখনো হয়তো ভুল হয় ; অবশ্য সে রকম ভুল খুব অল্প।

"একটু চূণ দিতে পারো ?"

কাগজে মোড়া শুকনো এক ঢেলা চূণ বিশাখা এগিয়ে দিলো।

"চা খেতে ভারি ইচ্ছে করছে। পরের ষ্টেসনে একবার খোঁজ করতে হবে।"

বিশাখা নড়ে বস্‌লো। "হাঁ, ষ্টেশানের ময়লা চা খেয়ে অসুখ না বাধালে সুখের ষোল-কলা ভর্ত্তি হবে কি করে ?"

যাক্। মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেললো সুধাময়। তার কথার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। উৎসাহিত হয়ে সে বললো, "ষ্টেশানের চা খেলে আবার অসুখ করে নাকি ? পাগল ? গরম জলের মধ্যে জার্ম্‌স্ বাঁচতে পারবে ক্যানো ?"

"না, তা কি আর পারে ? ময়লা কাপ তো ওরা ধোয় ভারি। সাতশো টি-বি রুগীর এঁঠো না খেলে চলছে না।"

"না-না, ভাঁড়ে করে খাবো। তাতে তো আর··· "

"জানি না বাপু। কে তোমার সঙ্গে তর্ক করবে বল ? একটা কথা যদি শোনো··· "

"না-না, তাই কি আর বলছি নাকি ! তুমি অমত করলে··· "

"থাক্, ঢের হয়েছে। আমার আবার মতামত। দ্যাখো, ন্যাকামো কোরো না।"

সুধাময় একটু বিমর্ষ হয়ে চুপ করলো। এ কথা এখানেই শেষ হওয়া ভালো। খানিক চুপচাপ।

"বেরুবার আগে," সামান্য নড়ে বসে বিশাখা নিজে থেকেই আরম্ভ করলো, "মুখের কথাটা একবার খসালেই তো পারতে। এ বাঁদী তো ছিলই। ফ্লাস্কে করে চা না হয় করেই আনতুম।"

"অত হাঙ্গামা করে চা খাবার কী দরকার।" একটু থেমে সুধাময় বললো, "চায়ের জন্যে সত্যি তো আর কষ্ট হচ্ছে না। সন্ধ্যেয় ওখানে পৌঁছেই না হয় খাওয়া যাবে। ইস্‌মাইল সব ব্যবস্থা করে রাখবে নিশ্চয়।"

"হ্যাঃ, ইস্‌মাইল তোমার জন্যে চা নিয়ে বসে থাকবে! চাল-ডাল ছুটো ফুটিয়ে রাখলেই বাঁচি।"

"না গো না। লোকটা খুব এক্‌স্‌পার্ট। দেখো, সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখবে।"

"ভালো হলেই ভালো।" বিশাখা চুপ করলো।

কথার ঝাঁঝ কমে এসেছে। এটা ভালো লক্ষণ। হয়তো আরো মাইল খানেকের মধ্যে সে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। সুধাময় স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেললো।

কিন্তু ঘণ্টাখানেকও অপেক্ষা করতে হল না। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামতে বিশাখা নিজেই চা-ওলাকে ডাকলো। কিনলো ছু ভাঁড় চা। তারপর বললে, "চা-চা। এই নাও। হল তো?"

সুধাময় একমুখ হাসলো। হল বৈকি। নিশ্চয়ই!

ট্রেণ আবার ছাড়লো আর এর পর থেকে তাদের অনাবশ্যক ব্যবধান কমে এলো। বিশাখা যে আবার এতো তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে আসবে সুধাময় তা ভাবে নি। দূরে সবুজ পৃথিবীর সীমা ঘুরছে, জানলার ভেতর দিয়ে দেখতে ভারি ভালো লাগে। পৃথিবীর গ্রামোফোন ঘুরছে, শব্দে-ছন্দে-ঝঙ্কারে অপরূপ। কখনো চকিত পালিয়ে যাওয়া বাবলা গাছের পেছনে নিশ্চিন্ত নীল আকাশ। আর পাউডার-পাফের মত থোপা থোপা মেঘ কি যেন মনে পড়িয়ে দেয়: সে কি অনেক অনেক দিন আগেকার সবুজ পৃথিবী আর সোনালী আলো? সুধাময়ের ভালো লাগলো: তৈলাক্ত মানুষের ভীড় ছিঁড়ে এই অলস উধাও যাত্রা।

"এবারে একদিন ত্রিকূটে যাওয়া যাবে, কি বল?"

"বুড়ো হতে চল্‌লুম, এখন কি আর উঠতে পারবো?"

"খুব পারবে। বুড়ো আবার কি? তা ছাড়া ওপরে যে উঠতেই হবে তা তো নয়। নীচেই কোনো গাছতলায় সমস্ত দিন কাটানো যাবে। অদ্ভুত টাট্‌কা, তাজা হাওয়া..." বলতে বলতে সুধাময়ের যেন নেশা ধরে গেল। মানুষের ভীড় নেই, হৈ-চৈ নেই: সবুজ পৃথিবী আর আশ্বিনের ধারালো আকাশ। বাতাসে ঝল্‌মল্ মর্ম্মর ছুপুর। শান্ত সন্ধ্যা। নিছক আল্‌সেমি

করে একটা পুরো দিন কাটানো, মাঝে মাঝে সিগারেট টানা। হঠাৎ ভেবে পেলো না সুধাময় এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে!

সন্ধ্যে সাতটায় ট্রেণ এসে দেওঘরে পৌঁছুলো।

ষ্টেশনে ইস্‌মাইল হাজির। পরিষ্কার ডোরাকাটা সার্ট আর ফরসা ধুতি পরে এক হাতে লণ্ঠন অন্য হাতে লাঠি নিয়ে সে অপেক্ষা করছিলো। অনেক দিন পরে তার মনিব আসছে। কি করলে তারা খুসি হবে এ নিয়েই সে ব্যস্ত। লোকটা বেজায় চট্‌পটে আর বুদ্ধিমান। তার কথা-বলা আর হাব-ভাব সমস্তই চমৎকার মাজা-ঘষা। এখানে সুধাময়ের কতকগুলো ছোটোবড় বাড়ী আছে। ভাড়া নেহাৎ মন্দ পাওয়া যায় না। সহর ছাড়িয়ে দু-তিন বিঘে জমির ওপর বাড়ীগুলো ছড়ানো। বাকী জায়গাটায় প্রকাণ্ড বাগান, আম-পেয়ারা-জামরুল-পেঁপে ইত্যাদি গাছের ভীড়। ফুল গাছও আছে। এ সমস্ত সুধাময়ের পৈতৃক সম্পত্তি। অনেক দিন আগেকার কেনা। তখন দাম খুব শস্তা ছিলো। এখন বেশ চড়েছে। ইস্‌মাইল লোকটা পুরাণো আমোলের। তার ওপরেই এখানকার সমস্ত ভার: বাড়ী সারানো থেকে ভাড়াটে জোগাড় করা আর ভাড়া আদায় করে সুধাময়কে পাঠানো পর্য্যন্ত। লোকটা বিশ্বাসী, এ পর্য্যন্ত তার ব্যবহারে কোনো খুঁৎ পাওয়া যায় নি।

ইস্‌মাইল তাদের প্রণাম করলো। সূর্য্যাস্ত বহুক্ষণ হয়েছে। সন্ধ্যার মিলিয়ে-আসা আলোয় ওপরের আকাশ নীল হ্রদের মত টলটলে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সমস্ত শরীর শিরশির করে: ভালো লাগে।

কুলির মাথায় জিনিসগুলো চাপিয়ে ইস্‌মাইল বললো, "বাইরে গাড়ী ঠিক করে রেখেছি মা। আসুন।"

বিশাখা স্পষ্টই খুসি হয়ে উঠেছে। "হ্যাঁ বাবা যাচ্ছি।" তারপর স্বামীকে উদ্দেশ্য করে, "চলো গো, যাওয়া যাক। যা দূর, যেতে তো আবার ঘণ্টাখানেক লাগবে।"

চেকারকে টিকেট দিয়ে তারা ঘোড়ার গাড়ীতে এসে উঠলো। মালপত্র তুলে ইস্‌মাইল বসলো কোচওয়ানের পাশে। সুধাময় নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরালো। গাড়ী ছাড়লো।

তারা বাড়ী পৌঁছুল। আকাশে তখন আলোর আভাস নেই। [illegible] স্বচ্ছ আকাশে তীক্ষ্ণ তীব্র তারার ভীড়।

বাড়ীর মালিগুলো গাড়ীর শব্দে ছুটে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। ইস্‌মাইল গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়ালো। মনিব এসেছে। স্পষ্টই তারা উত্তেজিত আর খুসি। তারা অন্ধকারে মালপত্র নিয়ে দিব্যি চলে গেল। ইস্‌মাইল লণ্ঠন নিয়ে পথ দেখাচ্ছে। ডানদিকের পেয়ারা গাছে অনেক জোনাকি। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। গাঁদা ফুলের ঠাণ্ডা গন্ধ হঠাৎ এলো।

এই বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে গোটা পাঁচ-ছয় ছোটো বড় বাড়ী। মাঝেরটাই বড় আর ভালো। সেখানেই তারা থাকবে লিখেছিল। তাই ইস্‌মাইল সেটা ভাড়া দেয়নি। তিনটে বাড়ীতে ভাড়াটে এসেছে। বাকী বাড়ীগুলোও ভাড়া হয়ে গেছে। আজ কালের মধ্যে লোক আসবে।

অন্ধকার। অন্য বাড়ীগুলোয় কেরোসিনের আলো জ্বলছে। বাড়ীর পুরাণো কুকুরটা কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। বিশাখার হাতে আগে সে প্রত্যহ ভাত খেয়েছে।

"দ্যাখো দ্যাখো, তোমার ভুলু এসেছে। তোমাকে ভোলেনি তো!" সুধাময় বললো।

বিশাখা নীচু হয়ে কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। "ও মা! কি ছিরিই হয়েছে! তোকে বুঝি কেউ খেতে-টেতে দেয় না রে?"

লণ্ঠন নিয়ে ইস্‌মাইল দাঁড়িয়েছিল। বললো, "খেতে দোবো না কি মা! রোজ নিজে হাতে খাওয়াই। হতভাগা পাড়ায় পাড়ায় ফাঁকি দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু খাবার সময় ঠিক হাজির। ভারি ফাঁকিবাজ হয়েছে।"

বাঁ দিকের হাত পঞ্চাশ দূরে ছোটো একটা বাড়ী। সেখানে ভাড়াটে এসেছে। খিড়কির কপাট দুটো খোলা। একটি মেয়ে তাদের দেখছে, একটি ছোটো ছেলে তার শাড়ীর পাড় ধরে দাঁড়িয়ে। লণ্ঠনের আলোটা তাদের মুখে পড়ে নি। তাই কিছু বোঝা গেল না।

বিশাখা বললো, "যাক্। আর মুখ বুজে থাকতে হবে না। কালকেই আলাপ করবো। ওঁরা কে ইস্‌মাইল?"

"উনি রায়বাবুর স্ত্রী। একমাস হল এসেছেন। কিছুদিন থাকবেন।"

এখানে পথটা ডানদিকে বেঁকেছে। আর একটু এগুতেই বড় বাড়ীটা

পাওয়া গেল। প্রথমে ঢাকা বারান্দা, তারপরে ঘর। ঘরে কেরোসিনের আলো জলছে। মাল্লীরা মালপত্র বারান্দার একপাশে নামিয়েছে।

ইস্‌মাইল ভারি ব্যস্ত। সে বললো, "ভেতরে চলুন মা। আমি চা-খাবার নিয়ে আসছি।"

চা-এর নামে সুধাময় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ইস্‌মাইল কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হল। তারা ভেতরে এলো।

নতুন চুণকাম করা হয়েছে। ঘরে চুণের কাঁচা গন্ধ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। মেঝে ধুইয়ে, ঝাঁট দিইয়ে ইসমাইল সমস্ত তকতকে করে রেখেছে। ছোট্ট ব্র্যাকেটের ওপর কেরোসিনের বড় আলোটায় বেশ ভালো আলো হচ্ছে। এটা বসার ঘর। মাঝের টেবিলটায় নতুন ছোট্ট ঝুড়িতে বাগানের টাট্‌কা ফল সাজানো। কিছু ফল কেনাও হয়েছে দেখা গেল।

বিশাখা সত্যিই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। লণ্ঠনটা নিয়ে সে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ইজিচেয়ারে সুধাময় হাত-পা এলিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ইস্‌মাইল ফিরে এলো। হাতে মস্ত এক ট্রে: দু পেয়ালা গরম চা, দুটো প্লেটে ফল আর নিম্‌কি সাজানো। লোকটার পছন্দ নিঃসন্দেহে সৌখীন।

মাঝের টেবিলটায় সেগুলো নামিয়ে রেখে ইস্‌মাইল আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলো। "ওগো, এসো শিগগীর। খাবার এসেছে।" সুধাময় ডাকলো। ফিরে এলো বিশাখা।

"বাঃ, সত্যিই ইস্‌মাইল তোমার এক্‌স্‌পার্ট। সব ঘরগুলো ঝক্‌ঝক তক্‌তক্‌ করছে। ওমা," ট্রের দিকে চেয়ে বিশাখা যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠলো, "ওমা! এতো সব কখন আনলে ইস্‌মাইল?"

দুটো চেয়ার টেবিলের কাছে ইস্‌মাইল এগিয়ে আনলো। ঠোঁটের পাশে লজ্জিত হাসি।

"কাপ-প্লেট কিছুরই অভাব নেই! পেলে কোথা থেকে?"

"আজ্ঞে মা, ও সমস্ত রায়বাবুদের বাড়ী থেকে নিয়ে এলুম। ওনাদের ওখানেই আজ খাবার বন্দোবস্ত করেছি। বেশী দেরী নেই। ওনাদের লোক এসেই আজ রাতে খাবার দিয়ে যাবে।"

"ওগো, ট্রেনের মুখ-হাত আগে ধুয়ে এসো। বাথরুমে জল-সাবান সবই আছে। ইস্‌মাইল, বিছানা খুলে তোয়ালেটা বার করে দাও তো।"

চটপট বিছানা খুলে ইস্‌মাইল তোয়ালে বার করে দিল। মুখ-হাত ধুয়ে এলো সুধাময়। জিনিষপত্র সমস্ত ইস্‌মাইল গুছিয়ে রাখছে। পাশের ঘরটা শোবার। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিছানা পেতে, মশারি টাঙিয়ে ইস্‌মাইল ঠিক করে ফেললো।

"আজ এই রকমই থাকুক মা। কাল দেখিয়ে দেবেন। তখন সাজিয়ে রাখবো।"

সকালবেলায় যে লোক আগুন ছিলো সন্ধ্যায় যে তাকেই জল হতে দেখবে, সত্যি বলতে কি, সুধাময় এতোটা আশা করেনি। ইস্‌মাইলের ওপর মনে মনে সে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো। যাক্‌, ছুটিটা কাটবে ভালোই।

রাত্রির খাওয়া শেষ হলো। তখন তারা বাইরের ঢাকা বারন্দায় ডেক্‌-চেয়ারে বসে গল্প করছে। অন্ধকার। খুসিতে কারুর চোখে ঘুম নেই। সেই পুরোনো পলাতক দিনের সৌরভে আজকের রাত্রি হঠাৎ যেন ভরে গেছে। অদ্ভুত অন্ধকার! গেটের পাশে ইয়ুক্যালিপটাস্‌ গাছের দীর্ঘ ডালপালা থম্‌থম্‌ করছে। রাত্রির অন্ধকার চুলে ডালপালারা আঙুল বুলুচ্ছে। বিশাখার পায়ের কাছে ভুলু কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে। জেগে আছে কি ঘুমুচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। আকাশের তারায় নতুন পালিশ। বাতাসে মিষ্টি শীত। পূব-আকাশ নিঃশব্দে তোলপাড় করে এবারে চাঁদ উঠলো। খানিকটা তার অন্ধকার, বাকীটা আশ্চর্য্য উজ্জ্বল। চাঁদ আজ স্বপ্ন দেখছে। এখনো ভালো করে ঘুম তার ভাঙেনি। আধবোজা চোখ। শিরশির করে উঠলো ইয়ুক্যালিপটাসের পাতাগুলো। ও কিছু নয়, বাতাস। আর সুধাময়ের হঠাৎ মনে পড়লো কতদিন এ ভাবে চাঁদকে উঠে আসতে সে দেখেনি! চাঁদকে সে ভুলে ছিলো! ভুলে ছিল! কতদিন! বলো, কতদিন! আজ অনেক বছর পরে এখানে আকাশ তাকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে এসেছে! তবু, অনেক তারা এগিয়ে এসেছে। সেদিন নেই আর। নইলে বিশাখাকে হয়তো সে গান গাইতে বলতো। গান: আশ্চর্য্য, কতদিন সে বিশাখার গান শোনে নি!

অন্ধকারের প্রচ্ছদপট ক্রমশঃ স্বচ্ছ হয়ে এলো। এখানকার ছবি স্পষ্ট হয়ে

উঠ্ছে। চেনা-না-চেনা, খানিক-মনে-পড়া, খানিক-ভুলে-যাওয়া এখানকার ছবি।

হাত ঘড়িতে তখন দশটা বেজে দশ মিনিট। সুধাময় বললো, "চলো গো, শোয়া যাক। সমস্ত দিন ট্রেণে এসেছি। তোমার ক্লান্তি লাগ্ছে না ?"

"নাঃ, এমন আর কি।"

বিশাখা একটু থামলো। একটু ভাবলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো সে। আর বললো, "চলো।"

তার পরক্ষণেই পাশের ছোটো বাড়ীটা থেকে প্রচণ্ড কাশির শব্দ এলো : খক্-খক্ ; শেষহীন, বুকভাঙা কাশির শব্দ। তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলো। এর আগেও, তাদের মনে পড়লো, ও বাড়ীতে তারা কাশির শব্দ শুনেছে। অন্য কাজে তারা ব্যস্ত ছিলো, মন দেয়নি। কিন্তু এ কাশি যেন থামতে চায় না, বুকভাঙা শেষহীন শব্দ। মিনিট পাঁচেক পরে শব্দ থামলো। মিনিট পাঁচেক তারা মুখোমুখি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। ঘরের আলো বিশাখার খানিকটা মুখে এসে পড়েছে। উদ্বেগে ফ্যাকাশে তাব ফরসা চামড়া।

"না বাপু", শব্দ থামতেই বিশাখা বললো, "আমার মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না। ইস্মাইলকে ডাকো তো একবার। জিগ্গেস করি, ও বাড়ী কাকে সে ভাড়া দিয়েছে।"

ইস্মাইলের আসতে দেরী হল না। তাকে দরজার কাছে দেখেই তীব্র গলায় বিশাখা জিগ্গেস করলো, "পাশের ছোটো বাড়ীটা তুমি কাকে ভাড়া দিয়েছো ?"

নিমেষে ইস্মাইলের মুখের রঙ্ বদ্লে গেল, "আজ্ঞে মা, ও একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। কোথাও ওনারা বাড়ী পাচ্ছিলেন না, তাই··· "

"তাই তুমি এক টি-বি রুগীকে ভাড়া দিয়েছো ?" উত্তেজনায় থর থর করছে বিশাখা।

"আজ্ঞে, আগে তো ঠিক জানতুম না, ওনার অসুখ আছে। তবে তিন চার দিন ধরে দেখছি বাবু মাঝে-মাঝে কাশে, লাঠি ধরে অল্প বেড়াতে বেরোন। জিগ্গেস করলে সোজা উত্তর দেন না।"

"কতদিন ওঁরা এসেছেন ?" সুধাময় জিগগেস করলো।

"আজ্ঞে, দিন সাত-আট হবে ।"

"যেমন তুমি", ঝাঁঝাঁলো গলায় বিশাখা প্রায় চীৎকার করে উঠলো", তেমনি বে- আক্কেলে তোমার লোকজন—এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না। এক্ষুনি ইস্‌মাইল গিয়ে ওদের বার করে দিয়ে আসুক ।"

"এই, একটু আস্তে······"

"আস্তে আবার কী ?" বিশাখার স্বর আরো চড়ায় উঠলো, লোক ঠকিয়ে বাড়ী ভাড়া করা। ওদের পুলিসে দিয়ে ছাড়বো। জানো টি-বি রুগীকে ঘর ভাড়া দিচ্ছো শুনলে কখনো আর তোমার বাড়ী ভাড়া হবে ? কালকেই আমি গিয়ে অন্য বাড়ীর লোকদের সাবধান করে দিয়ে আসবো। বলবো, তাঁরা যেন উঠে যান। সবাই চেঞ্জে এসেছেন, মরতে আসেন নি তো ।"

পায়ের নখ দিয়ে ইস্‌মাইল মেঝে খুঁটতে লাগলো।

কী দাঁড়িয়ে রইলে ক্যানো ? কথাগুলো কানে গ্যাল না ?"

"তুমি পাগল হলে নাকি ?" অস্বস্তিতে সুধাময় নিজেই প্রায় পাগল হয়ে গেল, আজ রাতেই কখনো ওঁদের যেতে বলা যায় ? এই মাঝরাতে কোথায় ওঁরা যাবেন ?"

"সে কি আমাদের জানার কথা ?" বিশাখা কোনা যুক্তি-তর্কই শুনবে না। "আমরা তো আর টি-বির হাসপাতাল খুলি নি। যে বিয়ের যা মন্তর। এই মুহূর্ত্তে ওদের বেরিয়ে যেতে বল : ঠগ. জোচ্চোর, বদ্‌মাইস।···"

সুধাময় বিশাখাকে চেনে। সে জানে পাশের বাড়ীর ভাড়াটে যতক্ষণ না উঠে যাবে ততক্ষণ এই চীৎকার চলবে। বিশাখা ক্রমশঃ নিজের শাসনের বাইরে চলে যাবে। সে হিস্‌টিরিক্ হয়ে উঠবে।

"···এই করতে আমাকে এখানে নিয়ে এলে ? টি-বি রুগীর সঙ্গে থাকার জন্যে ? যেমনি মনিব তেমনি জুটেছে তার চাকর।···দু-পয়সা বেশী হাতে গুঁজে দিলেই যাকে হোক বাড়ী ভাড়া দিয়ে দেবে! ক্যানো, মনিবের নুন তোরা খাস্ না ? ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দাও অমন লোককে। বিশ্বাসী লোক! পুরোণো লোক! এই না করলে আর বিশ্বাসী লোক হয়! ও হতভাগা তো সব পারে দেখেছি! এ বাড়ীও হয়তো রুগীদের ও ভাড়া দিয়েছিল ?···"

"না মা। আল্লার কসম। এমন কাজ কখনো করিনি। আগে জানলে

কি আর ওনাদের ভাড়া দিতুম? কাল সকালেই ওনাদের কথা আপনাদের বলতুম।"

"তা হলেই আমরা উদ্ধার হয়ে যেতুম। মাথা কিন্‌তিস্ হারামজাদা।" বিশাখা দস্তুরমত কুৎসিৎ হয়ে উঠেছে, "চোর, বদমাইস্ উল্লুক···"

"আহা, অমন করছো ক্যানো? রাতটা যেতে দাও···"

"সখ করে করছি, না? মাঝরাতে চীৎকার করতে আমার খুব ভালো লাগছে!—এই মুহূর্ত্তে ওদের দূর করে দাও। নয়তো এই আমি চললুম। বিয়ের সময় এমন কথা কি বাবা মা লেখাপড়া করে দিয়েছিলেন যে টি-বি রুগীর সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে?"

"আঃ, বাড়াবাড়ি করছো ক্যানো? ও বাড়ী তো খানিক তফাতে। তা ছাড়া···"

"থামো," রীতিমত ধমক দিয়ে উঠলো বিশাখা। "বাড়াবাড়ি করছি? বলতে লজ্জা হল না?—তুমি যাবে, নাকি আমিই নিজে গিয়ে তাদের বার করে দিয়ে আসবো?"

সুধাময় শঙ্কিত হয়ে উঠলো। এখুনি কি যে কেলেঙ্কারি হবে কে জানে। "লক্ষীটি শোনো। আজ রাতটা যেতে দাও। কাল আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করবো।"

আরো অনেক বোঝানোর পর বিশাখা খাণিক ঠাণ্ডা হল। সে রাতে আর কারুর ঘুম এলো না। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে সারারাত সুধাময় বারান্দায় পায়চারি করলো। বসার ঘরে চেয়ারের ওপরেই বিশাখার সমস্ত রাত কাটলো, খানিক ঘুমিয়ে খানিক বকাবকি করে।

এ রকম দুশ্চিন্তায় সুধাময়ের কোনো রাত কাটেনি।

সূর্য্য তখনো ওঠেনি। শিশিরে সমস্ত মাঠ ভিজে। মুখ হাত না ধুয়েই ছোটো বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালো সুধাময়। নেহাৎ ছোটো বাড়ী। থাকার মত মাত্র দুটো ঘর। ভাড়া টাকা দশেকের মধ্যে।

সজোরে কড়া নাড়ালো সুধাময়। "কে আছেন ভেতরে?"

দরজা খুলে খানিকটা ঘোমটা টেনে এক বিধবা মহিলা বেরিয়ে এলেন। "আমরাই এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছি।"

"শুনে খুব সুখী হলুম। এই মুহূর্ত্তে বাড়ী খালি করে বেরিয়ে যান। এ্যাডভান্স যা দিয়েছেন তা আর পাবেন না। বেরিয়ে যান শিগ্গীর···"

অপমানে, ভয়ে, সুধাময়ের রাতজাগা আর উস্কোখুস্কো চেহারা দেখে বিধবা মহিলার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তবু কথা তাঁকে বলতে হল, "বেরিয়ে কোথায় যাব বাবা? ছুদিন ধরে আবার খোকার কাশিটা বেড়েছে। এখানে অন্য বাড়ী পাইনি। অনেক খুঁজে অল্প টাকায় এখানে এলুম···"

"কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যান আপনারা। আপনারা মরুন-বাঁচুন আমাদের তা দেখবার দরকার নেই। আপনাদের জন্যে আমরা তো আর মরতে পারি না।"

সুধাময়ের চীৎকারে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বছর কুড়ির একটি ছেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। গাল ছুটো ভাঙা, চোখ কোটরে ঢুকেছে, সরু লম্বা চেহারা, সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি তার নেই।

"এই যে, আপনারই অসুখ বুঝি?" আপাদমস্তক ভালো করে নিরীক্ষণ করে সুধাময় জিগ্গেস করলো।

উত্তেজিত হয়ে এইটুকু হেঁটে আসতেই ছেলেটা বেজায় হাঁপাচ্ছে, ঠোঁটগুলো থরথর করছে, সেখানে অসুস্থ আরক্ত আভা। অতি কষ্টে সে বললো, "আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখুন স্যার, আপনি রাগ করবেন না। অসুখটা একটু কমলেই বাড়ী ছেড়ে দেবো। দেখ্ছেন তো", সে হাঁপাতে লাগলো, "দেখ্ছেন তো আজ আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। আর স্যার," সুধাময়কে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছুটো হাত রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে সে বললো, 'সব রকম প্রিকশ্যান নিচ্ছি। স্পুটাম পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। ব্লিচিং পাউডার আর ফিনাইল···," মুখে কাপড় দিয়ে অমানুষিক কষ্টে কাশির একটা ধাক্কা সামলে নিলো সে। কিন্তু দাঁড়াতে পারলো না। চৌকাঠের কাঠটা কোনো রকমে হাৎড়াতে হাৎড়াতে দরজার পাশে সে বসে পড়লো।

"অমন কচ্ছিস্ ক্যানো বাবা, জল আনবো?"

'না মা," ততক্ষণে ছেলেটি সামলে নিয়েছে, "না মা, ঠিক আছি।" তারপর

সুধাময়ের দিকে চেয়ে সে হাসতে চেষ্টা করলো, "একটু উইক্ হয়ে পড়েছি স্যার। ···ডাক্তার বললে কোলকাতার বাইরে কোথাও যেতে। টাকাকড়ি বেশী নেই, তাই কাছাকাছি কম খরচে যাতে হয়···। মা'কে বললুম যা হবার তা তো হবেই, তবে আর অনর্থক পয়সা খরচা করে কোলকাতার বাইরে যাই ক্যানো ? কিন্তু মা···," তার কোটরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া চোখ দুটো মেলে সুধাময়ের দিকে চেয়ে এবার সে হাসতে চেষ্টা করলো।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সুধাময় প্রস্তুত হয়ে নিলো। "বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই। জানেন, চিটিং চার্জ্জে আপনাদের আমি পুলিসে হ্যাণ্ড্ ওভার করে দিতে পারি ? আমি বেড়াতে চড়লুম। ফিরে এসে যদি আপনাদের দেখি তা হলে জোর করে বার করে দিতে বাধ্য হব।"

ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে হন্ হন্ করে সুধাময় বেরিয়ে গেল। তার মা দরজা ধরে থরথর করে তখনো কাঁপছেন।

এমন সময় দেখা গেল একটি সুন্দর ফরসা মেয়ে তাদেরই বাড়ীর দিক এগিয়ে আসছে : সে বিশাখা। বিধবা মেয়েটি তাকে আন্দাজে চিনলো।

"সারারাত ধরে কত বোঝালুম", বিশাখা তাদের কাছে এসে বললো, "বললুম ওঁদের তুমি সক্কালেই যেতে বোলো না। থাকুক না। সাবধানে থাকলে আর ভয় কি ? আর এই বিদেশ বিভুঁয়ে চট্ করে যাবেনই বা কোথায় ? যাবো বললেই তো আর যাওয়া হয় না ! তা উনি কি আর শোনেন ? বেজায় রগচটা লোক। কাল রাতেই বলেন, চললুম থানায়। হাতে পায়ে ধরে থামাই।" একটু থেমে আঁচল থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে বিশাখা বললো, "এই নিন দিদি। আপনারা কোলকাতাতেই ফিরে যান। আমি গাড়ী ডাকতে পাঠিয়েছি। আমার বিশেষ অনুরোধ দিদি, উনি ফেরার আগেই আপনারা রওনা হয়ে পড়ুন। যা রগচটা লোক, কখন কী যে করে বসবেন কেউ জানে না।"

কৃতজ্ঞতায় বিধবা মহিলা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। "না, খোকাকে আর বাঁচাতে পারলুম না। কী আর করবো দিদি, আমার কপাল।"

ইস্‌মাইল জানালো গাড়ী এসেছে।

বিশাখা চোখে কাপড় দিয়ে জল মুছলো। নিজেই সে নোট দুটো বিধবার

কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিলো। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বললেন, ' আপনাদের ঋণ দিদি জীবনে শোধ করতে পারবো না।...খোকা, ওঠ্ বাবা, জামা জুতো পরে নে।"

ইস্‌মাইলকে বিশাখা আদেশ দিলো জিনিসগুলো সে যেন গাড়ীতে তুলে দেয়। মিনিট পনেরোর মধ্যে রওনা হল তারা।

আশ্বিনের ধারালো আকাশে সূর্য্য সোনা ছড়িয়েছে। শিশির প্রায় শুকিয়ে এলো।

বেলা বারোটা নাগাদ সুধাময় বেড়িয়ে ফিরলো। সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে, মুখের ওপর রক্ত উঠে এসেছে, টকটকে লাল।

"ওমা, এ কী মূর্ত্তি ?" বিশাখা চমকে উঠ্‌লো, ' বোস বোস, পাখাটা নিয়ে আসি।"

' থাক্, হাওয়ার দরকার নেই।" সুধাময় সিগারেট ধরিয়ে জিগ্‌গেস্ করলে, ' কি হল ?"

' হাঁ, ওরা চলে গেল। আহা বেচারা, এমন কষ্ট হচ্ছিল। আমি কুড়িটে টাকা দিয়ে দিয়েছি। ছেলেটা বোধ হয় আর বাঁচবে না। বিধবার একমাত্র ছেলে। তুমি কিন্তু অতটা কড়া না বললেও পারতে। আমারি খারাপ লাগছিলো।"

"হুঁ," ইজি চেয়ারটায় লম্বা হয়ে শুয়ে সুধাময় বললো, ' ইস্‌মাইলকে চা দিয়ে যেতে বল। সকাল থেকে অনেক ঘুরেছি। এখনো কিছু খাই নি।"

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ফ্লাউড্ কমিশন ও জমিদারী প্রথা

জমিদারী প্রথা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে, ব্যক্তিবিশেষের উপর জমির "দারত্ব" বা স্বামিত্ব অর্পিত হয়েছে। জমি থাকলেই তার "দার" থাকবে—অর্থাৎ যে কৃষক নয়। জমির প্রয়োজন কৃষক ও জমিদার। কৃষক চাষ করবে এবং জমিদার সেই কৃষককে সাহায্য করবে। অতএব জমিদারী প্রথা জমির সঙ্গে জড়িত। অনেকে ভাবেন যে, জমিদারী প্রথা শুধু তখনই প্রবর্তিত হল যখন ব্যক্তিবিশেষের হাতে জমির অধিকার চলে গেল। এ হ'ল জমিদারী প্রথার এক রূপ। জমিদারীর কাজ ব্যক্তিবিশেষ সম্পন্ন করতে পারেন—গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন অথবা অন্য কোন সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান বা সমিতি সেই জমিদারত্ব গ্রহণ করতে পারে। মোট কথা, জমি থাকলেই কৃষক ও জমিদার থাকবে। যাঁরা ভাবেন যে, কৃষককে জমির মালিক করে দিলে জমিদারের স্থান নিঃশেষিত হ'ল তাঁরা জমিদারী প্রথার সংকীর্ণ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু জমিদারী প্রথার মূল কথার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই। কৃষক জমির মালিক হলেও তার জমিদারের প্রয়োজন কারণ সে নিজে নিঃস্ব, জমিদারের সাহায্য ব্যতীত চাষ করা তার পক্ষে অসম্ভব, চাষের উন্নতি তো সম্ভব নয়ই। তাই যিনি কৃষককে সাহায্য করেন, উন্নতির পথ নির্দেশ করেন, প্রগতির পথে এগিয়ে দেন, জমিকে সদ্ব্যবহার করতে শেখান এবং অসদ্ব্যবহারের জন্য শাস্তি দেন—প্রকৃত পক্ষে তিনিই জমির মালিক এবং জমিদার। কৃষকের মালিকত্ব শুধু কথার কথা—রাজনৈতিক চাল, ঐতিকহাসিক ভাণ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থামাত্র। কারণ কৃষক মালিক হয়েও তাকে পরের সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে এবং পরের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা মানতে হবে। এই জমিদারী কথাটার সম্পূর্ণ অর্থ সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন নন, জমিদারী প্রথার মূলতত্ত্ব তাঁরা বুঝতে পারবেন না। কঠিন কড়া কথার আন্দোলনে কোন প্রতিষ্ঠিত প্রথা ভেঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু তাতে সেই প্রথার তথ্য ও সত্য বুঝতে পারা যাবে, তার কোন প্রমাণ নেই। তাই জমিদারী প্রথার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট

ধারণা না থাকলে ভূমি সমস্যা সম্বন্ধে কোন আলোচনা এবং সমাধানের জন্য কোন পথ-নির্ণয় সার্থক হ'তে পারে না।

এই তত্ত্বের মূল কথা যদি আমরা জানি ও মানি, তাহ'লে ফ্লাউড্ কমিশনের মতবাদ বুঝবার পক্ষে আমাদের সুবিধে হ'বে। ফ্লাউড্ কমিশন অনেক কথা বলেছেন—তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান কথা হচ্ছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশের কল্যাণের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ এবং জমিদারী প্রথা রদ করতে হবে। এখানে জমিদারী প্রথা মানে ব্যক্তির জমিদারত্ব এবং তাকে রদ করবার জন্য এই জমিদারী ব্যক্তির হাত থেকে গভর্ণমেণ্টের হাতে গিয়ে পড়বে। এতে অাঁতকে ওঠবার কোন কারণ নেই কারণ গভর্ণমেণ্টের জমিদারী বাংলাদেশে এখনও বিদ্যমান। ফ্লাউড্ কমিশন এই সমস্ত দেশের চাষ-ভূমিকে খাসমহলে পরিণত করতে চান। ব্যক্তির স্থানে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবেন এবং কমিশন বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তির জমিদারত্ব পরিত্যক্ত হলে বাংলাদেশে "রামরাজত্ব" প্রতিষ্ঠিত হবে। গভর্ণমেণ্ট জমিদার হওয়া এবং সেই জমিদারী দেশের কল্যাণের জন্যে উৎসর্গীকৃত হওয়া —এই দু'কথা এক কথা নয়। অথচ গভর্ণমেণ্ট জমিদার হ'লে দেশের কল্যাণের জন্য সেই জমিদারীকে নানাভাবে সংস্কৃত করা সহজ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং এই সম্ভাবনা আছে বলেই আমরা গভর্ণমেণ্টকে জমিদার হবার জন্য অনুরোধ জানাই। ফ্লাউড্ কমিশন সেই সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য কোন পরিকল্পনা দেননি। তাই বলতে হয় যে, কমিশনের মতবাদে ঝাঁঝ আছে কিন্তু ঝাল নেই—অর্থাৎ তার সিদ্ধান্ত সুস্বাদু হয়নি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে আমরা আজ বুঝি যে, জমা বা ভূমিরাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে। জমিদার খাজনা আদায় করতে সমর্থ হোক্ বা না হোক্, তাঁকে সেই স্থিরীকৃত রাজস্ব দিতেই হবে। নইলে তাঁর সম্পত্তি বিক্রী করে স্থিরীকৃত রাজস্ব সংগৃহীত হবে। কিন্তু ১৭৯৩ সালে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল, তা সুধু জমার পরিধির ভিতরই সন্নিবিষ্ট ছিল না— এর ব্যবস্থা অনেক গভীর ও বিস্তৃত ছিল, এবং উক্ত বন্দোবস্ত নানাভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু ১৮৫৯ খৃঃ পর্যন্ত নানাবিধ প্রজাস্বত্ব আইনের চেষ্টায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে কঙ্কাল মূর্তি আজ দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ১৭৯৩

খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে চালালে ইতিহাসকে অশ্রদ্ধা করা হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই যে আমূল পরিবর্তন ও সংশোধন হয়েছে, এতকাল এর কোন আইনগত বাধা ছিল না। বৃটিশ শাসকের সুবুদ্ধির উপর এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দাঁড়িয়ে ছিল এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের চেষ্টায় এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজ অন্তঃসারশূন্য হয়েছে। ১৮৫৯ সালের এবং ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন বৃটিশ কর্মচারীদের "প্রতিভা" প্রসূত এবং উক্ত আইন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে জখম করেছে, ভূমি প্রথাকে জটিল করেছে এবং প্রকৃত চাষীকে অপাঙ্‌ক্তেয় করেছে। সে আইন যদি সত্যিকারের সমস্যা-সমাধানে প্রবৃত্ত হ'ত, তাহলে বাংলার ভূমি সমস্যা আজ এত জটিল হতো না। কিন্তু সে-কথা আজ থাক্।

আজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করতে হলে গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য কারণ ভারত-শাসন-সংস্কার আইনে সে-রকম বিধান আছে। ক্ষতিপূরণের হার সম্বন্ধে কোন বিধান নেই—তাই আইনতঃ যে কোন সামান্য ক্ষতিপূরণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বিদূরিত করা যায়। কিন্তু এই প্রথাকে যে কোন ভাবেই আঘাত করা যাক্ না কেন—তাতে আইনের কোন বাধা নেই —শুধু সম্রাটের মন্ত্রণা-পরিষদের সম্মতি থাকলেই যথেষ্ট। যাঁরা বিনা ক্ষতি-পূরণে জমিদারী প্রথা ভাঙতে চান, তাঁরা এবংবিধ আঘাতের পক্ষপাতী। ফ্লাউড্ কমিশন অবশ্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারী প্রথা রদ করতে চান।

যদি ধরা যায় যে, একজন জমিদারের আয় ১০০৲ টাকা—অর্থাৎ তিনি কৃষকের নিকট হতে খাজনা পান ১০০৲ টাকা, তাকে নিম্নলিখিত ভাবে ক্ষতি-পূরণ দেওয়া হবে। যথা

জমিদারীর আয়—১০০৲ টাকা।
ভূমি রাজস্ব—২৭৲ টাকা।
জমিদারের সেস্—৫৲ টাকা।
খাজনা আদায়ের খরচা—১৯৲ টাকা।
অর্থাৎ জমিদারীর নীট আয়—৫০৲ টাকা।

জমিদারের ক্ষতিপূরণের দাবি হবে উক্ত নীট আয়ের দশগুণ—অর্থাৎ ৫০০৲ টাকা। কমিশনের মতে—হয় তাকে ৫০০৲ টাকা সম্পূর্ণ নগদ দেওয়া হবে—

যদিও তার সম্ভাবনা কম—পক্ষান্তরে তাঁকে একটি ৪ পার্সেন্টের বণ্ড দেওয়া হবে। অর্থাৎ তিনি বাৎসরিক ২০৲ টাকা পাবেন। যে জমিদারের ৫০৲ টাকা নীট আয় ছিল সেখানে কমিশনের নব ব্যবস্থায় তাঁর আয় হবে ২০৲ টাকা। এই ভাবে ৬০ বৎসর দেওয়া হবে।

এই যে ৫০৲ টাকা নীট আয় ধরা হল তার ভিতর মতভেদ আছে। জমিদার-বর্গের পক্ষ থেকে বলা যায় যে, কমিশন গভর্ণমেণ্ট খাসমহলে ১৪ পার্সেণ্ট খাজনা আদায়ের খরচ ধরেছেন অথচ জমিদারের খাজনা আদায়ের খরচা ১৮ পার্সেণ্ট ধরা হয়েছে। গভর্ণমেণ্টের তুলনায় ব্যক্তি বিশেষের জমিদারীতে যে আদায়ের দরুণ খরচা কম হয়—তা সবাই স্বীকার করেন। এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে যে দু'জন বিশেষজ্ঞ কমিশনের সভ্য ছিলেন, অর্থাৎ স্যার ফ্রেডারিক স্যাকসি এবং মিঃ কার্টার তাঁরা তাঁদের "নোটে" একথা স্বীকার করেছেন। যাক্‌গে, এ সব হ'ল খুটিনাটি কথা। মোট কথা এই যে, কমিশন-সমর্থিত ক্ষতি-পূরণের হার অনুসারে বর্তমান জমিদারবর্গের বাৎসরিক আয় ৪০ থেকে ৬০ পার্সেণ্ট কমে যাবে। যাঁরা জমিদারবর্গকে আঘাত করার জন্য ব্যস্ত তাঁদের মুখে হাসির রেখা ফুটবে সন্দেহ নেই কিন্তু যাঁদের ক্ষতি তাঁরা স্বভাবতই বিষণ্ণ হবেন। কিন্তু সত্যিকারের প্রশ্ন এই হর্ষ বা বিষাদ নয়—তা' হ'ল যে, দেশের কল্যাণের জন্য কোন পথ শ্রেয়ঃ? কোন অর্থ-নৈতিক বিধানকে বিচার করতে হ'লে আমাদের দেখতে হবে যে, কোন বিধানের সঙ্গে সমগ্র দেশের মঙ্গল জড়িত বেশি। তাতে কে আঘাত পেল বা না পেল, সেটা বড় প্রশ্ন নয় কিন্তু পারি-পার্শ্বিক অবস্থার ভিতর কোন বিধান বেশি কার্যকরী হবে, সে প্রশ্নই প্রধান। আমরা অনেক জিনিষ বিচার করি নিজের রুচি বা মত দিয়ে এবং দেশের সম্পূর্ণ মুক্তির সঙ্গে সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন রেখে। এবংবিধ ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন বিচার সমাজের হিতকর নয়। তাই আমরা যখন ক্রোধে কেঁপে উঠি, তখন আমরা শুধু নিজেকেই প্রচার করি—তা' সমাজের মঙ্গল মূর্তির পরিচায়ক নয়।

কমিশন বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত গভর্ণমেণ্টের জমিদারত্ব প্রবর্তিত না হয়, ততদিন জমিদারের আয়ের উপর আয়কর প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ ভূমিসমস্যা তেমনি জটিল ও অচল হয়ে থাক্—শুধু গভর্ণমেণ্টের কিছু আয় বৃদ্ধি হোক্। এরূপ সংকীর্ণ দৃষ্টিতে যাঁরা বাংলার ভূমিসমস্যাকে দেখেছেন, তাঁরা বাংলার

ভূমিসমস্যা সমাধানের অযোগ্য,একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। [illegible] রিপোর্ট বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে, যদি জমিদারী প্রথা রদ করা অসম্ভবই হয়ে উঠে, তাহলে আয়কর স্থাপন করে গভর্ণমেণ্ট আবার কিছুদিনের জন্য সুস্থির হতে পারেন। মনে হয় যে, গভর্ণমেণ্টের আয় বাড়ালেই ভূমিসমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যাবে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য ভূমিরাজস্বের স্বল্প হার অন্য উপায়ে এড়িয়ে যেতে পারলেই বাংলার শ্যামলক্ষেত্র আবার ধন-ধান্যে খিলখিল করে হেসে উঠবে। ভূমিসমস্যা সমাধানের সঙ্গে আয়কর প্রবর্তনের যোগ যে স্বল্প, একথা বললে অনেকের চোখ ক্রোধে রাঙা হয়ে উঠবে। কিন্তু সে-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই কারণ আয়কর প্রবর্তনের যে পরিকল্পনা কমিশন দিয়েছেন, তাতে খুব বেশী আয় হবে বলে কেউ মনে করেন না এবং সেই সামান্য আয় কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয়িত হবে, তা অনেকটা আত্মপ্রবঞ্চনার মতই শোনায়। তবুও সেসব গালভরা কথা কমিশন বলেছেন, প্রচার করেছেন এবং আমাদের অনেকের মধ্যে প্রশংসা পেয়েছেন। একথা আমি বিশ্বাস করি যে, এসব টুকরা সংস্কারে যাঁরা প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেন, তাঁরা বাংলাদেশের ভূমিসমস্যার গভীরতা ও উগ্রতা সম্বন্ধে সচেতন নন।

কমিশন যদিচ গভর্ণমেণ্টের জমিদারত্ব শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছেন, তথাপি গভর্ণমেণ্ট জমিদার হলে জমিদারী কি নীতিতে চলবে এবং তখন প্রজাস্বত্ব আইন কি ভাবে সংস্কৃত হবে—তার কোন ইঙ্গিতই তাঁরা দেননি। তাঁরা ভাবলেন যে, গভর্ণমেণ্ট জমিদার হলেই সব সমস্যা সমাধান হয়ে গেল—গভর্ণমেণ্টও যে তাঁর অধিকারকে অপব্যবহার করতে পারেন এবং তাঁর বিস্তৃত সুযোগকে অবহেলা করতে পারেন, সে-সব ভাবনা বা সম্ভাবনা বা জল্পনা কমিশনকে ব্যগ্র করেনি। এ আশঙ্কা আমাদের আছে কারণ গভর্ণমেণ্ট এখন খাসমহল সম্পত্তি যে ভাবে পরিচালনা করছেন এবং কৃষকদের উন্নতি বিধানের যে সব সুযোগ তাঁরা অস্বীকার করছেন—এইভাবে গভর্ণমেণ্টের জমিদারত্ব বাংলাদেশে কিছুদিন চললে বাংলার কৃষকবর্গের শীর্ণদেহ আপনা হইতেই বিকীর্ণ হয়ে যাবে। কৃষকের ধর্ম প্রণয়ীর মত ভূমিকে সেবা করা এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম স্বামীর মত কৃষকদের ভরণ-পোষণ করা। কিন্তু সব স্বামীই কি তাঁর কর্তব্য পালন

করেন ? স্বামীর কর্তব্য কিভাবে পালিত হবে এবং কৃষকের ধর্ম কি ভাবে রক্ষিত হবে সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই কমিশন করেন নি, এবং তা না করে নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে যে গভীর অবহেলা দেখিয়েছেন, তা ক্ষমার যোগ্য নয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এমন কোন কমিটি বা কমিশন স্থাপিত হয়নি যার আলোচনার পরিধি এত ব্যাপক ছিল কিন্তু এত বড় সমস্যা-আলোচনার যোগ্যতা তাঁরা দেখাননি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ হোক এবং গভর্ণমেণ্ট জমিদার হোক্ – ইত্যাদি ভাষণ ও মতবাদ তাঁরা প্রচার করেছেন কিন্তু কোন উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে পারেননি এবং তাঁদের আলোচনায় এমন কোন দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়নি, যা বিচারবুদ্ধিকে আনন্দ দেয়। তবে যদি কেউ বলেন যে, উক্ত মতবাদ এতই সুস্পষ্ট যে তার প্রমাণের দরকার হয় না, তাহ'লে তাঁরা এই কমিশনের রিপোর্টে খুসী হবেন, সন্দেহ নেই।

কমিশন বাংলার আর্থিক দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—(ক) বাংলার জনসংখ্যা অসঙ্গতভাবে বেশি। (খ) প্রজার জোত খণ্ডবিখণ্ডিত হওয়ায় এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেচে যে, সেখানে কোন লাভবান কৃষি-কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। (গ) কৃষিজাত পণ্য দ্রব্যের দাম লাভজনক নয়। (ঘ) উন্নত প্রণালীতে কৃষিকর্ম চালিত হয় না। (ঙ) অধিকাংশ জমিতে এক ফসল মাত্র উৎপন্ন হয়। (চ) বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি ডিভিসনে নদীর গতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং নানা কারণে মৃতপ্রায় হয়ে আছে। (ছ) কৃষকের ঋণ-ব্যবস্থা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। (জ) বাংলার খাজনার হার স্বল্প। (ঝ) অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার কৃষকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। উক্ত সিদ্ধান্তে নূতনত্ব কিছু নেই। বিশ্ববিদ্যালয়-সমর্থিত ভারতীয় অর্থনীতি গ্রন্থের মূল কথাগুলি তাঁরা শুধু স্বীকার করে গেছেন এবং সেই স্বীকৃতির ভিতর সমস্যার রূপ আছে কিন্তু সমাধানের পথ নেই। কমিশনও সমাধানের পথ দেখাতে চেষ্টা করেননি। বাংলার আর্থিক দুর্গতির কারণগুলি যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহ'লে দেখা যাবে যে, গভর্ণমেণ্ট জমিদার হলেই সমস্যা সমাধিস্থ হ'বে না। সমস্যা বর্ণনা করা যে সমাধানের পথ দেখিয়ে দেওয়া নয়—একথা কমিশনের জানা উচিত ছিল এবং সে কথা জানা থাকলে গভর্ণমেণ্ট জমিদার হ'লে কি

রীতি বা নীতিতে তাদের জমিদারী কার্য চালিত হবে, তার আভাস দিতেন,—অন্তত সে-সম্বন্ধে সজাগ থাকতেন। কমিশনের রিপোর্ট পড়লে মনে হয় যে, তাঁরা যেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তক লিখতে বসেছেন—অর্থাৎ সমস্যা সম্বন্ধে মুখর হয়ে সমাধান সম্বন্ধে অধ্যাপকীয় মূকতা জ্ঞাপন করেছেন। এতে শিল্পীর বাহাদুরী আছে কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নেই।

কমিশনের রিপোর্ট বিরাটও নয়, গভীরও নয়—অত্যন্ত হালকা ধরণের মামুলী কথার প্রতিধ্বনি মাত্র। তাতে ইতিবৃত্ত নেই—অথচ ইতিকথা আছে; তাতে যুক্তি নেই, অথচ উক্তি আছে। আমাদের দেশ আপ্ত বাক্যের দেশ—আমরা হয়ত তাতেই খুসী। এ তথ্য স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড জানতে পেরেছেন—তাই দেড়বৎসরে ২৭৩ পৃষ্ঠার রিপোর্ট প্রকাশ করে বাংলার সর্ববিধ দুর্গতি নিবারণ করতে চেষ্টা করেছেন। বাংলার ভূমিসমস্যাকে যাঁরা জটিল ভাবতেন তাঁরা দেখবেন যে, সেই জটিলতা আলোচনার যোগ্য নয়; যাঁরা ভাবতেন যে আমাদের ভূমিব্যবস্থা সমাজ ও অর্থনীতির কাঠামোর সঙ্গে জড়িত, তাঁরা দেখবেন যে এত বড় সমস্যার কি রকম বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা যায়; যাঁরা রিপোর্টে ইতিহাসের তথ্য ও সত্য অনুসন্ধান করতে যাবেন, তাঁরা জানবেন যে ইতিহাস-আলোচনায় তথ্যের চেয়ে উক্তির দামই বেশি। এ জন্য বাংলার গভর্ণমেন্ট গর্ব অনুভব করেছেন এবং সে-গর্বে স্ফীত হয়ে তাঁরা উক্ত বিচারিত রিপোর্টকে আবার আরেকজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা গভীরতরভাবে পরীক্ষা করাচ্ছেন। আমরা গভর্ণমেন্টের গভীরতম সিদ্ধান্তের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। জানি না, এই উন্মুখতা কবে মিটবে।

শচীন সেন

কথা মাত্র সদানন্দ রাজী হইল না, তবে শেষ পর্য্যন্ত রাজী সে হইয়া গেল। তবে একটা চুক্তি সে করিল বড় খাপছাড়া। প্রথমটা আরম্ভ করিল যেমন একটু সলজ্জ ভাবে, সঙ্কোচের সঙ্গে, বিপিনের হাঁটুর দিকে তাকাইয়া : "আমার সব কথা শুনে চলবি ?"

"না।"

আরও খানিকটা চোখ তুলিয়া সদানন্দ বলিল, "কোন বিষয়ে আমায় জ্বালাতন করবি না ?"

"করব।"

আরও খানিকটা তুলিয়া : "আমার কাছে কিছু গোপন করবি না ?"

"করব।"

তখন সোজাসুজি চোখের দিকে চাহিয়া সদানন্দ বলিল, "আরেকটা কাজ করতে হবে আমার জন্যে। মাধুকে আমার চাই।"

"মাধুকে তোর চাই ? কি করবি মাধুকে দিয়ে—ও !"

বিপিন হাঁ করিয়া সদানন্দের দিকে চাহিয়া রহিল। এরকম সদানন্দের সঙ্গে তার কোনদিন পরিচয় ছিল না। মাধবীলতার জন্য আকর্ষণ অনুভব করা অবস্থা বিশেষে সদানন্দের পক্ষে সম্ভব, অবস্থা বিশেষে হঠাৎ মাথাটা তার মাধবীলতার জন্য খারাপ হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু এভাবে কোন মেয়েমানুষকে চাওয়ার মানুষ তো সে নয়। যদি বা মনে মনে চায়, লজ্জায় দুঃখের জ্বালায় লোকের কাছে মুখ দেখাইতে তার অস্বস্তি বোধ হওয়া উচিত। বিপিন নিজেই দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে; সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে, মাধুকে পাওয়া সম্বন্ধে চেষ্টা করবার কথা না দিলে সদানন্দ ফিরিয়া যাইবে না।

"কিন্তু মাধুর যে বিয়ে হয়ে গেছে ?"

'তাতে কি ?'

'তাতে কি ? তাতে কি ? তুই একটা পাঁঠা সদা, আস্ত পাঁঠা। আগে বলনি কেন, বিয়ের আগে ? তোমার কথায় যখন উঠত বসত ?'

সদানন্দের চোখ জ্বলিয়া উঠিল—এ জ্যোতি বিপিন চেনে। মানুষকে খুন করবার আগে মানুষের চোখে এ জ্যোতি দেখা দেয়।—'কি জানিস বিপিন, আগে মেয়েটাকে বড় মায়া করতাম, তখন কি জানি এমন পাজী সয়তান মেয়ে, তলে তলে এমন বজ্জাত ! একটা রাত্রির জন্যে ওকে শুধু আমি চাই, বাস্, তারপর চুলোয় যাক, যা খুসী করুক, আমার বয়ে গেল। ওর অহঙ্কারটা ভাঙ্গতে হবে।'

এবার বিপিন যেন ব্যাপারটা খানিক খানিক বুঝিতে পারে। মাধবীলতা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, জীবনের সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাই সদানন্দের এত জ্বালা। নিজে সে যাচিয়া মাধবীলতাকে প্রত্যাখ্যানের অধিকার দিয়াছে তাই আজ প্রত্যাখ্যানের জ্বালা সহ্য হইতেছে না, নয়তো তাকে অবহেলা করার অধিকার কোন মেয়ের আছে এ ধারণাই সদানন্দের মনে আসিত কিনা সন্দেহ। নিজে সে মাধবীলতাকে বড় করিয়াছে, মাধবীলতাকে অধিকার দিয়াছে অনেক, নিজের উপভোগের স্বাদ বাড়ানোর জন্য নিজের কামনাকে জোরাল করিয়াছে, ব্যাপক করিয়াছে। নয়তো কে ভাবিত মাধবীলতার কথা—কেবল মাধবীলতার কথা নয়, সে কি করে না করে আর ভাবে না ভাবে তা পর্য্যন্ত ! বড় জোর একদিন তার কাছে মুচকি হাসির সঙ্গে আপশোষ করিয়া বলিত, 'ছুঁড়িটা বড় ফসকে গেল রে বিপিন !'

নূতন করিয়া সদানন্দকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ব্যাপারটা নিয়াই বিপিন মাথা ঘামায়। সদানন্দের সম্বন্ধে মহেশ চৌধুরীর কয়েকটা মন্তব্যও সে যেন কম বেশী বুঝিতে পারে। সদানন্দের সংযম সত্যই অসাধারণ ছিল, কারণ তার মধ্যে সমস্তই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অসংযম পর্য্যন্ত। কেবল তাই নয়, সংযমও তার মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কামনার যার এমনিই জোর নাই, ভিতর হইতে যার মধ্যে বোমা ফাটিবার মত উপভোগের সাধ কোনদিন ঠেলা দেয় নাই, আত্মজয়ের তো তার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু সদানন্দের মত মানুষ, অতি অল্প বয়সেই যারা নিজের উপর অধিকার হারাইয়া বিগড়াইয়া যাইতে

আরম্ভ করে, তার পক্ষে তো হঠাৎ কদাচিৎ অন্যায় করিয়া ফেলিয়াও অন্যায় না করিয়া বাঁচিয়া থাকা, অন্যায় করার অসংখ্য সুযোগের মধ্যে অন্যায় করার সাধ দমন করিয়া চলা, আত্মোপলব্ধির সাংঘাতিক সাধনায় ব্যাপৃত থাকার মত মনের জোর বজায় রাখা তো সহজ ব্যাপার নয়। সদানন্দের অনেক দুর্ব্বলতা, অনেক পাগলামীর একটা নূতন অর্থ বিপিনের কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে মহেশ চৌধুরীর কথাই ঠিক, ওসব দুর্ব্বলতা শক্তির প্রতিক্রিয়া, ওসব পাগলামী অতিরিক্ত জ্ঞানের অভিব্যক্তি। নিজে সদানন্দ জানিত না সে সত্য সত্যই মহাপুরুষ, তাই ভাবিত লোকের কাছে মহাপুরুষ সাজিয়া লোককে ঠকাইতেছে। শত শত মানুষ যে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হইয়া যায়, সামনে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া মুখের দিকে চাহিতে পারে না, তাও সে ধরিয়া নিয়াছিল শুধু তার নানারকম ছল আর মিথ্যা প্রচারের ফল। এত বড় বড় আদর্শই সে পোষণ করিত (হয়তো এখনো করে) যে, নিজের অসাধারণত্বকে পর্য্যন্ত তার মনে হইত (হয় তো এখনো হয়) সাধারণ লোকের তুচ্ছতার চেয়েও নীচু স্তরের কিছু।

বন্ধুর জন্য বিপিন একটা শ্রদ্ধার ভাব অনুভব করে, বন্ধুর আধুনিকতম এবং বীভৎস ও বিপজ্জনক প্রস্তাবটাও যার তলে চাপা পড়িয়া যায়। যোগাযোগটা তার বড় মজার মনে হয়। মহেশ চৌধুরী যখন সদানন্দকে মনে করিত দেবতা তখন তার জন্য বিপিনের মনে ছিল প্রায় অবজ্ঞারই ভাব, তারপর সদানন্দের অধঃপতনের জন্য মহেশ চৌধুরীর ভক্তি যখন উবিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বিপিনের মধ্যে জাগিয়াছে শ্রদ্ধা! মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের নিয়মকানুনগুলি খাপছাড়া নয়?

বিপিনের আশ্রম ত্যাগ করা, মহেশ চৌধুরীর বাড়ীতে বাস করা, নূতন আশ্রম খুলিয়া নূতনভাবে জীবন যাপন করা এবং তারপর আবার নিজের পুরাতন আশ্রমে ফিরিয়া আসা, নাম ছড়ানোর দিক দিয়া এ সমস্ত খুবই কাজে আসিল সদানন্দের। মহেশ চৌধুরীর আশ্রমে সমবেত নারী পুরুষের ভক্তিশ্রদ্ধা হারানোর যে ভয়টা সদানন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিল সেটা অবশ্য নিছক ভয়, সকলেই শিষ্যত্ব অর্জ্জনের এবং তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অধিকার আর সুযোগ পাওয়ায় তার সম্বন্ধেই লোকের অস্বাভাবিক ভয়টা

কমিয়া আসিতেছিল। বিপিনের সাহায্যে নিজের চারিদিকে সে যে কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল, মহেশের চেষ্টা ছিল সেটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সকলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সহজ করিয়া তোলা। সম্পর্কটা সত্যসত্যই সহজ হইয়া আসিতে থাকায় সদানন্দের মনে হইয়াছিল, লোকের কাছে সে বুঝি নীচে নামিয়া যাইতেছে।

হয়তো নামিয়া যাওয়াই। সংস্কার-নাড়া-দেওয়া ভয়ের ভিত্তিতেই হয়তো দেবতার সর্ব্বোচ্চ আসন পাতা সম্ভব।

সদানন্দের সঙ্গে মহেশ চৌধুরীর আশ্রমের জনপ্রিয়তা যেন শেষ হইয়া গেল, যেদিন পুরাতন আশ্রমে সদানন্দ নূতন পর্য্যায়ে আসর বসাইল প্রথমবার, সেদিন মহেশ চৌধুরীর আশ্রমে লোক আসিল মোটে দশ-বার জন। সকলে সদানন্দের উপদেশ শুনিতে গিয়াছে—আগে যত লোক আসিত তার প্রায় তিনগুণ। সদানন্দ ভাবিয়াছিল এবার হইতে যতটা সম্ভব মহেশ চৌধুরীর নিয়মেই আশ্রম পরিচালনা করিবে, শিষ্য করিবে সকলকেই, নাগালের মধ্যে আসিবে সকলেই, কথা বলিবে সহজভাবে। একনজর তাকাইয়াই আর নারী বা পুরুষকে অপদার্থ করিয়া দিবে না। কিন্তু ভিড় দেখিয়া হঠাৎ তার কি যে হইয়া গেল উল্লাস আর গর্ব্বের মেশানো একটা নেশায়, মুখের গাম্ভীর্য্যের আর তুলনা রহিল না, যেন গোপন পাপ সব আবিষ্কার করিয়া ফেলিতেছে দৃষ্টির তীব্রতায় এমনি অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল অনেকের, আর কথা শুনিতে শুনিতে অনেকের মনে হইতে লাগিল তার পায়ে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে মরিয়া যায়।

প্রণামী দিতে গিয়া দু'একজন পায়ে আছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সুবিধা হইল না।

প্রথম জনকে সদানন্দ বলিল: 'উঠে বোসো। তিনমাস মাছ মাংস মেয়েমানুষ ছুঁয়ো না। এবার যাও—যাও!'

দ্বিতীয় জনকে সংক্ষেপে বলিল: 'পাঁচ বছরের মধ্যে তুমি আমার কাছে এসো না।'

আগে কেউ বাড়াবাড়ি করার সাহস পাইত না, ভাবপ্রবণতার নাটকীয় অভিব্যক্তি সদানন্দ পছন্দ করে না। মাঝখানে অনেকগুলি ব্যাপার ঘটায় আর

সদানন্দ নিজের নূতন পরিচয় দেওয়ায় কয়েকজনের সাহস হইয়াছিল, নূতন লোকও আজ আসিয়াছিল অনেক। কিন্তু পায়ে আছড়াইয়া পড়ার (তিন টাকা প্রণামী দেওয়ার পরেও) আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করার (প্রণামী—আড়াই টাকা) ফল দেখিয়া সকলের সাহস উবিয়া গেল। সকলের বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সদানন্দ যেন কোথাও কোনদিন যায় নাই, মাঝখানে প্রায় বছরখানেকের ফাঁক পড়ে নাই, এইখানে আগে যেমন সভা বসিত আজ একটু বড় ধরণে সেই রকম সভাই বসিয়াছে।

কিন্তু দোকানে ফিরিয়া গিয়া শ্রীধর সেদিন সন্ধ্যার পর মুখখানা যেন কেমন একটু ম্লান করিয়া বলিল : 'ঠাকুরমশায় কেমন যেন বদলে গেছেন। ঠাকুর-মশায়ের রাগ তো দেখিনি কখনো, সত্যিকারের রাগ ?'

ঠিক সেই সময় আশ্রমে নিজের গোপন অন্তঃপুরে সদানন্দ বিপিনকে বলিতেছে : 'উমা আর রতনকে দিয়ে মাধুকে আনাতে হবে। এই ঘরে মাধুকে বসিয়ে রেখে ওরা চলে যাবে, তারপর আমি না ডাকলে কেউ আমার মহলে আসবে না।

'উমা আর রতন ? ওরা কেন রাজী হবে ?'

'হবে। আমি বললেই হবে।'

'তা হবে না। এরকম মতলবের কথা শুনলেই ওদের মন বিগড়ে যাবে, আশ্রম ছেড়েই হয় তো চলে যাবে।'

'সে আমি বুঝব।'

কিন্তু বুঝা বিপিনের পক্ষেও প্রয়োজন, সে তাই সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ে। তারপর অন্য কথা বলে, 'কিন্তু মহেশ বা বিভূতি যদি গিয়ে পুলিশ ডেকে আনে ?'

'আনে তো আনবে।'

'আনে তো আনবে ? তোর খারাপ মাথাটা আরও খারাপ হয়ে গেছে সদা।'

'তুই বড় বোকা বিপিন। পুলিস আশ্রমের ধারে কাছে আসামাত্র উমা, রতন আর আশ্রমের আরও পাঁচ সাতটি মেয়ে মাধুকে ঘিরে বসবে। পুলিশ এসে দেখবে মাধুকে কেউ আটকে রাখেনি, মেয়েদের সঙ্গে ফাঁকা যায়গায়

বসে গল্প করছে। তবু যদি জেলে যেতে হয়, আমি যাব, সব দোষ আমি নিজে মেনে নেব'খন।'

'কিন্তু দরকার কি শুনি এত হাঙ্গামায় ?'

'সে তুই বুঝবি না।'

বুঝুক না বুঝুক বিপিন ভয় পাইয়া গেল। একদিন চুপি চুপি গিয়া মাধবীলতাকে সাবধান করিয়া দিয়া আসিল। সব কথা সে ফাঁস করিয়া দিল তা নয়, আভাসে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে সদানন্দ বড় চটিয়াছে, সে যেন কখনো কোন অবস্থায় আশ্রমে না যায়।

'যেই নিতে আসুক, যে উপলক্ষেই নিতে আসুক, যেও না। উমা বা রতন এলেও নয়।' বুঝেছ ?

মাধবীলতা সায় দিয়া বলিল, 'বুঝেছি, সব বুঝেছি। আপনি না বললেও আমি যেতাম না।'

কয়েকদিন পরে উমা আর রত্নাবলী মাধবীলতাকে আনিতে গেল। সদানন্দ যেন কোথায় গিয়াছে, আশ্রমে মেয়েদের কি যেন একটা ব্রত আছে, কি যেন একটা বিশেষ কারণে বিপিন তাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে। মহেশ চৌধুরী আর বিভূতিরও অবশ্য নিমন্ত্রণ আছে।

মাধবীলতা আসিল না, বিভূতিও নয়। মহেশ চৌধুরী শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। ব্রতের কোন আয়োজন নাই দেখিয়া সে আশ্চর্য্যও হইয়া গেল না, কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না। মেয়েদের ব্রত কোন ঘরের কোণে, গাছের নীচে বা পুকুর ঘাটে কি ভাবে হয় মেয়েরাই তা ভাল করিয়া জানে! নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া কেউ কিছু খাইতে দিল না দেখিয়াই সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কে জানে, হয়তো ব্রত শেষ না হইলে খাইতে দিতে নাই। কিন্তু বেলা তিনটার সময়ও যদি ব্রত শেষ না হয়, না খাওয়াইয়া বসাইয়া রাখিবার জন্য কেবল তার বাড়ীর তিন জনকে নিমন্ত্রণ করিবার কি দরকার ছিল ?

সদানন্দ যেখানেই গিয়া থাক, ফিরিয়া আসিয়াছে। মহেশ চৌধুরী তার কাছে গিয়া বসিয়াছিল। এদিকে বিপিন ভাবে, উমা আর রত্নাবলী যখন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে তারাই মহেশকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিবে। উমা আর রত্নাবলী ভাবে, বিপিন যখন নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিয়াছে, সেই জানে

অতিথিকে কি খাইতে দেওয়া হইবে। বিপিন নিশ্চিন্তমনে একটু কাজে বাহির হইয়া যায়। সদানন্দের কুটীরে মহেশকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া উমা আর রত্নাবলী নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করে।

সদানন্দ বলে, 'কি খবর মহেশ ?'

মহেশ বলে, 'আজ্ঞে, খবর আর কি ?'

মহেশ যেন 'প্রভু' শব্দটা উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

'কিছু উপদেশ দেবে না কি ?'

'কি আর উপদেশ দেব বলুন ?'

'এই আমার কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়—'

মহেশ একটু ভাবিয়া বলে, 'উপদেশ তো নয়, পরামর্শ দিতে পারি। কথাটা মনে রাখলে কাজ দেবে। মানুষ যখন উঁচু পাহাড় পর্ব্বতে ওঠে, কত যত্নে কত সাবধানে প্রাণপণ চেষ্টায় তিল তিল করে ওঠে, সময়ও লাগে অনেক। কিন্তু মানুষ যখন উঁচু থেকে হাত-পা এলিয়ে নীচে পড়ে, পড়বার সময় কোন কষ্টই হয় না, সময়টা কেবল চোখের পলকে ফুরিয়ে যায়।'

সদানন্দ গম্ভীর হইয়া বলে, পড়বার সময়টা ফুরিয়ে গেলেও অনেক সময় কষ্ট হয় না মহেশ। বরং উঁচু থেকে পড়লে চিরকালের জন্য কষ্ট ফুরিয়ে যায়।'

'ফুরিয়ে যায় না সুরু হয়, কে তা জানে বলুন ?'

'আমি জানি। যে সীমার মধ্যে কষ্ট সে সীমাই যদি পার হয়ে গেলাম তবে আর কষ্ট কিসের ? যারা বোকা তারাই বেঁচে থেকে রোগের জ্বালা শোকের জ্বালা সহ্য করে। অথচ আত্মহত্যা করা এত সহজ !'

'আত্মহত্যা করা সহজ ? আত্মরক্ষা করা সহজ বলুন। আত্মহত্যা করা সহজ হলে মানুষের জীবনটাই আগাগোড়া বদলে যেত, সমাজ ধর্ম্ম রীতিনীতি সুখ দুঃখ ভাবনা চিন্তা অনুভূতি সব অন্যরকম হত। ব্রহ্মচারী দু'চারজন আছে কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য কি সহজ না মানুষের পক্ষে সম্ভব ? আত্মহত্যা দু'চারজন করে, কিন্তু সেটাও সহজ নয়, মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। আপনি তো যন্ত্রণায় ক্ষেপে যাবার উপক্রম করেছেন, একবার দেখুন তো আত্মহত্যা করতে গিয়ে পারেন কি না ? কষ্ট পাবেন, বেঁচে থাকার সাধ থাকবে না, তবু বেঁচে থেকে কষ্ট ভোগ করবেন। এই সমস্যা আছে বলেই তো বেঁচে থাকার এত নিয়মকানুনের

আবিষ্কার। আসল সাধু কি ঈশ্বরকে চায়, স্বর্গ চায়, পরকালের কথা ভাবে? সাধু চায়, বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় বাঁচতে যখন হবেই, বাঁচার সব চেয়ে ভাল উপায় কি তাই আবিষ্কার করতে। অনেক যুক্তিই লাগসই মনে হয়, কিন্তু সব যুক্তি কি খাটে? অতি তুচ্ছ বিষয়ে যুক্তি খাড়া করবার সময় বিচার করে দেখবেন, কত অসংখ্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্তিটার যোগ আছে। কোন যুক্তিটা সবচেয়ে বেশী খাটবে কোনটা সবচেয়ে কম খাটবে ঠিক করতে নিরপেক্ষ মন নিয়ে জগতের সমস্ত যোগাযোগ বিচার করতে হয়। ওটা হল মহাপুরুষের কাজ। মূল্য যাচাই করার ক্ষমতা অর্জ্জন করবার নাম সাধনা। এই জন্য সাধনা এত কঠিন। মানুষকে জানেন তো, মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মরবার সময় পর্য্যন্ত একগ্লাস জল আর একদলা সোনার মধ্যে বেছে নিতে বললে—'

'আমি তাই করেছি, না?' সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ, একেই পাপ বলে।'

'পাপ? অনুতাপ না হলে আবার পাপ কিসের?'

'অনুতাপ যদি না হয় তবে আর পাপ কিসের? হজম করতে পারলে আর শরীরের পুষ্টি হয়ে স্বাস্থ্য বজায় থাকলে রাশি রাশি অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়া আর দোষ কি! কিন্তু মুসকিল কি জানেন, অনুতাপ হয়। ভগবান দেন বলে নয়, লোকে বলে ব'লে নয়, অনুতাপ হওয়ার কথা বলেই অনুতাপ হয়। একটা কাজ করলে যদি আনন্দ হয়, আরেকটা কাজ করলে নিরানন্দ হতে পারে না?

'সাধারণ লোকের হতে পারে, সকলের হয় না। মনকে যদি বশ করা যায়, আপশোষ হতে না দিলে কেন হবে?'

'সে তো বটেই, কিন্তু মনকে বশ করা চাই তো। অনুতাপ হয় এমন কাজ যারা করে তাদের মনটা কিছুতেই বশ হয় না। অনুতাপ বড় ভীষণ জিনিষ, মনকে একেবারে ক্ষয় করে দেয়। অনুতাপ এড়িয়ে চলাও বড় শক্ত, একটা নখ কাটার জন্য পর্য্যন্ত অনুতাপ হতে পারে কি না। যাই করুক মানুষ, হয় সুখ পাবে নয় কষ্ট পাবে, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এর দুটোর একটা ঘটবেই ঘটবে। মহাপুরুষেরা এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটাবার উপায় দেখিয়ে দেন।

অনুতাপ হবেই, তবে মারাত্মক রকমের না হয়। মারাত্মক অনুতাপ যাতে হয় তাকেই লোকে পাপ বলে। যেমন ধরুন, আপনি যদি গায়ের জোরে মাধুর ওপোর অত্যাচার করেন—'

সদানন্দ চমকাইয়া বলে, 'তার মানে?'

মহেশ শান্ত ভাবেই বলে, 'কথার কথা বলছি, একবার মাধুকে ধরে টানাটানি করেছিলেন কিনা, তাই কথাটা বলছি। ওরকম কিছু করলে আপনার অনুতাপ হবেই। হিসাব করে হয়তো দেখলেন ওজন্য অনুতাপ করা মনের দুর্ব্বলতা, প্রকৃতির নিয়ম ধরে বিচার করলেও কাজটা আপনার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি, তবু অনুতাপে আপনি ক্ষয় হয়ে যাবেন। উচিত হোক আর অনুচিত হোক, এ প্রতিক্রিয়াটা ঘটবেই। মনকে যদি এমন ভাবে বদলে দিতে চান যাতে ওরকম পাপ করেও অনুতাপ হবে না, তখন বিপদ হবে কি জানেন, যত দিন পাপ করার ইচ্ছা না লোপ পাবে মনটা বদলাবে না। যোগসাধনার মূল নীতি এই। সাধারণ জীবনে উঠতে বসতে আমরা অসংখ্য ছোট বড় পাপ করি আর অনুতাপ ভোগ করি, সব সময় টেরও পাই না। সেই জন্য যোগসাধনার নিয়ম এত কড়া—কবার নিশ্বাস নিতে হবে তা পর্য্যন্ত ঠিক করে দেওয়া আছে। কামের চুলকানি জয় করলেই লোকে যোগী ঋষি হয় না, পিঠের চুলকানি পর্য্যন্ত জয় করতে হয়—নইলে মন বশে আসে না। তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিট তপস্যা করেও হয় তো এক মিনিট শিষ্যকে দিয়ে ঘামাছি মারানোর জন্য তপস্যা বিফল হয়ে যায়।'

'গায়ে ছাই মেখে যে তপস্যা—'

মহেশ মৃদু হাসে, আপশোষের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলে, 'আপনাকে বলা বৃথা, আপনি আমার কথা বুঝবেন না। গায়ে ছাই মেখে হাত উঁচু করে বসে থাকা কি তপস্যা? না আমি সে তপস্যার কথা বলছি? আমি বলছিলাম আপনার তপস্যার কথা, আপনি যে তপস্যায় দিন দিন সফল হচ্ছিলেন।

এবার সদানন্দ অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে 'আমার আর কোন উপায় নেই?'

'মনে তো হয় না। তবে তেমন গুরু যদি খুঁজে বার করতে পারেন—'

শেষ বেলায় উপবাসী মহেশ বাড়ী ফিরিয়া গেল। খাইতে চাহিল মাধবী-লতার কাছে।

মাধবীলতা অবাক হইয়া বলিল, 'এ আবার কোন দেশী ব্যাপার, নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খেতে না দেওয়া!'

যে ব্যাপার সে জানিত, তার চেয়ে এ ব্যাপারটা তার খাপছাড়া মনে হয়। তার সম্বন্ধে সদানন্দের খারাপ মতলব আঁটা আশ্চর্য্যের কিছু নয়, কিন্তু ডাকিয়া নিয়া গিয়া মহেশ চৌধুরীকে খাইতে না দেওয়ার কোন মানে হয়?'

'বড় পাজী লোক ওরা।'

'ছি মা, রাগ করতে নেই। কোন একটা কারণ নিশ্চয় ছিল, বিব্রত করার ভয়েই তো আমি বললাম না, নইলে চেয়ে খেয়ে আসতাম।'

দুজনে এসব কথা বলাবলি করিতেছে, শশধরের বৌ খাবার আনিয়া হাজির। কোথায় সে থাকে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সব সময়েই বোধহয় আশে পাশে আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া সকলের কথা শোনে।

মাধবীলতা কিন্তু হঠাৎ বড় চটিয়া গেল।

'সব ব্যাপারে তোমার বড় বাড়াবাড়ি। আমিই তো দিচ্ছিলাম?'

আড়ালে গিয়া শশধরের বৌ ঘোমটা ফাঁক করিয়া তাকে দেখাইয়া একটু হাসিল, হাতছানি দিয়া তাকে কাছে ডাকিল।

মাধবীলতা কাছে গেলে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'তোমার না আজ কিছু ছুঁতে নেই?'

মাধবীলতা চুপ করিয়া রহিল। সদানন্দের আশ্রমে নিমন্ত্রণ রাখিতে না যাওয়ার মিথ্যা অজুহাতের কথাটা তার মনে ছিল না।

এদিকে আশ্রমে তখন সদানন্দ বিপিনকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

'মাধু এল না কেন?'

উমা আর রত্নাবলীর কাছে বিপিন যা শুনিয়াছিল জানাইয়া দিল। সদানন্দ বিশ্বাস করিল না। দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, 'ওসব বাজে কথা, আসল কথা আসবে না। না আসুক, আমিও দেখে নেব কেমন না এসে পারে। তোকে

বলে রাখছি বিপিন, ওর সর্ব্বনাশ করব, মহেশকে পথে বসাব, তবে আমার নাম সদানন্দ।'

কয়েকদিন পরে মহেশের বাড়ীঘর বাগান আর আশ্রম পুলিশ তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করিয়া গেল। বিভূতির সঙ্গে যখন সংস্রব আছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ এরকম পুলিশের হানা দেওয়া আশ্চর্য্য নয়। তবু, বাহির হইতে তাগিদ না পাইলে এ সময়টা পুলিশ হয় তো বিভূতির নূতন আশ্রম নিয়া মাথা ঘামাইত না। বিভূতিকে যে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিল, খবরটা সেই ফাঁস করিয়া দিয়া গেল। পুলিশের লোকটি একদিন সদানন্দকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, কথায় কথায় সদানন্দ নাকি এমন কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল যে তাড়াতাড়ি একটু অনুসন্ধান না করিয়া উপায় থাকে নাই।

'সত্যি সত্যি, কিছু আরম্ভ করেছেন না কি আবার? উনি তো মিথ্যে বলবার লোক নন।'

'উনিই মিথ্যে বলবার লোক।'

পুলিশের লোকটি সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'বিয়ে থা' করেছেন, একটু সাবধানে থাকবেন। আর কি ওসব ছেলেমানুষী পোষায়?'

পুলিশের খানাতল্লাসের পর মহেশের আশ্রমে লোকের যাতায়াত আরও কমিয়া গেল। এতদিন পরে লোকের মুখে মুখে কি করিয়া যে একটা গুজব রটিয়া গেল, মহেশ চৌধুরী লোক ভাল নয় বলিয়া সদানন্দ তাকে ত্যাগ করিয়াছে, সাধু সদানন্দ।

ক্রমশঃ

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ধারা

ভারতীয় ইতিহাসে মধ্যযুগের প্রারম্ভ ঠিক কোন সময়ে সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, কিন্তু ভারতীয় কৃষ্টির ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতকের দিকেই সে যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। এই সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মমতগুলির বহিরঙ্গ বা ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রভাব চলে যায় এবং সেগুলির মধ্যে সাধন বিষয়ে এমন একটি ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় যা খুব সম্ভবতঃ ভারতীয় চিন্তার ধারায় মধ্যযুগের সূচনা করে। পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণব ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধকদের হাতে যে সাধনপন্থা পরিপুষ্টি লাভ করেছিল তার প্রারম্ভ এইখানে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ মতের তুলনামূলক বিচার করবার নানা চেষ্টা হয়েছে। খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতকের দিকে রচিত বৌদ্ধ দোঁহা ও চর্য্যাপদের আলোচনা করলে সে সাহিত্যের সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের যোগ বিশেষভাবে ধরা পড়ে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই শেষ যুগের গ্রন্থসমূহে এক বহিরাচারশূন্য সাধন পদ্ধতির খোঁজ পাওয়া যায়। এই সাধনব্যাপারে দেব দেবীর পূজা নাই, তীর্থ ভ্রমণের প্রয়োজন নাই। মন্ত্রজপ, দেব দেবীর আবাহন, প্রভৃতি কিছুই নাই। এই ধর্ম্মমতে শাস্ত্রপাঠেরও কোন আবশ্যকতা নাই। গুরু শিষ্যের কোন জাতিবিচার করা হয় না। একপ্রকার যোগই হচ্ছে এই সাধন পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ, সেখানে সাধকের দেহই হচ্ছে প্রধান বস্তু, বিশ্বের যা কিছু সমস্তই দেহের মধ্যে, সুতরাং বহিরঙ্গের কোন ক্রিয়ার বিশেষ মূল্য নাই, মূল্য আছে শুধু অধ্যাত্ম সাধনার। সে সাধন-পদ্ধতিও হওয়া চাই যতদূর সম্ভব সহজ।

জৈনধর্ম্মে এরূপ কোন সাধনপদ্ধতির খোঁজ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। এই ধর্ম্মের দুই প্রধান সম্প্রদায় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরদের নানা শাখা আছে। দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে সত্য কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহিরঙ্গের ক্রিয়াকাণ্ড অত্যন্ত প্রবল। এই দুই সম্প্রদায়ের যে সব শাস্ত্র গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অন্তরঙ্গের সাধনপদ্ধতির কোন

পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিন্তু কোন ভারতীয় ধর্ম্মমতে গূঢ় সাধনাপদ্ধতির উল্লেখ না থাকাই আশ্চর্য্য।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'পাহুড়দোহা' নামক একখানি দিগম্বর জৈন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন অমরাবতী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হীরালাল জৈন। 'পাহুড় দোহার' রচয়িতা মুনি রামসিংহ প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের কিছু পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, এ হ'তে অনুমান করা যায় যে মুনি রামসিংহ একাদশ শতকে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

'পাহুড়দোহা' অপভ্রংশ ভাষায় লেখা, অপভ্রংশ হচ্ছে প্রাকৃতভাষার পরবর্ত্তী রূপ এবং প্রাদেশিক ভাষা সমূহের পূর্ব্বগামী। সেই কারণে এই অপভ্রংশ ছিল নানারকমের, সৌরসেনী, মাগধী, মহারাষ্ট্রী ইত্যাদি। খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতকে এই ভাষা নানা প্রদেশে সাহিত্যের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, অনেক জৈন গ্রন্থও এই ভাষায় রচিত হয়। জৈন গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষা ছিল গুজরাট ও রাজপুতানা অঞ্চলের প্রচলিত অপভ্রংশ।

খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতকে অনুরূপ ভাষায় যেসব বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, সেসব গ্রন্থের রচয়িতারা ছিলেন সিদ্ধাচার্য্য, এঁদের মধ্যে সরহ, কাহ্নু ও তিল্লোপাদের রচিত নানা দোহা প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত দোহার সঙ্গে জৈন পাহুড়দোহাকে ভাব ও ভাষার দিকে তুলনা করা চলে। এই তুলনা হতে বেশ বোঝা যায় যে এই যুগে সমস্ত উত্তর ভারতে এমন একটি সাধনপদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল যা জৈন বৌদ্ধ সকলকেই একতাসূত্রে আবদ্ধ করে ফেলেছিল।

পাহুড়দোহায় ভেদজ্ঞানের কোন মূল্য দেওয়া হয় নাই, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, কিংবা শ্রেষ্ঠ, অধম, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি ভেদজ্ঞান সাধনার অন্তরায় জন্মায়।

ইউ বরু বংভণু ণ বি বইস্সু ণউ খত্তিউ ণ বি সেস্সু।
পুরিসু ণউঁসউ ইত্থি ণ বি এহউ জাণি বিসেস্সু॥

[বিশেষভাবে জান যে আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নই, বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা শূদ্রও নই, পুরুষ, নপুংসক বা স্ত্রী নই]

যারা মূর্খ, যাদের মধ্যে বোধিজ্ঞান বিস্ফুরিত হয় নাই তাদের মধ্যেই ভেদ-

জ্ঞান প্রবল। গৌর বা শ্যাম, দুর্ব্বল বা স্থূল ইত্যাদির মধ্যে ভেদজ্ঞান তারাই পোষণ করে। পণ্ডিত ও মূর্খ, ঈশ্বর ও অনীশ্বর, গুরু ও শিষ্য প্রভৃতির মধ্যে সত্যকার কোন প্রভেদ নাই। কার্য্য কারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, স্বামী ভৃত্য বা উত্তম নীচের মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই। পুণ্য পাপ কাল আকাশ ধর্ম অধর্ম কিছুই নাই। পাহুড়দোহা কোন দর্শনকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেননি। জৈন দর্শনকেও নয়। তিনি বলেছেন— মূর্খেরাই ষড়্‌দর্শন পাঠ করে, তাতে ভ্রান্তি বিনষ্ট হয় না। একই দেবতাকে ছ'ভাগ করলে কি মোক্ষ লাভ হয়?"

[বোহিবিবজ্জিউ জীব তুহুঁ বিবরিউ তচ্চু মুণেহি।···
হউঁ গোরউ হউঁ সামলউ হউঁ ভি বিভিন্নউ বন্নি।
হউঁ তণু অংগউ থুলু হউঁ এহউ জীব ম মন্নি॥
ণ বি তুহুঁ পংডিউ মুক্‌খু ণ বি ণ ঈসর ণ বিণীস্সু।
ণ বি গুরু কোই বি সীস্সু ণ বি কম্ম বিসেস্সু।—
পুন্নু বি পাউ বি কালু ণহু ধম্মু অহম্মু ণ কাউ।
এক্কু বি জীব ণ হোহি তুহুঁ মিল্লিবি চেয়ণ ভাউ॥]

বৌদ্ধ দোহা ও চর্য্যাপদে এই ভাবকে অদ্বয়জ্ঞান বলা হয়েছে। এই অদ্বয় জ্ঞান উৎপন্ন হলেই "সহজ" জ্ঞান লাভ হয় এবং সেই সহজ জ্ঞানই হচ্ছে বৌদ্ধ সাধকের কাম্য।

বহিরঙ্গের পূজাপার্বণের ব্যর্থতা সম্বন্ধে জৈন দোহায় নানা উক্তি আছে। "জিন বলেছেন বন্দনা কর বন্দনা কর, কিন্তু নিজের দেহের মধ্যে পরমার্থ লাভ হলে এই বন্দনার কোন প্রয়োজন নাই" (৪১)। এক তীর্থ হতে অন্য তীর্থে ভ্রমণ করলে শুধু সন্তাপই বৃদ্ধি পাই (১৭৮)। যে যোগী তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়ায় সে জানে না যে শিব তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন অথচ সে তাঁকে পায় না (১৭৯)॥

[বংদহু বংদহু জিণু ভণই কো বংদউ হলি ইত্থু।
ণিয়দেহাহং বসংতযহং জই জাণিউ পরমত্থু॥
তিত্থই তিত্থ ভমংতয়হঁ সংতাবিজ্জই দেহু।
অপ্পেঁ অপ্পা ঝাইয়ইঁ ণিব্বাণং পউ দেহু॥

জো পই জোইউঁ জোইয়া তিত্থইঁ তিত্থ ভমেই।
সিউ পই সিহুঁ হংহিঁ ডিযউ লহিবি ণ সক্কিউ তোই ॥]

বৌদ্ধ দোহাকোষ ও চর্য্যাপদে বহু স্থানে অনুরূপ উক্তি আছে। সরহপাদ বলেছেন "তীর্থ তপোবনে গিয়ে কোন ফল নাই, জলে স্নান করলেই মোক্ষ লাভ হয় না।"

[কিন্তহ তিত্থ তপোবণ জাই।
মোক্খ কি লব্ভই পাণী হ্নাই।]

জৈন ধর্ম্মমতে আত্মা বা জীবের স্থান আছে এবং কর্ম্মফল অনুসারে সেই আত্মার শ্বেত, পীত, রক্ত প্রভৃতি নানা বর্ণ বা "লেশ্যা" আছে। কিন্তু পাহুড়-দোহায় এ মতের বিপরীত উক্তি রয়েছে। আত্মা হচ্ছে অজরামর পরব্রহ্ম স্বরূপ [জো অজরামরু বংভুপরু সো অপ্পাণ মুণেহি]। সে আত্মার জরা মরণ নাই। কোন রোগের দ্বারা সে আত্মা অভিভূত হয় না, তার কোন বর্ণ বা লিংগ নাই [অত্থি ণ উব্ভউ জরমরণু রোয় বি লিংগই বন্ন]। যা কর্ম্মফলের প্রভাব হতে মুক্ত নয় তাকে আত্মা বলা চলে না, তাকে আত্মা মনে করলে পরমপদ লাভ করা যায় না। আত্মা জ্ঞানময়, শুদ্ধস্বভাব, বর্ণবিহীন। তাকেই নিরঞ্জন বা শিব বলা হয়। এই জ্ঞানময় আত্মার প্রতি অনুরক্ত হওয়াই হচ্ছে সাধকের একমাত্র কাম্য।

[বন্নবিহূণউ ণাণমউ জো ভাবই সব্ভাউ।
সংতু নিরংজণু সো জি সিউ তহিঁ কিজ্জই অণুরাউ ॥]

এই জ্ঞানময় আত্মা কিরূপে লাভ করা যায় সে কথাও পাহুড়দোহায় আছে। মনকে নিষ্ক্রিয় না করতে পারলে সে অবস্থা লাভ করা যায় না।

মণু জাণই উবএসডউ জহিঁ সোবেই অচিংতু।
অচিত্তহো চিত্তু জো মেলবই সো পুণু হোই ণিচিংতু ॥

[যখন মন চিত্তহীন হয় তখনই এ উপদেশ বোঝা যায়। সেই চিত্তহীন চিত্ত লাভ করলেই চিত্তবিহীন হওয়া যায়]।

এই উক্তির স্পষ্ট অর্থ বৌদ্ধ দোহা হতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ দোহা ও

চর্য্যাপদে নানাস্থানে চিত্ত হনন কররার কথা আছে। যেমন তিল্লোপাদের দোহাকোষে—

—মারহু চিত্ত ণিব্বাণেঁ হণিয়া।
তিহুঅণ সুস্ন ণিরঞ্জন পলিয়া ॥ ২ ॥
—এমণ মারহু লহু চিত্তে ণির্ম্মুল ॥ ৩৩ ॥

চিত্ত স্বভাবশতঃ চঞ্চল, সুতরাং চিত্তের সে স্বভাব নির্ম্মূল না করলে শূন্য নিরঞ্জন সহজ স্বভাবের স্ফূরণ হয় না। অন্য কথায় সেই সহজস্বভাব লাভ করলেই চিত্ত চিত্তহীন বা নিশ্চল হয়। সেই কারণে সরহপাদ বলেছেন—

এহু মণ মেল্লহ পবণ তুরঙ্গ সুচঞ্চল।
সহজ সহাবে সো ধসই হোই নিচ্চল ॥

[তুরঙ্গ বা পবনের মত চঞ্চল এই মনকে ত্যাগ কর। সে মন সহজ স্বভাবে নিশ্চলতা লাভ করে]।

মনকে চিত্তহীন করবার উপায় নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে পাহুড়দোহার রচয়িতা যা বলেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পংচ বলদ্দ ণ রক্‌খিবই নংদনবণু ণ গও সি।
অপ্প ু ণ জাণিউ ণ বি পরু বি এমই পব্বইও সি ॥
পংচহি বাহিরু ণেহডউ হলি সহি লগ্‌গু পিস্‌স।
তাসু ণ দীসই আগমণু জো খলু মিলিউ পরস্‌স ॥

[তুমি ত পাঁচ বলদ নিয়ে বাইরে বসে আছে, নন্দনবনে প্রবেশ করলে না। নিজেকেও জানলে না পরকে ও জানলে না। এমন প্রব্রজ্যার অর্থ কি?

হে সখি বাইরে অবস্থিত পাঁচজনের স্নেহে আবদ্ধ হয়েছ। প্রিয়তমের আগমন দেখতে পাও না, কেন না পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছ।]

'পাঁচ বলদ' বা 'পঞ্চজন' হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাদের প্রভাব হতে মুক্ত না হলে শুদ্ধ স্বভাব জ্ঞানময় আত্মা লাভ হয় না। এ কথা অনুরূপ ভাষায় বৌদ্ধ চর্য্যাপদে ও বলা হয়েছে—

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চীত্র পাইঠা কাল। [লুইপাদ]
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজন ঘালিউ। [কৃষ্ণপাদ]
মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফল রাহা।
বরগুরুবঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ। [কৃষ্ণপাদ]

পাহুড়দোহায় আরও বলা হয়েছে—বিষয়-কষায়ে চিত্ত রঞ্জিত হতে থাকলে চিরকাল সংসার ভ্রমণ করতে হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় বিষয় পরিত্যাগ করে অনুদিন পরমপদ ধ্যান করা উচিৎ। তাহলেই সত্যকার সাধনা হবে।

কিন্তু ইন্দ্রিয়বিষয় পরিত্যাগ করতে হলে যোগ সাধনারও প্রয়োজন আছে। এই যোগ সাধনার কথা পাহুড়দোহায় স্পষ্ট করে বলা নাই তবে তা ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। তার কারণ হয়ত একথা কেউ স্পষ্ট করে বলতে চাইতেন না।—

নিজ্জিয় সাসো ণিস্ফংদ লোয়ণো মুক্ক সয়ল বাবারো।
এয়াইঁ অবত্থ গও সো জোয়উ ণত্থি সংদেহো।

—শ্বাস জয় করলে, নয়ন নিস্পন্দ হলে, সমস্ত [বিষয়] ব্যাপার বিনষ্ট হয়। এই অবস্থায় পৌঁছুতে পারলে যোগ হয়।

এই 'শ্বাস' জয় করতে পারলেই মনের ব্যাপার বিনষ্ট হয়। মনের ব্যাপার বিনষ্ট হলে পরমপদ বা নির্বাণ লাভ করা যায়। এ কথা পাহুড়দোহার রচয়িতা আরও স্পষ্ট করেই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলেছেন।

তুট্টে মনবাবারে ভগ্গে তহ রায়রোসসব্ভাবে।
পরমপ্পয়ম্মি অপ্পে পরিঠ্ঠিত্র হোই নির্ব্বাণ॥

মনের ব্যাপার বিনষ্ট হলে রাগরোষের সদ্ভাব ভগ্ন হলে আত্মা পরমপদে স্থিতি লাভ করে করে, তখন নির্বাণ লাভ হয়।

বৌদ্ধ দোহা ও চর্য্যাপদে অনুরূপ ভাষায় একই কথা বলা হয়েছে। গুণ্ডরী-পাদ একস্থানে বলেছেন যে সমাধিস্থ হতে হলে যোগীকে "শ্বাসের ঘরে তালা

দিতে হয়" [সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল]। সরহপদে তাঁর এক দোহায় বলেছেন—

জহি মণ পবণ ন সঞ্চরই রবি সসি নাহ পবেস।
তহি বড় চিত্ত বিসাম করু সরহেঁ কহিস উএস॥

—চিত্তকে সেইখানে বিশ্রাম করতে দাও যেখানে মন পবন কিছু সঞ্চরণ করে না, রবি শশিও প্রবেশ করতে পারে না। সরহ অন্যত্র বলেছেন যে এই স্থানই পরমপদ, নির্বাণ বা পরম মহাসুখ।

পাহুড়দোহায় এই অবস্থা সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে—"পরম সুখ হচ্ছে সেই অবস্থা যাতে মন্ত্র তন্ত্র, ধ্যেয়, ধারণ উচ্ছ্বাস কিছুই নাই। সে অবস্থা প্রাপ্ত হলে সমস্ত গোলমাল বিনষ্ট হয়।"

[মংতু ণ তংতু ণ ধেউ ণ ধারণু।
ণ বি উচ্ছাসহ কিজ্জই কারণু।
এমই পরমসুক্খু মুনি সুব্বই।
এহী গলগল কাসু ণ রুচ্চই॥]

বৌদ্ধ সরহপাদ তাঁর দোহায় ঠিক একই কথা বলেছেন—

মন্ত ণ তন্ত ণ ধেঅ ণ ধারণ।
সব্ববি রে বঢ় বিব্ভমকারণ॥
অসমল চিত্ত ম ঝাণেঁ খরড়হ।
সুহ অচ্ছন্ত ম অপ্পণু ঝগড়হ॥

—মন্ত্র তন্ত্র ধ্যান ধারণা কিছুই থাকে না। কারণ এ সমস্ত ভ্রমাত্মক। চিত্ত স্বভাবতঃ নির্ম্মল, ধ্যান ধারণায় তাকে ব্যস্ত করা হয়। সুখের অবস্থায় আত্মাকে বিচলিত করা উচিৎ নয়।

মনের এই বিলীন অবস্থাকে পাহুড়দোহার রচয়িতা অস্তগমন বলে উল্লেখ করেছেন। [মনু পঞ্চাহি সিতু অত্থবণ জাই]—মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে অস্তমিত হয়, মনের এই অবস্থাতেই পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয় [পরম তত্তু ফুড্ড

তহি জি ঠাই]। মনের এই অবস্থায় 'অবনাগমন' নষ্ট হয়, অর্থাৎ বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়। এই 'অবনাগমন' যতক্ষণ ছিন্ন না হয় ততক্ষণ পরমতত্ত্বে পৌঁছান যায় না।

অপ্পাপরহঁ ণ মেলযউ আবাগমণু ণ ভগ্গু।
তুস কংডতহঁ কালু গউ তংডুলু হথি ণ লগ্গু।

—আত্মপর রূপ ভেদ জ্ঞান নষ্ট হয় নি। অবনাগমন বন্ধ হয় নি, সেই জন্য তুষ কুটতে কুটতে কাল গত হল, চাউলে হাত পড়ল না।

বৌদ্ধ দোহা ও চর্য্যাপদেও আমরা অনুরূপ উক্তি পাই সরহপাদের এক দোহায়—

ণ ফুরই ণঅণ অত্থসই চিত্ত ফুড় তুট্টই ভন্তি।
আবাঅ গই অত্থ মণ জাই তহ ধারণ ধিয়ন্তি।

—তখন নয়ন আর স্ফূরিত হয় না, চিত্ত অস্তমিত হয়, ভ্রান্তি বিনষ্ট হয়। তখন বাক্য স্ফূরণ হয় না, মন অস্ত যায়, ধারণাও সেই অবস্থায় পর্য্যবসিত হয়।

মোহবিমুক্কা জই মণা
তবেঁ টুটই অবণাগমণা ॥

—যখম মন মোহবিমুক্ত হয় তখনই অবনাগমন বিনষ্ট হয়।

মন অস্তমিত হলে, অবনাগমন শেষ হলে যে ভাবের উদ্রেক হয় তাকে পাহুড়দোহার রচয়িতা 'সমরস' বলেছেন। তখন মনও পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ মিল সাধিত হয়, মন পরমেশ্বরে মিলিত হয় আর পরমেশ্বর মনের সঙ্গে মিলিত হন। উভয়ের এই মিলনই হচ্ছে সমরস, তখন আর কাউকে পূজা করবার আবশ্যকতা থাকে না।

[মণু মিলিযউ পরমেসরহো পরমেসরু জি মণস্স।
বিণ্ণি বি সমরসি হুই রহিঅ পুজ্জ চড়াবউ কস্স।]

এই মিলন এত সম্পূর্ণ ভাবে সাধিত হয় যে তখন উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ভেদ থাকে না।

[জিম লোণু বিলিজ্জই পাণিয়হিঁ তিম জই চিত্ত বিলিজ্জ] চিত্ত তখন এমন ভাবে বিলীন হয় যেমন লবণ জলের মধ্যে বিলীন হয়।

এই উদাহরণ সরহপাদের দোহাতেও আছে—

অলিঅ ধম্ম মহাসুহ পইসই
লবণ জিম পাণীহি বিলিজ্জই ॥

—লবণ যেমন জলে বিলীন হয় অলীক ধর্ম্মসমূহ তেমনি মহাসুখে বিলীন হয়।

এই অবস্থাকে বৌদ্ধ দোহাকারগণও 'সমরস' বলেছেন। সমরস ও সহজানন্দ তাদের মতে সমার্থক। সরহপাদ এই অবস্থাকে বলেছেন—"তখন শ্রবণ শুনতে পায় না, নয়ন দেখতে পায় না, পবন বইতে থাকে কিন্তু বিচলিত করে না, ঘন বৃষ্টি হয় কিন্তু নিমজ্জিত করে না, তখন ক্ষয় বৃদ্ধি কিছুই থাকে না, গতিবিধি থাকে না। একেই সমরস ও সহজানন্দ বলে।" এই সহজাবস্থার কথা পাহুড়দোহার রচয়িতা জানেন। কারণ এক দোহায় তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন—' হে যোগী সহজাবস্থা লাভ করে ইন্দ্রিয়রূপ করভকে নিবারণ কর।" বৌদ্ধ দোহায় বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথা "শূন্য"কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মতে সমস্তই শূন্য স্বভাব—"হউঁ সুন্ন জও সুন্ন তিহুঅণ সুন্ন" [আমি শূন্য, জগৎ শূন্য, ত্রিভুবনও শূন্য]। সহজানন্দ বা সমরস উৎপন্ন হওয়া এবং শূন্য স্বভাব হওয়া একই কথা। জৈনধর্ম্মে এ শূন্যতার কোন স্থান নাই, তথাপি পাহুড়দোহার রচয়িতা এই শূন্যতাকে ছাড়তে পারেন নি।—

সুন্নঁ ণ হোই সুন্নঁ দীসই সুন্নঁ চ তিহুবণে সুন্নঁ।
অবহরই পাবপুন্নঁ সুন্ন সহাবেণঁ গও অপ্পা।

—শূন্য শূন্য নয়, শূন্য হতেই শূন্য দেখা যায়। ত্রিভুবন শূন্য। পাপ শূন্য সমস্তই এই শূন্য স্বভাবে বিলীন হয়।

এই তুলনামূলক বিচার হতেই বোঝা যাবে মধ্যযুগের প্রারম্ভে ভারতীয় ধর্ম্মসমূহের মধ্যে নানা প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও সাধন বিষয়ে কতটা ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

সাগরিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য :—সহরের পশ্চাদ্‌ভাগে "ভিউ"-তে গুল্মাচ্ছাদিত পাহাড়। একটু আড়ালে সিগ্‌নেল ও বায়ু-দর্শনী। সিগ্‌নেলের চতুর্দ্দিকে, বিশেষত প্রাগ্‌ভাগে বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা আসন রচিত হইয়াছে। আরো পশ্চাতে, ফিওর্ডের সম্মুখ-ভাগে দ্বীপাবলি ও সুদূর প্রসারিত অন্তরীপ পরিদৃশ্যমান্। দৃষ্টির অন্তরালে উন্মুক্ত বারিধি। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে প্রদোষান্ধকার প্রস্তীর্ণ হইতেছে। অতি দূরে বায়ু-মণ্ডলে ও পর্ব্বত-শীর্ষে স্বর্ণাভ লালের ঝিকিমিকি। নীচে হইতে কোয়ার্টেট্ সঙ্গীতের রেশ ভাসিয়া আসিতেছে। তরুণ নাগরিকগণ ও নর-নারীদল জোড় বাঁধিয়া দক্ষিণ দিক্ হইতে বিশ্রম্ভালাপ করিতে করিতে সিগ্‌নেল্ অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে, এক বিদেশী ভ্রাম্যমান দলের নর-নারীর পথ-প্রদর্শক রূপে বেলেষ্টাডের প্রবেশ। তাহার কাঁধে ও হাতে শাল ও ভ্রাম্যমানদের পেটরা বোঝাই।]

বেলেষ্টাড—(যষ্টি দ্বারা উর্দ্ধদেশ দেখাইয়া) Sehen Sie, meine Herrschaften, dort, out there, liegt eine andere mountain. That wollen wir also besteigen, and so hervnter. (বার্ত্তালাপ করিতে করিতে ঐ দলকে বামদিকে লইয়া যাইতেছেন। হিল্ডে পাহাড়ে উঠিতে-উঠিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিল। ক্ষণকাল পরেই বোলেত্-ও সেই পথে উঠিতেছেন।)

বোলেত্—লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌কে পেছনে ফেলে দৌড়ুচ্ছিস্ যে ?

হিল্ডে—আমি পাহাড়ের চড়াই অতো আস্তে-আস্তে উঠতে পারিনে। দেখো, দেখো—কেমন গুটিগুটি আস্‌ছে।

বোলেত্—আঃ! ও যে অক্ষম, তুই তো জানিস্।

হিল্ডে—খুব ভয়ের কারণ আছে, দিদি ?

বোলেত্—নিশ্চয় আছে।

হিল্ডে—আজ বিকেলে বাবার কাছে দেখাতে গেছলো। বাবা এ-সম্বন্ধে কি বল্লেন, জানি কোত্থেকে—বলো তো ?

বোলেত্—বাবা আমায় বলেছেন, এঁর ফুস্‌ফুস্ জমে যাচ্ছে অথবা এই-রকম-একটা-কিছু হবে। বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বাঁচবে না।

হিল্ডে—বাঁচবে না ; সত্যি বলেছেন ? যাঃ, ঠিক আমি যা ভেবেছি, তাই।

বোলেত্‌—মাইরি, তুই যে জানিস্ কেউ যেন টের না পায়—বুঝলি ?

হিল্ডে—তা আমি টের পাওয়াতে যাবো কেন ? (স্বর নামাইয়া) দেখো, হেন্‌স্‌ গুটি গুটি হেঁটে এলো বলে'। আচ্ছা, তাঁকে দেখলেই মনে হয় না যে, নামটি ওঁর হেন্‌স্‌ ?

বোলেত্‌—(ফিস্‌ফিস্ করিয়া) হয়েছে—রাখ্‌! এখন ওঁরা এলে একটু আদব-কায়দা মেনে চলিস্। (লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌ দক্ষিণ দিক্ হইতে আতপত্র-হস্তে আসিতেছেন।)

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—ভদ্রাদের সঙ্গে পা ফেলে দ্রুত চলতে পারিনি। ক্ষমা করেছেন তো ?

হিল্ডে—আপনার হাতে যে অ-বেলায় ছাতা দেখছি ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—এ আপনার মা দিয়েছেন—লাঠি করে চালিয়ে নিতে। আমারটা সঙ্গে ছিলো না কিনা।

বোলেত্‌—বাবা এখনো নীচেই রয়েছেন ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—তিনি দু'এক মিনিটের জন্যে একবার রেস্তোরাঁয় গেলেন। আর সকলে বাইরে গান শুনছিলেন। আপনার মা বল্লেন, এক্ষুণি পাহাড়ে উঠে আসবেন সবাই।

হিল্ডে—(তাঁহার দিকে স্থির লক্ষ্য করিয়া) কি, খুব ক্লান্তি বোধ কচ্ছেন ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—হাঁ, একটু ক্লান্ত লাগছে। কিছুক্ষণ বসলেই সেরে যাবে। (সামনের একটি প্রস্তরাসনে বসিলেন।)

হিল্ডে—(সম্মুখে দাঁড়াইয়া) জানেন ?—নীচেকার ওই বিহার-স্থলীতে নাচ হবে।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—হাঁ, কথা হচ্ছে শুনছিলুম।

হিল্ডে—আচ্ছা, নাচ দিব্যি মজার ; নয় ?

বোলেত্‌—(হেদার ফুলের ঝাড় হইতে ছোটো-ছোটো ফুল কুড়াইতেছেন) শুনলি হিল্ডে ! মিঃ লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌কে একটু জিরোতে দে।

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—(হিল্ডের প্রতি) সত্যি মিস্ হিল্ডে, আমার নাচতে খুব ইচ্ছে। তবে পারি কই ?

হিল্ডে—অ্যাঁ, আপনি শেখেননি কখনো ?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—না, তা নয়। বুকের জন্য নাচা অসম্ভব।

হিল্ডে—আপনি যে একটা দুর্ব্বলতায় ভুগছেন, তার কথাই তো বলছেন—না?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—হাঁ, তাই।

হিল্ডে—এই দুর্ব্বলতার জন্যে আপনার মনে খুব দুঃখু?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—না-না, তা বলি কি-করে? (মৃদু হাসিয়া) আমার মনে হয়, এরই জন্যে সবাই আমায় বন্ধুর মতো খাতির করেন, দয়ার চোখে দেখে থাকেন।

হিল্ডে—তারপর, এ তেমন ভয়েরও কিছু নয়।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—এতে ভয়ের কিছুই নেই ;—আপনার বাবার কাছে জেনে নিয়েছি।

হিল্ডে—আর যথারীতি বেড়াতে আরম্ভ করলেই অম্‌নি সেরে যাবে—না?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—অবশ্যি সেরে যাবে।

বোলেত্‌—(ফুল লইয়া) এদিকে তাকিয়ে দেখুন, মিঃ লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌! এই ফুলটি বাটন্‌-হোলে পরুন দিকি?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—এ আপনার অপরিসীম অনুগ্রহ, মিস্‌ বাঙ্গেল্‌। আপনার অনুকম্পার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি!

হিল্ডে—(পাহাড়ী পথের নিম্ন ভাগের দিকে তাকাইয়া) ঐ যে তাঁরা উঠ্‌ছেন।

বোলেত্‌—(তদ্রূপ নীচে চাহিয়া) কোন্‌খানটায় মোড় ফিরতে হবে, জানা থাকলে হয়। ঐ যাঃ, ভুল পথে চল্লেন।

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—(দাঁড়াইয়া) আমি মোড়ের ওখানে দৌড়ে গিয়ে ওঁদের ডেকে দিচ্ছি।

হিল্ডে—জোরে চেঁচিয়ে ডাকতে হবে কিন্তু।

বোলেত্‌—দরকার নেই। কেন মিছিমিছি শ্রান্ত হতে যাবেন?

লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌—বাঃ! পাহাড় থেকে নামা ভারি সোজা। (দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া চলিলেন।)

হিল্ডে—সোজা বৈকি। (তাঁহাকে ছুটিতে দেখিয়া) দেখলে, একেবারে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে। ফের যে চড়াই ভাঙতে হবে, তা ভুলেই গেলো।

বোলেত্‌—আহা বেচারী!

হিল্ডে—আচ্ছা, ধরো লিঙ্‌ষ্ট্রাণ্ড্‌ প্রপোজ্‌ করলে—তাঁকে তুমি গ্রহণ করবে?

বোলেত্—কী পাগ্লামি করিস্?

হিল্ডে—মা-না, যদি তাঁর সেই "তুর্ব্বলতা"-টুকু না থাকতো ; আর ধরো, জীবন আরও কিছু পিছিয়ে গেলো—তাহলে ?

বোলেত্—বেশ তো, তুই নিজেই গ্রহণ কর্ না ?

হিল্ডে—সে আমি করছিনে। এক কানা-কড়িও যার সম্বল নেই তার তো নিজেরই বেঁচে থাকা মুস্কিল।

বোলেত্—তবে, তুই যে বড়ো তাঁর পিছু পিছু ঘুরিস্?

হিল্ডে—ও! সে ঐ তুর্ব্বলতা বলে'।

বোলেত্—কই, আমি তো কখনো দেখিনি, তুই তাঁর জন্যে এতটুকু দরদ দেখেয়েছিস্?

হিল্ডে—তা কেন দেখাতে যাবো ? তবু, ভারি মজা কিন্তু।

বোলেত্—কি মজা রে ?

হিল্ডে—এই, তাঁর দিকে তাকানো ; তাঁকে দিয়ে বলানো যে, ওতে ভয় পাবার মতো কিচ্ছু নেই ; ওঁকে দেশ-ভ্রমণে বেরোতে হবে ; তারপর ও একজন শিল্পী হবে। সত্যি, এ সবই ও বিশ্বাস করে ; আর ভারি খুশী। অথচ ওকে দিয়ে কিছুই হবে না কিচ্ছু হবে না। বাঁচবেই না ত' হবে কি-দিয়ে ?—এ ভাবতে আমার বড্ড ভালো লাগে।

বোলেত্—ভালো লাগে ?

হিল্ডে—সত্যি ভয়ানক ভালো লাগে ;—জোর করেই বল্বো।

বোলেত্—হিল্ডে, তুই কি তুরন্ত মেয়ে রে বাপু!

হিল্ডে—তাই আমি হতে চাই। সাধ করে নয়, হিংসার চোটে। (নীচের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া) উঁহু, আর্ন্‌হলম্ যে। ওঁর পাহাড় ভেঙে উঠতে একতিল-ও ইচ্ছে আছে, মনে হয় না। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) একটা কথা। জানো ?—ডিনারের সময় আর্ন্‌হল্ম্-এর দিকে তাকিয়ে দেখি—

বোলেত্—কি দেখ্লি ?

হিল্ডে—রামো রামো! তাঁর মাথার সব-কটা চুল ঝরতে আরম্ভ করেছে—ঠিক তালুর ওপরটায়।

বোলেত্—চুপ কর্। মিথ্যে কথা আর বলতে হবে না।

হিল্ডে—সত্যি কথা। আরো শোনো—দু'চোখের চারদিক্‌টা কোঁচকানো। ধন্যি মেয়ে তুই, বোলেত্! কী-করে যে তুই ওঁর কাছে পড়বার সময় অতো তাঁর প্রেমে পড়্‌লি !!

বোলেত্—(প্রফুল্লমুখে) আচ্ছা, এমন কেন হয়, বল্ দেখি? আমার মনে আছে, একদিন আমি কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলুম। কারণ তিনি বলে-ছিলেন, বোলেত্ নামটি নাকি কুশ্রী।

হিল্ডে—তা হলেই ভেবে দেখো না। (নীচের দিকে তাকাইয়া) একবার দেখো নীচে তাকিয়ে; "মৎস্য-নারী" গুঞ্জনালাপ করতে করতে হেঁটে আসছেন—বাবার সঙ্গে নয় কিন্তু। কি-জানি বাপু, দু'জনে চোখ ঠারাঠুরি চলছে কিনা!

বোলেত্—ছি! তোর লাজ-সরম নেই। মা'র সম্বন্ধে এমন একটা কথা বল্লি তুই?—বিশেষতঃ এখন যখন আমাদের সম্পর্কটা মোলায়েম হয়ে আসছে?

হিল্ডে—বেশ বেশ। তুমি চোখে ঠুলি দিয়ে এ-রকমটি বসে বসে ভাবো। কিসে হয় শুনি? ওঁর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক আমাদের হতেই পারে না। কারণ, উনি আমাদের নন্ মোটেই। আমরাও তাঁর কেউ নই। বাবা কেন যে তাঁকে বাড়ীতে ঠাঁই দিতে আনলেন তা এক বিধাতাই জানেন। একদিন যদি আচম্‌কা উনি বেহেড্ হয়ে যান, তবু অন্ততঃ আমি বিস্মিত হবো না।

বোলেত্—বেহেড্ হতে যাবেন কেন? তুই, কেন যা-তা ভাবিস্, বল্ তো?

হিল্ডে—পাগল হওয়াটা কিছু ছিষ্টিছাড়া নয়। এঁর মা'র উন্মাদ-রোগ হয়ে-ছিলো। সেই রোগে মারাও গেছেন, জানি।

বোলেত্—অনধিকার চর্চ্চা নিয়েই তুই আছিস্। যাক্, এ-নিয়ে বক্‌বক্ করিস্ নে, বলে দিচ্ছি। নেহাৎ বাবার মুখ চেয়ে তুই ভালো হ' হিল্ডে, শুন্‌ছিস্?

(বাঙ্গেল্, এলীডা, আর্নহলম্ ও লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ডের দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রবেশ।)

এলীডা—(পাহাড়ের পশ্চাদ্দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ ঐখানে।

আর্নহলম্—হাঁ ঐদিকেই হবে।

এলীডা—ঐখানেই সমুদ্র।

বোলেত্—(আর্নহল্‌ম্-এর প্রতি) এই জায়গাটা ভারি আরামের, কি বলেন ?

আর্নহলম্—হাঁ-হাঁ, বিচিত্র দৃশ্য ! অপূর্ব্ব !

বাঙ্গেল্—তুমি তো এখানে বড়ো-একটা আসতে না ?

আর্নহলম্—না ! আমার সময়ে এখানে ওঠারই যো ছিলো না ;—একটাও পথ ছিলো না।

বাঙ্গেল্—বিহার-স্থলীও ছিলো না। এসব এই গত কয়েক বছরের মধ্যে হয়েছে।

বোলেত্—ঐ "পাইলট্ পাহাড়" এর চেয়েও চমৎকার দেখতে।

বাঙ্গেল্ ওখানে যাবে এলীডা ?

এলীডা (প্রস্তরাসনে উপবেশন করিয়া) না ধন্যবাদ। তোমরা যাও না। আমি ততোক্ষণ এখানেই বসি।

বাঙ্গেল্—তাহলে আমিও তোমার কাছে বসছি। মেয়েরা বরং আর্নহল্‌ম্-কে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসুক।

বোলেত্—আমাদের সঙ্গে যাবেন, মিঃ আর্নহল্‌ম্ ?

আর্নহল্‌ম্—খুব। রাস্তা আছে ?

বোলেত্—বেশ সুন্দর চওড়া রাস্তা।

হিল্ডে—পথটি যেন শুধু তু'জনের পক্ষে হাতে হাত জড়িয়ে আরাম করে যাবার জন্যে তৈরী।

আর্নহল্‌ম্—(উপহাস ছলে) সত্যি তাই—ছোট্ট বিবি ? (বোলেতের প্রতি) আমরা তু'জনে পরখ্ করে দেখবো ?

বোলেত্—(মুচকি হাসিয়া) চলুন, তাই দেখি। (তাঁহারা বাহু জড়াইয়া বামদিকে চলিয়া গেলেন।)

হিল্ডে—(লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড্‌কে) আমরাও যাবো ?

লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড্—কি, হাতে হাত জড়িয়ে ?

হিল্ডে—তা নয়তো কি ? ডরাই নাকি ?

লিঙ্গষ্ট্রাণ্ড্—(হাত লইয়া খুসী ভাবে হাসিয়া) কেমন মিষ্টি-মিষ্টি ঠেক্‌ছে !

হিল্ডে—বটে ?

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—মনে হচ্ছে যেন, আমাদের বাগ্‌দান হয়ে গেলো।

হিল্ডে—বুঝেছি, মিঃ লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্! কোনো ভদ্র-মহিলার সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে আপনি কখ্‌খনো হাঁটেন নি, (উভয়ের প্রস্থান)।

বাঙ্গেল্—(সিগ্‌নেলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া) যাক্, তোমাকে ক্ষণেকের জন্যে নিরালায় পেলুম।

এলীডা—এসো পাশে বসবে এসো।

বাঙ্গেল্—(উপবিষ্ট হইয়া) শান্তিতে দু'টো কথা হোক্।

এলীডা—কী কথা ?

বাঙ্গেল্—কথা তোমাকে নিয়ে; তারপর আমাদের দু'জনের-ই সম্বন্ধে। এলীডা, এ-রকম আর কদ্দিন চলে বলো!

এলীডা—কি করতে চাও তবে ?

বাঙ্গেল্—ওগো! চাই দু'জনে একাত্মা হতে; আগেকার মতো, একত্র স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপন কর্‌তে।

এলীডা—হায়, সে-কী আর হয় ? সে-যে একেবারে অসম্ভব!

বাঙ্গেল্—তুমি মাঝে মাঝে যে দু'একটা কথা বলেছো, তার থেকে বোধ হয় কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি।

এলীডা—(সোচ্ছ্বাসে) না গো, তুমি বোঝোনি। কেন শুধু শুধু বলছো ?

বাঙ্গেল্—তবু আমি জানি, এলীডা, তোমার নিষ্কলুষ মনে এতোটুকু গ্লানি নেই।

এলীডা—তা না হয় হলো। তারপর ?

বাঙ্গেল্—তুমি তোমার সম্পূর্ণ, সহজ সত্যিকার জীবন পাওনি, এলীডা। পেলে তো তুমি অনাবিল সুখের অধিকারিণীই হতে।

এলীডা—(সাগ্রহে তাকাইয়া) কী বলতে চাও ?

বাঙ্গেল্—তুমি কারুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হবার যোগ্যা নও।

এলীডা—কি করে বুঝলে ?

বাঙ্গেল্—এ আমার মনে বহুবার জেগেছে—কী যেন এক অমঙ্গল আশঙ্কার মতো। আজ স্পষ্ট করে বুঝতে পেলুম, মেয়েদের উৎসব-আয়োজনের

মধ্যে, তুমি আমার কারচুপি লক্ষ্য করেছো। কিন্তু দেখো, স্মৃতিকে নেহাৎ মুছে ফেলা যায় না। আর যাই বলো, আমি পারিনে। আমি তেমন লোক নই।

এলীডা—সে তো আমি জানি গো!

বাঙ্গেল্—কিন্তু তবু তুমি ভুল করলে। তুমি ভাবছো, এই মেয়েদের মা এখনো বেঁচে আছে। যেন, অদৃশ্যা হয়েও সংসারে আমাদের-ই মাঝখানে সে রয়েছে। তুমি ভাবো, আমার হৃদয় তোমাদের দু'জনার মধ্যে আধা-আধি ভাগ করা। এই ভাবনায় তুমি পীড়িত। তুমি আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে এমন কিছু আছে মনে করো যা নীতি-সম্মত নয়। তাই তুমি আমার সঙ্গে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করতে পারো না; তোমার প্রবৃত্তিও হয় না।

এলীডা—(দাঁড়াইয়া) অতোখানি ভেবে নিয়েছো, বাঙ্গেল্?

বাঙ্গেল্—হাঁ। আজ এই অনর্থের গূঢ় অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখতে পেলুম।

এলীডা—অন্তঃস্থল তুমি দেখোনি, কেন মিছে ও-কথা বলছো?

বাঙ্গেল্—(দাঁড়াইয়া) অবিশ্যি আরও কিছু আছে, ডীয়ার। তাও দেখতে পাচ্ছি।

এলীডা—(উৎকণ্ঠিত) আর কি দেখছো?

বাঙ্গেল্—ধরো না: এখানকার আবেষ্টন তোমার পক্ষে অসহ্য। এই পাহাড়-গুলো যেন জগদ্দল পাথরের মতো তোমার বুকের ওপর মস্ত ভার হয়ে চেপে আছে। এখানে সব কিছুই চারদিক থেকে তোমায় কুঞ্চিত করছে। মাথার আকাশ অ-বিস্তীর্ণ। বাতাসে ঝাঁঝ্ নেই, চেতনা নেই।

এলীডা—সত্যি। রাত্রে দিনে শীতে গ্রীষ্মে সমুদ্রের দুর্নিবার আকর্ষণ আমার অসহ।

বাঙ্গেল্—জানি, এলীডা। (মস্তকে হাত বুলাইয়া) সেই জন্যই তো আমার ব্যথাতুরা প্রিয়াকে তাঁর সাগরায়তনে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছি।

এলীডা—মানে?

বাঙ্গেল্—মানে অতি সহজ। আমরা এবার বেরোচ্ছি।

এলীডা—বেরোচ্ছি মানে ?

বাঙ্গেল্—তোমাকে নিয়ে দরাজ দরিয়ায় ভাসান্ দেবো। তুমি তোমার মনের মতন পরিবেশ পেয়ে সুখী হবে।

এলীডা—ঐ ভাবনা ছাড়ো, ডীয়ার! এ একেবারে অসম্ভব। পৃথিবীর আর কোথাও এখানকার মতো বেঁচে থেকে সুখ নেই।

বাঙ্গেল্—তা হোক্, তুমি কি ভাবো, তোমাকে ছাড়া আমি এখানে সুখে থাকবো ?

এলীডা—তা আমি তো এখানেই আছি, থাকবো-ও। আমি যে তোমারি।

বাঙ্গেল্—তুমি আমার এলীডা ?

এলীডা—আঃ, কী যে বলো ? তোমার প্রেম, তোমার কর্ম্ম, সব যে এরই মধ্যে নিবদ্ধ। এই তো তোমার সারাজীবনের কর্ম্মক্ষেত্র।

বাঙ্গেল্—সে না-হয় হলো। কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি, আমরা এ-যায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও—ঐ হোথা—চলে যাবো। এই তবে কথা রইলো, এলীডা।

এলীডা—কিছু লাভ হবে এতে, ভেবে দেখেছো ?

বাঙ্গেল্—কেন, তোমার স্বাস্থ্য ফিরবে। তুমি শান্তি পাবে।

এলীডা—অসম্ভব। তাছাড়া তোমার নিজের কথা। নিজের কথাও একবার ভেবে দেখো। তোমার কি হবে ?

বাঙ্গেল্—আমি আমার প্রিয়তমাকে জয় করে আবার আমার করে নেবো।

এলীডা—না, তা হয় না। এ কিছুতেই করতে পারবে না, বাঙ্গেল্! এই-খানটাই তো সাংঘাতিক। ভাবলেই হৃদয় চূর হয়ে যায়।

বাঙ্গেল্—সেটা এখনও প্রমাণিত হয়নি। তুমি যদি এমনিধারা চিন্তা মনে-মনে পুষতে থাকো, তাহলে এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। যত শীঘ্র হয় ততোই ভালো। এই পাকাপাকি হয়ে রইলো।

।খণ্ড।

এলীডা—নাঃ, তোমার কাছে সব খোলাখুলি প্রকাশ করাই ভালো। নইলে সত্যের অবমাননা হবে। ঠিক যা খাঁটি তা-ই বলবো।

বাঙ্গেল্—হাঁ-হাঁ, সেই ভালো।

এলীডা—আমার জন্যে তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত হবে না। এতে দু'তরফাই ক্ষতি।

বাঙ্গেল্—কথা দিচ্ছো, প্রকৃত কথা আমায় বলবে?

এলীডা—সব বলবো, যতোখানি বলা আমার পক্ষে সম্ভব আর যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি। এসো, কাছে বসো। (উভয়েই প্রস্তরাসনে বসিলেন।)

বাঙ্গেল্—আচ্ছা এলীডা, তবে—

এলীডা—সেই যেদিন তুমি এসে বল্লে, আমি তোমার হবো কিনা, তুমি কেমন স্পষ্ট অকপট ভাবে তোমার প্রথম পরিণয়ের কথাও বলেছিলে। বলেছিলে, তোমাদের সুখের সংসার ছিলো।

বাঙ্গেল্—সুখের সংসার ছিলো ঠিকই।

এলীডা—হাঁ গো, আমারও সে-বিশ্বাস আছে। এই যে কথাটি বল্লুম তার অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে। আমি শুধু তোমায় মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমার দিক্ থেকেও এতোটুকু ভাবের ঘরে চুরি ছিলো না। আমিও তোমায় খোলসা করে বলেছিলুম যে, একবার আমি আরেকজনকে ভালো বেসেছি, এক-রকমের বাগ্‌দান-ও হয়ে গেছ্‌লো।

বাঙ্গেল্—এক-রকমের—

এলীডা—হাঁ, অনেকটা তাই। দেখো এসব মাত্র অল্প কয়-দিনের ক্রিয়া-কাণ্ড। তারপর সে চলে গেলো। আমার দিক থেকেও এর ইতি হলো। তোমাকে তো সমস্তই বলেছি।

বাঙ্গেল্—ঐ পুরোণো কথা তুলে আর কি হবে? ওতে আমার এতটুকু সংশ্রব-ও ছিলো না। আমি একদিনও ওর পরিচয় তোমার কাছে জানতে চাইনি।

এলীডা—তা জানি। আমিই তোমার সর্ব্বক্ষণের চিন্তা।

বাঙ্গেল্—(সস্মিত) অবিশ্যি এক্ষেত্রে লোকটি যে কে, তা একেবারে টের পাইনি, এমন নয়।

এলীডা—কে, শুনি?

বাঙ্গেল্—স্কিওলভাইকেন ও পাশাপাশি যায়গার মধ্যে বেছে নেবার মতো

ক'জনই বা ছিলো ! একজনের নাম বলবো ?

এলীডা—তুমি ভাবছো আর্ন্‌হল্‌ম্‌ ?

বাঙ্গেল্‌—তাই নয় ?

এলীডা—না।

বাঙ্গেল্‌—ও নয় ?—তাহলে আমি নাচার।

এলীডা—মনে পড়ে ?—হেমন্তের শেষে একখানা বড়ো মার্কিন্‌ জাহাজ মেরামতের জন্যে স্কিওল্‌ভাইকেনে এসে লাগলো।

বাঙ্গেল্‌—হাঁ, বেশ মনে আছে। একদিন সকালবেলা দেখা গেলো, ঐ জাহাজে কাপ্তেন নিজের কেবিনে নিহত। আমিই শব-ব্যবচ্ছেদ করতে গেছলুম।

এলীডা—হুঁ।

বাঙ্গেল্‌—কাপ্তেনের দ্বিতীয় সঙ্গীটিই ওঁকে হত্যা করেছিলো।

এলীডা—তা কি বলা চলে ? কোনো প্রমাণ তো পাওয়া যায়নি।

বাঙ্গেল্‌—প্রমাণ যথেষ্ট ছিলো বৈকি। নচেৎ সাগরে ডুবে মরতে যাবে কেন ?

এলীডা—সে তো ডুবে মরেনি। অন্য একটা জাহাজে উত্তর অঞ্চলে চলে গেলো।

বাঙ্গেল্‌—(চমকিত) তুমি কিসে জানলে।

এলীডা—(দম লইয়া) বাঙ্গেল্‌, এরই কাছে আমি বাগ্‌দত্তা হয়েছিলুম।

বাঙ্গেল্‌—(লাফাইয়া উঠিয়া) বটে ! এ-ও সম্ভব !!

এলীডা—হ্যাঁ গো, তাই। এ-ই সে-ই।

বাঙ্গেল্‌—এলীডা, শেষে তুমি এই লোকটার কাছে বাগ্‌দান করলে ? অপরিচিতের কাছে বাগ্‌দান ! তার নাম জানো ?

এলীডা—তখন ফ্রিমেন্‌ বলে জানতুম। তারপর চিঠিতে আলফ্রেড জনষ্টন বলে নাম সই করতো।

বাঙ্গেল্‌—কোত্থেকে এসেছিল ?

এলীডা—বলেছিলো, ফিনমার্ক থেকে আস্‌ছে। বাকী খবরটা হচ্ছে, জন্ম ফিনল্যাণ্ডে। বোধ হয়, বাপের সঙ্গেই নরোয়ে এসেছিলো।

বাঙ্গেল্‌—ফিনল্যাণ্ডে বাড়ী তাহলে !

এলীডা—তাই তো বলেছে।

বাঙ্গেল্—আর তার সম্বন্ধে কিছু জানো ?

এলীডা—খুব ছেটোবেলা থেকেই নাবিক হয়ে বেরিয়েছিলো। অনেক লম্বা সাগর-পাড়ি দিয়েছে।

বাঙ্গেল্—আর কিছু ?

এলীডা—না। এ-নিয়ে আমাদের কখনো কথা হতো না।

বাঙ্গেল্—তবে কি কথা হতো ?

এলীডা—প্রায়ই সমুদ্রের বিষয়ে আলোচনা কর্‌তুম্।

বাঙ্গেল্—বটে ? সমুদ্রের আলোচনা—

এলীডা—ঝড়-ঝঞ্ঝার কথা। সুশান্ত সমুদ্রের কথা। সমুদ্রের অন্ধকার রাত্রি, রবি-কিরণে সাগর-জলের ঝিলিমিলি ;—এ-নিয়েও প্রসঙ্গ হতো। কিন্তু প্রায়ই আলোচনা করতুম—হাঙ্গর-তিমি-সীল এরা কি-রকম মধ্যাহ্ন রৌদ্রে পাহাড়ের কোলে শুয়ে থাকে, এই নিয়ে। তাছাড়া, গাল-ঈগ্‌ল এবং আরো কতো সাগরীয় পাখী সম্বন্ধেও কথা হতো। আমার মন কেমন করে উঠতো!—কথা বলতে-বলতে ও একেবারে সমুদ্রের জন্তু ও পাখী-গোষ্ঠীর সঙ্গে যেন এক হয়ে যেতো।

বাঙ্গেল্—তুমি এক হয়ে যেতে না ?

এলীডা—হাঁ, আমারো মনে হতো, আমিও যেন ওদেরি একজন।

বাঙ্গেল্—বটে ? এম্‌নি বুঝি তুমি বাগ্‌দত্তা হলে ?

এলীডা—হাঁ। সে বল্লে, কথা আমাকে দিতেই হবে।

বাঙ্গেল্—দিতেই হবে, মানে ? তোমার একটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা কিছু ছিলো না ?

এলীডা—ও কাছে থাক্‌লে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ধুয়ে-মুছে একাকার হয়ে যেতো। পরে আমার কাছে এ-একটা মস্ত রহস্য বলে ধরা পড়লো।

বাঙ্গেল্—তোমরা প্রায়ই একসঙ্গে কাটাতে ?

এলীডা—না। কখন্‌সখন্ দেখা হতো। একদিন আমাদের বাড়ীর পাশাপাশি এসে বাতি-ঘরের ওপর দিকে তাকালে। ক্রমশঃ আমাদের জানাশোনা

সুরু হলো ; মধ্যে-মধ্যে সাক্ষাৎ হতো। শেষে কাপ্তেন সংক্রান্ত সেই দুর্ঘটনা। ওর-ও চলে যাওয়া।

বাঙ্গেল্—ব্যাপারটা আরেকটু খুলে বলো।

এলীডা—সেদিন সবে ভোর হয়েছে, এম্‌নি সময় তার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলুম। লিখেছিলো, ব্রাথাম্মেরে তার সঙ্গে যেতে হবে—যে যায়গাটা বাতি-ঘর ও স্কিওলভাইকেন্-এর মাঝখানে।

বাঙ্গেল্—বুঝেছি।

এলীডা—লিখেছিলো, আমাকে অবিলম্বে যেতে হবে ;—একটা কি কথা নাকি—

বাঙ্গেল্—তুমি গেলে ?

এলীডা—হাঁ, গেলুম। না গিয়ে উপায় ছিল না। আমায় বল্লে যে, রাত্তিরে কাপ্তেনকে হত্যা করেছে।

বাঙ্গেল্—নিজের মুখে বল্লে ? সত্যি-সত্যি এ-রকম বল্লে ?

এলীডা—তবে এ-ও বল্লে, যা করেছে ভালোই করেছে, অন্যায় নয়।

বাঙ্গেল্—ভালো ! অন্যায় নয় ?—অথচ একেবারে খুনোখুনি !

এলীডা—সে-কথা বিশদ্ প্রকাশ না করেই বল্লে, এ আমার শোনা উচিত হবে না।

বাঙ্গেল্—তার প্রত্যেকটি কথা বেমালুম মেনে নিলে ?

এলীডা—কী করি ! অবিশ্বাস করার কথা একবারও মনে জাগলো না। তারপর সে গেলো চলে। যাক্, কিন্তু যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নেবে—নাঃ, তুমি কিছুতেই কল্পনা করতে পারবে না, সে কী করলে—

বাঙ্গেল্—বলো, বলো।

এলীডা—নিজের পকেট থেকে একটা চাবির রিং বার করলে। আরেকটা আংটি খুললে আঙুল থেকে ; আংটিটি সে হামেসাই পরে থাক্‌তো। আমার কাছ থেকেও একটা ছোটো আংটি চেয়ে নিলে। দু'টো আংটি চাবির রিংএ এঁটে বল্লে, সমুদ্রের সাথে আমাদের বিয়ে হবে।

বাঙ্গেল্—বিয়ে !

এলীডা—হাঁ। ঐ কথা বলেই চাবির রিং-শুদ্ধ দু'টো আংটি গায়ের জোরে

সমুদ্রের মাঝে যতখানি দূর সম্ভব ছুড়ে ফেললে।

বাঙ্গেল্—এলীডা! তুমি—তুমি এসব হতে দিলে?

এলীডা—কী করবো? তখন যে ভাবতুম এইটেই একান্ত স্বাভাবিক। যাক্ শেষে বিধাতার কৃপায় সে চলে গেলো।

বাঙ্গেল্—কখন গেলো, জানো?

এলীডা—ওগো! তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছো, আমারো জ্ঞান-বুদ্ধি ফিরে এলো। বেশ বুঝলুম, খানিকটা হুবহু অর্থহীন পাগ্লামো হয়ে গেছে।

বাঙ্গেল্—আবার, এখনি যে চিঠির কথা বল্লে? সুতরাং এর পরেও তার কাছ থেকে চিঠি-পত্র পেয়েছো?

এলীডা—হাঁ, চিঠি এসেছে। প্রথমবার আর্চ্‌এঞ্জেল থেকে দু'চার ছত্রের চিঠি। লিখলে যে, আমেরিকা যাচ্ছে। কোথায় উত্তর পাঠাতে হবে, তাও লেখা ছিলো।

বাঙ্গেল্—তুমি উত্তর দিলে?

এলীডা—হাঁগো, তৎক্ষণাৎ লিখলুম। অবিশ্যি জানিয়ে দিলুম, আমাদের এ সম্বন্ধ চল্‌তে পারে না—আমাকে যেন ভুলে যায়, আমিও তাকে ভুলে যাবো।

বাঙ্গেল্—উত্তর এলো?

এলীডা—হাঁ।

বাঙ্গেল্—তোমার কথার কি উত্তর দিলে?

এলীডা—এর উল্লেখই করলে না। যেন তার সঙ্গে আমার আগেরই মতো ভাব। নির্ব্বিকার শান্ত ভাবে লিখে পাঠালে যেন, আমি তার প্রতীক্ষা করে থাকি। কখন যে আমায় নিতে আস্‌বে তা পরে লিখে জানাবে। আমি যেন তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকি।

বাঙ্গেল—ও তোমায় মুক্তি দিতে চায় না?

এলীডা—না। তবু আমি আবার লিখলুম। আগেকার কথা-গুলি ফিরিয়ে তার চেয়েও জোরালো করে জবাব দিলুম।

বাঙ্গেল্—তোমার কথা মেনে নিলে?

এলীডা—না গো, ও মেনে নেবে! ফের নির্ব্বিকার ভাবে লিখলে। তার সঙ্গে

আমার ভাব-ভঙ্গের একটা কথাও উল্লেখ করলে না। আমি দেখলুম, লিখে খামোখা নাকাল হওয়া। তাই আর লিখিনি।

বাঙ্গেল্—তার কাছ থেকে আর চিঠি এলো?

এলীডা—এলো বৈকি। তিন তিন খানা চিঠি। প্রথম খানা কালিফর্ণিয়া থেকে, দ্বিতীয় খানা চীন থেকে, সর্ব্বশেষ খানা অষ্ট্রেলিয়া থেকে। লিখেছিলো, সোণার খনিতে কাজ করতে যাচ্ছে। সেই থেকে তার আর খোঁজ খবর পাইনি।

বাঙ্গেল্—লোকটা তোমায় যাদু করেছে, এলীডা!

এলীডা—নাগো, কী ভীষণ লোক!

বাঙ্গেল্—এখন থেকে ওকে একদম ভুলে যাও। ওর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলো। এনিয়ে আর চিন্তা করো না।···এলীডা·—লক্ষিটি! তোমার জন্যে কিন্তু আরেকটি চিকিৎসা দরকার। তোমাকে এই ফিওর্ডগুলোর রুদ্ধ বাতাস থেকে মুক্তি পেতে হবে—খোলা হাওয়ার মধ্যে, সাগরের ফুর্‌ফুরে লোনা হাওয়ার মধ্যে। ডীয়ার! এই তবে ঠিক।

এলীডা—না, ওকথা বলো না। তা'কি আর হয়? মুক্তি আমার নেই—বেশ বুঝতে পাচ্ছি। আমি বন্দিনী। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েও আমার নিষ্কৃতি নেই।

বাঙ্গেল্—এ কি বলছো তুমি!

এলীডা—বুঝছো না?—কী লাঞ্ছনা! আমার মনের ওপর তার কী অরাজকতা!

বাঙ্গেল্—কেন? তার সঙ্গে তোমার সেই ছাড়াছাড়ির কাল থেকেই তো এসব চুকে বুকে যাওয়া উচিত।

এলীডা—(লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া) যায়নি, যায়নি।

বাঙ্গেল্—কী?

এলীডা—চুকে যায়নি, বাঙ্গেল্। কখ্‌খনো যাবে না, সারা জীবনেও না। এই তো আমার ভয়।

বাঙ্গেল্—(করুণ সুরে) এই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটিকে তোমার অন্তর থেকে ভুলে যেতে পারোনি?

এলীডা—ভুলে তো গেছ্‌লাম। কিন্তু হঠাৎ সে আবার ফিরে এলো।

বাঙ্গেল্—কখন ?

এলীডা—প্রায় তিন বছর কি আরও কিছু বেশী দিন হবে—ঠিক সন্তান-সম্ভাবনার সময়টিতে।

বাঙ্গেল্—তখন ?—ও ! বুঝেছি, এলীডা। এখন অনেক কথা বুঝতে পাচ্ছি।

এলীডা—ভুল করো না, ডিয়ার। হায়রে, আমার যে কী হবে ! বিশ্ব-সংসারে এমন কিছুই নেই, যা-দিয়ে আমি তোমায় এতোটুকুও বোঝাতে পারি !

বাঙ্গেল্—(করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) এই তিন বছর ধরে তুমি পর-পুরুষের জন্যে লালায়িত হয়েছো, পর-পুরুষকে কামনা করেছো, আমায় করোনি —ইতরজনকে করেছো !

এলীডা—ছি ! মিথ্যে কথা। তুমিই আমার কামনার ধন, আর কেউ নয়।

বাঙ্গেল্—(অনুদাত্ত স্বরে) কেন তবে এতোদিন তুমি আমার সঙ্গে পত্নীর মতো আচরণ করোনি ?

এলীডা—ঐ ভিন্‌দেশী লোকটির ভয়ে।

বাঙ্গেল্—ভয় ?

এলীডা—উঃ ! কী দারুণ ভয় !—বুঝি বা এক সাগরই অমন্ ভয় দেখাতে পারে ! রসো, তোমাকে বলছি বাঙ্গেল্।

(সত্বরে তরুণ-তরুণীরা ফিরিতেছেন। নতি পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে বাহির হইয়া গেলেন। ঐ দলে আর্ন্‌হলম্ ও বোলেত্, হিল্ডে ও লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্।)

বোলেত্—(হাঁটিতে হাঁটিতে) কিগো, এখনো তোমরা এইখানেই রয়েছো ?

এলীডা—এই জায়গাটিতে বেড়ে ঠাণ্ডা। বেশ আরাম লাগছে।

আর্ন্‌হলম্—আমরা কিন্তু নাচ ঘরে চললুম্।

বাঙ্গেল্—এসো আমরাও যাচ্ছি।

হিল্ডে—আচ্ছা, তবে চললুম এখন।

এলীডা—মিঃ লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্! এক মিনিট দাঁড়াবে ? (লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্ দাঁড়াইলেন। আর্ন্‌হলম্, বোলেত্ ও হিল্ডে বাহির হইয়া গেলেন। লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ডের প্রতি) তুমিও কি নাচে চল্লে ?

লিঙ্গ্‌ষ্ট্রাণ্ড্—না, মাসীমা। আমার অতো বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

এলীডা—হুঁ তুমি একটু সাবধানে থেকো। বুকে ব্যথা; ভুলে যেও না। এখনো সেরে ওঠোনি, মনে থাকে যেন।

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড—মনে আছে।

এলীডা—(একটু ইতস্তত করিয়া) আচ্ছা, তোমার সেই সমুদ্র-যাত্রা কদ্দিন হলো, বলো তো?

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—যখন আমার বুকে ব্যথা হলো, তখনকার কথা?

এলীডা—হাঁ; এই যে সকালে ভ্রমণ-কাহিনী শোনাচ্ছিলে!

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—ও! বল্‌ছি, এই—আজ অবধি পুরোপুরি তিন বছর হবে।

এলীডা—তিন বছর।—ঠিক তো?

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—একটু বেশীও হতে পারে। ফেব্রুয়ারীতে আমেরিকা থেকে রওনা দিলুম, মার্চ্চে বিষুবীয় ঝড়ের সময় আমাদের জাহাজ ডুবি হলো।

এলীডা—(বাঙ্গেলের দিকে তাকাইয়া) ঐ তখনই—

বাঙ্গেল্—কিন্তু, এলীডা-ডীয়ার—

এলীডা—আচ্ছা, তোমাকে আর আট্‌কাতে চাইনে, মিঃ লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্।—নেমে যাবে? নাচে যেও না কিন্তু।

লিঙ্গ ষ্ট্রাণ্ড্—না। আমি দর্শক-মণ্ডলীতে থাক্‌বো। (নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

এলীডা—জনষ্টন্-ও ঐ জাহাজে ছিলো, আমি নিশ্চয় বলছি।

বাঙ্গেল্—কিসে জানলে?

এলীডা—(যথোত্তর না করিয়া) জাহাজে থাক্‌তেই সে খবর পেলে, আমি তাকে অনাদর করে আরেকজনকে বিয়ে করেছি। সেই সময় থেকেই এই আতঙ্কের সৃষ্টি।

বাঙ্গেল্—বটে?

এলীডা—হ্যাঁগো আচম্‌কা দেখ্‌তে পাই, ও আমার সাম্‌নাসাম্‌নি জল্‌-জ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে; অথবা কখনো কখনো তার মুখের একটা পাশও চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে।

বাঙ্গেল্—কি-রকম দেখায় বলো তো?

এলীডা—বিদায়ের কালে তাকে যেমনটি দেখেছিলুম তেম্‌নি।

বাঙ্গেল্—দশ বছর আগেকার মতো?

এলীডা—হাঁ, ঐ ব্রাথাম্মেরে যেমনটি দেখেছিলুম। সব চেয়ে স্পষ্ট করে দেখি, তার বুকের ওপর পিন্ দিয়ে গাঁথা নীলাভ স্বচ্ছ যে বড়ো মণি—সেইটি। মণিটি যেন মরা মাছের চোখ্; আমার দিকে তাকিয়ে চক্‌মক্ করে জ্বলে।

বাঙ্গেল্—হায় ভগবান! আমি যতোটুকু ভাবতে পারিনি তার চেয়েও দেখছি, তোমার ব্যাধি গুরুতর। এলীডা তুমিও জানো না, কতো শক্ত তোমার ব্যামো।

এলীডা—সত্যি, বাঁচোয়া নেই। তুমি পার যদি বাঁচাও। নইলে, দিনের পর দিন ব্যাধি বাড়ছেই।

বাঙ্গেল্—আর, পুরো তিনটে বছর তুমি এই রোগ নিয়ে বেড়িয়েছো। নিজের কাছেও গোপন করেছো। আমায়ও কিছু বলো নি।

এলীডা—পারিনি, তাই বলিনি। তোমার গায়ে এর আঁচ্‌টি পর্য্যন্ত না লাগে; এই ছিলো আমার কাম্য।···তোমাকে বলতে গেলে তো আরেকটি অঘটনের কথাও বলতে হয়!

বাঙ্গেল্—সে আবার কী?

এলীডা—না-না-না, ও জানতে চেও না। শুধু একটি কথা বলবো। তার বেশী নয়। বাঙ্গেল্! আমাদের খোকার ঐ চোখ দু'টোর মর্ম্ম তো এখনো বোঝা গেলো না!

বাঙ্গেল্—ওগো! এ তোমার কল্পনার অনাসৃষ্টি। আর কিছু নয়। খোকার চোখ অন্যান্য ছেলেদের মতো সাধারণ চোখই ছিলো।

এলীডা—না-না, তুমি দেখোনি। খোকার চোখে সমুদ্দুরের রঙের ঢেউ খেলে যেতো। ফিওর্ডে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দু'টি ঝক্‌ঝক্ করে উঠতো! আবার ঝড়ের সময় তার চোখে নতুন রঙের আভা দেখতে পেতুম! ওগো, তুমি না দেখলেও আমি দেখেছি।

বাঙ্গেল্—(সান্ত্বনা দিয়া) আচ্ছা, না-হয় দেখলেই বা। তাতে কি হলো?

এলীডা—(কাছে আসিয়া, অনুচ্চ কণ্ঠে) এমনি তরো চোখ যে আমি আগে দেখেছি।

বাঙ্গেল্—কোথায়?

এলীডা—বাথাম্মেরে দশ বছর আগে।

বাঙ্গেল্—(পশ্চাৎপদ হইয়া) কী ?

এলীডা—(কম্প্রদেহে ফিস্‌ফিস্ করিয়া) খোকার চোখে আমি ঐ পরদেশীর চাউনি দেখতে পেয়েছি।

বাঙ্গেল্—(বিরক্তি জনিত চীৎকার করিয়া) এলীডা !

এলীডা—(উভয় হস্ত দ্বারা হতাশ ভাবে মাথা আঁকড়াইয়া) এখন তবে বুঝলে, কেন তোমার সঙ্গে স্ত্রীর মতো আচরণ কর্‌তে পারি না ?—আমার সাহস নেই। (অকস্মাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের সানুদেশ দিয়া ছুটিয়া চলিলেন।)

বাঙ্গেল্—(পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া ডাকিলেন) এলীডা, এলীডা ! অভাগিনী এলীডা ! !

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলকুমার দেব

ইব্‌সেনের "The Lady from the sea" হইতে অনূদিত

শ্লাভ্‌ রিয়ালিজম্‌

আলেকজান্দার কিউপ্রীন একজন নামজাদা বস্তুতান্ত্রিক। তাঁর কুনাম আছে যে তিনি নাকি গণিকাদের নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছেন। তাঁরই মতন কয়েকজন ধুরন্ধরের দৌরাত্ম্যে রুশ-সাহিত্যে নাকি কিছুদিন 'অন্ধকার যুগ' গেছে।

কিউপ্রীনের বিখ্যাত বই 'Yama The Pit'। এই বই এর নায়ক প্লেটানভ্‌ দৃশ্যতঃ সাংবাদিক এবং অদৃশ্যতঃ সমাজনীতিবিদ্‌। পণ্যস্ত্রীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, জগতের বস্তুতান্ত্রিকেরা দুইটি প্রধান বস্তুকে চিরকাল অবহেলা করে গেছে, অথচ সমাজের ইতিহাসে এই দুইটি বস্তুই প্রাচীনতম এবং সমাজ-গ্রন্থির সহিত নিবিড়তম সূত্রে আবদ্ধ। এর একটি বেশ্যা, আর একটি কৃষক (moujhik)!

প্রথমতঃ—কিউপ্রীন বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যে ব্যক্তির চেয়ে শ্রেণীকে প্রাধান্য দিতে চান। 'বেশ্যা' বা 'কৃষক' বলতে বেশ্যাশ্রেণী বা কৃষকশ্রেণী বোঝায়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মূলানুসন্ধানের পক্ষপাতী! বেশ্যা বা কৃষকেরা কেন প্রাধান্য পাবে? কারণ, সমাজগ্রন্থির সাথে যেহেতু তারা নিবিড়তম সূত্রে আবদ্ধ। বেশ্যা বা কৃষকদের নিজ গুণে নয়, সমাজের একটা মূলীয় বস্তু হিসাবেই তারা সাহিত্যিকের কাছে আদরের পাত্র। বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করছেন, মূল পয়েন্ট থেকে কিউপ্রীন ক্রমাগত সরে আসছেন। শ্রেণী-প্রীতি তাঁকে জীবন্ত, রক্তমাংস-সম্বলিত মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে আনবে। আর মূলানুসন্ধানে তিনি শ্রেণীকেও হারাবেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বস্তুতান্ত্রিকতা একটা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসায় পরিণত হবে।

নিজের উপন্যাসেও তিনি এ ছাড়া আর কোন পরিণতি আশা করতে পারেন? তাঁর উপন্যাসে তথ্য (facts) সংগ্রহের প্রশংসনীয় উদ্যম আছে। তাঁর তথ্যসমূহ সংখ্যায় যেমন বহু, তেম্নি চরিত্রের ভিতর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার পক্ষেও প্রত্যেকটি মূল্যবান। কিন্তু বরাবর শ্রেণী-প্রাধান্য ফোটাতে গিয়ে আর

একটা মূলানুসন্ধিৎসার দরুণ তাঁর এই তথ্যসমূহ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে ; অর্থাৎ তথ্য-গুলির সঙ্গে চরিত্রগুলির সংযোগ স্থাপন স্বাভাবিক হয় নাই। এই জন্যই কি তাঁকে 'vulgar' বলা হয়? Vulgarism-এর একটা প্রতিশব্দ হচ্ছে বিস-দৃশতা। যে চিত্রের ভিতর পরিমাণ থাকে না, যা অস্বাভাবিক, তাই দৃষ্টিকটু বা বিসদৃশ। 'My University Days'-এর ভিতর রেল-শ্রমিকদের যে বীভৎস চিত্র আঁকা হয়েছে, বা 'And Quiet Flows The Don'-এর ভিতর কসাক চাষীদের যে নৈতিক শৈথিল্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, অশ্লীলতার মাপকাঠিতে তা কিউ- গ্রীনের কোন চিত্র থেকে কম নয়! তা সত্ত্বেও গোর্কী বা শোলোখভ্‌কে কেন Vulgar বলা হয় না?

একদিক দিয়ে কথাটা সত্য। জীবনের নিখুঁত চিত্র আঁকতে পারলে কিছুতেই তা অশ্লীল হতে পারে না। যৌন আবেদন বা আখ্যায়িকার ভিতর রুচি-বিগর্হিত অংশ থাকলেও তাকে অশ্লীলতার হাত থেকে বাঁচান যায়, যদি সে চিত্র হয় স্বাভাবিক এবং যদি সে চিত্র আঁকা যায় অকপট মনে। কিউ-গ্রীনের বিরুদ্ধে অকপটতার অভিযোগ আনা যায় না বটে, কিন্তু অস্বাভাবিকতার অভিযোগ অনায়াসে আনা যায়। এই অস্বাভাবিকতা তার শিল্পজ্ঞানের অভাব প্রমাণ করে না। প্রমাণ করে যে তাঁর বৈজ্ঞানিক মন বা 'বিজ্ঞান-বৃত্তি' তাঁর শিল্পজ্ঞানকে ছাপিয়ে গেছে। বস্তুতান্ত্রিক হবার নেশায় তিনি একেবারে বৈজ্ঞানিক হয়ে পড়েছেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যেতে পারে, কোন বিজ্ঞানের পুস্তকে যেমন প্রথম একটা generalisation বা সূত্র দেওয়া হয় এবং পরে সেটাকেই বিশদভাবে বুঝাবার জন্য কতকগুলো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়, কিউগ্রীনের উপন্যাসকেও তেমনি বিজ্ঞাননীতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তাঁর প্লেটানভের উক্তিগুলি হচ্ছে এক একটা সূত্র। এই সূত্রগুলিকেই বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করেছে তাঁর অসংখ্য তথ্যসমূহ। কিউগ্রীন vulgar, তার কারণ তাঁর যৌন- কৌতূহল নয়, বিশদৃশতা নয় ; তার কারণ তিনি বৈজ্ঞানিক।

কিউগ্রীনের এই বস্তুতান্ত্রিকতার পিছনে যে মনোবৃত্তি লুকিয়ে আছে, সেটা ফ্রান্স থেকে আমদানী। ফ্রান্সে প্রথম যখন বস্তুবাদের জোয়ার আসে, তখন সেটা আসে একটা প্রতিবাদ হিসাবে। এই প্রতিবাদ কীসের বিরুদ্ধে? এক কথায় রোমান্টিসিজম্‌-এর বিরুদ্ধে। আর বহু কথায় প্রথমতঃ, তখনকার

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয়তঃ, ব্যারন ব্যারনেসদের আতিশয্য-বহুল, একঘেয়ে আভিজাত্যের বিরুদ্ধে, তৃতীয়তঃ প্যারিসের বহুবিধ 'জাঁকজমকের' বিরুদ্ধে। যার বিরুদ্ধেই হোক, সাহিত্যের এই নূতন আদর্শ একটা প্রতিবাদ হিসাবে এল, প্রয়োজন হিসাবে নয়। ঠিক এই কারণেই তখনকার প্রগতি-পন্থী ফরাসী সাহিত্যিকদের বস্তুতান্ত্রিকতার ভিতর উষ্মার অংশটাই বেশী থাকতো, বইয়ের পাত্রপাত্রীকে কী করে 'জীবন্ত' করে তোলা যায়, সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত না। গী দ্য মোপাসাঁর উপন্যাসে যে পরিমাণ উত্তাপ আছে, সেই পরিমাণ সজীবতা আছে কি? এমিল জোলার বইতে যে পরিমাণ নোংরামি আছে, সেই পরিমাণ স্পষ্টতা আছে কি? ফ্রান্সের এই বস্তুবাদের ভিতর প্রতিবাদের (প্রতিহিংসার?) আগুন এত বেশী যে তার শরীরের উত্তাপ কখনো ১০৫°-ডিগ্রীর নীচে নামে না!

ফ্রান্সের যে মূলগত মন, সেটা হচ্ছে আর্টিষ্ট-এর মন, শিল্পীর মন। সৌন্দর্য্যের প্রতি টান তাদের সংস্কারগত বা জাতিগত। তাই বস্তুবাদ নিয়ে তারা যতগুলি পরীক্ষা করেছে, প্রত্যেকটাই ব্যর্থ হয়েছে, একটা বিকৃত, উৎকেন্দ্রিক জীবনের সৃষ্টি করেছে। মোপাসাঁর কথা তো পূর্ব্বেই বললাম। তিনি বস্তুতান্ত্রিকতাকে একটা দুরারোগ্য যৌন ব্যাধিতে পরিণত করেছেন, জোলা পাগ্‌লা কুকুরের মত ক্ষিপ্ত হয়ে যাকে তাকে আক্রমণ করেছেন, কবি বোদেলেয়রের আত্ম-পীড়ন রীতিমত mosochism-এর পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়; ফ্লবেয়ার মানসিক রসালুতায় নিমগ্ন হয়ে আফিঙখোরের মত ঝিমিয়ে পড়েছেন; মার্সেল প্রুস্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ একটা কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এক কথায় ফরাসী সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতার ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি বিকৃত জীবনের ইতিহাস। বাইরের ভাবধারার প্রভাবে এবং ফরাসী বিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে বহুদিনের রসভাণ্ডার তারা ভেঙ্গে ফেললো। কিন্তু সৃষ্টি করলো কি? আমদানী করলো কী? কতকগুলি ব্যাধির। সুস্থ সজীব জীবনের পরিবর্ত্তে কতকগুলি ব্যাধিগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, স্বপ্নবিভোর জীব। একটা বিনিদ্র রজনী কাটালে যে রকমের অস্থিরতা জাগে, ফ্রান্সের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য পড়লেও, তেমি অস্থিরতা জাগে।

আমি বলতে চাই না, কিউপ্রীনের বস্তুবাদের পিছনে এই সমস্ত লেখকের

ভারধারা ছিল। কিউপ্রীনের বস্তুবাদের উত্তাপ বেশী হবার কারণ অবশ্য এই 'প্রতিবাদ' করবার প্রবৃত্তি। কিন্তু যেহেতু তাঁর মন আর্টিষ্টের মন নয়, এবং যেহেতু সৌন্দর্য্যের ক্ষুধা তাঁর কাছে সংস্কারগত নয় সেহেতু ফ্রান্সের প্রতিবাদ-প্রধান বস্তুবাদ তাঁকে 'পেয়ে বসতে' পারেনি। তবে লাভ যে কিছু হয়েছে এমনও নয়। ফ্রান্স যেখানে ব্যাধির সৃষ্টি করেছে, ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের সৃষ্টি করেছে, কিউপ্রীনের বস্তুবাদ সেখানে কোন জীবনেরই সৃষ্টি করতে পারেনি। আরো স্পষ্ট ভাবে বলা যায়, কিউপ্রীন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেননি। তাঁর মূল্যবান্ তথ্যগুলি আলাদা থেকে গেছে, খবরের কাগজের সংবাদের মত সম্বন্ধহীন খণ্ড খণ্ড ভাবে। খবরের কাগজে যেমন সংবাদগুলি এক একটা কলামে ভাগ করে দেওয়া হয়, তেম্নি কিউপ্রীন তাঁর তথ্যগুলি এক একটা চরিত্রে ভাগ করে দিয়েছেন। এক কথায়—ফ্রান্সের বস্তুবাদ 'অনাসৃষ্টি' করেছে, আর কিউপ্রীন সৃষ্টিকে ধ্বংস করেছেন।

তবে কিউপ্রীনের ধ্বংসলীলা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এই-খানেই রুশ-সাহিত্যের কৃতিত্ব। কৃতিত্বও বলা যায়, আবার এটা রুশ সাহিত্যের বিশেষত্বও বলা যায়। স্নায়ুর জোর তাদের এত বেশী যে প্রথম উত্তেজনার 'টাল' তারা অল্প সময়ের ভিতরেই সামলাতে পারে না। আর টাল সামলাতেও তাদের বিশেষ দরকার হয় না। রাশিয়ানরা আর্টিষ্ট নয়, রিয়ালিষ্ট। রিয়ালিষ্টদের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ী লোকদের এক করে ফেললে ভুল করা হবে। রিয়ালিষ্টদের জাতই আলাদা। সাধারণ বিষয়ী লোকদের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তাদের জীবনে আদর্শবাদের অভাব। পৃথিবীর কাছে তাদের কোন অভিযোগ নেই। তাদের জীবনে যত অশান্তিই থাক না কেন, এক অর্থে তারা 'সন্তুষ্ট'। কিন্তু রিয়ালিষ্টদের একটা আদর্শ আছে, একটা মত আছে, একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। এই মত বা আদর্শ বা ধারণাটা কী? প্রকৃতি আমাদের যে সকল সম্পদের অধিকারী করেছে, তার কোন একটাকে নিয়ে তারা বাড়াবাড়ী করতে চায় না, প্রত্যেকটাকে সমান ভাবে বাড়াতে চায়। রোমান্টিকদের মত তারা শুধু স্বপ্নই দেখে না, বুদ্ধিজীবীদের মত শুধু তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন হওয়াই তাদের কাম্য নয়, আবার ক্যাসানোভাদের মত শুধু প্রেমিকার সংখ্যা বাড়ালেই তাদের মোক্ষ লাভ হয় না। রিয়ালিষ্টদের আর

একটা লক্ষণ হচ্ছে মানবমনের ভিতর যত দুর্ব্বলতা আছে, সে সব স্বীকার করা। আত্ম-সমর্থন করতে তাদের লজ্জা নাই, কেননা তারা জানে, এটা ভীরুতার পরিচায়ক নয়। নির্ভীক আত্মসমর্থনকে তারা সহজভাবে বাঁচবার একটা অঙ্গ বলে মনে করে। আর এই দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করে বলেই মনের গভীরতম প্রদেশে অবগাহন করে; তারা সুস্থ থাকে সুস্থির থাকে। ফ্রয়েড সাহেব আমাদের চোখের সামনে মনের যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তুলে ধরেছেন, ডি, এইচ, লরেন্স বা ফরাসী বস্তুতান্ত্রিকেরা সাহিত্যে তার রূপ দিতে গিয়ে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি করেছেন এবং জীবনের দুর্ব্বিসহতা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু রাশিয়ান রিয়ালিষ্টরা এই বিরাট 'ফ্রয়েডিয়ান আইসবার্গ' খুব সহজেই ভাঙ্গতে পারে এবং ভাঙ্গার পরও অবিচলিত হয়ে অন্যান্য কাজ করে যায়। তাদের স্নায়ুর জোরের কথা আমি আগেই বলেছি। দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করতে পারা এবং স্বীকার করেও অবিচলিত থাকা যেমন তার একটা দিক, তেমনি কোন কিছুর impression বা ছাপও তাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়। এটা হচ্ছে তাদের sensitive মনের পরিচায়ক। ইংরেজরা খুব sensual হতে পারে কিন্তু আশানুরূপ sensitive নয়, গত মহাযুদ্ধের মত এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাবার পরেও Sassoon প্রভৃতি কবির দল যে নৈরাশ্যপূর্ণ কবিতা লিখলেন, মীনার্ড কেনস্, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীরা যে প্রবন্ধ রচনা করলেন, তাও শান্তিবাদের জন্য। অর্থাৎ ভবিষ্যতের ভাবনা, যারা বেঁচে আছে তাদের ভাবনাই প্রধান হল, যুদ্ধের ভিতর যে একটা বেদনার দিক থাকে, তার স্মৃতির লেশমাত্র অবশিষ্ট রইলো না। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যেমন লণ্ডনে ডষ্টয়েভ্স্কির কাট্‌তি অসম্ভব বেড়ে গেল তেম্নি যুদ্ধশেষের সঙ্গে সঙ্গে আবার অতি সহজেই ডষ্টয়েভ্স্কির চাহিদা কমে গেল। রিয়ালিষ্টদের মনের গড়ন এই রকম নয়। স্মৃতির চাপ বা স্নায়ুর চাপ তাদের মজ্জাগত। খুব গভীর সুখ বা খুব গভীর দুঃখ তারা সহজে ভুলতে পারে না। এই সব ঘটনা তাদের মনে গভীর রেখাপাত করে।

রুশ-সাহিত্যের সপক্ষে আমি যে এই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম অনেকে হয়তো এটা বরদাস্ত করতে পারবেন না। বিশেষতঃ বিপ্লব-পরবর্ত্তী সাহিত্য সম্পর্কে আমার মত যে একেবারেই অচল তার যথেষ্ট প্রমাণ খুঁজে বের

করবেন। আমি বুঝতে পারছি, কোনখানে তাঁদের আপত্তি। আমার উল্লিখিত দুই নম্বর লক্ষণ, অর্থাৎ রাশিয়ানরা যে দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করে নেয়—এটা তাঁরা মানতে চাইবেন না! তাঁদের নজীরের অভাব নেই। এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌, বা মরিস হিণ্ডাস প্রমুখ intellectual journalist-দের থেকে আরম্ভ করে Riga Correspondent পর্য্যন্ত সমস্ত রিপোর্ট তাঁরা আনুপূর্ব্বিক তুলে দিতে পারেন কিম্বা আর একটু গভীরে প্রবেশ ক'রে—'Cement'-এর ভিতর যে প্রতিহিংসা গ্রহণ করবার হিংস্র ক্ষুধা প্রকাশ পেয়েছে বা, War-Communism-এর যুগে যখন এক এক করে মন্দির, রাজপ্রাসাদ আর বুর্জ্জোয়া আর্টের কেন্দ্র-গুলি ধ্বংশ করা হচ্ছিল—যা দেখে লুনাচার্‌স্কীর মত রক্ষণশীল কমিউনিষ্টরা চোখের জল ফেলেছে বা, 'মস্কো-ট্রায়ালে' রাডেক, জিনোভিয়েভ, কামেনভ যখন সমস্ত দোষ স্বীকার করেও মুক্তি পেল না—এই সব মূল্যবান সংবাদের ইতিহাস বলতে পারেন। এইখানে আমার বক্তব্য, মানসিক দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করা মানে 'রাজনৈতিক উদারতা' বোঝায় না। এর একটা ব্যক্তিগত, একটা জাতিগত, একটা প্রাকৃতিক, একটা সামাজিক; একটার উপরে সামাজিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে—আর একটা রাজনীতিকে অনিশ্চয়তায় ঢেকে ফেলে। যেমন গ্রেট ব্রিটেনের কুয়াশাচ্ছন্ন রাজনীতি। কিন্তু আমার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। আমি যখন বলেছি, রুশ সাহিত্যিকেরা জীবনের দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করে নেয়, তাদের স্নায়ুর চাপ অতিরিক্ত বেশী, তখন আমার মনে ছিল শ্লাভ জাতির কথা। তা না হলে আমার কথা সম্পূর্ণ হতো না। কেননা রাশিয়ান রিয়ালিষ্টরা যে দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করে, সেটা তাদের বইএর ঘটনা ধারাকে বা ভাবধারাকে পর্য্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় না, বোঝা যায় বই পড়তে পড়তে লেখকের প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে। এই প্রকৃতি হচ্ছে শ্লাভ প্রকৃতি। যারা ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, শ্লাভজাতির কথা উঠলেই তাদের মনে পড়বে পূর্ব্ব ইয়োরোপ বা মধ্য ইয়োরোপের আদিম যাযাবরদের কথা, দানিয়ুব নদীর সঙ্গে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা, তাদের অশিক্ষা ও কাল-চার-হীনতা একদিকে আর একদিকে বোহেমিয়ান চঞ্চলতা। কিন্তু যাঁরা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে কৌতূহলী, বিশেষতঃ যাঁরা সাহিত্যের সাহায্যে সমাজ-তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেন, তাঁদের কাছে শ্লাভ প্রকৃতির কতকগুলি লক্ষণ নিশ্চয়

ধরা পড়বে। এর মধ্যে তিনটির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া আরো দুটি আছে। যথা—জীবনশক্তির প্রাচুর্য্য এবং যৌন-চাপের উগ্রতা। প্রথম তিনটি ও শেষেরটি শ্লাভ সাহিত্যিকদের রিয়ালিষ্ট করেছে। জীবনী শক্তির প্রাচুর্য্য এবং তৃতীয় লক্ষণ অর্থাৎ স্নায়ুর চাপ বা অতিরিক্ত sensitiveness তাদের রিয়ালিজ্‌ম্‌কে নীতির আসনে বসিয়েও কৃত্রিমতাদোষশূন্য করেছে। তার মানে, রিয়ালিজ্‌ম্‌ মার্কা নীতিটা তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। এই 'রক্তের সঙ্গে মিশে' যাবার দরুণই তাদের বস্তুতান্ত্রিকতা ও পশ্চিম ইয়োরোপের বস্তুতান্ত্রিকতার ভিতর একটা প্রভেদ দেখা যায়। ধরা যাক আর্নল্ড বেনেটকে। অথবা আমেরিকার সিনক্লেয়ার লুইস বা আপটন সিনক্লেয়ারকে। এঁদের বস্তুতান্ত্রিকতায় সমাজের surface study বা দৃশ্যমান বস্তুজগৎকে পর্য্যবেক্ষণ করবার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু কোন suggestions বা অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত নাই। এঁদের সাইকলজি-বর্ণনা এবং facts-বর্ণনা একেবারে নিখুঁত এবং বিবরণ বহুল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁরা পাঠককে 'চেপে' ধরতে পারেন না। শ্লাভ রিয়ালিজ্‌ম্‌ ঠিক এর পরিপূরক। তাদের বস্তুতান্ত্রিকতায় 'সমাজের surfacel study' বা 'দৃশ্যমান বস্তুজগৎকে পর্য্যবেক্ষণ করবার' সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্যভাবে একটা fundamental uneasiness জাগে এবং এই uneasiness-এর দরুণ সর্ব্বাঙ্গময় একটা প্রবল অথচ বিষণ্ণ বিদ্রোহের সুরও পাঠকের সমস্ত তন্ত্রীকে নাড়া দিয়ে যায়। এই ক্ষমতার নাম হচ্ছে soul force। লজিক অনুসরণ করলে বস্তুতান্ত্রিকতায় soul-force-এর দাবী অগ্রাহ্য এবং পশ্চিম ইয়োরোপের বস্তুতান্ত্রিকতায় যে soul-force নাই তার কারণ সেটা লজিক থেকে ধার করা একটা থিওরীমাত্র।

রিয়ালিজম্‌ যে শুদ্ধমাত্র একটা থিওরী নয়, অক্সিজেনের মত একটা অপরিহার্য্য বস্তু, রুশ সাহিত্যিকরা সেটা প্রমাণ করেছেন। শুধু তাই নয়। বস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁরা আরো একটা ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমাদের ধারণা ছিল, বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য ও প্রচার-সাহিত্য পরস্পরবিরোধী। এই ধারণা হবার কারণ বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকরা একদিকে যেমন দৃষ্টিকোণকে মোটেই আমল দিতেন না, তেম্নি আর একদিকে প্রচারসাহিত্যিকরা ঐ জিনিষটাকেই যথাসর্ব্বস্ব মনে করতেন। আর্নল্ড বেনেটের মত নিরীহ বস্তুতান্ত্রিকেরা

মনে করতেন ঘটনাকে ঘটনাই প্রকাশ করবে, ব্যাখ্যা করবে। রাজনীতির ভাষায়—বিষয় বস্তুকে 'আত্মকর্ত্তৃত্ব' দেওয়াই ছিল তাঁদের বস্তুতান্ত্রিকতার মূল কথা। এর অতিরিক্ত কিছু করলে, অর্থাৎ একটা বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে ঘটনাকে দেখতে গেলে—হোক সে দৃষ্টি বস্তু-সম্পৃক্ত বা মেটারলিঙ্ক-এর মত ঝাপ্‌সা আধ্যাত্মবাদমূলক—বিষয়বস্তুর ভিতর কৃত্রিমতা আসবেই, তার বিশুদ্ধি নষ্ট হবেই। পক্ষান্তরে, প্রচার-সাহিত্যিকেরা বস্তুর কোন মূল্য স্বীকার করতেন না। তাঁদের কাছে 'দৃষ্টিকোণ' ছিল বস্তুকে ইচ্ছামত সৃষ্টি করবার একটা শৃঙ্খলাহীন ব্যবস্থা। তাঁরা ইন্দ্রিয়ের কোন আইন মানতেন না। ইন্দ্রিয়জ দৃষ্টিকে তাঁরা গায়ের জোরে সমাজতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতে পরিণত করতেন। ইবসেন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর 'The Doll's House' কলমের জোরে অনেকটা উৎরে গেছে। কিন্তু 'The Pillars of Society', 'Ghost' প্রভৃতি নাটকে এই 'গায়ের জোর' ও দৃষ্টি-বিকৃতির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্লাভ রিয়ালিজ্‌ম্‌ 'দৃষ্টিকোণ' সম্পর্কীয় এই দ্বিবিধ মত সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে। তাদের দৃষ্টিকোণ হচ্ছে ঘটনার বস্তুগত বিশ্লেষণের ফল। তারা বস্তু-জগৎকে আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ করে দেখেছে, ঘটনাকে বিশেষ বিশেষ ভাবে সংগ্রথিত করলে তারা বিশেষ বিশেষ আদর্শের রূপ দেয়। তাঁদের দৃষ্টি ঘটনাকে এই 'বিশেষ'ভাবে সংগ্রথিত বা সঙ্কলিত করবার কাজে লিপ্ত থাকে। দৃষ্টিকোণটা তাঁদের ব্যক্তিগত নয়, বস্তুগত—ঠিক 'বস্তুগত' বলা যায় না, বস্তুকে দেখবার একটা দিক্ নির্ণয় করে দেন। সোলোখভের 'Don' সম্পর্কীয় উপন্যাস বা ন্যুট হামসুনের 'August' সম্পর্কিত এপিক্ উপন্যাসের ভিতর এই ধরণের দিক্ নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। তারা দেখিয়েছেন, ঘটনাকে এমনভাবে নির্ব্বাচিত বা সঙ্কলিত করা সম্ভব, যাতে ব্যক্তিগত প্রচারস্পৃহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেও আদর্শবাদকে রূপায়িত করা যায়। বস্তুকে অক্ষত, অবিকৃত রেখেও 'প্রচার' করা যায়।

'আত্মকর্ত্তৃত্বে'র যুক্তি উপেক্ষণীয় নয়। বস্তু আপনাকে পরিচালিত করুক—মনের এই ভাব থাকা খুব সুস্থ লক্ষণ। শোলোখভ বা হামসুনের মধ্যে কি কোথাও আত্মকর্ত্তৃত্ব ব্যাহত হয়েছে? আমার তো মনে হয় না। বরঞ্চ আমি

মনে করি, শোলোখভ বা হামস্থনের বস্তুজগৎ এই আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ নিয়ে নিজেরাই স্রষ্টার ইচ্ছাপূরণ করেছে, স্রষ্টার আদর্শকে প্রচার করেছে। শ্লাভ রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর বিষয়বস্তু নিরীহ আর্ণল্ড বেনেটের হাতে গড়া 'ক্রুড মেটেরিয়াল' বা একটা বস্তুপিণ্ড নয়। তাদের ভিতর প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়, একটা elan vital বা আদিম জীবনীশক্তির বেগ অনুভব করা যায়।

শ্রীরণেন মজুমদার

রাত্রি ও রেবা

হে প্রিয় রাত্রি, প্রেমনিলয়,
হ'লো কি সাঙ্গ পৃথিবী জয় !
স্নায়ুতে তোমারই সুরভি বয়,
যাচে তোমারেই মর-হৃদয়,—
হে প্রিয় রাত্রি, প্রেমনিলয় ।

এখনো কি, এখনো কি জেগে আছে নিদ্রাহীন রেবা
তোমার তুহিন বক্ষে, হে রাত্রি আমার,
মূঢ় প্রতিবেশিনীর চিত্রার্পিত বাতায়ন-বিলাসের মত ?
এই স্তব্ধ মর্ম্মরিত অগাধ উদ্ধত
স্মৃতির বৃশ্চিক বন্যা তাহারে কি স্পর্শ করে ? ত্রস্ত করে
নয়ন তাহার—
বল বল হে রাত্রি আমার,
এখনো কি, এখনো কি জেগে আছে নিষ্পলক রেবা !

স্নায়ুতীরে যেন বুদ্‌বুদ্‌ প্রায় উঠিছে মুখ ঃ
শ্রান্ত, কোমল, ঝঞ্ঝা-পীড়িত কি উৎসুক ।
কারো আছে শুধু বিদ্রূপ ভরা শূন্য বুক,
কারো বা মেদুর স্বপ্নের মত নিরীহ মুখ,
ডোবে আর ভাসে—ভাসে আর ডোবে—উথলে বুক ;
তবু তারি মাঝে রেবার নয়ন কী উৎসুক !

জানি জীবনের নীতিবিশারদ সভয়ে
নিরাপদে যাবে বিদ্রূপ হেনে। টান্‌বে
গড্ডলিকার মৃত্যু যূথে। দিগ্বলয়ে
আমার সূর্য্য তবু নব উষা আন্‌বে।

*

জানি, আমি জানি,
প্রেমধ্বজ জীবনের মেরুদণ্ডহীন ঘৃণ্য গ্লানি
আত্মার অগ্নিরে করে নিরন্তর স্তিমিত, অস্থির,
নিরুত্তাপ। জানি পৃথিবীর
নির্দ্ধারিত কক্ষপথে উন্নতি, উচ্চাশা শান্তি, সুখ—
তারো চেয়ে সুনিশ্চয় সমাজের প্রহরা কৌতুক।
জানি। তবু জানি
সূর্য্যের ঔরসে আর ধরিত্রীর গর্ভে যার বাণী
সে নহে নিশ্চিত শান্তি,—ত্রস্ত ক্ষুব্ধ জ্বলন্ত উধাও,
সে চির অবাধ্য প্রেম। তারি বীর্য্যে পাও
লেলিহ আত্মার বহ্নি, তীব্র অনুভূতি,
তোমার স্নায়ুতে রক্তে জাগে তারি প্রজনন দ্যুতি।
চৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে তারি রুদ্ধশ্বাস নাম,
'হে প্রেম, আত্মার অগ্নি,—জন্মসূত্র কাম!'

*

রাত্রি যায়, রাত্রি যায় ক্ষীণ হলো আঁধার উৎসব।
পৃথিবীর প্রান্তে যেন ভেঙে পড়ে আলোর অসহ্য কলরব।
আরো গুটিকত পল, দণ্ড দুই পারো না কি দিতে
আসন্ন জাতক এই দিবসের আয়ু হ'তে একান্ত নিভৃতে
আমার রাত্রির ভাণ্ডে স্মৃতিগর্ভে অশ্রুর মতন,
অনাগত হে সূর্য্য, পূষন!
রাত্রি যায়, রাত্রি যায়, ঘুমাও, ঘুমাও, রেবা, আজ
ওই দেখ জেগে ওঠে তীব্র আলো বিচক্ষণ বৃশ্চিক সমাজ।

রাত চলে গেল, প্রখর আলোয় সঙ্গীহীন
ঘুরি বিষণ্ণ। কথা বেচা-কেনা সারাটা দিন।
(শুষ্ক ঘাসের বুকে বাতাসের সঞ্চারণ
মাঝে মাঝে বটে রেবার নামটা করে স্মরণ !)
রাত চলে গেল প্রখর শ্মশানে এ মরা দিন।
ঘুরি বিষণ্ণ সূর্য্যের মত সঙ্গীহীন ॥—

মণীন্দ্র রায়

পুস্তক-পরিচয়

উপনিষদের আলো—অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আলোচ্য পুস্তকখানি উপনিষদ-সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। দেড় শত পৃষ্ঠায় সমগ্র উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করা কঠিন কার্য্য। যাহা করা সম্ভব, তাহা প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় করিয়াছেন, উত্তম রূপেই করিয়াছেন। গ্রন্থখানি চারিভাগে বিভক্ত—অবতরণিকা, ব্রহ্ম কী, বহ্মবিদ্যা কী এবং উপনিষদ ও বর্ত্তমান ভারত। প্রথম ভাগে গ্রন্থকার উপনিষদের স্বরূপ, ব্যাখ্যা, রচনা-কাল ও প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। উপনিষদ বলিতে শতাধিক পুস্তক বুঝায়, কিন্তু তাহার মধ্যে দশখানিই যথার্থ উপনিষদ বলিয়া গণ্য হয়। এই দশখানি উপনিষদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। ভাষার সৌন্দর্য্যে ও তত্ত্বানুসন্ধানের গভীরতায় এই গ্রন্থগুলিই শ্রেষ্ঠ। তত্ত্ববোধের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। ছন্দকে বাদ দিয়া স্বাধ্যায় হয় না, এ কথা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। উপনিষদের প্রতিষ্ঠা তর্ক-বিচারের উপর নয়, সত্যদৃষ্টি ও অপরোক্ষ অনুভব তাহার মূল। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন, "The Sages of Veda and Vedanta relied entirely upon intuition and spiritual experience।" ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা অনেক শ্লোক দেখিতে পাই যাহা গূঢ়রহস্যপূর্ণ, mystical, সহজ উপায়ে যাহার অর্থবোধ হয় না। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নহিলে ত উপনিষদের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্তও পৌছান যায় না, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে আরও কিছুর প্রয়োজন। সে উপায় কি তাহার নির্দ্দেশ ঋষিগণই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শুধু ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যে সাধনার দ্বারা সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় তাহাও বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ধ্যান ও উপাসনা এই সাধনার প্রধান অঙ্গ। ভক্তিসম্পন্ন হইয়া স্বাধ্যায় এ দুই প্রক্রিয়ারই সাহায্য করে। অবতরণিকাতে ডাঃ সরকার

এ সম্বন্ধে সকল কথাই বলিয়াছেন। আমাদের বেদান্তে কোন দখল নাই সুতরাং যাহা দুই এক কথা বলিতেছি তাহা অতীব সঙ্কোচ সহ।

উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী সকলেরই কাছে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মানের বস্তু। সকলেই বিবাট ও ভূমার অনুভবকে অধ্যাত্ম জীবনের পরম সম্পদ বলিয়া মনে করিয়াছেন। অনুভবের প্রণালী লইয়াই ইঁহাদের ভেদ। অধ্যাপক মহাশয় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই প্রভেদ প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

উপনিষদ-সাহিত্য সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকাতে পূর্ণ। ডাঃ সরকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী, যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী, আরুণি-শ্বেতকেতু, যম-নচিকেতা, উমা-হৈমবতী ইত্যাদি বহু আখ্যান ও কথোপকথনের সারাংশ ও মর্ম্ম দিয়াছেন। তেমনই ভূমাবিদ্যা, সংবর্গবিদ্যা, মধুবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিদ্যা সম্বন্ধে পাঠকের একটা ধারণা করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তথাপি এই পুস্তক অল্পশিক্ষিত জনের উপযোগী নহে। অশিক্ষিত জনের ত কথাই নাই। সেজন্য আমাদের কোন নালিশ নাই। আমরা অধিকারভেদে গভীর বিশ্বাসী। অনধিকারীর মুখে "সোঽহং" বা "অহং ব্রহ্ম" উচ্চারণ অশোভন ও অর্থহীন। ছোট মুখে বড় কথা বলিয়া লাভ অপেক্ষা লোকসান বেশী হয়।

প্রামাণ্য উপনিষদগুলির মধ্যে একটা মস্ত লক্ষ্য করিবার জিনিস তাহাদের উদারতা। ব্রহ্মকে এই ঋষিগণ মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ সকল রূপেই দেখিয়াছিলেন। তাই আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার গুণাতীত ব্রহ্মের ও রামানুজদেব তাঁহার সগুণ ঈশ্বরের নজীর পাইয়াছেন বেদান্তের আপ্তবাক্যে। পরযুগের অপেক্ষাকৃত অখ্যাত বহু উপনিষদের আলোচ্য-বিষয় বিশিষ্ট রূপধারী দেবদেবী। অনেকগুলির, যথা নাদবিন্দু তেজবিন্দু ও ধ্যানবিন্দু, বিষয়-বস্তু যোগসাধনার বিশিষ্ট প্রণালী। অর্ব্বাচীন যুগে, ভারতে মুসলমানের আগমনের পরে, আল্লাহ উপনিষদ নামেও এক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এমনই সার্ব্বজনীন এই সাহিত্য! অদ্বৈতবাদীর "তত্ত্বমসি" ও ভক্তিমার্গীর "রসো বৈঃ সঃ" দুই রহিয়াছে উপনিষদে। এ হেন

গ্রন্থাবলীর সহিত সাধারণ হিন্দুর যিনিই পরিচয় করিয়া দিবেন তিনিই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য পুস্তকের ভাষা ও রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করিব। বেদান্ত সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট রচনাও নানা ভঙ্গীর হইতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ, একদিকে পরমহংসদেবের "কথামৃত" ও ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অভয়ের কথা"র সর্ব্বজনগম্য সরস লিখনভঙ্গী, এবং অপরদিকে কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "উপনিষদের উপদেশের" গুরুগম্ভীর ধ্রুপদী ভঙ্গী, কেবল পণ্ডিতজনবোধ্য। রবীন্দ্রনাথ সেকালে তত্ত্ববোধিনীতে ও ইদানীং শান্তিনিকেতনে-এ তাঁহার অনুপম ভাষায় উপনিষদ আলোচনা করিয়াছেন, সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের জন্য। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মনোমত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "উপনিষদে ব্রহ্মবাদ"-এর ভঙ্গী, অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের গভীর তত্ত্বের উপযুক্ত বাহন হিসাবে। "উপনিষদের আলো" পুস্তকেরও ভাষা প্রাঞ্জল, লিখনভঙ্গী মনোরম কিন্তু স্থানে স্থানে অতি সাধারণ কথিত ভাষায় ক্রিয়াপদাদির ব্যবহারে গাম্ভীর্য্যের কথঞ্চিৎ হানি হইয়াছে। যে বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদ নাই সেগুলি চমৎকার। একটি উদাহরণ দিতেছি।

"সে ব্যক্ত নয় অব্যক্তও নয়। ব্যক্তাব্যক্তের অতীত। বিশ্বচক্রের বিবর্ত্তন শান্ত, শক্তি নির্ব্বাপিত, বিশ্বলীলা স্তব্ধ। এই সত্য, এই মহিমা, এই অভয়। উপনিষদ বিদ্যার এই অভয় প্রতিষ্ঠা।" অতি মনোরম ভাষা!

আশা করি অধ্যাপক মহাশয় দ্বিতীয় সংস্করণে নিতান্ত চলিত ভাষার পদসমূহ বিসর্জ্জন দিয়া পুস্তকের ভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবেন।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Last Poems and Plays—by W. B. Yeats (Macmillan)

ফরাসী বিপ্লবের কিছুদিন আগে থেকে জনগণ সম্বন্ধে বুর্জোয়া কবিমনে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আজ পর্য্যন্ত চলেছে তার রেশ ইয়েট্স্-এর সমগ্র কাব্যে বর্ত্তমান। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসী, এবং এ বিশ্বাসের ফলে ইউরোপীয় অনেক কবির জীবনে এবং কাব্যে যে বিয়োগান্ত নাটকের পালা এখনো চলেছে, ইয়েট্স্ বোধহয় ইংরাজী কবিতায় তার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। স্বাতন্ত্র্যে তাঁর একাগ্র বিশ্বাস, অনাবশ্যক ভাবালুতার হাত থেকে তাঁর কাব্যের মুক্তি এবং বৃদ্ধবয়সে বিস্ময়কর পরিণতি, এ সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি নিজের জন্য যে দুর্গ গড়েছিলেন তাকে গজদন্ত-মিনার বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না, কারণ শেষ পর্য্যন্ত তিনি যুগবিক্ষোভ সম্বন্ধে স্বকীয়ভাবে সচেতন ছিলেন, এবং বিচ্ছিন্ন, কেন্দ্রচ্যুত সমাজের প্রতিমাপে যে আভিজাত্যের জয়গান করেছিলেন সেটা মূলতঃ বোধহয় মননের আভিজাত্য। এ কথা বোধহয় বলা চলে যে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে একটি যুগের শেষ হল।

এ বইএর বিষয়বস্তু নতুন নয়। ইয়েট্স্-পাঠকেরা অধিকাংশ কবিতারই জগতের সঙ্গে সুপরিচিত আছেন। তবে শুদ্ধমাত্র প্রকাশভঙ্গীর উপর কবিতার আবেদন কতখানি নির্ভর করে এবং কী পরিমাণে প্রকাশভঙ্গী পুরাতন বিষয়কে নতুন করে তার পরিচয় এ বইএর প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। "Purgatory" নাটিকার বক্তব্য ইয়েট্স্ "Words Upon the Window Pane"-এ সুইফ্টের জীবনের একটি অধ্যায়ের সাহায্যে পূর্ব্বেই বলেছেন। অথচ সে বক্তব্যের আবেদন প্রথমোক্ত নাটকে কিছুমাত্র কমেনি। সমাজগতি গত শতাব্দীর কবিমনকে বহুমূল গ্লানির মুখোমুখী করে যে সমস্যায় ফেলেছে তার সমাধানের প্রয়াস ইয়েট্স্ করেছেন। তাঁর সমাধান বর্ত্তমান মানুষের প্রিয় নয়, কিন্তু বিকৃতি কত গভীর ভাবে আধুনিক জগতে প্রসারিত, এবং আত্মম্ভরি উপায়ে এ বিকৃতি থেকে মুক্তি যে সম্ভবপর নয় সে উপলব্ধি রূপকের সাহায্যে ইয়েট্স্ মাঝে মাঝে করেছেন। তাই পুত্রহত্যার পর "Purgatory"-তে বৃদ্ধ লোকটি প্রথমে বলে :—

Study that tree.
It stands there like a purified soul,
All cold, sweet, glistening light.
Dear mother, the window is dark again,
But you are in the light because
I finished all that consequence.
I killed that lad because he had grown up,
He would have struck a woman's fancy,
Begot, and passed pollution on.

কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারে: Twice a murderer and all for nothing, এবং প্রার্থনা করে :—

O God,
Release my mother's soul from its dream !
Mankind can do no more. Appease
The misery of the living and the remorse of
the dead.

আধুনিক কবিতায় হত্যা, বিকৃতি ও বিশুদ্ধির কথা যে বারে বারে ওঠে, এবং এ সমস্ত কথা যে ইংলণ্ডের কয়েকজন প্রধান কবির মূল বক্তব্য, এ তথ্যটি নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য, এর মূলে নিশ্চয়ই গভীরতর কোনো কারণ আছে। এদিক থেকে এলিয়টের কাব্য এবং নাটক এবং ইয়েট্‌স্‌-এর শেষ দিনের লেখার মধ্যে একটি ঐক্য মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

ইয়েট্‌স্‌ কবিতায় অলঙ্কার ব্যবহারের সারমর্ম বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে যে স্বচ্ছ, কঠিন এবং অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি লিখে গিয়েছেন তার তুলনা ইংরাজী কবিতায় দুর্লভ। গত শতাব্দীর কয়েকটি সদর্থক বিশ্বাস, জাতীয় জীবনের কয়েকটি অধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এবং বিচিত্র জীবনযাত্রায় আসক্তি, এ সবের ঘাত প্রতিঘাতে তাঁর বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী গড়ে উঠেছে। বিশেষণ পরিহার করা কবিতায় অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ইয়েট্‌স্‌-এর কয়েকটি কবিতায় বিশেষণ-প্রয়োগ নামমাত্র। যেমন :—

Picture and book remain,
An acre of green grass
For air and exercise,
Now strength of body goes ;
Midnight, an old house
Where nothing stirs but a mouse.

Grant me an old man's frenzy,
Myself must I remake
Till I am Timon and Lear
Or that William Blake
Who beat upon the wall
Till Truth obeyed his call ;

ব্যক্তিগত জীবনে অতিরিক্ত আস্থা যে মাঝে মাঝে ইয়েট্স্-এরও কবিতায় হাস্যকর হয়ে পড়ে তার প্রমাণ হিসেবে একটি কবিতা উদ্ধৃত করে এ সমালোচনা শেষ করা যায় :—

Politics

'In our time the destiny of man presents its meaning in political terms.'—Thomas Mann.

How can I, that girl standing there,
My attention fix
On Roman or on Russian
Or on Spanish politics ?
Yet here's a travelled man that knows
What he talks about,
And there's a politician
That has read and thought,
And may be what they say is true
Of war and war's alarms,
But O that I were young again
And held her in my arms !

সমর সেন ।

নবজাতক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়) মূল্য—দেড় টাকা।
পদাতিক—সুভাষ মুখোপাধ্যায় (কবিতা-ভবন) মূল্য—এক টাকা।
জোনাকি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়) মূল্য—আট আনা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়া বিস্মিত হইবার কিছু নাই, কেননা বাল্যকাল হইতে তিনি কবিতা লিখিতেছেন এবং এখন তাঁহার বয়স পৌঁছিয়াছে আশীর কোঠায়। কিন্তু যথার্থ শিল্পসৃষ্টি মানুষের মনে তবু বিস্ময় না জাগাইয়া পারে না, তাই 'নবজাতক' যে কোনো কাব্যানুরাগী পাঠকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিবে এই কথা জোর করিয়া বলিতে পারি।

গাছগুলো সব ঘুমে ডুবে আছে
তন্দ্রা তারায় তারায়,
কাছের পৃথিবী স্বপ্ন-প্লাবনে
দূরের প্রান্তে হারায়।

ইহা পড়িয়া যদি কেহ বিস্মিত না হন, তাহাকে অরসিক বলিতে একটুও দ্বিধা করিব না। 'নবজাতক' বইখানিতে এই জাতীয় বিস্ময়ের খোরাক প্রচুর আছে এই কথা বলা ছাড়া আর কি বলিয়া ইহার পরিচয় দিব জানি না, কেননা রসবোধের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির যোগ ও সামঞ্জস্যসাধন সম্ভব হইলেও সহজ নহে এবং 'নবজাতক' এখনও এত নূতন যে রবীন্দ্র-কাব্যের ঠিক কোন স্তরে ইহার স্থান তাহা নির্ণয় করার চেষ্টাও অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক।

এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে 'নবজাতক' রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের প্রতিযোগী হইবার কোনো দাবী রাখে না—অত্যন্ত অকুণ্ঠিত ও অকপট গৌরবের সহিতই ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া নিজেকে প্রচার করে। কিন্তু তাহাতে ইহার নূতনত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না, কেননা 'নবজাতক-এর সব কবিতা সকলের ভালো লাগিতে না পারে, কিন্তু ইহার একটি কবিতাও মনে হয় না ছাঁচে-ঢালা, যাহা আগে পড়িয়াছি ঠিক তাহার অনুরূপ।

'নব-জাতক'-এর সূচনায় কবি বলিয়াছেন যে সমঝদারের দৃষ্টিতে এই কবিতাগুলি হয়তো 'বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল।' এই কথা সত্য মনে হয় যখন পড়ি :—

জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে,
বাহিরে প্রকাশ তার নহে

* * *

গোধূলির ধূসরতা ক্রমে সন্ধ্যার
প্রাঙ্গণে ঘনায় আঁধার।
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে তারা
আজ চিনে নিতে হবে তাদের ইশারা।

কিন্তু 'নবজাতক' পড়িতে আরম্ভ করিলে এই কথা আর মনে থাকে না কেননা, যদিও ইহার একাধিক কবিতা আমার মনকে একেবারে স্পর্শ করে নাই, যেগুলি সত্যই আমার মনকে নাড়া দিয়াছে সেগুলিতে পরিণত আঙ্গিক ছাড়া বয়সের আর-কোনো নিদর্শন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বিশ বৎসর পূর্ব্বে সেগুলি লিখিলেও বিস্ময়ের কোনো কারণ হইত না, যেমন সেগুলি সম্প্রতি লিখিয়াছেন বলিয়া বিস্ময়ের অণুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পড়িলে ধারণা হয় না যে বয়সে তিনি নবীন। তাঁহার আত্মপ্রত্যয় এত দৃঢ়, তাঁহার বিচার-বুদ্ধি এমন কুটিল এবং তাঁহার প্রখর দৃষ্টিতে এমন বিকট অবজ্ঞা যে মনে হয় না যে বিশ্ব সংসারে জানিবার ও বুঝিবার কিছুই তাঁহার আর বাকি আছে। যেন তাঁহার এখন একমাত্র কাজ শুধু নিজের অকাল পরিপক্ক অভিজ্ঞতা কাব্যে রূপান্তরিত করা, তাহারও চরম 'পদাতিক'-এর কবিতাগুলিতে তিনি করিয়াছেন, অতঃপর প্রলয়ের প্রতীক্ষায় স্থাণুবৎ বসিয়া থাকা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নাই।

এই জাতীয় কবিতা বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অতি আধুনিক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহা এত সংক্রামক ও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে ইহার যেটুকু নূতনত্ব ছিল তাহা আজ লুপ্তপ্রায়। কিন্তু নূতনত্ব থাক বা না থাক, যে গভীর অনুভূতি হইতে মহৎ কবিতার জন্ম, ইহাদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। কিন্তু প্রেরণা না থাকিলেও ইহাদের মূলে যে কোনো উদ্দেশ্য নাই তা বলা চলে না। যতদূর বুঝি ঐ উদ্দেশ্য দুই ঃ রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত কাব্যের সৃজন এবং বর্ত্তমান যুগের বাণী কাব্যে মূর্ত্ত করা। ওই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়

উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও শিল্পসৃজনের অনিবার্য্যতা এক জিনিষ নয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি ইহা অনিবার্য্য নহে—অতি সাবধানে ইহা সঙ্কলিত, প্রায় কারখানাজাত পণ্যের মতন। ইহাতে চাকচিক্যের অভাব নাই, ইহার আঙ্গিক অতি পরিপাটি, কিন্তু কবিতাগুলি সব ছাঁচে-ঢালা। এই ছাঁচের বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তবু তাহা ছাঁচ, অর্থাৎ 'পদাতিক'-এর কবিতা-গুলি একঘেয়ে নয়, কিন্তু কৃত্রিম। দুঃখ হয় শুধু এই যে প্রভূত আয়াস ও মেধার অপব্যয় করিয়া কবি এই কৃত্রিম ভঙ্গী অর্জ্জন করিয়াছেন। কেননা তিনি যে মেধাবী ও দক্ষ লেখক তাহাতে সন্দেহ নাই। বিরল দুই একটি কবিতায় তাঁহার লেখনীতে যথার্থ কবিত্ব স্ফুরিত হইয়াছে :—

জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও
লাল নিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক
রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পা'ক।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মাভিমান আর একটু কম তীব্র হইলে এই জাতীয় কবিতা তিনি যে আরও অনেক লিখিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

'পদাতিক'-এর পাশে 'জোনাকি' নিতান্তই সেকেলে মনে হয়। ইহা পঞ্চাশটি 'সনেট'-এর সমষ্টি। কিন্তু এই সনেটগুলির প্রচলিত 'সনেট' হইতে একটু পার্থক্য আছে ; ইহার প্রতি পংক্তি দশ বা এগারোটি অক্ষরে গ্রথিত। এই ভাবে কবি প্রচলিত সনেটকে 'সংক্ষিপ্ততর' করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা যে সার্থক হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'সনেট'এর যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য—সংহতি, 'জোনাকি'তে তাহার পরিচয় স্বল্পই পাওয়া যায়। এই 'সনেটগুলির একটি স্বকীয় সুর আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুর এত মৃদু যে তাহা জোনাকির আলোর মতনই অকিঞ্চিৎকর। মনে হয় কবি এইগুলি নিতান্তই অবসর বিনোদনের জন্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু রসিক পাঠকের পক্ষে ইহার রস এতই লঘু হইয়া পড়িয়াছে যে অবসর বিনোদনের জন্যও তাহা পর্য্যাপ্ত নহে।

হিরণকুমার সান্যাল।

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ—সুরেন ঠাকুর (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়) দাম দেড় টাকা।

বইখানির অপর নাম "এ-কেলে কথকতা"। ভণিতা'য় ঠাকুর মহাশয় বলেছেন, "সেকালের কথক ঠাকুরেরা যে-সব পুরাণ-কাহিনী বলতেন, তার চেয়ে লক্ষ্মী-ছাড়া নারায়ণের চির বিরহ ঘোচাবার জন্মে U S S R-এর যে নতুন ধরণের যজ্ঞ চলেছে, তার গল্প কম মনোহারী বা হিতকারী হবে না…।" এই বলে কয়েকটি পালায় তিনি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অভূতপূর্ব্ব অগ্রগতির কথা বর্ণনা করেছেন। বর্ত্তমান সাংবাদিকতার যুগে এই ধরণের বই কদাচিৎ 'সাহিত্য' হয়। বিদেশী বইয়ের অপটু অনুবাদই হ'লো বাংলার সাধারণ সাম্যবাদী সাহিত্য। তাতে রসের কাজ সারে কম। বস্তুত লেখকের সদিচ্ছা থাকাই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে থাকা চাই কিছুটা শিল্পজ্ঞান। কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের সম্পর্কে এ-সব কথা খাটে না। লিখন-চাতুর্য্যে বইখানি অপরূপ হয়েছে। তাই "এ-কেলে কথকতা"র উপভোগে বাধা তো কোথাও হ'লোই না, পরন্তু এই জগতের গল্প শোনার ক্ষুধা আরও বেড়ে গেল। যদিও এই বই তিনি 'ঘরে-বাইরের নাতি-নাতনী'দের হাতে তুলে দিয়েছেন, লেখার এমন সরস ও সরল ভঙ্গি সচরাচর দেখাই যায় না। দুরূহ তত্ত্ব পর্য্যন্ত উপমা ও রূপকের সাহায্যে ঠাকুর মহাশয় এমন সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন যে পড়লে বিস্মিত হ'তে হয়। এ-বই ধরলে একেবারে শেষ না ক'রে আর ছাড়বার উপায় নেই ; চুম্বকের মতো বইটা মনকে টানে। অথচ এই দু'শো পৃষ্ঠার বইয়ে ইতিহাস, ভূগোল সমাজ-তত্ত্ব, বিজ্ঞান প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হ'লেও লেখক কোনোখানে নীরস ঘটনা বা বিরক্তিকর ফর্দ্দের তালিকা দেন নি।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাঁদের কৌতূহল আছে, তাঁহাদের এই বই প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি। বিশেষ ক'রে ছাত্রদের এ বই বাদ দেওয়া উচিত নয়।

মেকিয়াভেলির রাজনীতি—মনোরঞ্জন গুপ্ত (সরস্বতী লাইব্রেরী) দাম পাঁচ সিকা।

ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্র সম্পর্কে যে মতবাদ লিপিবদ্ধ ক'রে যান, তারই উপর নব্য রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বনিয়াদ দাঁড়িয়ে আছে

বলা যেতে পারে। ১৫১৩ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Il Principe-এর রচনা শেষ হয়। "মেকিয়াভেলির রাজনীতি" তারই অনুবাদ। রাষ্ট্র-পরিচালনে নীতির স্থানকে পরিবর্জ্জন করায় ম্যাকিয়াভেলির অদৃষ্টে জুটেছে কেবল পরিবাদ। শুধু তাই নয়, সাধাধণের কাছে তিনি সয়তানের প্রতিভূ ব'লে পরিগণিত হ'য়ে থাকেন। মেকলে সাহেব তাঁর সম্পর্কে তো স্পষ্টই বলেছেন, "The terms in which he is commonly described would seem to impart that he was the Tempter, the Evil Principle, the discoverer of ambition and revenge, the original inventor of perjury, and that before the publication of his fatal *The Prince*, there had never been a hypocrite, a tyrant, or a traitor ; a simulated virtue, or a convenient crime".

কিন্তু এই অভিশপ্ত রাজনীতিকের পরিমিত পরিবাদ প্রাপ্য হ'লেও অভিভাববশত তাঁকে শুধু অভিঘাতই করা হয় নি, তাঁর নাম ভেঙ্গে অভিধানে নূতন অভিধারও সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ Il Principe-এর মধ্যস্থতায় তিনি কোন শাশ্বত সত্য প্রচার করবার চেষ্টা করেন নি। অবস্থাবিশেষে রাষ্ট্রের কর্ণধারের কোন্ উপায় অবলম্বন করা উচিত, এই পুস্তকে সেই সম্পর্কে তাঁর নানা নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু মজা এই, এত নিন্দাবাদ সত্ত্বেও অভিচারের জড় আজও মরে নি দেখা যাচ্ছে। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সিবিলীয় সুর যে অনুচ্চারিত ছিল, তার প্রমাণ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে অভিব্যাপ্ত। কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি যোগায় নি, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ থাকার জন্য সহজেই একে অন্যের পরিপূরক হয়েছিল। এ-কথা ম্যাকিয়াভেলি অকপটে প্রকাশ করেছেন যে, কূটনীতির সরণী যেমন সর্পিল, তার পরিণামও তেমনি দূর-বিসর্পী। এবং শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের তরণী পাছে মাঝ দরিয়ায় ভরা-ডুবি হয়, সেই ভয়ে নীতির ভারকে তিনি পারে রাখারই পক্ষপাতী।

ম্যাকিয়াভেলির লোকোত্তর প্রতিভায় একদিকে যেমন গড়ে উঠেছে নব্য রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, অপর দিকে তেমনি ইটালীয় গদ্য-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। একজন সমালোচক এমন কথাও বলেছেন যে, ইটালীয় গদ্যকে তিনি যে শুধু নূতন

খাতে চালিয়েছেন তা নয়, আধুনিক রচনা-রীতির উৎকর্ষের পরিচয়ও সর্ব্বপ্রথম তাঁর রচনাতেই পাওয়া যায়।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ ক'রে মনোরঞ্জনবাবু বাংলা সাহিত্যের উপকার করেছেন। অনুবাদের ভাষা সহজ ও স্বচ্ছ। এক শিলিঙ সিরিজের বই প'ড়ে যাঁরা সর্ব্ব-বিদ্যার অধিকারী হ'তে চান, এ-বই পড়ার তাঁদের ধৈর্য্য থাকবে কিনা জানি না—তবে রাজনীতির 'ছাত্রদের' কাছে ম্যাকিয়াভেলি অপরিহার্য্য।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাচীন হিন্দুস্থান—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত। (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়)

বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে নানা পাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়েছে। এ উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই, তার প্রয়োজনীয়তাও আমাদের নিকট ক্রমশঃ স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। পাঠ্য গ্রন্থের অল্পপরিসর গণ্ডির ভিতর সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সরল ভাবে সন্নিবিষ্ট করা দুরূহ সন্দেহ নাই। 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র যে দুখানি পুস্তিকা আমরা পেয়েছি, নিরাশ হই নি; বরং আশা আরও পুষ্ট হ'য়েছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরিচালনায় মনীষী পণ্ডিত-গণের সহায়তায় এই সুমহৎ উদ্দেশ্য সার্থক হ'য়ে উঠবে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য লোক সমাজে পরিবেষণ করবার ভার প'ড়েছে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর উপর। সুধী সমাজে তিনি সুপরি-চিত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বাহন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান গভীর। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সাধারণের নিকট সন, তারিখ, ঘটনাপঞ্জী নিয়ে বিবাদ বিতর্কের আলোচনা সভা। সাধারণের প্রবেশাধিকার সেখানে নেই। অনধিকারী ব'লে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও সে দিকে পা' বাড়াতে সাহস পান না। কিন্তু ইতিহাসের সংজ্ঞার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। তারিখ আর ঘটনা-পঞ্জীই ইতিহাস নয়, ইতিহাসের কাঠামো মাত্র। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁর "প্রাচীন হিন্দুস্থানে" প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কাঠামোর উপর তার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। সেটাই প্রকৃত ইতিহাস; সে ইতিহাসে বাদবিসং-

বাদের স্থান নাই। আর সে রূপের সবটাই অনুমান নয়, তার পরিচয় ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের পাতায় পাতায় আছে।

'ভূবৃত্তান্ত' আর 'ইতি বৃত্তান্ত' এই দুইটী অংশে ক্ষুদ্র এই পুস্তিকাখানি বিভক্ত। 'ভূবৃত্তান্তে' ভূমণ্ডল, ভারতবর্ষের অবস্থান, গঠন, প্রকৃতি, আবহাওয়া প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সন্নিবিষ্ট আছে। আর 'ইতিবৃত্তান্তে' আছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের সভ্যতার ইতিহাস আর তাদের মূলগত ঐক্যের কাহিনী। ভারতবর্ষের বাহিরেও ভারতীয় সভ্যতার অভিযান—এই বৃহত্তর ভারতের পরিচয় আছে 'অণুহিন্দুস্থান' নামক এক অধ্যায়ে।

ভূবৃত্তান্তের জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সহজ সরল ও সরস আখ্যায়িকার মতই সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে ইতিবৃত্তান্তে ভুল ভ্রান্তি থাকলেও প্রাচীন হিন্দুস্থানের যে-রূপ লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন সে-রূপের সত্যতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে না। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Rene Grousset-ও ভারতীয় সভ্যতার এই রূপই দেখাবার চেষ্টা ক'রেছেন।

ভাষা সহজ সাবলীল হ'লেও মাঝে মাঝে 'বীরবলী' ছাঁদে সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হ'তে পারে নি, যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা তা'র রচনায় জনসাধারণের মাপকাঠির সহিত সমতা রক্ষা করার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয়।

শ্রীসরসী সরস্বতী

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।